ফোটোগ্রাফি-অভিধান

রবি দত্ত

বাণীশিল্প

২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ
এপ্রিল ১৯৯৪

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
অরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ
হিরণ মিত্র

ফোটোগ্রাফি আমাদের জীবনের সঙ্গে আজ এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাকে ছাড়া আমাদের জীবনযাত্রা কল্পনাই করতে পারি না। পত্র-পত্রিকা বা সিনেমা-টিভি-র সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহার ছাড়াও রোগ নির্ণয়, লাইব্রেরির বই সংরক্ষণ, আবহাওয়ার খবর সংগ্রহ বা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার মত প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ফোটোগ্রাফি অপরিহার্য। বস্তুত ফোটোগ্রাফির ক্ষমতা ও প্রয়োগ এত ব্যাপক ও বহুমুখী যে তাতে নানান বিভাগের ব্যবস্থা করতে হয়েছে—যেমন, মেডিক্যাল ফোটোগ্রাফি, ইনডাস্ট্রিয়াল ফোটোগ্রাফি, স্পেস ফোটোগ্রাফি, ওসেনো ফোটোগ্রাফি, মাইক্রো ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি।

আবার অপর দিকে ফোটোগ্রাফি আমাদের দেখতে শেখায়, যেটা অনেকেই সচেতনভাবে অনুভব করি না। আমাদের দুই চোখ দিয়ে প্রতিদিন হাজারো জিনিষ দেখছি, কিন্তু ক'টা জিনিষ ঠিকমত লক্ষ্য করছি? ফোটোগ্রাফি আমাদের দেখার ক্ষমতা বাড়ায় ও বিশেষ একভাবে দেখতে শেখায়।

ছবি তোলা সহজ। প্রযুক্তি তাকে সহজতর করেছে। কিন্তু ফোটোগ্রাফি চর্চা, দৃষ্টির চর্চা, দৃষ্টিকে দর্শনে রূপ দেবার চর্চা। ছবি তোলার শখ যাদের আছে, এই চর্চা সম্পর্কে তাদের সচেতন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সেজন্য 'ফোটোগ্রাফির নান্দনিক বিচার' মুখবন্ধ হিসাবে আলোচিত হয়েছে। এই অংশে আমরা নিছক তথ্য ছাড়িয়ে গিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি। কিছু সূত্র, কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। দেখানো হয়েছে, ফোটোগ্রাফির মধ্য দিয়ে কি করে বিবিধ প্রসঙ্গের গূঢ় অর্থ ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য ধরা পড়ে।

ফোটোগ্রাফি কারিগরি নির্ভর শিল্প মাধ্যম। তাই একে যথাযথভাবে আয়ত্ত করে ঠিকমত ব্যবহার করার জন্য কলাকৌশলের ওপরেও আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি। এতে কারিগরি জ্ঞানের কথা প্রাধান্য পেলেও কারিগরি দক্ষতার সঙ্গে শিল্পবোধকে সমন্বিত করার প্রয়োজন সম্বন্ধে বার বার সচেতনও করেছি।

এই বই লিখতে গিয়ে বহু বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। সবিশেষ সাহায্য পেয়েছি Focal Encyclopedia of Photography, C. B. Neblette-র Photography its materials and processes (6th Ed), Derek Bowskill-এর Photography Made Simple, John Hedgecoe-এর The Photographer's Handbook, Dr. T. Lally-র ব্যক্তিগত কিছু কাগজপত্র ও ধীমান দাশগুপ্ত-র লেখা 'রঙ' বইটি থেকে। বস্তুত এ বইটি লেখার ব্যাপারেও ধীমানের নিরন্তর উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা এবং প্রকাশক অবনীন্দ্রর অদম্য উৎসাহ ও আগ্রহ ছাড়া এ বই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। লৌকিক

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে তাদের ঋণ শোধ হবার নয়। অঙ্কনের কাজে সাহায্য পেয়েছি শশী দত্তের।

অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের তুলনায় ফোটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয় অনেক কম। কিন্তু শিশু মনস্তত্ত্ব বা দাম্পত্য বিষয়ে জ্ঞান যেমন শিশুর ক্রমবিকাশ বা পারিবারিক জীবনকেই সাধারণভাবে সমৃদ্ধ করে, তেমনি ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে জ্ঞান শুধু যে আমাদের ভালো ছবি তুলতে বা ছবি ভালো ভাবে আস্বাদন করতে সাহায্য করে তাই নয়, আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রাকে আরও ভালো ক'রে ও ঠিকভাবে বুঝতেও সাহায্য করে। কেননা সমস্ত শিল্পমাধ্যমের মধ্যে ফোটোগ্রাফিই বোধহয় প্রকৃত অর্থে সবচেয়ে বেশি গণমাধ্যম।

বইটির প্রথম প্রকাশের পর আলোকচিত্র বিষয়ে আগ্রহী কিছু মানুষের সঙ্গে আলোচনার ফলে দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ছাড়াও 'এক্সপোজার' ও 'রাসায়নিক সংগঠন' নামে দুটি অংশ সম্পূর্ণ নতুন যোগ করা হল।

৯.৪.'৯৪ রবি দত্ত

রীতা, বাবুন, সৌ ও রাজাকে—

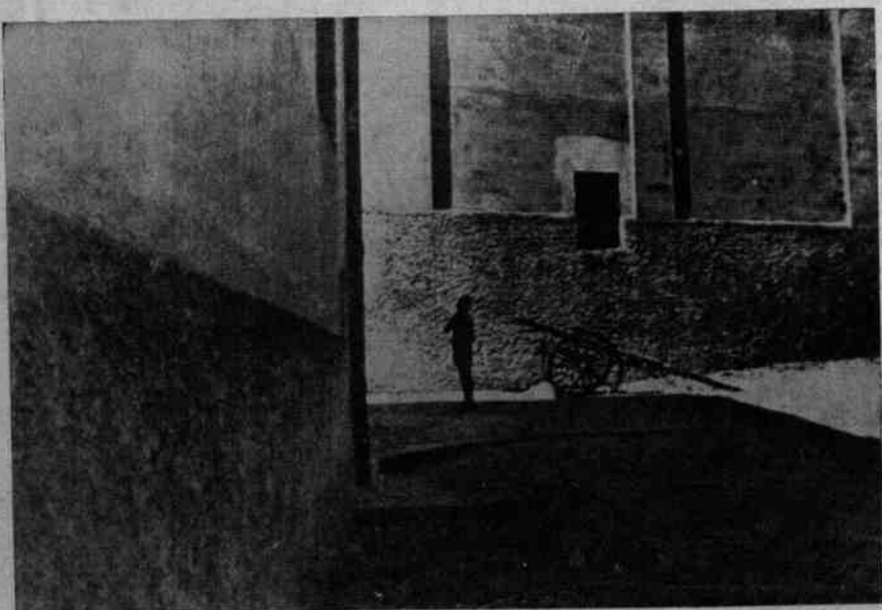
সূচীপত্র



Yu. Lushin



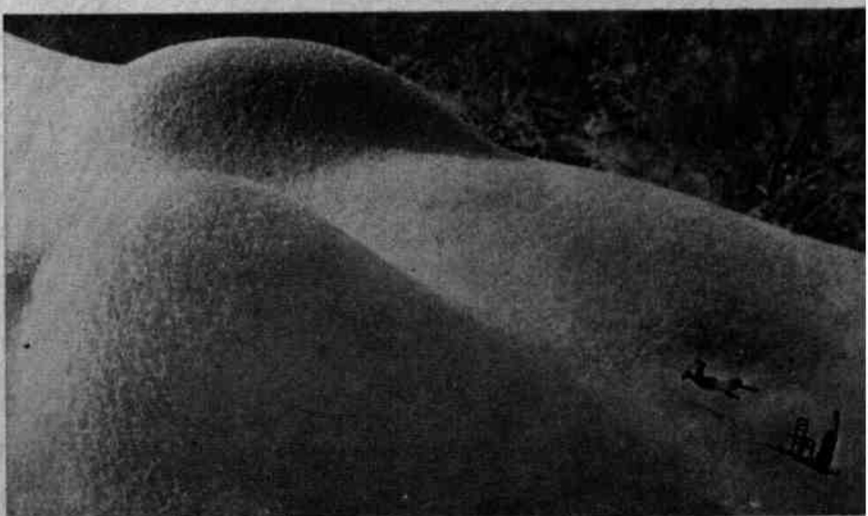
Marc Riboud



Henri Cartier-Bresson



V. Drachyov



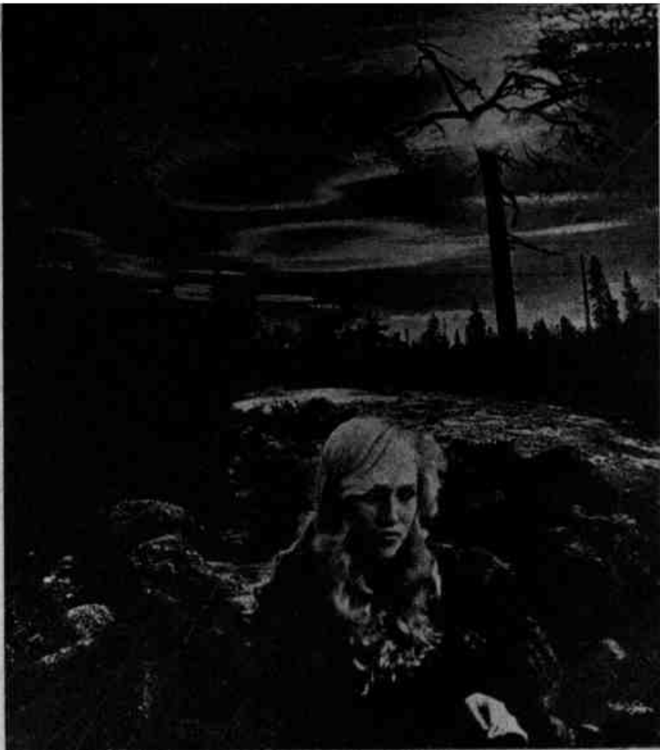
Robert Doisneau



Julia Margaret Cameron



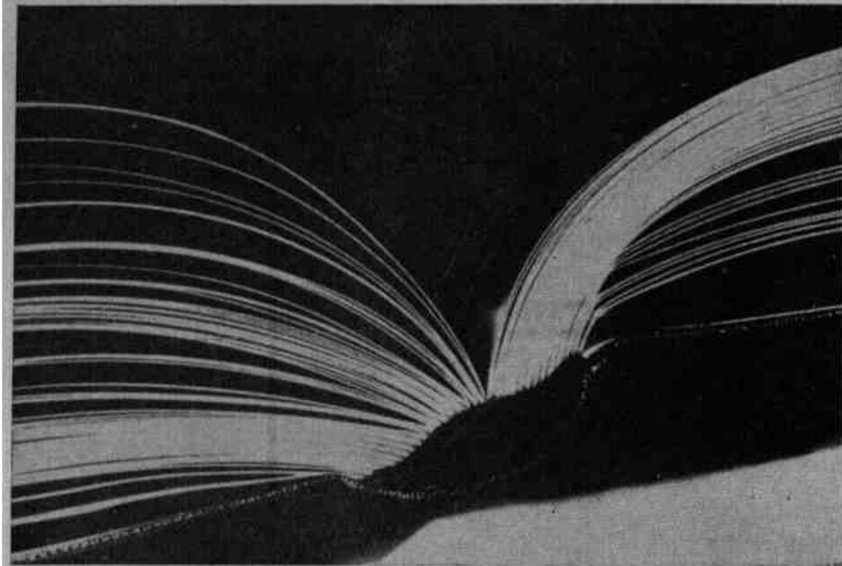
Yousuf Karsh



N. Rudakov



Philippe Halsman



Hein Gorny



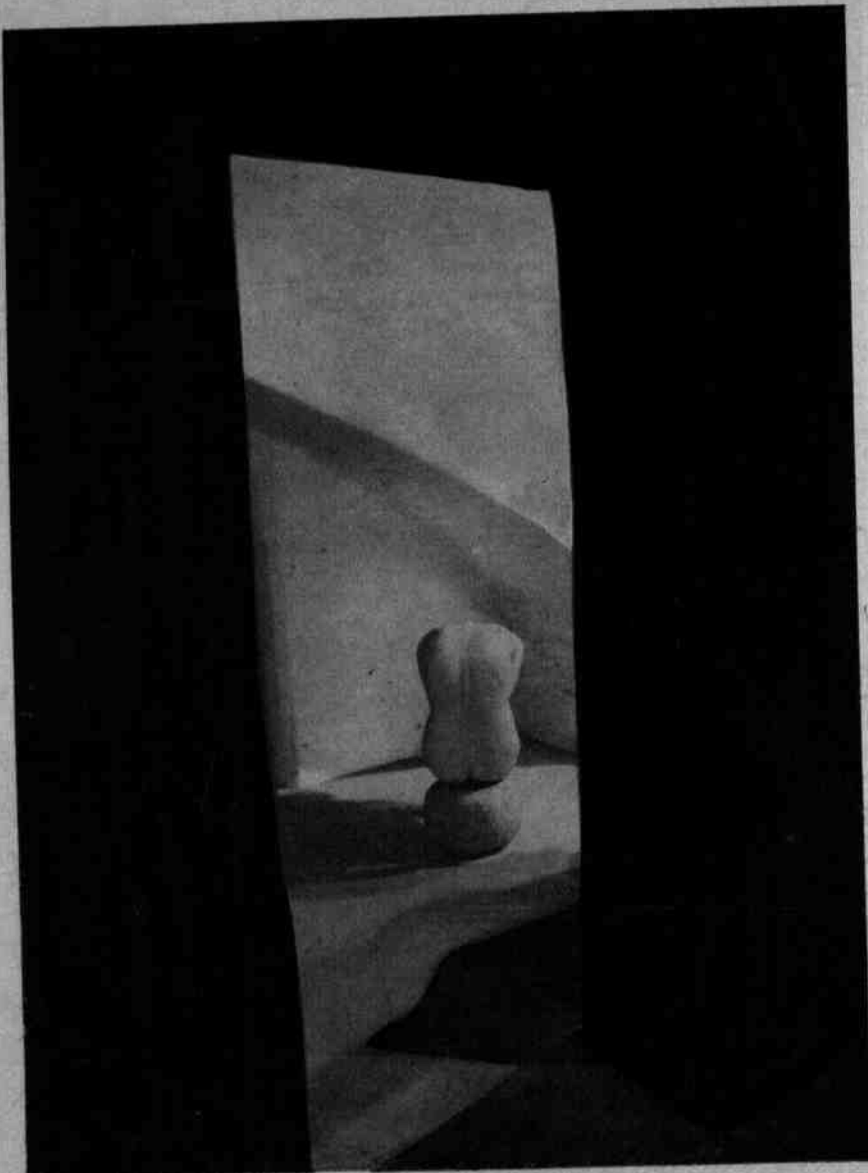
Man Roy



H. Heidersberger



D. O. Hill &
R. Adamson



Siegfried Wallner

মুখবন্ধ

ফোটোগ্রাফির নান্দনিক বিচার

তথ্য ও তত্ত্বের কোলাজ ও মনতাজ

ফোটোগ্রাফি কী ?

আমাদেব কৌতূহলের সবচেয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ফোটোগ্রাফিতে—*শোপেনহাওয়ার*

ফোটোগ্রাফি প্রকৃতিকে চিত্রিত করার একটা উপায় মাত্র নয়, তা প্রকৃতিকে পুনরুৎপাদিত হবার ক্ষমতাও যুগিয়েছে । —*লুই দাগোর*

কোন কোন গণতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন লেখকের পক্ষে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ফোটোগ্রাফি হল জনসাধারণের মধ্যে চিত্রকলা ও ইতিহাস সম্পর্কে বিরাগ ছড়িয়ে দেবার একটা সস্তা পদ্ধতি । —*বোদলেয়র*

ফোটোগ্রাফি নিতান্ত বাইরের স্তরে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে.....কোন স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা মানুষেব দৃষ্টিশক্তিকে বর্ধিত করে না, বরং মাছির চোখের দৃষ্টির মতো এক আশ্চর্যজনকভাবে সরলীকৃত দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে । —*কাফকা*

ফোটো জমানো মানে টুকরো টুকরো ভাবে পৃথিবী জমানো....ফোটোগ্রাফ তাৎক্ষণিক ইতিহাস ও তাৎক্ষণিক সমাজতত্ত্ব সরবরাহ বা উপস্থাপিত করে, তাৎক্ষণিক অংশগ্রহণ সম্ভব করে তোলে । আর বাস্তবতাকে ধারণ করার এই নতুন মোড়কের মধ্যে রয়েছে এক উল্লেখযোগ্য উপশমকারিতা । —*সুজান সোনটাগ*

এই বাস্তবতা কতটা বাস্তব? —*Paul Watzlawick*

ছবি আঁকা ছেড়ে ছবি তোলা মানে সোনার খনি ছেড়ে রুপোর খনি থেকে খনিজ আহরণ । —*পিকাসো*

আমাদের প্রতিদিনের দর্শন ও চিত্রশিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মাঝামাঝি কোথাও ফোটোগ্রাফির অবস্থান । —*ফোকাল এনসাইক্লোপিডিয়া*

আমাদের চোখে-দেখার পক্ষে যা অতি দ্রুত, অতি মন্থর, অতি বৃহৎ, অতি ক্ষুদ্র, অতি গভীর, অতি সুদূর, অতি অস্পষ্ট, অতি উজ্জ্বল ফোটোগ্রাফি তা দেখাতে পারে ।

—*পিক্‌চার হিস্ট্রি অব্ ফোটোগ্রাফি*

আধুনিক সাহিত্য, দর্শন ও চিত্রকলায় যখন 'মানুষের বিনাশ' এই থিমের প্রাধান্য বাড়ছে, ফোটোগ্রাফি তখন মানুষ ও মানবীয় আদর্শের ধ্বংসের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াচ্ছে ।—*ইভানভ*

সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচরণ, বাস্তব ও অধিবাস্তব, উদ্দেশ্যমূলকতা ও আবেগময়তা, ফোটোগ্রাফি হল প্রকৃতি, জীবন ও নিজের প্রতি ঋণস্বীকারের একটা উপায় মাত্র । তা অভিষিক্ত হয়ে থাকে এক বিষণ্ণতায়, এক ক্ষয়বোধে, এক নমনীয়তায় ।

ফোটোগ্রাফার কে ?

একটা ক্যামেরার—যা অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত যা আবার সংযুক্ত মস্তিষ্কের সঙ্গে—সাহায্যে ফোটোগ্রাফার আকর্ষণীয় দৃশ্য-উদ্দীপকের প্রতি তাঁর সৃজনশীল প্রতিবেদনকে প্রকাশ করেন । —*পিক্‌চার হিস্ট্রি অব্ ফোটোগ্রাফি*

কয়েকজন ফোটোগ্রাফারকে একই পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ ছেড়ে দিলে কেউ সেই দৃশ্যের ছবিকে করে তুলবেন নিষ্ঠুর, কেউ করে তুলবেন কোমল, কেউ করবেন পরিসংখ্যানের মতো শীতল ও নিরাসক্ত । ফোটোগ্রাফির চিত্রপ্রতিমা গণিতের সূত্রের মতো সুনির্দিষ্ট হতে পারে না, তার মধ্যে দ্ব্যর্থবোধকতা থাকতেই পারে ।

সমস্ত সুন্দর দৃশ্য আমি যার মুখোমুখি হয়েছি তাদের ধরে রাখার তীব্র বাসনা আমার ছিল, এবং শেষপর্যন্ত সেই বাসনার অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে ।—*মারগারেট ক্যামেরন*

সমস্ত আগ্রহী ফোটোগ্রাফার সর্বদা সব চাইতে সুন্দর চিত্ররূপের জন্য অনুসন্ধানরত, কিন্তু তাঁরা জানেন যে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং আশা করেন যেন তা কখনো খুঁজে না পাওয়া যায়, কেননা একমাত্র তাহলেই অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে ।

সমস্ত অসম্ভব অবস্থার মধ্যে মানুষ ও মানুষের মর্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে একজন ফোটোগ্রাফার বস্তুত তাঁর দেশের জাতীয় বিবেকচক্ষু হিশেবে কাজ করতে পারেন।

—*M. Meltzer.*

ফোটোগ্রাফিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে পাবার ক্ষমতা মোটের ওপর সীমিত, কেননা বহু গ্রন্থ প্রকাশক ও পত্রিকা সম্পাদক ইকোলজিক্যাল/সোশিওলজিক্যাল/সাইকোলজিক্যাল ফোটোগ্রাফারের কাছ থেকে ইকোলজিক্যাল/সোশিওলজিক্যাল/সাইকোলজিক্যাল পর্নোগ্রাফি প্রত্যাশা করেন ।

চিত্রশিল্পের পদ্ধতি হল যুত পদ্ধতি, শিল্পী তাঁর অন্তর্দর্শনকে একটু একটু করে প্রত্যক্ষ রূপ দেন । অন্যদিকে ফোটোগ্রাফার প্রত্যক্ষ বাস্তবের কাঁচামালকে একটু একটু করে কমিয়ে, সীমিত করে এবং অপরিহার্য উপাদান থেকে আনুষঙ্গিক উপাদানকে পৃথক করে কাজ করেন অল্পবিস্তর বিযুত পদ্ধতিতে । —*ফোকাল এন্‌সাইক্লোপিডিয়া*

যিনি ফোটো তোলেন তিনিই ফোটোগ্রাফার নন । ক্যামেরাম্যান ও ফোটোগ্রাফারের মধ্যে এই পার্থক্য আছে যে ক্যামেরাম্যানের মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই, কিন্তু ফোটোগ্রাফারের মধ্যে থাকবে নানান দ্ব্যর্থতা, দ্বান্দ্বিকতা, দ্বিযোজ্যতা, দ্বিধাসমতা, তাঁর সৃষ্টি হবে বিভিন্ন সংঘাতের ফল ।

ফোটোগ্রাফারের শক্তি হল নৈতিক শক্তি । তাঁকে তাঁর কাজের ও সেই কাজের ফলাফলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে । তিনি পেশাদার হলে তবেই তা পুরোপুরি সম্ভব । —*ইউজিন স্মিথ*

ফোটোগ্রাফি কারও জীবিকা হওয়া উচিত নয়, তা এক প্রকারের সৃজন-স্বাধীনতা, ফোটোগ্রাফিকে জীবিকা হিশেবে নিলে এই স্বাধীনতা ব্যাহত হয় । —*ফুং ল্যাম*

তিন ধরনের ফোটোগ্রাফার

বলা হয়, একজন ফোটোগ্রাফার কোন বিষয়বস্তুকে চিত্রিত করার চেষ্টা করতে পারেন তিন ভাবে—বিজ্ঞানীর সূক্ষ্মতা নিয়ে, কবির সংবেদনশীলতা নিয়ে, বা সাংবাদিকের দায়িত্ববোধ নিয়ে । Steichen -এর মতো বিজ্ঞানী-ফোটোগ্রাফার একটা কালো ভেলভেট পটভূমির সামনে সাদা কাপ ও সসার রেখে এক হাজার বারেরও বেশি ছবি তুলে পরীক্ষা করেছিলেন । Stieglitz -এর মতো কবি ফোটোগ্রাফাররা আলোকচিত্রকে শুধুই দৃশ্যনির্ভর না রেখে তাকে একটা 'প্রগাঢ় দর্শন' করে তোলারও চেষ্টা করেছেন, যেমন আলোকচিত্রের আবির্ভাবের পর থেকে কবিতায় ক্রমে ক্রমেই দৃশ্যরসের প্রাধান্য বেড়েছে । সুজান সোনটাগের মতে কোন কোন আলোকচিত্রীর শিল্পায়াস বৈজ্ঞানিকতায় স্থাপিত, কারও কারও স্থাপিত নীতিবাদে । ফোটোগ্রাফির সমগ্র ইতিহাসকে দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্যর মধ্যকার দ্বন্দ্ব রূপে ধরা যেতে পারে : সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সত্যভাষণের, প্রথম প্রবণতাটি এসেছে কবিতা ও ললিতকলার ঐতিহ্য থেকে, দ্বিতীয়টি একদিকে বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার অন্য দিকে উনিশ শতকের স্বাধীন সাংবাদিকতার ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত এক নীতিবাদী আদর্শ । বৈজ্ঞানিকতা ও সাংবাদিকতা এইভাবে কখনো মিলেমিশেও যেতে পারে ।

বস্তুত বিজ্ঞানী, কবি, সাংবাদিক—এই যে তিন ধরনের কথা প্রথমে বলেছি সেগুলো কিছুটা পরস্পরের সংলগ্ন । এমন অনেক আলোকচিত্রী রয়েছেন যাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণক্ষমতা ও কবির প্রসাদগুণের সমন্বয় ঘটেছে । শিল্পসমালোচকরা অভিযোগ করেছেন, ফোটোগ্রাফাররা বহু ফোটোগ্রাফকে নিতান্ত সাদামাটা কারণেই মাস্টারপীস বলে অভিহিত করে ফেলেন । এ যেন যথেষ্ট ভালো জানা নেই এমন কোন বিদেশি ভাষায় কবিতা পড়ার মতো । সেই কবিতা আসলে যতটা ভালো তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো বলে কল্পনা করা হয় । আবার উল্টোটাও সত্যি । সেই কবিতা অনেক সময় খুব ভালো হলেও তার ভালোত্ব, নিজের ভাষার দীনতার জন্য, পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না । শৈলী বা প্রবণতার বিচারে নয়, আমি অন্য এক ভাবে, স্বভাবের দিক থেকে, তিনটি ধরনের প্রস্তাব করছি : যুদ্ধের সৈনিক বা ক্রিকেট খেলার ব্যাটসম্যানের মতোই ফোটোগ্রাফাররাও মূলত এই তিন ধরনের—অনুগত, উদ্ধত ও হঠকারী । প্রতিটি ধরনেরই আবার দুটো করে ভাগ রয়েছে : শান্ত ভাবে অনুগত ও শশব্যস্ত ভাবে অনুগত, কঠোর ভাবে উদ্ধত ও সুকৌশলী ভাবে উদ্ধত, অক্ষতিকর হঠকারী ও অনৈতিক হঠকারী ।

নানা ধরনের ফোটোগ্রাফি

অ্যারোফোটোগ্রাফি
অ্যাস্ট্রোফোটোগ্রাফি
ক্যানডিড্ ফোটোগ্রাফি
ক্রোমোফোটোগ্রাফি
ক্রোনোফোটোগ্রাফি
সিনেমাটোগ্রাফি
সিনেফোটোমাইক্রোগ্রাফি
সিস্টোফোটোগ্রাফি
হেলিওফোটোগ্রাফি
ইন্‌ফ্রারেড ফোটোগ্রাফি
ম্যাক্রোফোটোগ্রাফি
মাইক্রোফোটোগ্রাফি
মিনিয়েচর ফোটোগ্রাফি
ফোনোফোটোগ্রাফি
ফোটোগ্রামেট্রি
ফোটোমাইক্রোগ্রাফি
ফোটোস্পেকট্রোহেলিওগ্রাফি
ফোটোটোপোগ্রাফি
ফোটোটাইপোগ্রাফি
ফোটোটাইপিং
পাইরোফোটোগ্রাফি
রেডিওগ্রাফি
রেডিওফোটোগ্রাফি
স্কাল্‌প্‌টোগ্রাফি
স্কাইঅ্যাগ্রাফি
স্পেক্‌ট্রোহেলিওগ্রাফি
স্পেক্‌ট্রোফোটোগ্রাফি
স্ট্রোবোস্কোপিক ফোটোগ্রাফি
টেলিফোটোগ্রাফি
ইউর‍্যানোফোটোগ্রাফি
এক্স-রে ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি

নানা ধরনের ক্যামেরা

এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ ক্যামেরা
বক্স ক্যামেরা
ক্যামেরা লুসিডা
ক্যামেরা অবস্কুরা
ক্লোজ-আপ ক্যামেরা
কালার ক্যামেরা
ইলেক্‌ট্রোপ্লেন ক্যামেরা
আই ক্যামেরা
ফিল্ড ক্যামেরা
ফ্ল্যাশ ক্যামেরা
ফোল্ডিং ক্যামেরা
হাফ্-ফ্রেম ক্যামেরা
মিনিয়েচর ক্যামেরা
প্যানোরামিক ক্যামেরা
ফোটোফিনিশ ক্যামেরা
পিনহোল ক্যামেরা
পলিপোজ ক্যামেরা
পোরট্রেট স্টুডিও ক্যামেরা
প্রেস ক্যামেরা
প্রসেস ক্যামেরা
কুইক-ফায়ার ক্যামেরা
রিফ্লেক্স্ ক্যামেরা
স্কিমিড্ ক্যামেরা
স্পাই ক্যামেরা
স্টিরিওস্কোপিক্ ক্যামেরা
টেকনিক্যাল ক্যামেরা
আলট্রা-মিনিয়েচর ক্যামেরা
আন্ডার-ওয়াটার ক্যামেরা ইত্যাদি

নানা ধরনের বিষয়বস্তু

বিমূর্ত
আকাশ
মহাশূন্য
জীবজন্তু
প্রত্নতত্ত্ব
পুরাকৃতি
স্থাপত্য
শিশু
উৎসব, অনুষ্ঠান
শিকার
পাখি
তাৎক্ষণিকতা
বিড়াল
গুহা
চীনামাটির পাত্র
সিনেমা
সার্কাস
ক্লোজ-আপ
মুদ্রা
প্রতিলিপি
নৃত্য
কুকুর
ফ্যাশন
আঙুলের ছাপ
বাজির দৃশ্য
ফুল
খাদ্যদ্রব্য
কুয়াশা
বাগান
ভূতত্ত্ব
গ্রোমার
কাচের পাত্র
দল
হাত
বরফ
কীটপতঙ্গ
ঘোড়া
ঘরের অভ্যন্তর
অলংকার
প্রকৃতি
বিদ্যুৎ
যন্ত্রপাতি
পুঁথি, পাণ্ডুলিপি
জাহাজ
মডেল
চন্দ্রালোক
মোটর রেসিং
পাহাড়
দেয়ালচিত্র
শহরদৃশ্য
নৈশদৃশ্য
নগ্ন নারী
চিত্রকলা
প্যানোরমা
গৃহপালিত জীবজন্তু
ডাকটিকিট
প্রচ্ছদ
প্রতিকৃতি
ঝড়বৃষ্টি
সরীসৃপ
ভাস্কর্য
সমুদ্র
সমুদ্রতীর
আত্মপ্রতিকৃতি

দোকানের শোকেস	টেলিভিশন পর্দার ছবি
রুপোর বাসনকোসন	নাট্যানুষ্ঠান
তুষার	রেলগাড়ি
যৌনক্রিয়া	ভ্রমণ
খেলাধুলো	গাছপালা
লোকজন	বিবাহানুষ্ঠান
খেলনা	শীতকালীন ক্রীড়া
কাজকরা কাঁচের জানলা	চিড়িয়াখানা
স্থিরদৃশ্য	মৃত ব্যক্তি
যুদ্ধ	নবজাতক
দুর্ঘটনা	টেবিল টপ
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত	এরিয়েল ভিউ ইত্যাদি ইত্যাদি

দর্শন ও দৃশ্যরস

সমস্ত দিনের আলোর উৎস হল সূর্য। এমনকি সূর্য যখন মেঘের আড়ালে পড়ে যায়, গ্রীষ্মকালের দুপুর হলে, তখনও সূর্যের আলোর তীব্রতা হয় ১০ হাজারটি বড় মোমবাতির আলোর অথবা বস্তু থেকে ৬ ফুট দূরত্বে বসানো ৪০০টি ফোটোফ্লাড ল্যাম্পের আলোর তীব্রতার সমান।

শিল্পী ও গবেষকরা যুগে যুগে এই আলোর প্রকৃতি, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক সূত্র নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। দর্শনের বৈজ্ঞানিক সূত্র ও ব্যক্তিগত দৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য —এই দুয়ের মধ্যকার অমিলের কথা তাদের জানা ছিল। এই বৈসাদৃশ্যের কথা সক্রেটিসের কথোপকথনে বারবার উঠেছে।

আমাদের চোখে সৃষ্ট প্রতিচ্ছবি চোখ-সংলগ্ন স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে সঞ্চারিত হলে আমাদের দর্শনের অনুভূতি জাগে। দর্শন একই সঙ্গে পদার্থবিদ্যক-মনোপদার্থবিদ্যক-মনোবিদ্যক এক জটিল পদ্ধতি। আমাদের চারপাশের জগত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য মন যে সমস্ত হাতিয়ার কাজে লাগায় দর্শন তার একটি। তা কোন বিচ্ছিন্ন, স্বয়ম্ভু, নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া নয়। মনের অন্যান্য ক্রিয়া ও আচরণের দ্বারা—যেমন, উদ্দেশ্য-স্মৃতি-অভিজ্ঞতা-জ্ঞান-চিন্তা-মূল্যবোধ—তা নিয়ত নিয়ন্ত্রিত। দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ও বিস্তার তাই আমাদের সামগ্রিক সচেতনতাকেই বৃদ্ধি করে ও তাকে আরো সক্রিয় করে তোলে।

আধুনিক কালে ফোটোগ্রাফি আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ব্যাপক সমৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিয়েছে। দর্শনের প্রাথমিক উপকরণগুলো ফোটোগ্রাফের মাধ্যমে চাক্ষুষ উদাহরণ হিশেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যে সব উপকরণের মধ্যে আছে সংগঠন, চিহ্নিতকরণ,

গুরুত্ব আরোপ, প্রকাশময়তা, সম্পর্ক, তথ্যমূলকতা, অনুধাবনের সঙ্কেত, এবং বিশেষত সাদা কালো ছবির ক্ষেত্রে বির্মূত-করণ। সাদা কালো ছবি আর রঙীন ছবি দেখার জন্য দুটো সম্পূর্ণ দু-ধরনের দৃষ্টি চাই। সাদা কালোয় দেখা মানে বস্তুকে বিমূর্ত করে নেওয়া; এইসব উপকরণের আবার দৃশ্যরসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দৃশ্যরস বা দৃশ্যগত আবেদন বলতে চোখকে আকৃষ্ট করার ও মনকে নিবিষ্ট করার ক্ষমতা। তা নির্ভর করে কী দেখানো হচ্ছে ও কে দেখছে দুয়ের ওপরই।

সংগঠন (organization)

দর্শনের বিভিন্ন উপাদান—আকার, আয়তন, রঙ, বুনন, ঔজ্জ্বল্য, অবস্থান ইত্যাদি—বিবিধ অনুভূতিগ্রাহ্য ধর্মের সাদৃশ্য অনুসারে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে। এই জ্যামিতিক প্রবণতার পেছনে সংগঠন ক্রিয়াশীল।

চিহ্নিতকরণ (identification)

যদিও কোন বস্তুর দর্শনগত পরিচিতির জন্য বস্তুর প্রধান প্রধান অক্ষ ও অনুপাতের শুধুমাত্র সাংগঠনিক কাঠামোই যথেষ্ট তবু চিহ্নিতকরণ বস্তুকে শুধু চিনতে পারার ক্ষমতার চাইতে বেশি কিছু কেননা তার সঙ্গে বস্তুর বিবিধ অনুষঙ্গ জড়িয়ে পড়তে পারে।

গুরুত্ব আরোপ (emphasis)

ছবিতে বস্তুর আকার, রঙ ও বুননের সমস্ত অনুপুঙ্খের মধ্যেই বস্তুর প্রধান দর্শনগত বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট প্রাধান্য থাকা চাই। প্রধান দর্শনগত বৈশিষ্ট্য কী হবে তা নির্ভর করে ছবিটির উদ্দেশ্যের ওপর।

প্রকাশ (expression)

প্রকাশময় হওয়ার জন্য বস্তু বা দৃশ্য দর্শনগত ভাবে সুস্পষ্ট এবং অনুভবগত ভাবে গোছালো হওয়া চাই। বস্তুর দৃষ্টিগ্রাহ্য ধর্ম যে সমস্ত অনুভূতিগ্রাহ্য শক্তির সঞ্চার করে তা থেকেই প্রকাশময়তার জন্ম।

সম্পর্ক (function)

দর্শনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্কের ঐক্য বা প্রকাশযোগ্য অনৈক্য থাকতে পারে। একগুচ্ছ আঙুর, এক বোতল মদ ও একখানা কাঁচের গেলাস—এ হল সম্পর্কের ঐক্যের উদাহরণ।

তথ্যমূলকতা (knowledge)

বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব বা সত্য যাইহোক না কেন ছবি থেকে কোন্ তথ্য বা বাস্তবতা বেরিয়ে আসবে তা নির্ভর করে মূলত ছবির প্রকাশভঙ্গির ওপর।

অনুধাবন (contemplation)

বস্তুজগতের বস্তু ছবির জগতে এসে অন্য চেহারা পায়। আমাদের দৈনন্দিন দৃষ্টি ব্যবহারিক, তা নির্বাচনসাপেক্ষ দর্শন। কিন্তু যখন আমরা আঁকা ছবি, ফোটো বা

সিনেমা দেখছি তখন আমরা নির্বাচন করার সুযোগ পাচ্ছি না, যা আমাদের দেখানো হচ্ছে সেটাই আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করছি । অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে নির্বাচন ও অবলোকন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত ও অনুধাবন ।

বিমূর্ত-করণ (abstraction)

ফোটোগ্রাফিতে অদৃশ্য প্রতিচ্ছবি যখন দৃশ্যমান হয় তখন বলা হয় 'the latent image is reduced to a visual image' । বিমূর্ত অবস্থা থেকে মূর্ত রূপ পাওয়া মানে তাই এক ধরনের 'reduction' । কোন বস্তুর সাদা কালো প্রতিচ্ছবি মানে তাতে রঙের বিভিন্ন সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত রয়েছে কিন্তু রঙীন প্রতিচ্ছবি মানে তাতে একটিই সুনির্দিষ্ট বর্ণবিন্যাস ।

দর্শনের এই উপকরণগুলি বিশেষত ছবির আঙ্গিককে তৈরি করে দেয় : শৈলীর সুস্পষ্টতা, নকশার ভারসাম্য এবং দৃষ্টিকোণ/অবস্থানানুপাত/ বা দর্শনের অন্যান্য উপাদানের বিশেষত্ব, যার ফলে ছবি শুধুমাত্র আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও নিজেকে চিহ্নিত করতে পারে ।

শৈলীর সুস্পষ্টতা বিষয়বস্তুকে তীক্ষ্ণতা ও পরিমিতি দেয় এবং বস্তুকে পরিবেশের সামান্য সীমা ছাড়িয়ে তুলে আনে । নকশার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে, যে নকশা বা নকশার যে ভারসাম্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ তাতে দর্শকের আগ্রহ জাগে কম । নকশায় জটিলতাকে যত দক্ষভাবে ভারসাম্য দেওয়া যায় তত ভালো । দর্শক যদি নকশার রহস্য ও বর্ণরীতিকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করে উঠতে পারে তাহলে সেই সাফল্য তার নান্দনিক তৃপ্তিকেও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় । দর্শনের বিভিন্ন উপাদানের সক্রিয় বৈশিষ্ট্য ছবিতে জোরালো গতিবেগ ও গভীর চিত্ররসের সৃষ্টি করে ।

এই আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও দৃশ্যরস বা দৃশ্যগত আবেদন হতে পারে আরো দু-ধরনের—নতুনত্বের অভিঘাত ও আবেগগত প্রতিক্রিয়া । নতুনত্ব বা কৌতূহল সৃষ্টি করা যেতে পারে ছবির ব্যক্তিমূল্য, সংবাদমূল্য বা প্রদর্শিত ক্রিয়াকর্মের আকর্ষণীয়তার সাহায্যে । আবেগগত প্রতিক্রিয়া কতকগুলি বিশেষ মানবিক অনুষঙ্গের সঙ্গে জড়িত : যেমন যৌনতা, পরিত্রাণ, নিজের অভিজ্ঞতা, অন্যের সাফল্য, বিলাস ও অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি । এইসব অনুষঙ্গের প্রত্যেকটিই আবার ব্যক্তিমূল্য, সংবাদমূল্য ও প্রদর্শিত ক্রিয়াকর্মের তারতম্য অনুসারে কম বা বেশি ফলপ্রদ ।

বস্তুজগতের বস্তু ছবির জগতে এসে হয়ে পড়ে ফ্রেমে সীমাবদ্ধ হয়ে ধারাবাহিকতা-বিচ্ছিন্ন, বৃহত্তর সম্পর্ক-হীন হয়ে খণ্ডরূপ, ত্রিমাত্রিক অবস্থা থেকে দ্বিমাত্রিক রূপারোপে পর্যবসিত । ক্যামেরা বস্তুকে শুধু স্থানগত ভাবে নয়, কালগত ভাবেও ধরে, সময়ের ধারাবাহিকতা থেকে একটা তাৎক্ষণিক মুহূর্তকে তুলে নেয় । কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের চিত্রাভিজ্ঞতা কালগত নয়, শুধুই স্থানগত, ছবিতে সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । এরই বিকশিত, চূড়ান্ত রূপ চলচ্চিত্র—যা একটি কালাশ্রয়ী মাধ্যম যে সময়কে ধরে রাখতে হয় স্থানের আধারে।

অবস্থানানুপাত ও কম্পোজিশন

বস্তুজগতের ত্রিমাত্রিক বস্তু বা দৃশ্য ছবিতে দ্বিমাত্রিক রূপারোপে পর্যবসিত । ফলে গভীরতা ও আয়তন বোঝাবার ক্ষমতা ফোটোগ্রাফের নিতান্ত সীমাবদ্ধ । ত্রিমাত্রিকতার একটা বোধ বা আভাস মোটামুটি কার্যকারী ভাবে আনা হয় অবস্থানানুপাতের মাধ্যমে, ওভারল্যাপ করে, আলো-ছায়ার বা আলোকের বৈপরীত্যের সাহায্যে ।

নন্দনতাত্ত্বিকদের মতে 'অবস্থানানুপাতের যুগ'-টির সূচনা হয়েছিল রেনেসাঁসের কালে । ত্রিমাত্রিক স্থান ও আয়তনের দ্বিমাত্রিক রূপারোপে 'সঠিক' অবস্থানানুপাত কী হবে তা নিয়ে দাভিঞ্চি বিস্তর অনুশীলন ও গবেষণা করেছিলেন ।

অবস্থানানুপাতে, দূরত্বের তারতম্য আয়তনের তারতম্য বা অপসারী রেখা দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে । আমাদের চোখের দৃষ্টিক্ষেত্র ৫০° কৌণিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ । অবস্থানানুপাত শুধু এই দৃষ্টিকোণের উপরই নির্ভর করে থাকে । যে নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ লেন্সের দৃষ্টিকোণ, কোন ছবি তোলা হয়, অবস্থানানুপাত একমাত্র সেই দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতেই সঠিক ।

দূরত্ব অনুসারে বর্ণেরও কিছু তারতম্য হয় । বর্ণমাত্রের পার্থক্য তেমন না হলেও, সংপৃক্তি ও ঔজ্জ্বল্য যথেষ্টই পরিবর্তিত হয়ে থাকে । দাভিঞ্চি প্রমুখ শিল্পীরা তাই তাঁদের ছবির পটভূমি, মধ্যভূমি ও পুরোভূমির জন্য তিন ধরনের রঙ ব্যবহার করতেন । এটাও অবস্থানানুপাতের একটা দিক । রঙীন ফিলমের বর্ণসংবেদনশীলতা আমাদের চোখের বর্ণসংবেদনশীলতা থেকে একটু আলাদা । তাই একই নাক্ষত্রমাত্রার একটা লাল তারা ও একটা নীল তারার মধ্যে খালি চোখে লাল তারাকে উজ্জ্বলতর ও রঙীন ফিলমে নীল তারাকে উজ্জ্বলতর দেখাবে ।

দর্শনের যেকোন উপাদানের মতো অবস্থানানুপাতও কম্পোজিশনেরই অঙ্গ ও হাতিয়ার । কম্পোজিশনের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম হয় না, তার কয়েকটা শুধু চারিত্রিক ইঙ্গিত দেব ।

কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আনুপাতিক বিচারে, নন্দনতত্ত্বের ভাষায় যাকে বলা হয় সোনালি বিভাজন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে কেননা তা যে কোন কম্পোজিশনকেই সাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক করে । এর ফলে সাংগঠনিক সুসংবদ্ধতাও আসে । এতে কেন্দ্রীয় বা প্রধান বস্তুকে দিয়ে ছবির বিভাজন ২:৩ অনুপাতের কাছাকাছি, আসল অনুপাতটা ১:১.৬১৮, বিভাজন প্রয়োজনে বিপরীত অনুপাতেও হতে পারে অর্থাৎ ৩:২-তে । একখানা ছবি কতগুলো ছোট, বড় ইউনিট নিয়ে গড়ে ওঠে । ছবিতে প্রধান ইউনিটের অবস্থান ও অন্যান্য ইউনিটের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছবির কেন্দ্রীয় বস্তুকে নির্দিষ্ট তাৎপর্যে বা ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে । সব মিলিয়ে এই ব্যাপারটাকেই বলা হয় বিন্যাস । বিন্যাস ছাড়া আর যা কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা হল : মাত্রা, টোন ও তীক্ষ্ণতা ।

অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে সমতা বা সাদৃশ্য থাকলে ছবির একক বৃহত্তম ইউনিটটিই

আমাদের মনোযোগ সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করবে, এটাই মাত্রার ব্যাপার। বৃহত্তম ইউনিটের তুলনায় প্রধান ক্ষুদ্রতম ইউনিটের অত্যধিক ক্ষুদ্রতা, অনুপাতের অস্বাভাবিক মাত্রার জন্যই সহজে দৃষ্টি-আকর্ষক হয়ে ওঠে। পটভূমির সঙ্গে কেন্দ্রীয় বস্তুর টোনের তারতম্য থাকা চাই, ছবিতে যদি টোনের মোটামুটি সমতা রাখা অনিবার্য হয় তবে অন্য কোন ভাবে কেন্দ্রীয় বস্তুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তা ছবির কোন একটা অংশকে তীক্ষ্ণ ও সানুপুঙ্খ করে ও অন্যান্য অংশকে অস্পষ্ট ও অনুপুঙ্খহীন রেখে করার রীতি বহু প্রচলিত। এইসব নিয়েই ছবির কম্পোজিশন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশিষ্ট কম্পোজিশনের কয়েকটা গুণ হল এই—

সরলতা—	বিন্যাসে, বিভাজনে ও জ্যামিতিক রূপবন্ধে
বৈপরীত্য—	রঙের, আলোছায়ার, বুননের বা আয়তনের
ভারসাম্য—	রঙের, টোনের ও আকারের
বৈচিত্র্য—	অবস্থানানুপাতে, নকশায়
ঐক্য—	নকশায়. নকশার সঙ্গে রঙের, দর্শকের অনুভূতিতে
পুনরাবৃত্তি—	নকশার, বুননের, আকারের
গুরুত্ব আরোপ—	কেন্দ্রীয় বস্তুতে, ছবির উদ্দেশ্যের ওপর
ভরবেগ—	বিষয়ের, টেনশনের মাধ্যমে, বা দর্শকের অনুভূতির।

ভালো কম্পোজিশনে এইসব গুণের কোন কোনটির কিছু কিছু অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীদের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় কম্পোজিশনের একটা নীতিই হল ছবিতে ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে 'চিত্রগত ত্রুটি' রাখা, যা দৃশ্যরসের দিক থেকে বা আবেগগতভাবে ছবিকে আরো ফলপ্রদই করে তোলে। ঠাট্টা করে বলা হয়— ছবির মূল কম্পোজিশন ছবি তোলার সময়ই মোটামুটি ঠিক করে নাও, তারপর কোন ভুল সংশোধন করতে হলে বা কোন ত্রুটি স্বেচ্ছায় রাখতে হলে তো এনলার্জার আছে।

বৈজ্ঞানিক ফোটোগ্রাফার

'Some photographers set up as scientists, others as moralists.' কথাটা সুজান সোনটাগের। প্রথম দলের লোকেরা নিজেদের বৈজ্ঞানিক ফোটোগ্রাফার মনে করেন, দ্বিতীয় দলের লোকেরা সাংবাদিক ফোটোগ্রাফার হয়ে ওঠেন। বৈজ্ঞানিক ফোটোগ্রাফার ছবি তোলেন এই ভাবে যে যেন তিনি কোন বিষয়ের চিত্রগত তালিকা তৈরি করছেন, ক্যাটালগ তৈরির মত নিরপেক্ষ ও আপাতনিরাসক্ত ভাবে তিনি তার কাজ সারতে চান।

ফোটোগ্রাফির আদিযুগে, ফোটোগ্রাফারের পক্ষে নান্দনিক বোধের চাইতে অনেক বেশি জরুরি ছিল রসায়নের জ্ঞান। ১৮৫১-র লণ্ডন বিশ্ব মেলায় ফোটোগ্রাফিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বৈজ্ঞানিক মাধ্যম রূপেই ; যন্ত্রবিজ্ঞানী ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও অন্তর্দৃষ্টির ফলেই ফোটোগ্রাফির জন্ম হয়েছিল এবং তার পরবর্তী

ক্রমবিকাশেও কলাকৌশলগত উন্নতি ও অগ্রগতি বারবার প্রধান ভূমিকা নিয়েছে । আজও ভালো ছবি তোলার জন্য শিল্পী-সুলভ বোধই যথেষ্ট নয়, কারিগর-সুলভ দক্ষতাও জরুরি । আধুনিক কালের ট্রিক ও ডার্করুম মুখাপেক্ষী আলোকচিত্রীরা কতটা চিত্রশিল্পী আর কতখানি বিশেষজ্ঞ কারিগর এ বিষয়ে সন্দেহ আছে ।

ফোটোগ্রাফির বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল সমস্ত ফোটোগ্রাফারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু ফোটোগ্রাফারের বৈজ্ঞানিকতা একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতার ব্যাপার । এর উদাহরণ জর্মন অধিবাসীদের নিয়ে তোলা অগষ্ট স্যাণ্ডার-এর চিত্রমালা, চার্লস শিলার-এর ফোর্ড মোটর কোম্পানির কারখানার অভ্যন্তরে তোলা ছবিগুলি, Henri Le Secq -এর প্রত্যক্ষ ও ভঙ্গিবিহীন স্টিল লাইফসমূহ (যাকে বলা হয়েছে বস্তুবাদী অনুশীলন), Steichen -এর কালো ভেলভেটের পটভূমিতে সাদা কাপ ও সসার রেখে এক হাজার বারেরও বেশি ছবি তুলে পরীক্ষা করার ঘটনা ইত্যাদি ।

আদি ফোটোমনতাজ-প্রস্তুতকারকদের অনেকেই নিজেদের শিল্পী না ভেবে, ইঞ্জিনিয়ার বলে ভাবতেন । তাঁরা মনে করতেন, তাঁরা ছবি 'সৃষ্টি' করেন না, 'তৈরি' করেন । Stieglitz -এর মতো বড় ফোটোগ্রাফার তাঁর স্টুডিও 'গ্যালারি ২৯১'-এর নাম দিয়েছিলেন 'Laboratory & Experimentary Station.' Feininger যখন তৃণখণ্ড থেকে অখণ্ড বিশ্ব পর্যন্ত সমস্ত মাত্রা ও গঠনের ছবি একই উৎসাহের সাথে বা সমনিরপেক্ষ ভাবে তোলেন তখন সেটাই বৈজ্ঞানিক প্রবণতা । এই একই কারণে আধুনিক কালের ছবিতে স্থানের রূপায়ণে অনেক বেশি ত্রিমাত্রিকতার আভাস, তা যতটা না ছবির জগত, অনেক সময়ই যেন তার চাইতে বেশি স্থাপত্যের মতো । সোনটাগ একে বৈজ্ঞানিক না বলে বলছেন ছদ্ম বৈজ্ঞানিক (pseudo-scientific) প্রবণতা ।

ফোটোগ্রাফি মাধ্যমটির প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার বিকাশের ধারা, ফলে, অন্য অভিমুখে গিয়েছে—প্রথমে গতি নিয়ে পরীক্ষায় । ধারাবাহিক প্রতিচ্ছবির সাহায্যে Muybridge গতিকে আলোকচিত্রিত করেছেন । তা থেকে দেখা গেছে গতির বিভিন্ন পর্যায় ও গতিভঙ্গিমা, এতদিন যা ধারণা ছিল সেই ধারণা থেকে মূলগত ভাবে আলাদা । শারীরতাত্ত্বিক Jules Marey মূলত আগ্রহী হয়েছিলেন মানুষের শরীরের গতিতন্ত্রে, কালো পটভূমিতে মানুষের শরীরের সাদা গতিশীল কাঠামোর যে চিত্রমালা তিনি তুলেছিলেন তা ছিল একরাশ বৈজ্ঞানিক তথ্যের খনি । এই সমস্ত গবেষণা চলমান আলোকচিত্র বা motion photography-র উদ্ভবে ও বিকাশে বিস্তর সাহায্য যুগিয়েছে ।

চলচ্চিত্রের আবির্ভাব হতে বৈজ্ঞানিক প্রবণতা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিশেবে স্থিরচিত্রের বদলে তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টারি ফিলমকে বেছে নেয় । ফিলম তৈরির উদ্দেশ্যর ভিত্তিতে তথ্যচিত্রের যে তিনটি শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে—তথ্যমূলক তথ্যচিত্র, কাব্যিক তথ্যচিত্র ও বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যচিত্র—তা সাংবাদিক ফোটোগ্রাফার, কবি/শিল্পী ফোটোগ্রাফার, ও বৈজ্ঞানিক ফোটোগ্রাফার—এই শ্রেণীবিভাজনের সঙ্গে প্রতিতুলনীয় । এবং এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, বৈজ্ঞানিক ফোটোগ্রাফের তুলনায়

বিজ্ঞানভিত্তিক ডকুমেন্টারি সংখ্যায় ও গুণে অনেক বেশি ।

আমি এখানে বলছি বৈজ্ঞানিক ফোটোগ্রাফের কথা, বৈজ্ঞানিক ফোটোগ্রাফির কথা নয় । বিজ্ঞানের গবেষণায় ফোটোগ্রাফি এক অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, এ তো সবার জানা । বিজ্ঞানে ফোটোগ্রাফির প্রয়োগ বহুবিস্তৃত, বিজ্ঞান ফোটোগ্রাফিকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে, প্রতিদানে ফোটোগ্রাফিক পদ্ধতি বিজ্ঞানকে সাহায্য করেছে বহু উন্নত প্রাযুক্তিক কৌশল ও আধুনিক জ্ঞান অর্জনে, তা ভিন্ন প্রসঙ্গ । আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ —ফোটোগ্রাফারের বৈজ্ঞানিকতা—ফোটোগ্রাফিতে আজও এক প্রকাশোন্মুখ চারিত্র্য, তা অনেক অগস্ট স্যাণ্ডার, অনেক ক্লার্ক ম্যোম্যান-এর অসমাপ্ত প্রয়াস সম্পূর্ণ করার কাজ ।

কবি/শিল্পী ফোটোগ্রাফার

ফোটোগ্রাফি কি শিল্প ?—ফোটোগ্রাফির জন্মকাল থেকে এই বিতর্ক । ফোটোগ্রাফি একটা শিল্প আর ফোটোগ্রাফাররা হলেন শিল্পী—এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ফোটোগ্রাফারদের কতদিন চেষ্টা চালাতে হল । তাঁদের কাজের মূল উপকরণ বাস্তবতা, বলা হত, বাস্তবকে নিয়ে শিল্পীর স্বাধীনতা খেলাবার সুযোগ নাকি নেই, নিজের অন্তর্দৃষ্টি অনুসারে বাস্তবকে পরিবর্তিত ও রূপায়িত করার সুযোগও ফোটোগ্রাফারের সীমিত, ফোটোগ্রাফি তাহলে শিল্প হবে কী করে ? ফোটোগ্রাফিতে বাস্তবতার প্রকাশ এবং ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক—এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি বাস্তব ও বাস্তবতা অংশে ।

ফোটোগ্রাফি শিল্প কি শিল্প না—এই বিতর্কে আলোকচিত্রের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি তুলনা টানা হয়েছে চিত্রকলার, দুয়ের মধ্যেকার সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও সম্পর্কের কথা বারবার উঠেছে । আলোকচিত্র ও চিত্রকলা অংশে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি। নানা সময়ে আলোকচিত্রীরা শিল্পের প্রচলিত সূত্রে অনীহা প্রকাশ করলেও, সামগ্রিক ভাবে শিল্পকে কখনোই তাঁরা হেয় করতে চান নি, শুধু চেয়েছেন শিল্প-সংক্রান্ত ধারণা আরো নমনীয় হয়ে ফোটোগ্রাফিকেও তার মধ্যে স্থান দিক ।

তাঁদের অনেকে বলেছেন, শুধুই বাস্তবতা ও আকস্মিকতার ভরসায় ফেলে রাখলে ফোটোগ্রাফি কখনোই বিশুদ্ধ বা প্রকৃত শিল্প হয়ে উঠতে পারবে না । কাজেই ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের চেষ্টা, নানান্ পরীক্ষা নিরীক্ষার সূচনা । মননগত অবধারণা হল বিজ্ঞানের ভিত্তি, শিল্পের ভিত্তি কিন্তু মূলত স্বজ্ঞাগত অবধারণা । মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ । সেজন্য মানুষ নিজে যেমন, শিল্পও তেমনি সহজাত ভাবে স্ববিরোধী । তাই ফোটোগ্রাফিকেও শিল্প হতে হলে হতে হবে 'equally ambiguous, ironic, even poetic.'

এইভাবে ফোটোগ্রাফির আলোচনায় শিল্পের পাশাপাশি কবিতাকেও রাখা হল । এদিকে অনেকে উপন্যাস ও আলোকচিত্রের রীতিকে বলছিলেন অব্জেক্টিভ আর কবিতা ও চিত্রকলার রীতিকে সাব্জেক্টিভ । ফোটোগ্রাফিতে এই দুইকে মেলাবার চেষ্টা হল, যেমন, অব্জেক্টিভ বাস্তবতার সাব্জেক্টিভ প্রকাশ । কবিরা যেমন 'ambiguity'

কে একটা গুণ হিশেবে ধরেন, ফোটোগ্রাফাররাও তেমনি ছবিকে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার গণ্ডী বা স্পষ্ট চিত্রগত অর্থের স্তর ছাড়িয়ে আর কোথাও পৌঁছে দিতে চাইলেন। ছবিকে খুব বেশি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও যথাযথ করা সূক্ষ্ম অর্থ, ভাব বা বোধের ক্ষতি করে, অনেকে বললেন, তাঁরা চাইলেন কবির কাছে শব্দ যেমন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, একটা স্বতঃস্ফূর্ত উপায়, ফোটোগ্রাফারের কাছে কলাকৌশলও হোক তেমনি।

কবিত্বকে নেওয়া হচ্ছিল শিল্পের এক প্রধান উপাঙ্গ হিশেবে। কবিত্ব ফোটোগ্রাফিতে একটা চারিত্র্যও হতে পারে, একটা প্রবণতাও হতে পারে, এবং অনেক সময়ই তা একটা গুণ, একটি সঠিক ও কার্যকারী প্রবণতা। উদাহরণ হিশেবে বলা যায় বায়ার্ড-এর স্টিল লাইফের কথা, যেখানে দৈনন্দিন সাধারণ বস্তুর সঙ্গে কিছু শিল্পসামগ্রীর ধাঁধালো সংঘাতে এক রহস্যময় কবিত্বের বিকিরণ ঘটে; আধুনিক নগরজীবনের মধ্যে ফ্রাঙ্ক সাটক্লিফের কবিত্ব সঞ্চার করতে পারার কথা, যা দু-এক যুগ পরে আমেরিকার অ্যাশ্‌কান স্কুলের বহু চিত্রশিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছিল; খণ্ড খণ্ড কবিতার মতো Alfred Stieglitz-এর সূক্ষ্ম, কমনীয়, আবেদনময় এক একটা চিত্ররূপের কথা যা দেখিয়েছে চিত্ররসের সঙ্গে কাব্যরসের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। হাইনের মতো সমাজসচেতন ফোটোগ্রাফারের ছবিতেও কখনো কখনো কবিত্বের আভা লেগেছে, তাঁর তোলা একরাশ গাটরি আর শিশু পরিবৃত বিষণ্ণ 'ম্যাডোনা'দের ছবি মহাকাব্যোচিত, তাঁর 'মেন এ্যট ওর্য়াক' বইতে মানুষ ও তার শ্রমের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তা সুন্দর ও মহান অর্থে কাব্যিক। পল ক্লী-র স্বপ্নসদৃশ অঙ্কন ও বর্ণিল প্রতিরূপে যে কবিত্ব, বহু ফোটোকোলাজ ও ফোটোমনতাজে সেই কবিতাঘন চিত্ররস খুঁজে পাওয়া যাবে।

কবিত্ব অনেক সময়ে ছবিতে কৃত্রিম ও আরোপিত বলেও মনে হয়েছে। এটা বিশেষত ঘটেছে সচেতন ভাবে যাঁরা কবি-ফোটোগ্রাফার তাঁদেরই ছবিতে। অনবদ্য প্রতিকৃতিগুলি ছাড়াও, মারগারেট ক্যামেরনের তোলা আর এক ধরনের ছবি ছিল— 'সাহিত্যগুণমণ্ডিত' ছবি। তাঁর কবিবন্ধু লর্ড টেনিসনের প্রভাবে ক্যামেরন শিল্প হিশেবে কবিতার নিরন্তর গুরুত্ব স্বীকার করতে চেয়ে এইসব প্রতীকী ছবি তোলেন, যা প্রায়ই হয়েছে অসার, উৎকেন্দ্রিক ও অত্যধিক ভাবপ্রবণ। রেজল্যাণ্ডার বা পীচ রবিনসনেরও এই প্রকার 'শিল্পগুণমণ্ডিত' ছবি রয়েছে। রবিনসন টেনিসনের 'দি লেডি অব শ্যালট' কবিতাটির চিত্ররূপ দেন। তাঁর 'ফেডিং অ্যাওয়ে' ছবির ফ্রেমে শেলীর 'কুইন ম্যাব' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে করুণরস ঘনীভূত করা হয়েছিল। সাহিত্যিক উপাদানের প্রাধান্য থাকলেও, এই কাব্যিক ফোটোগ্রাফির দৃশ্যরীতির সঙ্গে কবিতার সাহিত্যরীতির প্রতিতুলনা করার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। শুধু বলা যায় বস্তুত ফোটোগ্রাফার যদি কবি হতে চেয়ে কাজ করেন তবে তাঁর কবিত্ব কৃত্রিম ও আরোপিত হওয়াই স্বাভাবিক।

তেমনি ফোটোগ্রাফার যখন শিল্পী হতে চেয়ে ছবি তোলেন তখন তাঁর ছবিতে শিল্পগুণের প্রকাশ ঘটে সবচেয়ে কম। ফোটোগ্রাফির সূচনা থেকেই সমস্ত প্রাযুক্তিক,

সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি ফোটোগ্রাফির শৈলীগত ও সৃজনশীল —অর্থাৎ সব মিলিয়ে শৈল্পিক—প্রসঙ্গের কথা উঠেছে। যে সব ফোটোগ্রাফারের ছবিতে শিল্পগুণের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল তাঁদের অনেকেই অন্যান্য স্বীকৃত শিল্প-মাধ্যম থেকে এসেছিলেন, যদিও সেই সমস্ত মাধ্যমে তাঁদের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন অবদান ছিল না। উনিশ শতকে শিল্প ও আলোকচিত্রের এই পারস্পরিক সংযোগ, সম্পর্ক, প্রভাব ও অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন অটো স্টেলজার তাঁর 'আর্ট এ্যাণ্ড ফোটোগ্রাফি' বইটিতে।

একটা বিষয় আমার খুব অদ্ভুত লাগে। বলা হয়ে থাকে—১৮৭০ নাগাদ নিউ ইয়র্কে ফোটোগ্রাফারদের শ তিনেক গ্যালারি ছিল, এর মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত গ্যালারি ছিল তিনটে—নেপোলিয়ন স্যারোনি-র, উইলিয়াম কুর্টজ-এর এবং মারিয়া মোরা-র। এর মধ্যে স্যারোনিরটা ছিল সব চাইতে নামকরা, মোরারটা সব চাইতে লাভজনক এবং কুর্টজেরটা সব চাইতে শিল্পগুণসম্পন্ন গ্যালারি। আমার অদ্ভুত লাগে খ্যাতি, ব্যবসায়িক সাফল্য ও শিল্পগুণের মধ্যে এই বিভাজনটা।

যাই হোক, ফোটোগ্রাফাররা ক্রমেই একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমকে প্রসারিত করে দিতে চাইছিলেন সামগ্রিক শিল্পানুভবের প্রতি তাঁদের প্রতিবেদন প্রকাশের বৃহত্তর মাধ্যমে। Moholy-Nagy বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমের (নাটক, স্থাপত্য, কবিতা, চলচ্চিত্র) পারস্পরিক ও আন্তর্সম্পর্কিত প্রেক্ষাপটের ওপর জোর দিলেন। ১৯১৫-র সান ফ্রানসিসকো মেলা এডওয়ার্ড ওয়েস্টনকে আধুনিক চিত্রকলা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ দিল, সফট ফোকস, 'আর্ট' ফোটোগ্রাফ ছেড়ে ওয়েস্টন সৃজনশীল ছবি, বিমূর্ত কম্পোজিশন ও আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষায় হাত দিলেন। ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগের ফলে আবার ভের্তভ-এর চলচ্চিত্র উপকৃত হল।

কবিতা ও চিত্রকলা ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমের কিছু কিছু উপাদান ফোটোগ্রাফিতে প্রথম থেকেই ছিল। যেমন নাট্যকলা। মারিয়া মোরা সুন্দর দৃশ্যের হাতে আঁকা পটভূমির সামনে মূল্যবান সামগ্রী সহ বিখ্যাত নাট্যাভিনেত্রীদের রেখে যে সব প্রতিকৃতি তুলতেন তার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের স্বপ্নকল্পনাকে উদ্দীপিত করা। তখনকার সাধারণ মানুষদের গ্রুপ ফোটো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানেও নাট্যকলার উপাদান রয়েছে—দলটিকে সাজানোর নাটকীয় পদ্ধতিতে, ছবির ভেতরকার লোকগুলোর পরনের পোশাকে, তাদের ভঙ্গিতে।

যেমন সঙ্গীত। বিশেষত বিমূর্ত ফোটোগ্রাফির ছন্দ ও নকশার মধ্যে সাঙ্গীতিক উপাদান সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সঙ্গীতের জ্ঞান বহু আলোকচিত্রীকে বিমূর্ত ফোটোগ্রাফি সৃষ্টিতে ও অনুধাবনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আনসেল অ্যাডামসের কোন কোন ছবিকে বলা হয়েছে সোনাটা বা সিম্ফনি, অ্যাডামস নিজেও ছিলেন একজন দক্ষ সঙ্গীতশিল্পী। সঙ্গীত অনেক ব্যক্তিগত, তা একা একাও করা যায়, নিজের জন্যও হতে পারে, ফোটো কিন্তু অন্য কারো দ্বারা দেখা হয়ে ওঠা চাই। এ বিষয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে

কবিতার, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে থিয়েটারের সাদৃশ্য আছে । আবার এরই সঙ্গে নন্দন-তাত্ত্বিকরা কখনো কখনো থিয়েটারকে নিয়েছেন 'as poetry personified.' সঙ্গীতকে নিয়েছেন 'as concentrated mass-feelings'.

শিল্প ও ফোটোগ্রাফি প্রসঙ্গে আর একটা দিক হল অন্যান্য শিল্পকর্মকে আলোকচিত্রিত করা । যেমন চিত্রকলাকে । অন্যের ছবিকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত করাই কি ফোটোগ্রাফারের পক্ষে যথেষ্ট, নাকি তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দেবেন ? দিলে, যাঁর ক্যানভাসের সামনে আলোকচিত্রী ক্যামেরা বসিয়েছেন সেই শিল্পীর নান্দনিক ও মননগত উদ্দেশ্য ও অবধারণা ব্যাহত হবে না তো ? এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি ।

যেমন স্থাপত্যকে । স্থাপত্য এক অর্থে সমন্বয় । তার একটা উদ্দেশ্য, মানুষ বা বিশেষ কিছু মানুষের সঙ্গে তার কোন এক প্রকার সম্পর্ক আছে । তা কোন স্থির, নিষ্ক্রিয় সম্পর্ক নয়, অত্যন্ত গতিশীল, যেন স্পন্দিত-ই হচ্ছে এমন এক মিথষ্ক্রিয়া এখানে সক্রিয় । সেজন্যই স্থাপত্যের ছবি প্রায়ই আশপাশের কোন অনুষঙ্গকে নিয়ে সংহত ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে ।

যেমন ভাস্কর্যকে । ফোটোগ্রাফির দৃষ্টিকোণ থেকে ভাস্কর্য হল কয়েকটি রূপবন্ধের খেলা । ক্যামেরাকোণ পালটে গেলে অবস্থানানুপাত পালটে যায়, রূপভঙ্গিও পালটায় । শরীরী রূপ বিমূর্ত বলে মনে হয়, বিমূর্ত রূপ চাপা শরীরী অনুভূতি জাগায় । মানুষের উপস্থিতি বা মানুষের শরীরের আংশিক উপস্থাপনা তাই অনেক সময়ে ভাস্কর্যের ছবিকে অন্য মাত্রা দেয় ।

আধুনিক শিল্প বহুমুখী । আর আধুনিক শিল্প-প্রতীতির মতো ফোটোগ্রাফিও নানাত্ববাদী (pluralistic) । শিল্পের সঙ্গে ফোটোগ্রাফির এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় সাদৃশ্য ।

সাংবাদিক ফোটোগ্রাফার

ননফিক্শন নভেল, ডকুমেনটারি থিয়েটার, ডকুমেনটারি ফোটো, ননফিক্শন ফিলম —তথ্যমূলক প্রতিন্যাস বা প্রবণতার প্রভাব গত কয়েক দশকে ক্রমেই দূরপ্রসারী হয়েছে । সমস্যার অনুসন্ধান, তথ্যসম্মত বিবরণী এবং সমস্যাতীত ও তথ্যাতিরিক্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে ডকুমেনটারি ফোটোগ্রাফাররা দেখাতে চান জীবন কী এবং তা কী হওয়া উচিত । সত্যের এই উদ্‌ঘাটন সমাজ ও ইতিহাসের তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত । তিরিশের বছরগুলোতে আমেরিকার ডকুমেনটারি ফোটোগ্রাফাররা সারা দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন (বিশ্বের মধ্যেই যেমন তৃতীয় বিশ্ব তেমনি) দেশের মধ্যেকার 'নিমজ্জিত তৃতীয় ভাগ'-এর কথা, প্রান্তিক চাষী, ভবঘুরে শ্রমিক ও গ্রাম্য বস্তিবাসীর দুর্দশার কথা । এই সব ছবি তীক্ষ্ণ এবং নিষ্করুণ । নৈরাশ্যের মরুভূমির মধ্য দিয়ে দারিদ্রপীড়িত মানুষগুলির মন্থর যাত্রার মধ্যে সৌন্দর্যের কোন বালাই ছিল না ।

মুখগুলির মধ্যে এমন একটা কর্কশতা যা পটভূমির ধূসর আনন্দহীনতার সঙ্গে সঙ্গতিময়। আবার অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফের ব্যবহার হয়েছে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিশেবে—বুর্জোয়া ও প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাচ্চা কম্যুনিষ্টের অমোঘ হাতিয়ার রূপে—ও দিকে দিকে কীভাবে প্রগতির জয় হচ্ছে তা প্রচার করার শৈল্পিক/নান্দনিক মাধ্যম রূপে। এমনকি ফোটোমনতাজকেও পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনের মত রাজনৈতিক কাজে লাগানো গেছে। জন হার্টফীল্ডের মনতাজ এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, এই স্যাটায়ারিস্টের সেই সব সৃষ্টিকে ব্রেখ্‌ট বলেছিলেন ক্লাসিক।

ডকুমেনটারি ফোটোগ্রাফ আর ফোটোজার্নালিজম (ফোটোএসে, পিক্‌চারস্টোরি, নিউজ ফোটোগ্রাফি নানা নামে পরিচিত) এই দুই মিলিয়ে সাংবাদিক ফোটোগ্রাফারের জগত। প্রশ্ন উঠবে—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? ফোটোজার্নালিজম হল ছবি ও লেখার এক সুনির্বাচিত, সুবিন্যস্ত সিকোয়েন্স, এক অসাধারণ শক্তিশালী সংবাদ-চিত্রশৈলী, গণমাধ্যমের—খবরের কাগজ ও পত্রপত্রিকার—এক প্রধান সহায়। নাদারকে দিয়ে এর শুরু, এর বর্তমান রূপ প্রধানত মারগারেট বার্ক-হোয়াইটের অবদান, আর আধুনিক শ্রেষ্ঠ ফোটোজার্নালিস্ট সম্ভবত ডব্লিউ ইউজিন স্মিথ। আধুনিক ফোটোজার্নালিজম সম্ভব হয়েছিল, কোন সন্দেহ নেই, মিনিয়েচার ক্যামেরা আবিষ্কারের ফলে। আর এর সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক প্রসারের জন্য একটা বড় কৃতিত্ব 'লাইফ' পত্রিকার প্রাপ্য, যে পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দৃষ্টিচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা ও যার প্রচার-সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষের কাছাকাছি।

আর ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফি? ডরোথী ল্যাং -এর মতে, তা ফোটোজার্নালিজম থেকে আলাদা। ফোটোজার্নালিজম করা সহজ, তাতে সময়ও কম লাগে। কিন্তু ডকুমেনটারি ফোটোগ্রাফি হল 'where you go in over your head, not just up to your neck'। ডকুমেন্টারি একটা দৃষ্টিভঙ্গি, তা নিতান্ত শৈলী বা প্রকরণ নয়, তা একটা বিশ্বাস, কোন নিরাশা নয়। এর উদাহরণ হিশেবে তিনি দেখান তাঁর ও তাঁর স্বামী ড. পল টেলরের বই 'An American Exodus : A Record of Human Erosion'কে। ফোটোগ্রাফির ইতিহাসে আলোকচিত্রী ও সমাজবিজ্ঞানীর এই প্রথম সহযোগিতায় এক অসাধারণ সুশৃঙ্খল ও কার্যকারী চিত্রবিবরণীর সৃষ্টি হয়েছিল। ল্যাং-এর আগে ও পরে এই রকম কার্যকারী অন্যান্য চিত্রবিবরণীর মধ্যে রয়েছে এডওয়ার্ড এস. কার্টিজ-এর 'দি নর্থ অ্যামেরিকান ইণ্ডিয়ান' যা সাদা মানুষদের লোভ ও হিংসার মধ্য দিয়েও প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ান সভ্যতার সামান্য যা বেঁচেছিল তার এক অনির্বচনীয় চিত্ররূপ। জ্যাকব রীজ-এর 'হাউ দি আদার হাফ লিভ্‌স' যা বস্তিবাসীদের জন্য নতুন বাসস্থান এবং অন্যান্য পৌর সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। লুইস হাইন-এর খেতেখামারে, কলকারখানায়, দোকানে ও খনিতে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের (আমেরিকায় সেই সময়ে ১৫ বছরের কমবয়সী শ্রমিকের সংখ্যা ১৭ লক্ষ) নিষ্প্রভ চোখ, ভাবহীন মুখ, ধূসর চামড়া, নোংরা হাত পা ও কর্মক্লান্ত শরীরের চিত্রমালা যা শিশু-শ্রম-আইন পাশ হতে

সাহায্য করেছিল । বায়ুদূষণ নিয়ে Martin Schneider-এর ফোটো ডকুমেন্ট 'ব্রেথ অব ডেথ' যা পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি করেছিল । ইত্যাদি ।

এই সাংবাদিক ফোটোগ্রাফাররা (এঁদের অনেকে প্রথমে আক্ষরিক অর্থেই সাংবাদিক ছিলেন) বুঝতে পেরেছিলেন নানান সমস্যা ও অবিচার সম্পর্কে নিছক তথ্য আমাদের মননে আঘাত করে কিন্তু আমাদের আবেগকে আহত করার জন্য চাই সচিত্র তথ্য । যে সচিত্র, নির্ভেজাল তথ্য সঠিক ভাবে ব্যবহৃত হলে যা ঘটবে তা বিপ্লব না হলেও হবে অ্যাকশন । তার প্রমাণ এঁরা অবস্থার পরিবর্তনে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে ও সমাজসংস্কারে সক্রিয় অবদান যোগাতে পেরেছিলেন । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনও ঘটেছে । প্রথমে ঘটনাই যথেষ্ট ছিল, তারপর সমস্যা ও অবিচারের ওপর জোর পড়েছে, তারপর বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ওপর । মানুষের দুর্দশার ছবি নয়, মানুষের সংগ্রামের ছবি কেননা অবিচারের শিকার যে মানুষ তার ছবিতো বহু তোলা হল, এবার অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যে বিদ্রোহী তার ছবি তোলার পালা ।

আর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়ই আরোপিত নয়, বরং সহজাত । কেননা সাংবাদিক ফোটোগ্রাফারদের অধিকাংশ দুঃখ দারিদ্র্য অবিচারের মধ্য দিয়ে নিজেরাই গিয়েছেন । ১৮৭০-এ ডেনমার্ক থেকে আমেরিকায় চলে এসে রীজ ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হয়েছেন । হাইন কৈশোরে কারখানায় অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন । ল্যাং-এর শৈশবে ল্যাং-এর বাবা তার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিলেন, সামান্য চাকরি নিয়ে ল্যাং-এর মাকে গোটা পরিবার প্রতিপালন করতে হয়েছে। উইলিয়াম ম্যাকে-র ছিল আট ভাই ও আট বোন যার অর্ধেক শৈশবেই মারা যায়, তাঁর ঠাকুমা ছিলেন ক্রীতদাসী, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর তিনি মুক্ত হন । শৈশবে ব্রঙ্কাইটিক হাঁপানি Schneider-কে কিছুকালের জন্য অকেজো করে দেয়, পরে তিনি টিবিতেও আক্রান্ত হন আর তাঁর বাবা মারা যান এমফিসিমায়, তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে বায়ুদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি অপকারী ? ফুং ল্যাম-এর জন্ম হয় হংকংয়ে এমন এক দরিদ্র পরিবারে যে মাত্র চার বছর বয়সে তাঁকে বেঁচে থাকার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমেরিকায়, এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে যেখানকার ভাষা ল্যাম তখন এক বর্ণও জানেন না ।

দুর্ভোগ তাঁদের পরেও সহ্য করতে হয়েছে, সাহসিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য । যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে কতজন নিহত বা আহত হয়েছেন । আপত্তিকর ছবি তুলছেন এই অজুহাতে জাপানের এক অতিবৃহৎ কেমিক্যাল কর্পোরেশনের ছজন ভাড়াটে গুণ্ডা মেরে ইউজিন স্মিথের এক চোখ নষ্ট করে দিয়েছে । এ হচ্ছে সাংবাদিক ফোটোগ্রাফারের দায়িত্ববোধের কঠিন মূল্য । আর সংবাদচিত্রের ক্ষমতার সঙ্গে সাংবাদিক ফোটোগ্রাফারের দায়িত্ববোধ যুক্ত হলে তবেই ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফ বা ফোটোজার্নালিজম অমোঘ হয়ে ওঠে ।

সংবাদচিত্রের বিষয় হতে পারে দাসপ্রথা নিয়ে গৃহযুদ্ধ বা ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার মতো ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে শুরু করে তুলনায় কম ব্যাপক কিন্তু গভীর মর্মস্পর্শী

সামাজিক/আঞ্চলিক প্রসঙ্গ পর্যন্ত যা কিছু । এক্ষেত্রে বড় কাগজের গরম খবরের কিছুটা একপেশে ও চমকদার বিবরণ বনাম ছোট কাগজে সাধারণ মানুষের সাধারণ সমস্যার সহজ বর্ণনার কথা উঠবে । বলা হয়, ফ্লিট স্ট্রীটের নীতি হল : তথ্যকে কখনো ছবির মধ্যে নাক গলাতে দিও না । অর্থাৎ তথ্যের জন্য ছবি নয়, যেন ছবির জন্য তথ্য । এবং তথাপি, তেমন বিস্ফোরক ছবি হলে লাইফের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের হাত থেকেও ছবি রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে, সবচেয়ে ভয়াবহ ছবিগুলো ছাপা না হতে পারে, ছবির সঙ্গের লেখা নরম ও তরল করে নিয়ে ছাপা হতে পারে, নিজের দেশের পক্ষে অস্বস্তিকর ছবি ছাপানো সরকার অপছন্দ করতে পারে ।

একদিকে প্রকাশের এই সমস্যা, অন্যদিকে সংবাদচিত্রকে শিল্প রূপে স্বীকৃতি দিতে অনীহা । যেন জীবনধারণের জন্য খাদ্যগ্রহণ আর খাবার ব্যাপারটাকে একটা 'আর্ট' করে তোলা এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তথ্যমূলকতা ও শৈল্পিকতার মধ্যে সেই ব্যবধান । কিন্তু তথাকথিত শিল্পের প্রশ্ন নিয়ে সাংবাদিক ফোটোগ্রাফাররা তেমন ভাবিত কি ? মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাপট্য বাদ দিলে অধিকাংশের উপযুক্ত পরিচয় এই বাগর্থে : 'committed and conscientious' । এই দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক ভাবে জগতকে পালটাতে পারে কিনা জানিনা, কিন্তু তা মানুষকে প্রগাঢ়ভাবে জীবনমুখী হতে শিক্ষা দেয়, জীবন থেকে পলায়ন করতে নয় । ফুং ল্যাম যখন প্রতিবন্ধী শিশুদের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ছবি তোলেন তখন সেই ছবি সমস্ত মানুষের অপরাজেয় জীবনসত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে ।

ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গি আসলে সামগ্রিক জীবনদৃষ্টিই । শৈশব থেকেই একটু একটু করে গড়ে উঠেছে তাঁদের সেই অনুভব যার সাহায্যে বোঝা যায় জীবনে ও কর্মে কোনটা শুদ্ধ ও কোনটা বিকৃত বা অন্যায় বা দুর্নীতিপরায়ণ আর শুদ্ধতার প্রশ্নে তাঁরা মোটেই অল্পে সন্তুষ্ট নন । যেমন ডরোথী ল্যাং তাঁর সৌন্দর্যচেতনা পেয়েছিলেন আর্নল্ড গেনথের কাছ থেকে, গঠনসৌকর্যের শিক্ষা পেয়েছিলেন ক্ল্যারেন্স হোয়াইটের কাছ থেকে, আর ইসাডোরা ডানকানের কাছ থেকে শিখেছিলেন উত্তুঙ্গ গুণমান বলতে কী বোঝায় । রীজ যখন বস্তির অন্ধকার ঘর ও গলিঘুঁজির ছবি তুলতে গিয়ে কৃত্রিম আলোকসম্পাতের প্রয়োজন অনুভব করে বলে ওঠেন, 'আলো আসুক, যেখানে আলোর এত বেশি দরকার' এবং হাইন যখন ছবি তুলতে গিয়ে বলেন, 'আলো চাই, আলো, আলোর বন্যা !', তখন আলোর জন্য সেই আহ্বান সময় ও সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রতীকী মূল্য পায় ।

উৎকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি

যা বেখাপ, যা বেমানান, যা সরস, যা হাস্যকর, যেখানে ব্যঙ্গ, যেখানে বিদ্রূপ—জীবনের সেই সব প্রকৃত মজাদার, শ্লেষাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত দিকগুলোও ফোটোগ্রাফির বিষয় হতে পারে । ভাবনা ও রূপের অদ্ভুতত্ব, উদ্ভটত্ব ও খেয়ালিপনা প্রচলিত নিয়মনীতিকে আঘাত করে, ফোটোগ্রাফারের চাপা উত্তেজনার প্রশমন ঘটায় অথবা সকৌতুকে দর্শকের

মনোরঞ্জন করে। আমোদ ও কৌতুকের বিভিন্ন অনুষঙ্গ আমাদের ক্রীড়নশীলতার পরিচয় দেয়, চপল, চটুল ও মজাদার মুহূর্তের চিত্রণ একদিকে জীবনের রহস্য ও ঐশ্বর্যের উদঘাটন করে, অন্যদিকে তার মধ্য দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনার উদাহরণ মেলে। এ হচ্ছে অদ্ভুত রস, অপ্রত্যাশিতের রস।

প্রচলিত নিয়মনীতিতে মারগারেট ক্যামেরনের ছিল গভীর অশ্রদ্ধা ও অনীহা, তিনি অনুসরণ করতে চাইতেন তাঁর নিজস্ব প্রবৃত্তি, নিজস্ব প্রবণতাকে। ব্যক্তি হিশেবে তিনি অবশ্যই ছিলেন উৎকেন্দ্রিক, যিনি মনে করতেন ফোটোগ্রাফি হল এক 'আধ্যাত্মিক শিল্প'। জ্যাকব রীজ যখন কোন কাজের দায়িত্ব নিতেন, বিশ্রামের কথা ভুলে যেতেন। মনের মতো ছবি তোলার জন্য তিনি ধাক্কা দিতেন, খোঁচা মারতেন, তোষামোদ করতেন, গালাগালি দিতেন; হিমশীতল বিদ্বেষ দেখাতেন বা চণ্ডক্রোধ। ডরোথী ল্যাং বলতেন, শিল্পী হিশেবে তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি হল একটা শারীরিক খুঁত, তিনি ছিলেন জন্মাবধি খোঁড়া, 'এই ত্রুটিই সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা আমাকে একই সঙ্গে গড়ে তুলেছে, শিক্ষা দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে, সাহায্য করেছে এবং অন্যের কাছে ছোটও করেছে।' Robert Doisneau' ছিলেন ক্যামেরা কাঁধে ব্যঙ্গকার, পথঘাট থেকে তুলে আনতেন অপ্রত্যাশিতের রূপ, তাঁর হল দারুণ হাস্যরসবোধ, ফোটোগ্রাফারদের ক্ষেত্রে একটা বিরল গুণ। Arnulf Rainer-এর ভাষায় তাঁর তোলা বিভিন্ন প্রতিকৃতি হল উৎকেন্দ্রিকতার অনুসন্ধান ও উৎকেন্দ্রিকতায় রূপান্তর। ছবিতে শরীর বা মুখের প্রগাঢ় বিকৃতি সাধন করে 'আমার নিজের ভেতর যে সমাজবিরোধী সত্তা আছে তার অনুসন্ধান, যে মনুষ্যেতর অংশ আছে তার আবিষ্কার।'

কোথা থেকে আসে এই প্রেরণা? ভেতর থেকে আসে। ম্যান রে-র ভাষায়, 'প্রসন্নতা ও স্বাধীনতার ইচ্ছা হল আমার শিল্পকর্মের প্রধান উদ্দেশ্য।' প্রসন্নতার বদলে অনেক শিল্পী চপলতা শব্দটি বসাবেন। বস্তুত রহস্যময়তা, মরমিয়তা, আধ্যাত্মিকতা বারবার ফোটোগ্রাফারদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। এসবই ভেতরের তাগিদ। অলৌকিকতায় গভীর আগ্রহী আর্থার কোনান ডয়েল উইলিয়াম হোপের তোলা অশরীরী প্রাণীর ছবি দেখে মোহিত হয়েছিলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান গোয়েন্দা শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার বুঝে উঠতে পারেননি যে হোপের ছবিগুলো সব জাল, ডাবল এক্সপোজারের ফল বা ডার্করুমের কারসাজি। ডয়েলের কাছে যা ছিল একটা অতি পবিত্র ভাবনা, অনেকের কাছে তা হল জালিয়াতির বিষয়।

ল্যাং যখন ডার্করুমের কলাকৌশল শিখছিলেন তখন তাঁর প্রথম 'ডার্করুম আতঙ্ক'-এর অভিজ্ঞতা হয়— যে অনিশ্চয়তা থেকে তিনি আর কখনো মুক্ত হননি। এও এক অনিবার্য রহস্যময়তা—সৎ ও সদর্থক। বহু আলোকচিত্রীর ছবিতে বা জীবনে শুধু নয়, বিবৃতিতে ও মতামতেও মিষ্টিসিজমের ছোঁয়া। বস্তুত ফোটোগ্রাফি মাধ্যমটিই মূলগত ভাবে এক ধরনের মরমিয়তার উৎস। এই জন্যই ফোটোবাস্তবতা বাস্তবতা থেকে আলাদা। এই মিষ্টিসিজমের ভয় কারুকে গভীর ভাবে বাস্তবমুখী করে, এর মোহ কারুকে করে তোলে অধিবাস্তববাদী। হয়তো কেউ হন আত্মকেন্দ্রিক, কেউ উৎকেন্দ্রিক। কোন

আলোকচিত্রীর চিত্রকর্মকে যখন এরূপ বাগর্থে অভিহিত করা হয়—'সযত্নে যত্নহীন' বা 'গোঁড়া প্রগতিশীল' বা 'উদ্ধতভাবে বিনম্র'—তখন তা হয় সমালোচকের উৎকেন্দ্রিকতা।

বুর্জোয়া সমাজ ও ফোটোগ্রাফি

রেনেসাঁসের কালকে অভিহিত করা হয়েছে ব্যক্তিপ্রাধান্যের যুগ হিশেবে। ফলে এই সময় থেকে ব্যক্তি-প্রতিকৃতির গুরুত্ব ক্রমেই বেড়েছে। শহরাঞ্চলে বুর্জোয়া শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি, এই শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার সমৃদ্ধি, ও সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত গণতন্ত্রীকরণের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মপ্রতিকৃতির চাহিদাও ক্রমবর্ধমান হয়েছে। চিত্রকলার মতো একটি ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ মাধ্যম এই চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়নি। আরো দ্রুত ও আরো সুলভ মাধ্যমের প্রয়োজন থেকে জন্ম নিয়েছে প্রতিকৃতি অঙ্কনের হরেক দৃক্‌বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্র। কিন্তু ফোটোগ্রাফির আবিষ্কারের পরেই এই প্রয়োজন পুরোপুরি মিটলো।

১৮৪৮-য়ের ফরাসি বিপ্লবের পব থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী সমাজে তার সঠিক অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ফোটোগ্রাফি সেই কাজে তার একটা বড় হাতিয়ার হয়ে উঠলো। ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেকে অনেকখানি একাত্ম ভাবতে পারলো। ললিতকলা যদি হয় অভিজাতশ্রেণীর জন্য, ফোটোগ্রাফি তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য; তা সনাতন কিছু নয়, আধুনিক; মন্থর ও দুর্লভ কোন জিনিশ নয়, সহজ, সুলভ ও দ্রুত; এমনকি শিল্পকলা নয়, প্রাযুক্তিক মাধ্যম। সামান্য চর্চাই এর পক্ষে যথেষ্ট, এর জন্য সহজাত প্রতিভার কোন দরকার নেই।

ফোটোগ্রাফি বুর্জোয়াশ্রেণীকে দিল তার বিশ্বস্ত প্রতিরূপ, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও তার জীবন আর পরিবেশ সম্পর্কে তথ্যমূলক প্রমাণ, তাকে করে তুললো গুরুত্বপূর্ণ, বুর্জোয়াশ্রেণী আলোকচিত্রকে গ্রহণ করলো তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার আর একটা প্রকাশ হিশেবে। বস্তুত ফোটোগ্রাফি ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সমান্তরাল উদ্ভব হয়েছে আব উভয়ের ক্রমবিকাশের মধ্যে ঘটেছে বহুল পরিমাণ ও আশ্চর্য প্রকৃতির মিল। আদিযুগের প্রতিকৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বিজ্ঞাপনীচিত্র ও সংবাদের গণমাধ্যম পর্যন্ত ভাবলে এ-কথা স্পষ্ট হবে। এই সমাজতাত্ত্বিক বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন Gisele Freund তাঁর 'ফোটোগ্রাফি এ্যাণ্ড দি বুর্জোয়া সোসাইটি' বইটিতে।

ভিক্টোরিয় ইংল্যাণ্ডে ফোটোগ্রাফি গৃহীত হয়েছিল এমন এক মাধ্যম রূপে যা সমস্ত দুর্নীতির ঊর্ধ্বে, বিশ্বস্ত, উদ্দেশ্যাত্মক ও প্রায় কঠোর এক প্রকাশভঙ্গি হিশেবে। আমেরিকায় যখন 'ক্যামেরা মিথ্যাচরণ করতে পারে' এই তথ্য ফোটোগ্রাফির জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে ইংল্যাণ্ডে তখন ফক্স ট্যাল্‌বট প্রভাবিত সম্পূর্ণ অনাটকীয় ও অপেক্ষাকৃত গোঁড়া আলোকচিত্রশৈলী অনুসরণ করে তোলা মানুষ ও সমাজের ছবি সেই যুগের সঠিক ও বিশ্বস্ত চিত্র রূপে সমাদৃত হয়েছে। মারগারেট ক্যামেরন বা গুস্তাভ্ রেজল্যাণ্ডার-দের তোলা প্রতীকী ছবিগুলো মন দিয়ে লক্ষ্য করলে ভিক্টোরিয় যুগে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত

সমাজে শিল্প, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে যে অতিরঞ্জিত চিন্তা ও এমনকি আধ্যাত্মিক বিলাস ছিল—যা সাধারণ সমাজের জীবনের প্রবণতা থেকে আলাদা—তার আভাস পাওয়া যায়। শিল্পশৈলীর এই সাহিত্যিক/আধ্যাত্মিক ঝোঁকের জন্য এই সব প্রতীকী চিত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও কৃত্রিম। একই কারণে রেজল্যাণ্ডারের প্রতীকী ছবির নাম হয় 'দি টু ওয়েজ অব লাইফ' বা তিনি তাঁর স্টুডিওর নামকরণ করেন 'দি টেম্পল্ অব আর্ট'।

১৮৫১-য় লণ্ডন বিশ্ব মেলায় ফোটোগ্রাফিকে চিহ্নিত করা হয় শিল্পমাধ্যম রূপে নয়, বৈজ্ঞানিক মাধ্যম রূপে। কিন্তু ওই প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত ইংরেজ ফোটোগ্রাফারদের ছবি থেকে বোঝা যায়, তাঁরা, সচেতন ভাবেই হোক কি প্রবৃত্তি বশতই হোক, আলোকচিত্রকে নিতে চাইছেন শুধু বৈজ্ঞানিক কঠোরতায় নয়, শিল্পীর স্বাধীনতাতেও। আর শিল্পীর স্বাধীনতা এক বুর্জোয়া ধারণাই মাত্র। ফোটোগ্রাফি বাস্তবকে ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রকাশ করে, বুর্জোয়াশ্রেণীও বাস্তবকে ভগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও আরোপিত করে নিয়ে নিজের কাজে লাগায়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতির মিল রয়েছে, ফোটোগ্রাফি যতটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশি অধিবাস্তবের ধারক ও বাহক, বুর্জোয়া সমাজ যতটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশি অধিবাস্তবের পোষক। ভিক্টোরিয় যুগের প্রতিকৃতিতে প্রায়ই দেখা যেত একটা চমৎকার চেয়ার, ব্যক্তিটি যার পেছনে বা পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কিন্তু কখনো তাতে বসতেন না—এই ছোট ইঙ্গিতটি দিয়ে এই প্রসঙ্গ আপাতত শেষ করলাম।

বাস্তব ও বাস্তবতা

সত্যকথন, স্বাভাবিক সাদৃশ্য, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের চিত্রণ, পরিচিতের উদঘাটন ইত্যাদি হল ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত কয়েকটি বাগর্থ। এ থেকে মনে হতে পারে নিখাদ ও নিখুঁত বাস্তবতাই হল ফোটোগ্রাফিব একমাত্র বিবেচ্য। কিন্তু বাস্তবতা কতটা বাস্তব এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখি ফোটোগ্রাফি একদিকে বাস্তবতার পরিধি বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে বাস্তবতাকে সীমাবদ্ধ করে আনে। যা আমাদের চোখে দেখার পক্ষে বেশি দ্রুত বা বেশি মন্থর, বেশি বৃহৎ বা বেশি ক্ষুদ্র, বেশি গভীর বা বেশি সুদূর, বেশি উজ্জ্বল বা বেশি অন্ধকার ফোটোগ্রাফি তা দেখার সুযোগ করে দিয়ে মানুষের দর্শনের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি অতিবেগনি বা অবলোহিতের মতো অদৃশ্য বিকিরণও ফোটোগ্রাফিতে ধরা পড়ে। আবার ফোটোগ্রাফি ছোট করে, কম দেখিয়ে, সংকুচিত, সরলীকৃত ও বিচ্ছিন্ন করে এবং বিমূর্তায়নের মাধ্যমে (ত্রিমাত্রিককে দ্বিমাত্রিক করে বা রঙীনকে সাদা কালো করে) বাস্তবকে সীমায়িত করে ফেলে। কিন্তু তার ফলেই যা সামান্য তা অসামান্য, যা সাধারণ তা অসাধারণ, যা গুরুত্বহীন তা গুরুত্বপূর্ণ, যা অসুন্দর তা সুন্দর, ও যা সাদামাটা তা অদ্ভুত হয়ে উঠতে পারে এবং এগুলোর বিপরীতও ঘটতে পারে।

সুতরাং এই বাস্তবতা গুণগত ও মাত্রাগত ভাবে আলাদা। বাস্তবতার ওপর অতি নির্ভরতা—ফোটোগ্রাফির যে বৈশিষ্ট্যটি মনে হয়েছিল সৃজনশীল শিল্পের পক্ষে বাধাদায়ক,

সেই গুণ বা ক্ষমতার মধ্যেই ছিল ফোটোগ্রাফির অন্তর্নিহিত শৈল্পিক ও নান্দনিক শক্তি। তাঁর 'থিয়োরি অব ফিলম' বইয়ে সিগফ্রিড ক্রাকাউয়র ফোটোগ্রাফির একটি নান্দনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। এই তত্ত্বের জন্য তিনি উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করেছেন মূলত ফোটোগ্রাফির প্রাযুক্তিক প্রকৃতির কথা মনে রেখে। আলোকচিত্রপ্রতিমার প্রকৃতি ও সংগঠন সম্পর্কে তাঁর ও বার্জাঁর মতবাদের ওপর নির্ভরশীল এই তত্ত্ব রায় দেয় যে ফোটোগ্রাফারের ভূমিকা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ বাস্তববাদী। এই মত পরবর্তীকালে অনেকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছেন। বিশ্ব-জগত সম্পর্কে বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি হল 'বাস্তববাদী', ফলে ফোটোগ্রাফির ইতিহাসে বিষয়, আঙ্গিক ও প্রবণতার দিক থেকে এই 'বাস্তবতা'র ছাপ পড়েছে।

এই বাস্তবতা অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা থেকে আলাদা। এমনিতে বাস্তব হল প্রতারণাপ্রবণ ও ফোটোগ্রাফির মধ্যেই এক ধরনের দ্ব্যর্থতা রয়ে গেছে। তাই বাইরের বাস্তবের সঙ্গে অন্তর্বাস্তব মিলে শিল্পের বাস্তব হয়ে ওঠে, শিল্পের সত্য বাস্তবের সত্য থেকে হয় আলাদা। পপ আর্টে এসে শিল্প আবার শুধুই বাইরের বাস্তবের মুখাপেক্ষী হল। তা অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। পাশ্চাত্য ফোটোগ্রাফিতে ১৯২০-র পর থেকে নব্য বাস্তববাদের যে আন্দোলন দেখা গেছিল তার ফলস্বরূপ আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বস্তুর প্রকট ক্লোজ আপ দৃশ্যের প্রাধান্য ঘটে, বলা হত, এই সব প্রতিরূপ হল অকপট (অবান্তর বিষয়ের অবতারণাহীন অর্থে) ও (কোন রকম রিটাচ করা হত না বলে) স্বাভাবিক। সমসাময়িক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ফোটোগ্রাফির পাশে রেখে দেখলে এই সব প্রতিরূপের সাফল্য ও ব্যর্থতা স্পষ্ট করে বোঝা যাবে।

ফোটোগ্রাফির বাস্তববাদী শৈলী ও ঘরানার সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা থেকেই অন্যান্য শৈলী ও ঘরানার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং কালক্রমে সেগুলি স্বাভাবিক ও বৈধ বলে গৃহীত হয়। বাস্তববাদী ফোটোগ্রাফি ও সৃজনশীল ফোটোগ্রাফির মধ্যকার বিভাজন রেখাও ক্রমে ক্রমে মুছে আসছে। ছবিতে তথ্যমূল্যের সঙ্গে শিল্পগুণকে (আবেগানুভূতি ও নির্দিষ্ট নান্দনিক বোধ অর্থে) কীভাবে মেলানো হচ্ছে তা সংবাদপত্রের ছবি দেখলেই বোঝা যায়। আধুনিক কালে, পেশাদার আলোকচিত্রীদের সঙ্গে অপেশাদার আলোকচিত্রীদের দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত সাদৃশ্য ঘটতে থাকায় ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট পরিবর্তন লক্ষণীয়।

স্থান/কালে আবদ্ধ বাস্তবতাকে স্থান-কাল-উত্তীর্ণ চিরায়ত প্রতিরূপে রূপান্তরিত করা যায় কীভাবে তার একটা সামান্য উদাহরণ দিচ্ছি। সুনির্দিষ্ট পটভূমির সামনে জনৈক মডেলকে রেখে তোলা ছবির কথা ভাবুন। এবার ছবির পটভূমিটি ও মডেলের পোশাক সম্পূর্ণ ঢেকে দিন, মডেলের মুখের মেক-আপ এত উগ্র করুন যেন মুখোশ বলে মনে হয় ও মুখ থেকে পরিচিতিজ্ঞাপক উপাদানগুলি—চোখ ও ঠোঁট—তুলে নিন, যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে নারীর এক চিরকালীন নির্বিশেষ প্রতিরূপ।

উদ্দেশ্যাত্মক বাস্তববাদ যে বাস্তবতার কথা বলবে তা সুনির্দিষ্ট সমাজের প্রেক্ষাপটে

সমসাময়িক বাস্তবতা । এই ধারণা ডকুমেনটারি ফোটোগ্রাফি হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ছবিতে গিয়ে পৌঁছয় । এই রাজনৈতিক কমিটমেণ্টের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র ফোটোগ্রাফিতে বাস্তববাদকে প্রয়োজন মতো অতিক্রম করতে না পারলে ফোটোগ্রাফি নীরস ও নিরক্ত চিত্ররূপে পর্যবসিত হতে পারে ।

আলোকচিত্র ও চিত্রকলা

যখন দাগ্যের-পদ্ধতির আবির্ভাব হল জনৈক প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রায় দিলেন, 'এখন থেকে চিত্রকলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার' । কিন্তু পরিবর্তে দেখা গেল, আদিযুগের আলোকচিত্র বরং সমকালীন চিত্রকলাকেই বিশেষ ভাবে অনুসরণ করছে । সূচনায় ফোটোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ছিল প্রতিকৃতি । আর আলোকচিত্রিত প্রতিকৃতির জন্য আদর্শ হিশেবে থাকতো অঙ্কিত প্রতিকৃতি । শুধু স্বাভাবিক সাদৃশ্যের দিক থেকে নয়, রূপবন্ধ ও কম্পোজিশনের, এবং আলোছায়ার বিভাজনরীতির দিক থেকেও । যদিও বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ততার খাতিরে চিত্রকর নিজেকে নিতান্ত যন্ত্রে পর্যবসিত করতে পারতেন না এবং আলোকচিত্রীর হাতের যন্ত্রটিও কিছুটা চালকের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই চালিত হত । তবু সমস্ত বিচারে বলা যায়, তখনকার বহু অঙ্কিত প্রতিকৃতিই আলোকচিত্রিত প্রতিকৃতির তুলনায় বেশি ব্যক্তিত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিত ।

স্থির বস্তুর আলোকচিত্রের ক্ষেত্রেও চিত্রসুলভ স্টিল-লাইফ সৃষ্টির দিকেই লক্ষ্য থাকতো । বিভিন্ন স্থির বস্তুকে জোগাড় করে ছবি তোলার জন্য বিশেষ ভাবে সাজিয়ে নেওয়া হত কিন্তু দৃশ্যটি যাতে সচেতন ভাবে সাজানো বলে মনে না হয়, বরং যাতে স্বতঃস্ফূর্তই লাগে—যেন বস্তুগুলি আকস্মিক ভাবে একত্রিত হয়েছে এমন—সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হত । এই 'সযত্নে যত্নহীন' দৃষ্টিভঙ্গিটি চিত্রকলা থেকে নেওয়া । অবশ্য পরবর্তীকালে স্টিল-লাইফের ছবি যথাযথ ও পরিমিত হয়ে উঠে ধীরে ধীরে চিত্রকলার প্রভাব মুক্ত হতে থাকে ।

যদিও প্রথম দিকে নগ্ন নারীশরীরের ছবি তোলা হত খুবই কম, তবু যা তোলা হত তাতে রেনেসাঁস-উত্তর কালের চিত্রকলার প্রভাব লক্ষণীয় । আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে চিত্রকলার প্রভাব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ছিল তথাকথিত সাহিত্যগুণ বা শিল্পগুণ মণ্ডিত ছবিতে । সমস্ত স্বাভাবিকতা বর্জিত, সম্পূর্ণ কাল্পনিক পরিবেশপ্রধান এই সব ছবি চিত্রকলার ওপর নির্ভরতার চরম নিদর্শন । চিত্রকলার প্রভাব সব চেয়ে কম ছিল নগরদৃশ্য ও যুদ্ধদৃশ্যের ছবিতে । চিত্রকরের তুলিতে আঁকা যুদ্ধদৃশ্য মূলত ছিল রোমান্টিক, সেই তুলনায় ক্যামেরায় তোলা যুদ্ধদৃশ্যের ছবি অনেক বেশি সঠিক, বিশ্বস্ত ও বাস্তবসম্মত । আলোকচিত্রিত প্রতিকৃতি যদি হয় স্থির ইতিহাস, যুদ্ধ ও বিপ্লবের ছবি তবে সচল ইতিহাস। ফোটোগ্রাফিতে ক্রমেই বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যক্তিগত এক সৃজনশীলতাকে সমন্বিত করা হচ্ছিল ।

ফোটোগ্রাফি বাস্তবতা থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করলেও, তত্ত্বগত বিচারে তার

অবস্থান আমাদের দৈনন্দিন দর্শন ও চিত্রকলার মাঝামাঝি । ফোটোগ্রাফি হল আমাদের প্রত্যক্ষ দৃশ্যাভিজ্ঞতার আধা বাস্তব আধা বিমূর্ত বিন্যাস । চিত্ররীতি মূলত সংযোগাত্মক পদ্ধতি, শিল্পী তাঁর ধ্যানধারণা থেকে একটু একটু করে উপাদান সংগ্রহ করে ছবিটি গড়ে তোলেন । আলোকচিত্রের রীতি কিন্তু মূলত বিয়োগাত্মক, আলোকচিত্রী বাস্তবের উপকরণকে প্রয়োজনমতো কমিয়ে তাঁর ছবিকে সংহত করে তোলেন । এখনকার চিত্রপটের চাইতে মধ্যযুগীয় চিত্রপটের সঙ্গে আলোকচিত্রের সাংগঠনিক উপাদানের অধিক সাদৃশ্য রয়েছে । উভয়ক্ষেত্রেই স্রষ্টার চাইতে বড় হয়ে ওঠে স্রষ্টার কারিগরি দক্ষতা । মধ্যযুগের সাতটি উদারনীতিক শিল্পের মধ্যে চিত্রকলার স্থান ছিল না, চিত্রকলাকে ধরা হত শিল্প হিসেবে নয়, কারুকর্ম হিসেবে ।

চিত্রকলা ও আলোকচিত্র—দুয়ের মধ্যে যে যোগাযোগ, সম্পর্ক, আদানপ্রদান ও মিথস্ক্রিয়া তা খুবই জটিল ও চিত্তাকর্ষক । বিশেষ ধরনের আলোকসম্পাতের মাধ্যমে কুর্টজ যে সংবেদনাময় প্রতিকৃতি তুলতেন সেই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছিল 'রেমব্রান্ট' ফোটোগ্রাফি । Steichen -এর তোলা প্রথম দিককার ছবি দেখে বলা মুশকিল তিনি মূলত আলোকচিত্রী না মূলত চিত্রকর । Stieglitz -এর 'ইমপ্রেশনিস্ট' ফোটোগ্রাফের তুলনা করা যায় রেনোয়ার ছবির সঙ্গে এবং উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের আলোচনাও চিত্তাকর্ষক হতে পারে। আলোকচিত্রী Brassai -র হাতে আঁকা ছবি দেখে পিকাসো বলেছিলেন, 'তুমি ছবি আঁকা ছেড়ে ছবি তোলা ধরেছ কেন ? সোনার খনি ছেড়ে তুমি কাজ করতে গেছ রুপোর খনিতে ।' প্যারিসের দেয়ালে দেয়ালে যে চিত্র ও অঙ্কন Brassai তাঁর নাটকীয় চিত্ররূপ আমাদের উপহার দিয়েছিলেন । এই সব ছবি যেন গ্রাফিত্তি-জাতের উদাহরণ । কার্টিয়ার-ব্রেসঁ শেষ জীবনে ক্যামেরার পাশাপাশি হাতে তুলে নিয়েছেন তুলি ।

১৯৩৭-এর প্যারিস বিশ্ব মেলায় ব্রিটিশ প্যাভিলিয়নের চার দেয়ালে সুবিশাল আলোকচিত্র টাঙানো হতে বোঝা গেল দেয়ালচিত্রের ক্ষেত্রেও ফোটোগ্রাফি পেন্টিং-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে । এর আগে থেকেই বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীরা (Delacroix, Dominique থেকে সেজাঁ পর্যন্ত) তাদের ছবির কাজে প্রয়োজন মতো ফোটোগ্রাফির সাহায্য নিতেন । বালজাকের মূর্তি গড়ার সময় এমনকি রদাঁও একটা পুরনো দাগ্যেরোটাইপের বিশেষ সাহায্য নিয়েছিলেন । দেগা নিজে ছবিও তুলতেন, ফলে তিনি জানতেন ফোটোগ্রাফির কেমন ও কতটা ব্যবহারে তিনি প্রকৃতই উপকৃত হবেন । ফোটোগ্রাফির তাৎক্ষণিকতাকে চিন্তা, ধৈর্য ও পরিশ্রমের সাহায্যে এক ধরনের চিরকালীনতা দেওয়ার এই ব্যাপারটি অংশত তুলুজ-লোত্রেক-এর ক্ষেত্রেও সত্য । অন্যদিকে আবার ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ব্রাকের-এর শিল্পের, বিশেষ করে তার জ্যামিতিক প্রসঙ্গের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা দেখা যাচ্ছিল ।

সব মিলিয়ে ফোটোগ্রাফির নিজস্ব বিকাশ ঘটতে চিত্রকলা চাক্ষুষ বাস্তবতার বাস্তববাদী চিত্রায়ণের দায়িত্ব থেকে কিছুটা মুক্তি পেল । এর ফলে একদিকে চিত্রকলা

এক ধরনের শৈল্পিক স্বাধীনতা অর্জন করলো, অন্যদিকে চিত্রশিল্পী কিছু কিছু সামাজিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন । নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই বিচ্ছিন্নতা চিত্রকলার পরবর্তী বিকাশে এক প্রকার সাবজেকটিভিজম নিয়ে এল যা ছিল অনেকটাই বাস্তববাদী ফোটোগ্রাফির অবজেকটিভিজমের সম্পূর্ণ বিরোধী । এই সময়কার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের আঁকা বিখ্যাত প্রতিকৃতিগুলো দেখলে বোঝা যায় কীভাবে তার মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব, ব্যক্তিগত অনুভবের এবং আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষার ছাপ পড়েছে । একই ভাবে সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে কোন কোন কবিও পূর্বোক্ত সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছিলেন ।

আজ আমরা শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্ম দেখতে হলে গ্যালারি বা মিউজিয়ামে যাবার বদলে সাধারণত সেই শিল্পীর ছবির কোন বই তুলে নিই । এইভাবে ফোটোগ্রাফি চিত্রকলা সহ বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের অসংখ্য শিল্পীর শিল্পকর্মকে চিত্রায়িত ও সংরক্ষিত করে রাখে । এই সব ফোটোগ্রাফ তখন মূল শিল্পকর্মকে প্রতিস্থাপিত করে এক নিজস্ব, নতুন মাত্রা পায় । তা তখন অন্য কোন শিল্পমাধ্যমকে অনুপ্রাণিতও করতে পারে। যেমন প্রতীতিবাদী চিত্রকলার প্রারম্ভিক সূচনার সঙ্গে সেই সময়কার ফোটোগ্রাফির একটা পরোক্ষ সম্পর্ক টানা যায় । বিভিন্ন ভাব ও ধারণার চিত্রগত প্রতীক থেকে একদিন অক্ষর ও শব্দের উদ্ভব হয়েছিল । কিন্তু চিত্রের আবির্ভাব পরে কখনোই লিপিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ঘটে নি, বরং চিত্রকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে শুধু লিপির ব্যবহার ঘটেছে বহুবার । বইয়ে অলঙ্করণ হিশেবে ছবির ব্যবহার বা ছবির সাহায্যে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বা বিন্যাস ছাড়াও সাম্প্রতিক কালে লিপি ও ছবির আর এক প্রকার সমন্বয় ঘটেছে ফোটোগ্রাফিতে—লিপি কম্পোজিশনের অন্যতম উপাদান রূপে ছবির অংশ হয়ে গেছে অথবা লিপি স্বয়ং হয়েছে ছবির বিষয়বস্তু ।

ফোটোগ্রাফে যে প্রতিরূপ আমরা দেখি তা সাধারণত আমাদের দৃষ্টির স্বাভাবিক অবস্থানানুপাতকে অবলম্বন করে । এই প্রতিরূপের বিন্যাস রেখা, টোন, গঠন, বর্ণ ইত্যাদির বিন্যাসে । যে কোন স্থিরচিত্র একটি বদ্ধক্ষেত্র, তার অন্তঃস্থ নিজস্ব গতি নির্ভর করে প্রতিরূপের বিন্যাস ও ছবির ভেতরের অংশগুলির নির্দিষ্ট সম্পর্কের ওপর । আলোকচিত্রের প্রকাশভঙ্গিমার ক্ষেত্রে অনেকে চিত্রকলার নান্দনিক নিয়মকানুনকেই অনুসরণ করেছেন, আবার কেউ কেউ (যেমন ফক্স টালবট) চিত্রকলার নান্দনিক উপাদানকে ফোটোতে আরোপ করার আদৌ চেষ্টা করেননি । চিত্রকলার মতো আলোকচিত্রেও দ্বিমাত্রিক প্রতিরূপ এবং ত্রিমাত্রিকতার বোধ-বিশিষ্ট প্রতিরূপ—উভয়েরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । তবে যে অর্থে চলচ্চিত্র আলোকচিত্রেরই বিস্তার, সেই অর্থে আলোকচিত্র কখনোই চিত্রকলার প্রসার, বিস্তার বা ক্রমবিকশিত রূপ কোনটাই নয় । চিত্রকলার সঙ্গে আলোকচিত্রের মিথস্ক্রিয়াকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় : প্রথম পর্বে আলোকচিত্র বিশেষভাবে অনুসরণ করেছে চিত্রকলাকে, দ্বিতীয় পর্বে উভয়ের মধ্যে ক্রমাগত আদানপ্রদান হয়েছে, যে সময় একদিকে ফোটোগ্রাফি নিজস্ব চারিত্র্য অর্জন

করে, অন্যদিকে ফোটোগ্রাফিতে বিভিন্ন জটিল ও কখনো কখনো এমনকি স্ববিরোধী প্রয়োগ ঘটে, আর আধুনিক পর্বে চিত্রকলার গুণ বা নির্যাস ফোটোগ্রাফিতে একটা বিমূর্ত স্তরে এসে পৌঁছেছে। একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে দীর্ঘকালীন সম্পর্কের মতো বিচিত্র ও বহুমুখী এই সম্পর্ক ।

সুন্দর, গুরুত্বপূর্ণ ও ফোটোজেনিক—ইউরোপে ফোটোগ্রাফি প্রধানত এই তিনটে ধারণার দ্বারা চালিত ছিল, আর নিরপেক্ষতা ছিল ফোটোগ্রাফের উদ্দেশ্য বা কাম্য । তুলনায় আমেরিকান ফোটোগ্রাফি অনেক বেশি উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট ভাবধারার অনুগামী হয়েছে । সারসংক্ষেপ করে বলা যায়, ফোটোগ্রাফির ইতিহাস দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্য—সৌন্দর্যসৃষ্টি ও সত্যকথনের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস । এর মধ্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির ধারণাটি ললিতকলা থেকে পাওয়া, আর অন্যটি একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-তথা-নৈতিক আদর্শগত ধারণা । আজ ফোটোগ্রাফি নিজেই যখন ললিতকলার একটা শাখা রূপে অবিসম্বাদিত স্বীকৃতি পেয়েছে তখন তার নান্দনিক সংবিধানের মধ্যে হয়তো একটা নতুন ও উন্নততর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে ।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

সাহিত্যের সঙ্গে আলোকচিত্রের কিছু মিল তো আছেই, বহিরঙ্গে না হলেও অন্তর্প্রকৃতিতে, আকর্ষণীয় ঘটনা ও চরিত্রের প্রতি টান, গল্পরস, বা বর্ণনাময়তার দিক থেকে। আরো ব্যাপক, গভীর ও সূক্ষ্ম সাদৃশ্যের কথা কবি-ফোটোগ্রাফার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে । ক্যানডিড ফোটোগ্রাফি, ফোটোএসে, ফোটোজার্নালিজম এই নামগুলোও মোটের ওপর সাহিত্যঘেঁষা । আলোকচিত্রীদের মধ্যে যিনি বিবেকবান সাংবাদিক তাঁর উদ্দিষ্ট আক্ষরিক সত্য, আর যিনি সৃজনশীল শিল্পী তাঁর উদ্দিষ্ট কাব্য বা প্রসাদগুণ। ফোটোএসে ও ফোটোজার্নালিজম এই দুই বৈশিষ্ট্যকে কিছুটা মিলিত ও সমন্বিত করেছে ।

Gisele Freund তাঁর অ্যালবাম ভরে রেখেছেন কবি, সাহিত্যিকদের রঙীন প্রতিকৃতিতে : জেমস জয়েস, অদ্রে জিদ, পোল ভালেরি, রমাঁ রোলাঁ, এইচ. জি. ওয়েলস, জি. বি. শ । তেমনি শ আবার সময় পেলেই লাইকা ক্যামেরায় ছবি তুলেছেন, ফোটোগ্রাফি নিয়ে লেখালেখি করেছেন । শিকার করতে করতে ছবি তুলেছেন হেমিংওয়ে, আর তাঁর বলিষ্ঠ ও নিয়তিবাদী লেখক-শিকারী-ইমেজ চিরকালীন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে য়ুসুফ কার্শ-এর তোলা প্রতিকৃতিতে । আর্থার কোনান ডয়েলকে, অশরীরী বস্তুর জাল ফোটোগ্রাফ দেখিয়ে, তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে বিভ্রান্ত করেছে জালিয়াত ও চালিয়াতেরা । আবার তিনের দশকে আমেরিকায় গ্রাম্যবস্তিবাসী, ভবঘুরে, শ্রমিক ও প্রান্তিক চাষীদের বিষয়ে তোলা ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফ জন স্টেইনবেককে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁর ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ'-এর রচনায় ।

Eugéne Atget-কে তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুপুঙ্খের স্পষ্টতার জন্য বলা হয়েছে 'ক্যামেরার ওয়াল্ট হুইটম্যান' । শুধু তাই নয়, বহু লেখক তাঁদের গ্রন্থচিত্রণ ও

অলংকরণের দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁকে। আর গর্ডন পার্কস তাঁর তোলা ছবির সাথে নিজেই কবিতা লিখে প্রকাশ করেছেন তিন তিনটে কাব্যগ্রন্থ । মার্গারেট বার্ক-হোয়াইট লিখেছেন আত্মজীবনী, নাম দিয়েছেন : 'পোরট্রেট অব মাইসেলফ' ।

ফোটোগ্রাফি হল একমাত্র 'ভাষা' যা পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে বোধগম্য । ফোটোগ্রাফির ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা উভয়েই আমাদের চারপাশের অমানবীয় জগতের মধ্যে মানবিকতা সঞ্চারিত করে এবং যে কোন বিষয়বস্তুর অন্তর্গত মানবীয় উপাদান ও অংশসমূহকে রূপমুক্তি দেয় । ফোটোগ্রাফির ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা মানবসভ্যতার মানবিকতা ও অমানবিকতাকে চাক্ষুষ দর্শন করি, আর সাহিত্যের ভাষার মধ্য দিয়ে তাকে অনুভব ও উপলব্ধি করি। সাহিত্যে বাকপ্রতিমা, আলোকচিত্রে চিত্রপ্রতিমা । সাহিত্যে ওই প্রতিমার অবজেকটিভ বিচার, আলোকচিত্রে ওই প্রতিমার সাবজেকটিভ বিচার। সাহিত্যে অনুভূতির মানসিক প্রস্তুতি, আলোকচিত্রে মূলত ইন্দ্রিয়াবেগের দৃশ্যগত প্রস্তুতি । সব মিলিয়ে, বাকপ্রতিমা ভাবপ্রতিমা হয়ে উঠতে পারে কিন্তু চিত্রপ্রতিমা রসানুভূতি সৃষ্টি করতে পারলেও তার পক্ষে ভাবপ্রতিমা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত সীমিত ।

স্বাধীনচেতা আলোকচিত্রী হাইনের অভিমত হল তাঁর ক্যামেরার দরকার হয় সেই কথা বলার জন্য যে কথা তিনি শব্দ দিয়ে বলতে পারবেন না । আর ১৯২১-য়ে প্রাগে প্রতিকৃতি তোলার জন্য একটি যন্ত্র বসিয়ে যখন তা অভিহিত করা হয়েছিল 'নৌ-দাইসেলফ' নামে, তখন কাফ্কা ঈষৎ ব্যঙ্গ-সহকারে বলেছিলেন, 'নামটা হওয়া উচিত —মিসটেক-দাইসেলফ' । এই দুই মন্তব্য থেকে কোন তাৎপর্য ভেসে আসে কিনা তা পাঠকের বিবেচ্য । তবে প্রতিনিয়তই মিলেমিশে যায় সমান্তর শিল্পমাধ্যমগুলি । গদারের ছবিতে সংলাপ শোনা যায় : আ, পল ক্লি-র আকাশ; সল বেলোর লেখায় বর্ণনা পাওয়া যায়: যেন আনসেল অ্যাডামসের তোলা প্রকৃতি ।

প্রকৃতি

প্রকৃতি হল অসংখ্য ছবির অনন্ত উৎস । তৃণখণ্ড থেকে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত প্রকৃতি চিরকালই মানুষের কাছে শৈল্পিক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে এসেছে। শিল্পীর কাছে সর্বোচ্চ যা দাবি করা হয়েছে তা হল এই : যে তিনি প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন,তাকে অনুশীলন করবেন, অনুকরণ করবেন এবং এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা তার প্রতীতির বিরোধী নয়; কোন প্রাকৃতিক বস্তুকে যখনই তিনি গ্রহণ করেন, তখন তা আর প্রকৃতির অন্তর্গত থাকে না, বস্তুত, তার মধ্যে যা যা তাৎপর্যপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যময়, আগ্রহকর আছে সে সমস্তকে নিষ্কর্ষণ করে অথবা বস্তুটিতে এক অতিরিক্ত মূল্য যুক্ত করে শিল্পী বস্তুটিকে তাঁর মতো করে সৃষ্টি করেন ।

কথাগুলো গ্যয়টের । গ্যয়টে এই কথা বলে ওঠেন, আর ফাউস্ত আক্ষেপ করে : কী করে তোমাকে আমি বুঝে উঠবো, অসীম প্রকৃতি ? শুধু শিল্পের শ্রেষ্ঠ উৎস নয়, প্রকৃতি সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীও । কোন নান্দনিক দায় তার নেই, তাই তার বিচিত্র ও

অনন্ত শিল্পকর্মের যে অবাধ প্রকাশ চারদিকে, তার যৎসামান্য আমাদের ছবিতে ও ক্যানভাসে নান্দনিকতায় মণ্ডিত অর্থাৎ আবদ্ধ শিল্পরূপ পায় । প্রকৃতি খুব বড় বিচারকও । যেমন কয়েকটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মিকে নির্বাচিত ভাবে শোষণ করা ফিলটারের কাজ । পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বা জলরাশি হল সবচেয়ে জোরালো সেই ফিলটার । সাদা সূর্যালোকের কোন কোন রঙ জলে বাধাপ্রাপ্ত হয় । জলপৃষ্ঠ থেকে তিন ফুট নিচে লাল রঙে অর্ধেক শোষিত হয়ে যায়, ষোল ফুট নিচে সবটা লাল রঙ, তেত্রিশ ফুট নিচে সবটা কমলা, ছেষট্টি ফুট নিচে সমস্ত হলুদ ও বেগনি শোষিত হয় । একশো ফুট গভীরতায় সবকিছু নীলচে ধূসর লাগে । আরো নিচে গেলে সমস্ত গাঢ় কালো, অন্ধকার ।

প্রকৃতির নিজস্ব অনুষঙ্গগুলি বিভিন্ন আবেগ ও অনুভবেরও বাহক । যেমন খুব তির্যক হয়ে এসে পড়া সূর্যালোক যাতে দীর্ঘ ছায়া পড়ে তা ভোরবেলা ও সন্ধ্যা উভয় সময়েই দেখা যায় । কিন্তু ভোরের দীর্ঘ ছায়া অপেক্ষা সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়ার সঙ্গে সাধারণত আমরা বেশি পরিচিত বলে তির্যক সূর্যালোকের দীর্ঘ ছায়াকে আমরা প্রায়ই সন্ধ্যার দৃশ্য হিশেবে নিই । আর এই রকম ছবির ভাব সাধারণত হল নীরবতা, প্রশান্তি, বিশ্রামের অর্থাৎ যেসব ভাব সন্ধ্যার অনুষঙ্গে জড়িত । সুতরাং আলোকচিত্রীর কাছে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সূচনায় থাকে সৌন্দর্য, নান্দনিক আকর্ষণ, আবেগের অভিঘাত । পরবর্তী স্তরে, ছবি তোলা হয়ে যাবার পর, এই উৎসাহ, এই আবেগ থেকে তাঁকে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়, নিজের ছবিকে দেখতে হয় নিরাসক্তভাবে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হয় । পারলে শিল্পী পাঁকাল মাছের মতো বেরিয়ে আসতে পারেন, নয়তো স্ত্রী-মাকড়শার মতো প্রকৃতি তাঁকে গ্রাস করে নেয় ।

১৯০৭-যে রঙীন ফিলমের পরিস্ফুটন সহজ ও সুলভ হল । আর এই ঘটনা জনৈক ফরাসি কোটিপতিকে এত উৎসাহী করে তুললো যে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন প্রান্তে ফোটোগ্রাফারদের পাঠালেন প্রসিদ্ধ সমস্ত স্থানের প্রথম রঙীন ছবি তুলে আনতে । ভ্রমণ আর অভিযান প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির জন্য দুটি প্রধান উপায় । মানুষের সহজাত আগ্রহও রয়েছে এই দুই কর্মের প্রতি । ও' সুলিভান-এর মতো সমাজসচেতন তথ্যচিত্রগ্রাহকও ভৌগোলিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলেছিলেন । তাঁর তোলা নেভাদা, আরিজোনা, কলোরাডো ও নিউ মেকসিকো অঞ্চলের পাহাড়, মরুভূমি ও জলপথের ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার কোন বিরোধ নেই ।

কোন সামাজিক প্রসঙ্গ, মানবিক কোন অনুষঙ্গ নিয়েও আলোকচিত্রী ছবি তুলতে পারেন, আবার কোন প্রাকৃতিক রূপের, কোন নান্দনিক প্রসঙ্গেরও ছবি তুলতে পারেন । প্রথম ক্ষেত্রে তাঁকে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে জীবনের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে। এই বোঝাপড়াটা খুব জরুরি । প্রকৃতির কখনোই কোন তাড়া নেই আর মানুষের সদা ব্যস্ততা । মানুষের ইতিহাসে আজকের মতো আর কখনো মানুষ

প্রকৃতি থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি, প্রকৃতি আজ আমাদের কাছে অপরিচিত, বিদেশি। যেমন আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে পশুপাখি দেখে আসি, তেমনি শহর বা নগর থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে প্রকৃতিকে দেখতে যাই। প্রকৃতির সঙ্গে ধৈর্য ধরে দীর্ঘ, গাঢ়, গভীর কথোপকথন না করলে আলোকচিত্রী ও প্রকৃতির মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে উঠবে কী করে ? এই কথোপকথন আনসেল অ্যাডামসের মতো প্রায় আধ্যাত্মিক, সাঙ্গীতিক কথোপকথনও হতে পারে (যা প্রকৃতির যে আদর্শ রূপবন্ধ কল্পনা করে তা হল ধ্রুপদী প্রাকৃতিক স্থাপত্যের রূপ) আবার বহু জাপানি ফোটোগ্রাফারের মতো অনুসন্ধিৎসু কবিমনের কথোপকথনও হতে পারে (যা প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষুদ্র ডিটেলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম মুডের সরস চিত্রণের ওপর জোর দেয়)। প্রকৃতির ছবি তোলা হতে পারে স্বল্প নিবেদিত, কম কৌতূহলী ও প্রায় সহানুভূতিহীন ভঙ্গিতে কিন্তু অধিক বোঝাপড়া-সহ, তোলা হয়ও।

প্রকৃতির যে কোন দৃশ্যের বাইরের রূপের মধ্যে রয়েছে তার ভেতরের রূপ, নিজস্ব গোপন জীবন। যেমন তার প্রশান্তি অগ্নিগর্ভ প্রশান্তি, নীরবতা বাঙ্ময় নীরবতা। তাই প্রকৃতি যতটা উত্তর যোগায় যেন তার চেয়ে বেশি প্রশ্ন তুলে ধরে। প্রকৃতি আর জীবন নিয়ে আমাদের জগত। এই জগতের সঙ্গে শিল্পীর সপ্রেম কলহের আর এক নাম : শিল্প।

নারীশরীর

নারীশরীর বলতে আমরা প্রায়ই নগ্ন নারীশরীর বুঝিয়ে থাকি : আর ন্যুড অর্থ নগ্ন হলেও আমরা একে নিরপেক্ষ শব্দ হিশেবে নিই না, মূলত অর্থ করি নগ্নিকা—নগ্ন নারী। চিত্রে নগ্ন নারী অথবা নারীর নগ্নতা প্রদর্শিত হয়। চিত্রকলার চেয়ে আলোকচিত্রে, সাদা কালো আলোকচিত্রের চেয়ে রঙীন আলোকচিত্রে, আলোকচিত্রের চেয়ে চলচ্চিত্রে নগ্নতা বেশি আকর্ষণীয়। নগ্নতার দৃশ্যগত আবেদন দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারার ও মনোযোগ ধরে রাখতে পারার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। কী দেখানো হচ্ছে এটাই যথেষ্ট নয়, কে দেখছে সেটাও দরকারি।

আলোকচিত্রে নগ্নতা কখনো যেমন অসাধারণ শিল্প-সুষমা, বক্তব্য ও মন্তব্য, ব্যঞ্জনা ও উত্তরণ নিয়ে এসেছে, কখনো তেমনি নিছক অশ্লীলতা ও যৌন আবেদন হয়েও এসেছে। একদিকে নারী ও নারীশরীরের প্রতি আলোকচিত্রীর অ্যাটিচুড শুধু মনস্তত্ত্ব নয়, সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিকতা ও অর্থনীতিকতার দ্বারাও প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, অন্যদিকে নগ্নতার প্রতিরূপ দর্শকের কাছে আধুনিক পাশ্চাত্য নারীর (রেডি টু স্ট্রিপ এ্যট দি ফার্স্ট ভোশচার) উপযুক্ত প্রতিমা রূপে গৃহীত হবে ও ফলে নগ্নতার সম্ভাবনা বড় করে দেখিয়ে দর্শকের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য ব্যাহত করে।

নগ্নতার প্রতিরূপটি মূল ছবির কতটা অংশ জুড়ে রয়েছে তা অনেক সময় দর্শকের ওপর ওই প্রতিরূপের প্রতিক্রিয়া কতটা হবে তা নিরূপণ করে। যে ছবিতে নগ্নতার

প্রতিরূপ ছবির ক্ষেত্রফলের অর্ধেকেরও বেশি তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে থাকেন বহু আলোকচিত্রী, এই ধরনের ছবিতে পটভূমিকে উপেক্ষা করা হয়। এরই সঙ্গে পটভূমি/পুরোভূমি বিভাজন, ক্যামেরাকোণ ও অবস্থানানুপাত, আলোকসম্পাত ও আলোছায়ার বৈষম্য, মডেলের দেহভঙ্গি ও অভিব্যক্তি এবং ছবির অন্তর্গত মোটিফ বা বিশেষ কোন ইঙ্গিত এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন পরিপূর্ণ নগ্নতার চেয়ে আংশিক নগ্নতা অধিক উত্তেজনাময় মনে হয়, উদ্দীপক দেহশ্রীর অধিকারিণীর মুখশ্রী সরল বা নির্দোষ হলে সামান্য ধর্ষকামনা জাগে, নগ্নতা নিতান্ত নগ্নতার প্রদর্শনে আবদ্ধ না থেকে অন্যান্য অনুষঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে নগ্নতার আবেদন সুবিস্তৃত হয়।

নগ্নতার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। কিন্তু নগ্ন নারীচিত্র দর্শনে যৌনকামনা জাগবেই এই ধারণাও স্বতঃসিদ্ধ নয়। মনস্তাত্ত্বিকরা দেখেছেন নগ্ন নারীচিত্র দর্শনে পুরুষের মনে যে তাৎক্ষণিক অনুষঙ্গের উদ্ভব হয় তার শতকরা মাত্র তিরিশ ভাগের মতো যৌনমিলনের কামনা। অনুভূতি যে সত্যিই একাধিক ধরনের হতে পারে, যেমন কামনাময় ও কাব্যিক, তা অনেক সময় একটি পশ্চিমী ন্যুড ছবি ও একটি জাপানি ন্যুড ছবি পাশাপাশি রাখলে পাঠক নিজেই টের পাবেন। জাপানি ন্যুড ছবিতে নারীর প্রতিরূপ সুগভীর ভাবনায় ও দেশজ ঐতিহ্যে পরিকল্পিত, নিখুঁত ভাবে আলোকিত এবং বুনন, শৈলী ও মেজাজে সূক্ষ্মভাবে ভাবব্যঞ্জক। এই সমস্ত ছবি স্থির, সুষম, সংবেদনশীল।

দেশ থেকে দেশে নগ্নতা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও মাপকাঠি আলাদা হলেও দেশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে যে কোন পুরুষের পুরুষ বলেই একটা উপরিকমন্যতা আছে, যে প্রবণতা নারীকে ভোগ্যপণ্য হিশেবে গ্রহণ করতে চায়, ন্যুড ছবি তার কাছে ওই ভোগ্যপণ্যটির বিজ্ঞাপন। যে কোন আলোকচিত্রের মতো ন্যুড ছবিরও দৃশ্যরস তিনটে বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করতে পারে। এর প্রথমটি নতুনত্বের অভিঘাত। নগ্নতার প্রতিরূপের সংবাদ-মূল্য ও আঘাত করার ক্ষমতা থাকলে, তা কোন পরিচিত বা সুপরিচিত নারীর নগ্নতা হলে, ও নগ্নতার স্থির রূপ অপেক্ষা সক্রিয় ও গতিশীল নগ্নতার, দৃশ্যগত আবেদন বেশি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল আবেগগত প্রতিক্রিয়া। নগ্নতার আবেগগত আবেদন মৌল ও জৈব আবেদন এবং নগ্নতার প্রতিরূপের প্রতিক্রিয়া সদর্থক না নঞর্থক, অনুষঙ্গ শোভন না অশোভন, চিত্ররূপ আনন্দদায়ক না বিরাগকর প্রভৃতি প্রসঙ্গ নির্বিশেষে এই আবেদন কার্যকর থাকে। নগ্নতার বিশেষ কোন প্রতিরূপের আবেদন অশ্লীল বা বিকৃত হলেও সুস্থ মানসিকতার দর্শকরাও তা দেখে আবেগ অনুভব করে থাকেন। সবশেষে শুধুমাত্র আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে ছবির নিজেকে চিহ্নিত করতে পারার ক্ষমতা। নারীশরীর সেখানে কিছু আদি ও মৌল তল, রূপ ও আকারে পর্যবসিত, শরীরের ভূগোল তখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম (স্তন বা নিতম্বের পাহাড়, তলপেটের ঢালুভূমি, যোনিদেশের অরণ্য), নগ্নতা নানান ভাবার্থের প্রকাশক। এই ধরনের ছবিতে নকশা, বৈষম্য, বুনন, বর্ণবিভেদ প্রভৃতির ওপর জোর দিয়ে জোরালো চিত্রগত গতিবেগ সৃষ্টি করা হয়।

Lucien Clergue-এর ভাস্কর্যের আয়তন বিশিষ্ট ও Bill Brandt-এর বিচিত্র ও প্রায় বিমূর্ত রূপ বিশিষ্ট নগ্ন নারীশরীরের আলোকচিত্র এই ধরনের ছবির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। Clergue-এর ছবিতে তরঙ্গায়িত ও সফেন সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে বালুকাময় তটভূমিতে উঠে আসে যে রূপসী নারী, যার নাম ককতো দেন আফ্রোদিতি, তার স্তন, উরুত ও নিতম্ব যেন দ্বীপের আশ্রয়, নাভি যেন অতল জলস্তম্ভ, সিক্ত কেশরাশির জলবিন্দু যেন অন্ধকার আকাশে অসংখ্য তারকারাজি। নাটকীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই নারীকে যেন স্পর্শন দ্বারা বোধ করা যাবে এমন। Brandt-এর ছবিতে বাস্তব ও স্বাভাবিক অবস্থানানুপাতকে ভেঙ্গে নারীশরীরকে নিয়ে যথেচ্ছ জ্যামিতিক রূপবন্ধ সৃষ্টি করা হয়, রূপবন্ধের এই ধারণা এল গ্রেকোর ধর্মীয় কৃচ্ছ্রতায় শীর্ণ করে আনা, রহস্যময় রূপকল্পনার অনুরূপ।

শিল্পে ও সাহিত্যে, আমি মনে করি, পর্নোগ্রাফির কেন্দ্রীয় বিষয় যতটা না যৌনতা তার চেয়ে বেশি মৃত্যুভয়, যৌনতার প্রধান অনুষঙ্গ যতটা না নগ্নতা তার চেয়ে বেশি সাফল্য ও ক্ষমতার বাসনা, নগ্নতা যতটা না প্রদর্শিত প্রতিরূপ সংক্রান্ত তার চেয়ে বেশি কল্পনাপ্রবণতা ও পলায়নপরতা বিষয়ে। এই কারণেই নগ্ন নারীশরীরের ছবি একই সঙ্গে বাস্তব ও অবাস্তব। তাই যে ঘরোয়া জাপানি কিশোরী শান্তভাবে ও নিঃসংকোচে ক্যামেরা লেনসের দিকে চেয়ে আছে এবং রিও ডি জেনিরোর সমুদ্রতটের যে অভিজাত রূপসী অহংকারীর মতো ক্যামেরা থেকে নিজের চোখ সরিয়ে রেখেছে তারা দুজনেই একই আপেক্ষিকতার কারণ ও ফল।

যুদ্ধ

সারা পৃথিবী জুড়ে সংবাদপত্রে যত ছবি ছাপা হয় তার একটা বড় অংশ দুর্ঘটনার, ভয়াবহতার, যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের অনিশ্চয়তার। আর এই সব সংগ্রামের ছবি যাঁরা তোলেন, শান্তিপ্রিয়, সমর্পিত সেই সব মানুষ যাকে ঘৃণা করেন—হিংসা, যুদ্ধ, আতংক—নিজেদের কাজে সেগুলির দ্বারাই সুতীব্র ভাবে আকৃষ্ট। তাঁদের সাহসিকতা সংগ্রামী সৈনিকদের চেয়েও বেশি ও আরো জীবনমুখী, কেননা কোন বাধ্যতামূলকতা থেকে নয়, নিজেদের ভেতরের তাগিদ থেকে তাঁরা তাদের কর্তব্যকর্ম বেছে নিয়েছেন। যুদ্ধের ছবি তোলার অনুমতির জন্য তাঁদের সেনাপতিদের সন্তুষ্ট করতে হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাতায়াতের নিজস্ব ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে, নিজের সমস্ত খরচ নিজেকে যোগাতে হয়েছে। যে দীর্ঘ সময় ধরে ও' সুলিভান আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ছবি তুলেছেন সেই সময়ের মধ্যে ছয় ছয় জন ইউনিয়ন জেনারেল বদল হয়েছে।

কোরিয়ার যুদ্ধে হিমাংকের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া বরফের ঝড় যখন ডেভিড ডগলাস ডানকানের হাতের আঙুল আর ক্যামেরার শাটারকে অবশ করে দিত, উনি তখন নিজের শরীরের ভেতর দুহাত আর ক্যামেরাকে ঢুকিয়ে নিতেন। যখন বুঝতেন শাটার এখন আবার কাজ করছে, ক্যামেরা বের করে তাড়াতাড়ি দু একটা ছবি তুলতেন, মরণপণ সংগ্রামে রত সৈনিকদের হাতাহাতি যুদ্ধের ক্লোজ-আপ ছবি। যুদ্ধচিত্রে পারদর্শিতার জন্য

তাঁকে দেওয়া হয়েছিল দুটো ডি. এফ. সি., তিনটে এয়ার মেডেল, ছটা ব্যাটল স্টার এবং একখানা পার্পল হার্ট (আহত হবার জন্য), অধিকাংশ সৈনিকের চাইতে বীরত্বের অধিক স্বীকৃতি ।

যুদ্ধের ছবি যাঁরা তুলেছেন আহত অথবা নিহত হবেন জেনেই তাঁরা তা তুলেছেন । রবার্ট কাপা তাঁর ফোটোগ্রাফার প্রেমিকাকে নিয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধের ছবি তুলতে গেছিলেন, সেখানে ট্যাঙ্কের তলায় নিষ্পেসিত হয়ে তাঁর প্রেমিকা মারা যান । সতের বছর ও তিনটে যুদ্ধের পর কাপা নিজেও ভয়াবহ মৃত্যু বরণ করেন । চিম, যুদ্ধকে যিনি দেখেছিলেন এই পৃথিবীর শিশুদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ হিশেবে, নিহত হন আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে । ড. এরিখ সলোমন, যাঁকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম প্রকৃত চিত্র-ঐতিহাসিক, তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল নাৎসিদের গ্যাস চেম্বারে ।

তাঁদের এই সাহস, সততা ও সহানুভূতি বিশুদ্ধ ও স্বতোৎসারিত । সেই কারণেই ডগলাস ডানকান ভিয়েতনাম যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে, আমেরিকান সৈনিকদের অমানুষিক আচরণের প্রতিবাদ করে বই লেখেন : 'আই প্রোটেস্ট' । সেই কারণেই চিম যেখানে যখন যান যুদ্ধের ফলে অনাথ হয়ে পড়া শিশুদের দত্তক হিশেবে গ্রহণ করেন । সমস্ত যুদ্ধ আর রক্তপাতের মধ্যেও এঁরা গান ভালোবাসেন, স্ত্রী বা প্রেমিকাকে নিয়মিত চিঠি লিখে পাঠান, অবকাশ মতো পিকাসোর ছবির ফোটো তোলেন । এঁদের অনেকেই নম্র ও নরম মনের মানুষ, শেষ পর্যন্ত মানুষের মধ্যেই তাঁরা শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চান । যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর ভয়াবহ চিত্ররূপের নিচ থেকে তাঁদের ত্যাগ ও আর্তির রুপোলি রেখা ফুটে উঠে মানবিক মূল্যবোধের লিখন রেখে যায় । মানবিক ব্যর্থতার মধ্যে মানুষের সাফল্যের এ এক অনন্যসাধারণ ও প্রয়োজনীয় উদাহরণ ।

যুদ্ধ আর একটা বড় কাজ করে, কিছু কিছু ভাববাদী ধারণা থেকে আমাদের মুক্ত করে দিয়ে যায় । Steichen প্রথমে তুলতেন অস্পষ্ট, উদ্দেশ্যহীন ছবি, আর্টি ফোটোগ্রাফ। সামরিক অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্য ভাবে ছবি তুলতে শেখালো, তিনি শুরু করলেন সরাসরি ছবি তুলতে, স্ট্রেট ফোটোগ্রাফি । তেমনি শিল্প ও অলংকরণের Art Nouveau শৈলী আলোকচিত্রের ওপরও তার প্রভাব ছড়িয়ে রেখেছিল বেশ কিছুদিন, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবতা সেই প্রভাবকে চিরকালের মতো বাতিল করে দেয় । রাশিয়ার বিপ্লব ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে বস্তুবাদী ও তথ্যমূলক বা ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফির পক্ষে কতটা সহায়ক হয়েছে তাও বিশেষ বলার অপেক্ষা রাখে না ।

খেলাধুলো

মানুষের অজস্র আর বিচিত্র ক্রিয়াকর্মের মধ্যে একটা হল খেলা—সে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত আর সামাজিক প্রসঙ্গ । ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ হিশেবে তা মানুষের জীবনযাপনের অন্যতম অঙ্গ, সামাজিক প্রসঙ্গ হিশেবে তা সমাজের অপরিহার্য অংশ। মানুষের মৌল কর্ম ও আবেগের এক মৌলিক উপাদান রূপে খেলাধুলো অনেক মানবীয় পরিস্থিতি, অনেক মানবিক ঘটনার আদর্শ প্রতিরূপ । সৎ সাহস, কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য, সৌন্দর্য, সূক্ষ্মতা

—খেলা খেলোয়াড়ের কাছে যা দাবি করে, মানুষের কাছ থেকে জীবনও দাবি করে ঠিক তা-ই ।

একটা সময় ছিল যখন ক্রীড়া ও শিল্প, আর মনন ও ক্রীড়া পরস্পরের বিপরীত পথ ধরে চলেছে, সেটা হল তাদের অপ্রাপ্তমনস্কতার সময় । আজ যখন তারা সেই অপোগণ্ডতা পেরিয়ে এসেছে, ক্রীড়া তখন শিল্পের এক অন্যতম প্রধান বিষয় । তখন এমন ব্যক্তির দেখা মিলছে যিনি একদিকে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, অন্যদিকে অলিম্পিকে রৌপ্য পদক বিজয়ী । শিল্পে যেমন ক্রীড়াতেও তেমনি—সৃজনশীলতা প্রকৃতি ও প্রতিযোগীর সঙ্গে, সাময়িক হলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চায় ।

অন্য কোন শিল্পের চেয়ে আলোকচিত্রশিল্পের সঙ্গে খেলাধুলোর সম্পর্ক আরো বেশি গভীর । সঙ্গীত বা সাহিত্য অনেকটা ব্যক্তিগত শিল্পও, যা একা একাও সৃষ্টি বা উপভোগ করা যায় । অন্যে বা অনেকে না দেখলে কিন্তু ফোটোগ্রাফের আদ্ধেক মজাই মাটি । তেমনি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কেরও বোধহয় অন্য আর কোন ক্ষেত্র নেই যা খেলাধুলোর মত এতটা সার্বজনীন ও সমভাবে ভোগ্য । উভয়ের প্রথম সম্পর্ক এই যৌথ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে । দ্বিতীয়ত আলোকচিত্রশিল্প যা চায়—আকর্ষণীয় ঘটনা বা চমৎকার ভঙ্গি, ছন্দ বা গতির অনুভব অথবা শক্তি বা সৌন্দর্যের প্রকাশ—তা খেলাধুলোর মত এত বেশি আর কোথাও মেলে কি ?

ফোটোগ্রাফি পৃথিবীতে অসাম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষকে ফলপ্রদ ভাবে সচেতন করেছে সবচেয়ে বেশি আর পৃথিবীতে যুদ্ধ ও অস্ত্র-প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণকে তুলে ধরার কাজে খেলাধুলোই হল মানুষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার । আবার এই খেলাধুলোকে জনপ্রিয়, সুপ্রচারিত ও আন্তর্জাতিক করে তুলছে টিভি, সিনেমা ও ফোটোগ্রাফি । সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমি মনে করি যে, অদূর ভবিষ্যতে ফোটোগ্রাফির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দুটি বিষয় হয়ে উঠতে পারে—১. বন্যপ্রাণী (যা মানুষকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করবে) ও ২. খেলাধুলো (যা তাকে মানুষে মানুষে অন্তর্প্রকৃতির অভিন্নতা সম্পর্কে সচেতন করবে) ।

বিজ্ঞাপনী চিত্র

ফ্যাশন/অ্যাড়ভার্টাইজিং/কমার্শিয়াল ফোটোগ্রাফি—আধুনিক কনজিউমারিজমের প্রধান অবলম্বন । ১৯৩০ সন নাগাদ ফোটোগ্রাফি প্রচারের অন্যতম মাধ্যম রূপে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে, আর্ট মিউজিয়ামগুলোতে ফোটোগ্রাফের স্থানলাভ ঘটে, ফোটোগ্রাফির বিভিন্ন পত্রিকা আলোকচিত্রীদের আত্মপ্রকাশের বিস্তর সুযোগ করে দেয় । ছবির জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকও মিলতে থাকে । বহুল প্রচলিত পত্রিকার প্রচ্ছদে এতদিন ফোটো ছাপানো হত না, যেমন টাইম পত্রিকার প্রথম দিককার প্রচ্ছদে সব সময়েই চারকোলে আঁকা প্রতিকৃতি ।

ফোটোগ্রাফির মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশন ও ব্যবসার জগতে তার চল বাড়লো । বর্তমানে বিজ্ঞাপনে দৃশ্যগত দিকটা প্রায় পুরোপুরি ফোটোগ্রাফের দখলে ।

বিশেষ ধরনের আলোকসম্পাত, চটকদার দেহভঙ্গিমা, চমকপ্রদ পোশাক ও আকর্ষণীয় প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে এইসব ছবি এমন এক দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও মনোরঞ্জক প্রতিরূপের সৃষ্টি করে যা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে নারীর সাজসজ্জা ও পরিবারের বিলাস ব্যসন সম্পর্কে (কৃত্রিম) চাহিদা তৈরি করে থাকে। জীবনযাত্রার এমন এক পরিবেশ তৈরি করে যেখানে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও বিভিন্ন বিলাসসামগ্রী প্রদর্শিত নারী ও পুরুষের বয়স, স্বাস্থ্য, অর্থ, সামাজিক অবস্থা ও ভাবমূর্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। বিজ্ঞাপনী ফোটোগ্রাফারের প্রধান গুণ হল স্বপ্নকল্পনাময় কম্পোজিশন ও অপার্থিব সুষমা সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতা, তাঁর নিজের ভাষায় তিনি কাজ করেন 'মডেল নিয়ে নয়, অ্যাকট্রেস নিয়ে।'

প্রকৃতই, কমার্শিয়াল ফোটোগ্রাফার যতটা না চিত্রশিল্পীর সঙ্গে তুলনীয় তার চেয়ে বেশি তুলনীয় নাটক বা চলচ্চিত্রের পরিচালকের সঙ্গে। ফোটোগ্রাফি মাধ্যমটির প্রতি তিনি মূলগত ভাবে বিশ্বস্ত, ছবিতে প্রদর্শিত জগতের সঙ্গে দর্শকের সংঘাত তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি চান সেই কাল্পনিক জগতের প্রতি দর্শকের মৌন সম্মতি। তবে একথা মনে করি না যে ফোটোগ্রাফির মানদণ্ডে বিজ্ঞাপনী ফোটোগ্রাফির অবস্থান বাস্তববাদী ফোটোগ্রাফির বিপরীত মেরুতে। কেননা ফ্যাশন ও বিজ্ঞাপন সামাজিক আবহাওয়ার সংবেদনশীল ও নির্ভরযোগ্য নির্দেশক। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনী চিত্রের কাল্পনিক জগত ব্যক্তিকল্পনার জগতের চাইতে বেশি সমষ্টিকল্পনার জগত।

নান্দনিক দৃষ্টিকোণের উদ্ভব হয় বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান ও আবেগময় অভিজ্ঞতার সংযোগে। বিজ্ঞাপনের ছবি দেখার সময় দর্শকের নান্দনিক ও সমাজ সচেতনতা ছবির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং ছবির চিত্রপ্রতিমাকে দেখা ও ছবির ভাবাবহকে বিচার করা—এই দুই কাজ একই সঙ্গে হয়। এই ভাবে দর্শক কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয় ঘটান। নিজেরই সৃষ্টি করা ছদ্মবাস্তবকে তিনি অবাস্তবও করে দিতে পাবেন আবার ওই ছদ্মবাস্তবকে নিজের ভেতরে টেনে নিতেও পারেন। বিজ্ঞাপন হচ্ছে এমন এক হাতিয়ার যা আমরা ব্যবহার করতে পারি অথবা যা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে। দর্শককেই ঠিক করতে হবে তিনি প্রভাবিত বা প্রতারিত হবেন, না, নিজের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করবেন।

ক্যামেরা

ফোটোগ্রাফির ইতিহাস কিছুটা ক্যামেরার ইতিহাসও বটে। ক্যামেরা ব্যবহারের ইতিহাস। কোন্ ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে—ভারী ত্রিপদ সহ বড় ক্যামেরা না ৪ x ৫ ভিউ ক্যামেরা না ৩৫ মি. মি. ছোট ক্যামেরা—বিষয়বস্তু বা প্রকরণের ওপর তার কমবেশি ছাপ পড়ে বৈকি। যেমন ৩৫ মি. মি. লাইকা ক্যামেরার আবিষ্কার ফোটোগ্রাফির প্রতিটি শাখায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। ভঙ্গিবিহীন, ক্যানডিড ক্যামেরাশৈলী সম্ভব হয়েছিল এর ফলে। বস্তুত আধুনিক ফোটোসাংবাদিকতার দ্রুত বিকাশ ও প্রসারের কারণ ছোট ক্যামেরার অবির্ভাব। রিফ্লেক্স ক্যামেরার পেশাদারী দক্ষতা আর সাধারণ বক্স ক্যামেরার পারিবারিক জনপ্রিয়তা শুধু ক্যামেরা বিশেষে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ নয়,

ফোটোগ্রাফির সমগ্র ঐতিহ্যেরই এক এক অংশ। এই জন্যই বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুসারে ক্যামেরার ফর্ম্যাটিও পালটে যেতে পারে। ফোটোগ্রাফির ইতিহাসে তার প্রমাণ মেলে।

তবে কোন্ ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই সব নয়, কী ফল পাওয়া যাচ্ছে সেটাই আসল। টেক্‌নিক যেমন বক্তব্য বা উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্যই দরকার, ক্যামেরাও তেমনি। ফলে প্রতিটি ক্যামেরার সুবিধা ও সম্ভাবনার কথাও জানতে হবে, আবার অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতার কথাও জেনে রাখতে হবে। যেমন ছোটি ক্যামেরার যেগুলো বিশেষ আকর্ষণ—ক্ষুদ্র আকারের দরুন বহনযোগ্যতা, এক রোল ফিল্‌মের ওপর অনেকগুলো ছবি তোলার সুযোগ, লেন্‌স পাল্টাবার সুবিধা—সেগুলোর মধ্যেই রয়ে গেছে অন্তঃস্থ বিপত্তির আশঙ্কা। প্রকরণের সঙ্গে বোধের মিলন হলে তবেই এই আশঙ্কা কাটিয়ে ওঠা যায়।

ক্যামেরার প্রধান গুণ বা শক্তি হল তার সত্যকথনের ক্ষমতা, আবার ক্যামেরা মিথ্যাচরণ করতে পারে এটা জানার পরই ফোটোগ্রাফির জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে গেছিল। ক্যামেরার অন্যতম উদ্দেশ্য হল মনে-করানো : দর্শককে স্মৃতিচারণার সুযোগ দেওয়া। ক্যামেরার অন্যতম আরেক উদ্দেশ্য হল একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা। এর ফলে ফোটোগ্রাফার নিজে যা দেখছেন তা অন্যকে দেখাতে পারেন, এবং শুধু তাই নয়, তিনি যা দেখলেন সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিবৃতিও রাখতে পারেন। যা আমাদের চারপাশে সদা বর্তমান তবু পর্যবেক্ষণের বাইরে থেকে গেছে, ক্যামেরা তাকে স্থায়ী রূপ ও নির্দিষ্ট চরিত্র দেয়। এইভাবে ক্যামেরা আমাদের চারপাশের জগতের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করতে পারে। যা হয়তো এতদিন শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য ছিল তাকে আবেগগতভাবেও ফলপ্রদ করে তুলতে পারে।

নিজের জীবনের স্মৃতি সংরক্ষিত করে রাখার প্রয়োজনে সাধারণ যে মানুষ বছরে মাত্র কয়েকবার ক্যামেরা তুলে নেন আর পেশাদার যে ফোটোগ্রাফার ব্যক্তিগত বিবৃতি রচনার জন্য ক্যামেরার ব্যবহার ঘটান দুজনেই কিন্তু কাজ করেন একই যন্ত্র নিয়ে। একজনের কাছে ক্যামেরা একটা যন্ত্র, দরকার মতো কাজে লাগে ; ক্যামেরা অন্যজনের সবসময়ের সাথী, শরীরের অন্য যে কোন অঙ্গের মতো সহজাত ও স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের জন্য কোম্পানি যে বিজ্ঞাপন দেয় তাতে লেখা থাকে : এ ক্যামেরাটা কিনুন, এতে ক্যামেরার কাজ ছেলেখেলার মতো সহজ। আর পেশাদার আলোকচিত্রীরা তাঁদের বিপুল সাজসরঞ্জামে ভূষিত ক্যামেরায় যে ছবি তোলেন তার একটা বড় অংশ ছেলেভুলানোর জন্য নয় তো ?

রঙ ও রঙীন ছবি

রঙ বলতে আমরা দুটো ভিন্ন প্রতীতিকে বোঝাই—১. মানুষের দৃশ্যানুভূতি বিশেষ কোন আলো থেকে রঙের বিষয়ে যে অনুভব প্রাপ্ত হয় তা ২. বস্তুর বিশেষ ধর্ম হিশেবে রঙ, যে ধর্মের ফলে বস্তুটির নির্দিষ্ট বর্ণের আলোককে প্রতিফলিত বা প্রেরণ করার

প্রবণতা দেখা যায় । রঙের এই দুই প্রতীতিকে যথাক্রমে ১. দৃশ্য-ইন্দ্রিয় অনুসারে বর্ণ ও ২. বস্তুবর্ণ বলা যেতে পারে । দৃশ্য-ইন্দ্রিয় অনুসারে যে বর্ণ তাতে আলোর বর্ণের মিশ্রণ হয় যুত মিশ্রণ, আর রাসায়নিক রঙে রঞ্জিত বস্তুবর্ণে রঙের যে মিশ্রণ তা হয় বিযুত মিশ্রণ । পদার্থবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদরা দৃশ্যানুভূতি নিয়ে যে গবেষণা করেন তা আলোর যুত মিশ্রণের এবং চিত্রশিল্পীরা কৃত্রিম রঙে যে ছবি আঁকেন তা বর্ণের বিযুত মিশ্রণের উদাহরণ । রঙীন ফোটোগ্রাফিতে একই সঙ্গে রঙের যুত মিশ্রণ ও বিযুত মিশ্রণের উদাহরণ মেলে ।

রঙ এক অভিঘাতী ও দূরপ্রসারী অনুষঙ্গ, তার প্রভাব ব্যক্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক । বৈজ্ঞানিক মতে অক্ষিপটে পতিত আলো শারীরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ও তারপর মনস্তাত্ত্বিক সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গিয়ে আমাদের বর্ণানুভূতি জাগায় । আবার শিল্পগতভাবে রঙের সৌন্দর্য, নান্দনিকতা ও মনস্তত্ত্ব একে অপরের মধ্যে অনেকখানি ডুবে গিয়ে কিছুটা করে জেগে থাকে, ফলে একটাকে বাদ দিয়ে অন্যের কথা বলা মুশকিল । দর্শকের মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্য শুধু দর্শনের ক্ষেত্রে নয়, বর্ণানুভূতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উপাদান । মানুষের বর্ণ-অভিজ্ঞতা নিতান্ত এক ধরনের সংবেদন নয়, তা আরো অনেক জটিল ও পূর্ণাঙ্গ অনুভবের রূপে সংঘটিত হয় । বর্ণানুভূতি হয়ে থাকে বিভিন্ন বিন্যাসে, প্রণালীতে ও মাত্রায় । শিক্ষা ও ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অনুভূতি, আবেগ ও অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণানুষঙ্গও সৃষ্টি হয় । রঙের মনস্তত্ত্ব কখনোই আবেগ, অনুভূতি ও ব্যক্তিসত্তার ওপর রঙের প্রভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না । তা ব্যক্তির যাবতীয় সচেতন ক্রিয়া ও আচরণের ওপর রঙের যে ভূমিকা তার সঙ্গে যুক্তির সূত্রে বাঁধা । এই সব ক্রিয়া ও আচরণের মধ্যে রয়েছে মনোযোগ, সংবেদন, অনুভব, শিক্ষা, স্মৃতিশক্তি, স্মরণে আনতে ও চিহ্নিত করতে পারার ক্ষমতা, কল্পনা, প্রেষণা, বোধশক্তি, আবেগ, যুক্তি বা বিচারক্ষমতা, কর্ম ।

রঙের নান্দনিক প্রসঙ্গ তার মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গের একটা দিক মাত্র । বিভিন্ন প্রকারের উদ্দীপকের প্রতি দর্শকের চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়া ও তার ফলে উদ্ভূত আবেগগত ও অনুভবগত প্রতিক্রিয়া—এই দুয়ের মধ্যকার মিথষ্ক্রিয়াই হল রঙের নান্দনিক প্রসঙ্গের বিষয় । উনিশ শতকের প্রথমার্ধের আগে পর্যন্ত রঙের নান্দনিকতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সমসাময়িক দর্শনের ওপর নির্ভরশীল ছিল ও শিল্পের ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য ছিল কিছু প্রথাসিদ্ধ নিয়ম ও বিধি প্রচলিত করা । পরে নান্দনিকতা সম্পর্কে ব্যবহারিক ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণার উদ্ভব হয় এবং শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পকর্ম দেখে কারণ, নীতি ও উপাদান বিচারের প্রবণতা দেখা যায় । এর ফলে ধরাবাঁধা নিয়মের চাইতে ব্যক্তির নিজস্ব বিচারের ওপর বেশি জোর পড়ে । এই বিচার, ব্যক্তিবিশেষে, প্রভাবগতও হতে পারে, আবার বিশ্লেষণধর্মীও হতে পারে । নান্দনিকতা কোন নির্জীব, নীরস, খণ্ড উপাদান মাত্র নয়, তা সমগ্র ও স্পন্দিত শিল্পসত্তার এক অঙ্গাঙ্গি অংশ ।

ব্যক্তি বস্তুর দিকে তাকিয়ে আগে বুঝবে তা প্রিয় না অপ্রিয়, আকর্ষণীয় না বিরাগকর,

পরে দেখবে বস্তুটির কী রঙ, কোন্ আকৃতি । অপ্রিয় বর্ণে রঞ্জিত কোন চমৎকার আকারকে আমাদের চোখ সাধারণত অপছন্দই করবে । ব্যক্তি যে রঙ চোখে দেখলো বস্তু বা বিন্যাসের অর্থযুক্ত বর্ণানুষঙ্গের সাথে তাকে মেলাতে চাইবে ও সেই অনুসারে বিশেষ প্রয়োগ বা উদ্দেশ্যর পক্ষে ওই রঙ কতটা কার্যকারী বা অসঙ্গত তার বিচার করবে । উদ্দেশ্যর উপযোগিতার ও নকশার সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ওই রঙ কতদূর অবধি ফলপ্রদ ও সঙ্গত—তা দিয়েই রঙ ব্যবহারের কার্যকারিতা নির্ধারিত হয় । বর্ণবিন্যাসের প্রথম কথা হল, উদ্দীপকগুলিকে এমনভাবে নির্বাচিত, উপস্থাপিত ও বিন্যস্ত করতে হবে যাতে দর্শকের মনে অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল অনুভূতির জন্ম না হয় ।

যে কোন বর্ণবিন্যাসের বেলায়, সঠিক বর্ণ-পরিকল্প হল তাই যা ১. শিল্পীর মনের মতো ২. উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়ক ৩. ভাব ও রূপের মধ্যে ঐক্য রক্ষাকারী ৪. বৈচিত্র্যময় ও আগ্রহকর । ঐক্য নানাভাবে সৃষ্টি হতে পারে, জোরালো ও সুসঙ্গত নকশা, বিশেষ কোন বর্ণ বিভেদের প্রাধান্য ও এককে কোন বর্ণের ওপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে । আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে বর্ণমাত্র ও আলোকতার বৈচিত্র্য, সংপৃক্তি ও বর্ণবিভেদের বিভিন্নতার মাধ্যমে । ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে ছান্দিকতাও সমান দরকারি । একাধিক বস্তু ও বর্ণের মধ্যেকার সম্পর্ককে অনুপাত ও ছন্দ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, যা বস্তু বা বর্ণরাজির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ।

রঙীন ছবিতে বর্ণবিন্যাস করা হয় আবেগময় প্রভাব ও দৃশ্যরসের দিকে লক্ষ্য রেখে । এখানে কম্পোজিশন তলের বিরুদ্ধে তলের, রঙের পরিপ্রেক্ষিতে রঙের সমাবেশে । রঙীন ফোটোগ্রাফি দৃশ্যগত সম্পাদনার এক ত্রিমাত্রিক পদ্ধতি—বর্ণমাত্র, সংপৃক্তি ও ঔজ্জ্বল্যের তিন মাত্রা । যে দৃশ্যে বাস্তবতারই প্রাধান্য সেখানে মোটের ওপর পার্থিব রঙেরই অনুকরণ আর দৃশ্য যেখানে নিজেতে পুরোপুরি আবদ্ধ না থেকে অতিরিক্ত বা বাস্তবাতীত আরো কিছু নির্দেশ করে সেখানে আপাতবিরোধী বর্ণপ্রয়োগের সুযোগ । সঙ্গতি হল একঘেয়ে সাদৃশ্য ও চূড়ান্ত বৈসাদৃশ্য এই দুই চরম অবস্থার মাঝামাঝি কিছু । চলচ্চিত্রের তুলনায় স্থিরচিত্রে দর্শক বর্ণপ্রয়োগের ওপর নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভব ও বিচারশক্তি আরোপ করার অনেক বেশি সময় ও সুযোগ পান । নান্দনিক মনস্তত্ত্বের একটা কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হল শিল্পসৃষ্টির প্রতি ও শিল্পানুভূতির বিষয়ে দর্শকের প্রতিক্রিয়ার অনুশীলন । এই কাজে রঙীন ছবির যথেষ্ট ভূমিকা আছে ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ক্যানভাসে শিল্পের বৈচিত্র্য ও শক্তির একটা প্রধান কারণ হয়ে দেখা দিল রঙের নিঃসংকোচ প্রয়োগ । রেনেসাঁসের পরে রঙের বিষয়ে যে কঠোর বিরোধিতা দেখা গেছিল পাশ্চাত্যের মানুষ তা ততদিনে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছিল । শিল্পীদের কারো কারো মত ছিল তাঁরা প্রবৃত্তি ও স্বজ্ঞার দ্বারা চালিত হয়ে রঙ ব্যবহার করেন । আবার কেউ কেউ—কান্দিনস্কি প্রমুখ—রঙ ব্যবহারের পেছনে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ও সুসঙ্গত তাত্ত্বিক ধারণা ও নীতি খাড়া করার চেষ্টা করেছিলেন । এঁরা আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে তাল রেখে রঙকে গণিত বা জ্যামিতির সঙ্গে একাত্ম

করে ভাবতে চাইতেন । এঁদের কারও মতে নীল রঙ হল বৃত্তাকার, হলুদ ষড়ভুজ, লাল ত্রিভুজাকৃতি, কারও মতে লাল বর্গক্ষেত্র, কমলা আয়তক্ষেত্র, হলুদ ত্রিভুজ, সবুজ ষড়ভুজ, নীল বৃত্ত এবং রক্তবেগনি ডিম্বাকার, কান্‌দিন্‌স্কির মতে হলুদের বিচলন যেন তার কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে, নীল তার আপন অক্ষ বরাবর আন্দোলিত, আর লালের আভ্যন্তর অনুরণন ।

একদম আধুনিক শিল্পের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যার উত্থান ও প্রসার, ফলে বিশেষত রঙীন ফোটোগ্রাফির, মধ্যে রঙ ব্যবহারে কোন নির্দিষ্ট ও সুসঙ্গত চারিত্র্যের অভাব দেখা যায় । এই শতকের গোড়ার দিকে রঙের ব্যবহারে যে কাব্যিক ও রোমান্টিক প্রবণতা দেখা গেছিল তার প্রতিক্রিয়া হিশেবে বহু রঙীন ছবিতে আজকাল গাঢ়, অনুজ্জ্বল রঙের এক প্রকার বিষণ্ণ ব্যবহার দেখা যায় । একদিকে কিছু ছবিতে রঙের বা রঙের বৈসাদৃশ্যের স্বল্পতা, অন্যদিকে আর কিছু ছবিতে রঙের বৈসাদৃশ্যের চূড়ান্ত অবস্থা লক্ষণীয় । সব মিলিয়ে ছবির মধ্যে এক ধরনের বিক্ততা বা উম্মত্ততার পরিচয় ফুটে ওঠে । আধুনিক জীবনে আবেগ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দেখা গেছে, শিল্পেও রঙ ব্যবহারের স্বাধীনতা ও নান্দনিক স্বেচ্ছাচারের মধ্য দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটেছে । বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন বিখ্যাত ঘরানার শিল্পে সাধারণত রঙ ব্যবহারের নির্দিষ্ট পরিকল্প বা বৈশিষ্ট্য থাকতো । এতে কালের প্রয়োজন ও শিল্পের দাবি দুইই মিটতো । দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক জগত ও এই জগতের প্রধান মাধ্যম ফোটোগ্রাফি এরূপ কোন মুখ্য বর্ণপরিকল্প বা বর্ণবিন্যাস সংগ্রহ বা অর্জন করতে পারেনি ।

মনস্তাত্ত্বিকরা আজকাল মনে করছেন মানুষের বর্ণচেতনা যতটা পারিবেশিক প্রায় ততখানি বোধ হয় সহজাত এবং রঙ যতটা চোখের তার চেয়ে বেশি হয়তো মস্তিষ্কের বিষয় । যে কারণে হেলেন কেলার অন্ধ হয়েও তাঁর 'যে পৃথিবীতে আমি বাস করি' গ্রন্থে এত অনুভববেদ্য ভাবে রঙের কথা বলতে পেরেছেন । এই ধারণা যদি সত্যি হয় তবে ভবিষ্যতে মানুষের বর্ণচেতনার প্রধান উৎস হয়ে উঠতে পারে প্রকৃতি নয়, রঙীন ফোটোগ্রাফ ।

বাস্তবের বিকৃতি : ট্রিক ও এফেক্ট

বাস্তবের 'ম্যানিপুলেশনে' ট্রিক ও এফেক্ট প্রধান হাতিয়ার । কেউ কেউ এর দারুণ ভক্ত, কারও কারও এতে প্রবল আপত্তি । সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বোধ হয় এই দুই প্রবণতার মাঝামাঝি কিছু । ফোটোগ্রাফির প্রচলিত পদ্ধতি যেখানে যথেষ্ট নয়, সেখানে বিষয়বস্তুর নান্দনিক বা তথ্যমূলক সমৃদ্ধির জন্য ট্রিকের ব্যবহার ঘটতেই পারে । তবে তা ঘটা উচিত বিচারসাপেক্ষ ভাবে ও পরিমিতিবোধ সহ । অর্থ ও ব্যঞ্জনার প্রসারতা ও গভীরতার জন্য । ফোটোগ্রাফির সূচনাকাল থেকেই ফোটোগ্রাফারের চেষ্টা হল ফোটোগ্রাফির মাধ্যম, ফোটোগ্রাফার ও বিষয়বস্তুর যে ত্রিভুজ সম্পর্ক তার মধ্যে নিজের অবস্থানকে সুবিধাজনক করে তোলা । এই প্রচেষ্টায় সে কদাচিৎ সফল । আর এই উদ্দেশ্যে সে ট্রিকের যথেচ্ছ

ব্যবহার করায় আজ 'ট্রিকের জন্য ট্রিক' এমন উদাহরণ বেশি । কত রকম ট্রিক ও এফেক্ট সে ব্যবহার করেছে তার একটা তালিকা দিচ্ছি দেখুন ।

প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয়

১. বেঠিক আলোকপাত/অতিরিক্ত আলোকপাত
২. যুগ্ম ও যৌথ আলোকপাত
৩. একই বস্তুর একাধিক এক্সপোজার
৪. পুনরাবৃত্ত নকশার জন্য যৌথ এক্সপোজার
৫. ভৌতিক প্রতিচ্ছবির জন্য যৌথ এক্সপোজার
৬. বুননের একত্রীকরণের জন্য যুগ্ম এক্সপোজার
৭. বুননের পৃথকীকরণের জন্য যুগ্ম এক্সপোজার
৮. মাস্কের সাহায্যে যৌথ এক্সপোজার
৯. সমাবর্তিত আলোকের সাহায্যে যৌথ এক্সপোজার
১০. দীর্ঘকালীন আলোকপাত
১১. আলোকপাত সংক্রান্ত অন্যান্য কৌশল
১২. শাটারের সাহায্যে দ্রুত গতিশীল বস্তুর বিকৃতি
১৩. ফ্ল্যাশ সহযোগে ফোকল প্লেন শাটারের ব্যবহার
১৪. মালটিপল্ মিরর রিফ্লেক্শনের প্রতিচ্ছবি
১৫. বিভিন্ন ধরনের আউট-অব-ফোকস প্রতিরূপ
১৬. আলোর বুদ্বুদ ও আলোকতারা
১৭. আলোকবৃত্তের সাহায্যে নকশার কৌশল
১৮. গতির দরুন অস্পষ্টতা/ক্যামেরার অসম প্যানিং
১৯. তীক্ষ্ণতা ও অস্পষ্টতার সমন্বয়
২০. স্ট্রবোস্কোপিক এফেক্ট
২১. আলোকপথ ও আলোর নকশা
২২. ঘূর্ণায়মান বস্তু/ঘূর্ণায়মান প্রতিরূপ
২৩. ক্যামেরায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ঝাঁকুনি
২৪. ক্যামেরার, গতিশীল বস্তু অভিমুখে, বিচলন

যন্ত্রাংশ ও ফিল্টারের ব্যবহার

২৫. এফেক্ট লেন্স হিশেবে জুম লেন্সের ব্যবহার
২৬. বিচিত্র ও অস্বাভাবিক জুম এফেক্ট
২৭. ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স ও ওয়াইড স্ক্রীন লেন্সের সাহায্যে বিকৃতি
২৮. ফিশ-আই লেনস ও অস্বাভাবিক লেন্স ব্যবহারের বিচিত্র ফলাফল
২৯. বিভিন্ন এফেক্ট ফিল্টারের ব্যবহার

৩০. অনুপযোগী ফিল্‌টার ব্যবহারের বিচিত্র ফলাফল
৩১. প্যানোরামিক ক্যামেরার সাহায্যে বৃত্তীয় অবস্থানানুপাত
৩২. ক্যালিডোস্কোপিক এফেক্ট
৩৩. সাদা কালো ফিল্‌মে বিভিন্ন স্পেশাল এফেক্ট

রঙীন ফিল্‌মে বিভিন্ন স্পেশাল এফেক্ট

৩৪. কৃত্রিম আলোর রঙীন ফিল্‌ম দিনের আলোয় ব্যবহার
৩৫. দিনের আলোর রঙীন ফিলম কৃত্রিম আলোয় ব্যবহার
৩৬. বিশেষ আলোকসম্পাতের সাহায্যে বিচিত্র রঙ
৩৭. রঙীন আলোকচিত্রে সাদা কালো ফিল্‌টারের ব্যবহার
৩৮. অবলোহিত কালার ফিল্‌মের ব্যবহার
৩৯. সাদা কালো নেগেটিভের অপ্‌টিক্যাল কালারিং
৪০. স্যাণ্ডউইচ ট্রিক/ট্রান্সপারেন্সি মনতাজ

অন্যান্য পদ্ধতি

৪১. বিশেষ ধরনের দর্পণ, ট্রিক লেন্‌স ও জলবুদ্বুদের ব্যবহার
৪২. ফোটোমনতাজ ও ফোটোকোলাজ
৪৩. একাধিক বস্তুর বিবিধ সমন্বয়
৪৪. বিভিন্ন উপায়ে সাধারণ বস্তুর অসাধারণ রূপান্তর, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ সমস্তই ছবি তোলার সময়কার কৌশল । ছবি পরিস্ফুটন ও মুদ্রণের সময়ে ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করা যায় তার সুবিস্তৃত তালিকা এর বাইরে । সে (ফোটোগ্রাফার) যদি ট্রিককে স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করতে পারে তবেই তার মুক্তি নয়তো ট্রিক তাকে দাস বা গ্রাস করে নেবে । শিল্পের ইতিহাসে এমন উদাহরণ অজস্র ।

বিমূর্ত প্রতিরূপ

একজন আলোকচিত্রী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী হন কেন, কখন ? এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে । প্রথমত, ভিন্ন কোন চিত্ররূপ সৃষ্টি করতে পারার বিশুদ্ধ আনন্দ । দ্বিতীয়ত, আঙ্গিক, কলাকৌশল বা উপাদানের দিক থেকে মাধ্যমটির সম্ভাবনা বাড়াবার চেষ্টা । তৃতীয়ত, কোন মৌলিক, সৃজনশীল, নিজস্ব ব্যক্তিগত ধারণাকে শিল্পরূপ দেওয়া । এই সব কারণ কারুকে ঠেলে দেয় সাব্‌জেক্‌টিভ ফোটোগ্রাফির দিকে—তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবনা, ধারণা, মতামতকে ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে অন্যের কাছে তুলে ধরার তাগিদ বোধ করেন । ফোটোগ্রাফি তাঁদের কাছে যতটা না শৈল্পিক বা নান্দনিক বা সামাজিক প্রসঙ্গ তার চাইতে বেশি অনুভবের এক অভিনব উপায় ।

একই কারণ কারুকে ঠেলে দেয় বিমূর্ত ফোটোগ্রাফির দিকে । আলোকচিত্রের এই শাখা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী শিল্পীরা দৃশ্যের

বদলে দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা, নিছক বস্তুর বদলে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ক, এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবের ওপর নির্ভরতার বদলে জ্যামিতিক প্রতীতির গুরুত্বের ওপর জোর দেন। আলোকচিত্রে বস্তুর মূর্তি তখন হয়ে পড়ে রূপ ও নকশা, রেখা ও আয়তন, আকার ও বুননের খেলা।

কোবার্ন পরিচিত নগরদৃশ্যের ছবি এমন ভাবে তুললেন যে তার অবস্থানানুপাত প্রায় কিউবিষ্ট রীতির ছবির মতো বিচিত্র হয়ে উঠলো। দৃশ্যগত বিকৃতি, আলোছায়ার অতিরঞ্জন, চমকপ্রদ বুনন ও কাঠামো এবং জোরালো জ্যামিতিকীকরণের ফলে তাঁর ছবি যথার্থ বিমূর্ত শৈলীর আলোকচিত্র। চিত্রশিল্পী ম্যাক্স আর্নস্ট-এর আলোকচিত্রকর্মের কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার যার উদ্দেশ্য ছিল নান্দনিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হওয়া। চিত্রশিল্পী ও আলোকচিত্র শিল্পী ম্যান রে-ও বিমূর্ত ফোটোগ্রাফি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি কৃত্রিম-আলোকনিয়ন্ত্রণ ও ডার্করুমের কলাকৌশলের কারসাজি নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা করেন। তাঁর ক্যামেরার সাহায্য ছাড়া তোলা ছবিগুলো (যাদের তিনি নাম দেন রেয়োগ্রাম) যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায় ও বিমূর্ত ফোটোগ্রাফিতে আগ্রহ বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। দাদাবাদী ও অধিবাস্তববাদী রে-র তুলনায় অবশ্য Moholy-Nagy অনেক গভীর ও সুশৃঙ্খল ভাবে বিমূর্ত ছবি নিয়ে চিন্তা ও কাজ করেছিলেন। তাঁর ফোটোমনতাজগুলি (যাদের তিনি নাম দেন ফোটোপ্লাস্টিক) অধিকাংশই ছিল জোরালো সাংগঠনিক ধরনের এবং সাধারণত তা পজিটিভ ও/বা নেগেটিভ চিত্রমূর্তির মধ্যে রৈখিক বা তলীয় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গঠিত। Aaron Siskind-এর ছবি আবার ফোটোগ্রাফিতে বিমূর্ত প্রকাশবাদ (অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেসনিজম)-এর উদাহরণ।

সব মিলিয়ে বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গি ফোটোগ্রাফিতে এনেছে এক নতুন চিত্ররূপ, এক মৌলিক অভিজ্ঞতা। বিমূর্ত ফোটোগ্রাফি এককালে বিমূর্ত চিত্রকলাকে যথেষ্ট উপাদান যুগিয়েছে। বর্তমানে জ্যাকসন পোলক-এর মতো চিত্রশিল্পীদের ছবি থেকে বিমূর্ত ফোটোগ্রাফি আবার অনেক ইঙ্গিত, উপাদান পাচ্ছে। পাচ্ছে অপ ও পপ শিল্পের চাক্ষুষ উদ্দেজনা ও গতির ব্যঞ্জনা থেকেও। বলা হয়, আমাদের মনোদূষণের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিশেবে পরিবেশ দূষণ নিয়ে আমাদের এত হৈ চৈ। তেমনি বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গি কি নন্‌ফিগ্যারেশনের কোন মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার প্রকাশ?

অন্তর্পাঠ

কবিতায় যেমন 'to read between the lines,' ফোটোগ্রাফে তেমনি 'to read below the surface,' স্পষ্ট চিত্রগত অর্থের স্তর ছাড়িয়ে আর কোথাও পৌঁছনো। সেই কাজে দর্শককে সাহায্য করার জন্য আলোকচিত্রী ছবির মধ্যেই কিছু ইঙ্গিত, কিছু লক্ষণ রেখে যান। এই ইঙ্গিত যেমন যথাযথ হতে হবে, দর্শকের চোখ ও মনও তেমনি তৈরি থাকতে হবে। প্রয়োগবিজ্ঞানের স্বাধীন কুশলতা আয়ত্তে এলে এমন সম্ভব। তখন শিল্পীর শৈলীতে

আর কিছুই থাকে না ভারাক্রান্ত, শুকনো, অপরিচ্ছন্ন । এই শৈলীর অনুষঙ্গেই তৈরি হয় তাঁর নিজস্ব নান্দনিক অভিঘাত ।

হাতের কাছে এনে রাখা লাইকা ফোটোগ্রাফি পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যা উলটে দেখা যাক । নানান উদাহরণ মিলছে । ইচ্ছাকৃত বিকৃতির উদাহরণ : নর্তকীর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত পা অ.ত-দীর্ঘায়িত করে দূরপাল্লা গতির ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা গেছে । উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ট্রিকের উদাহরণ : এক যুবতী নিজের সঙ্গে নিজে দাবা খেলছে, ছবির রস পুরোপুরি উপভোগ করা গেল তখনই যখন জানলাম যুবতীটি এই ছবির ফোটোগ্রাফারের স্ত্রী । উইলিয়াম ম্যাকের তোলা ছবি দেখেছিলাম—দাসদাসীদের পুরনো কবরখানায় সমাধিপ্রস্তর ভগ্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, অনেক পরে যেদিন জানলাম ম্যাকে ছিলেন দাসবংশের সন্তান, ছবিটির তাৎপর্য সেদিন সঠিক উপলব্ধি করা গেল । জুমের অস্বাভাবিক কিন্তু সফল প্রয়োগ : চলন্ত গাড়িগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত জুমিংয়ের ফলে অস্পষ্টতা ও সম্বদ্ধতা সৃষ্টি করে অফিস আওয়ারে নগরজীবনের ব্যস্ততা ও চাপা উত্তেজনা সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । গূঢ় অর্থ, গহন ব্যঞ্জনা, প্রতীকী মূল্য— ছবির চিত্রগত ভাবনার সমৃদ্ধি ও দর্শককে তার শরিক করে তোলা ।

নাটকে কখনো কখনো কিছু কিছু ঘটনা ঘটে মঞ্চের বাইরে । ছবিতেও কখনো কখনো প্রধান বা একমাত্র ঘটনাটি ঘটতে পারে ছবির ফ্রেমের বাইরে । শুধু খোলা দরজা, বিছানো বিছানা, চকিত ছায়াপাতে বোঝা যায় ছবির শূন্যতা ভরে দেবার জন্য কেউ কাছেই উপস্থিত আছে । বিপরীত ভাবে ভরাট স্থানের ছবিতেও অনুভূত হতে পারে শূন্যতা, একাকিত্ব । কোন অসাধারণ চিত্রকল্পনা এমন ভাবে মূর্ত করা হয় যে তা দর্শককে ছবি ছাড়িয়ে যেতে নির্দেশ করে, দর্শককে তার মতো করে ছবিটি সম্পূর্ণ ও ভরাট করে নিতে হয়, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে পৌঁছতে হয় চিন্তা ও মননের জগতে । আপেক্ষিকতা-ই হলো এই নান্দনিক সমীকরণের মূল কথা । অধিবাস্তববাদী আলোকচিত্রীরা মূল ছবির মধ্য থেকে অন্য ছবি বার করে এনে এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন যে, আমরা যাকে বলি চিত্রগত সম্পর্ক তা আদতে খুবই আপেক্ষিক । ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের মতে ক্যামেরা পরিবেশ ও চরিত্র ছাড়াও আরও কিছু চিত্রিত করে, আদি যুগের গ্রুপ ফোটো থেকে বোঝা যাবে টানটান ফ্রেমিং, বিশেষ ক্যামেরাকোণ বা সফট ফোকসের মাধ্যমে কীভাবে ছবিতে প্রদর্শিত মানুষগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কও নির্দেশ করা হয়েছে । কথাটা হয়তো সত্যি । কিন্তু এই সঙ্গেই মনে পড়ে ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে এক পুরনো কার্টুনের কথা : স্মাইল প্লিজ । ইউ মে রিজিউম ইয়োর ন্যাচরল গ্রাম লুক ইন জাস্ট এ মোমেন্ট । এইভাবে যে হাস্যোদ্ভাসিত ছবি তোলা হবে তাতে সঠিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটবে তো ?

আসলে ফোটোগ্রাফি কি সত্যিই খুব বিশ্বস্ত দর্পণ ? নিজের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ফোটোগ্রাফার যে আত্মপ্রতিকৃতি তোলেন তা এক ধরনের আত্মলা, আর আয়নায় নিজের প্রতিকৃতির দিকে ক্যামেরা তাক করে ধরে যে আত্মপ্রতিকৃতি তোলা হয় তা

আর এক ধরনের আত্মতা। এক বিখ্যাত আত্মপ্রতিকৃতিতে দেখছি ফোটোগ্রাফারের ডান চোখটা নেই। তবে কি এ ছবির জন্য বস্তুবাদী, পার্থিব ডান চোখের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কেবল বাঁ চোখের, কল্পনার দৃষ্টির ? বারবার মনে হয়, ফোটোগ্রাফার যে ঘটনা বা বিষয়েরই ছবি তুলুন না কেন, তার কেন্দ্রস্থলে তিনি উপস্থিত শুধু শিকারী হিশেবে নয়, শিকার হিশেবেও। এই আপেক্ষিকতাই ফোটোগ্রাফির চূড়ান্ত কথা।

আঁরি কারটিয়ার-ব্রেসঁ

জন্ম ১৯০৮, ফ্রান্স। সাহিত্য ও চিত্রকলা নিয়ে তিনি কেমব্রিজে অধ্যয়ন করেন, তারপর চিত্রপরিচালক রেনোয়ার সহকারী রূপে কয়েক বছর কাজ করে অবশেষে স্থিরচিত্রে মনোনিবেশ করেন। পরিমিত, সংবেদনশীল ও অনুভূতিগ্রাহ্য আলোকচিত্রের জন্য তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সমবায় ফোটো-সংস্থা ম্যাগনাম ফোটোজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে, ফোটোসাংবাদিকতা তাঁরই হাতে একটা স্বতন্ত্র শিল্পরূপ পেয়েছিল, তাঁর নিজের ফোটোএসেতে হয়তো ব্যাপকতা কম কিন্তু তা অসম্ভব সজীব ও অমোঘ। এই অমোঘতা নির্বাচনে, অর্থব্যঞ্জনায়, চিত্রাঙ্গিকে। সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে তিনি দেখতেন আদি-মধ্য- অন্ত পারম্পর্যে এবং কোন মুহূর্তটি বা কোন প্রতিমাটি সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যময় তা অনুধাবন করতে কখনো ভুল করেন নি। এই খণ্ড-মুহূর্তটিকে তিনি নাম দিয়েছিলেন চূড়ান্ত বা চরম মুহূর্ত এবং সাচ্চা গোয়েন্দার মতো অসীম আগ্রহ ও ধৈর্য নিয়ে তিনি এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করতেন। তাঁর অনেক ছবিই বারবার দর্শনের মধ্য দিয়ে আরো আরো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে, স্মৃতিতে আঘাত করে, আরো একবার অবলোকন করার বাসনা হয়, অর্থ বা ভাবের আরো একটি নতুন অনুষঙ্গের উদয় হয়, আরো একটা নতুন ব্যাখ্যা মেলে। ছবির অনিবার্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য তাঁর নিরন্তর প্রয়াস। স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, মিতব্যয়ী চিত্রাঙ্গিক তাঁর ছবির চরিত্রকে সংহত করে আনে, তাঁর আঙ্গিকের শক্তি নকশার সরলতায়, উপাদানের উষ্ণ অন্তরঙ্গতায়। তাঁর ছবিতে নেই সাজানো কম্পোজিশন, কৃত্রিম আলোকসম্পাত, আরোপিত বিষয় বা কলাকৌশলের কারসাজি। তাঁর সাদা-কালো কম্পোজিশন রেখা, তল, মাত্রা ও মূল্যের দৃঢ়, সুশৃঙ্খল সংগঠনের মধ্য দিয়ে অমোঘ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর ছবিতে সহজাত হলেও আঙ্গিকের বিশেষ ভূমিকা, তাঁর ছবি হল 'পারিপার্শ্বিক জগতের গঠনরূপের অনুসন্ধান, আঙ্গিকের বিশুদ্ধ আনন্দে অবগাহন', ফোটোগ্রাফি হল বস্তুজগতের মধ্যে আপাত-অদৃশ্য ছন্দের চাক্ষুষ প্রমাণ, প্রমাণ যে 'সমস্ত আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলা'।

এই শেষোক্ত ধারণা ভাববাদী হয়ে উঠতে পারতো যদি তাঁর অন্য সচেতনতা না থাকতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসি-অধিকৃত ফ্রান্সে তিনি প্রতিরোধ বাহিনীর এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন, তাঁর তৈরি তিনটে তথ্যচিত্রের বিষয় ছিল যথাক্রমে স্পেনের গৃহযুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা, যুদ্ধবিষয়ক তথ্যাদি, যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন। আসলে তিনি

ফোটোগ্রাফিকে নিতে চেয়েছিলেন এক নতুন ও প্রগাঢ় দর্শনভঙ্গি হিশেবে, যা পরিমিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও এমনকি বিজ্ঞানসুলভ হতে হবে। আমি সহজাত আঙ্গিক বনাম আঙ্গিকের মোহ—তাঁর এই দ্বিযোজ্যতাকে অন্যত্রও কার্যকর দেখি। তিনি মনে করতেন ক্যামেরা চোখ ও মনের সিদ্ধান্তকে ফিলমে রূপায়িত করে। 'আমার ডান চোখ বাইরের জগতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, বাম চোখ আমার ভেতরের ব্যক্তিজগতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে।' 'সমস্ত চিন্তাভাবনা করতে হবে ছবি তোলার আগে ও পরে, কিন্তু কখনোই ছবি তোলার সময়টিতে নয়।' তাঁর ছবি 'স্বাদের দিক থেকে নিওরিয়ালিজমের ও আদর্শের দিক থেকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অনেকটা কাছাকাছি' বললে এই দ্বিযোজ্যতার তালিকার একটা পর্ব শেষ হয়।

সুজান সোনটাগ ও অন্ ফোটোগ্রাফি

জন্ম ১৯৩৩, আমেরিকা। দর্শনের শিক্ষক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চিত্রনির্মাতা—বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মকুশলতার পরিচয় দিলেও সোনটাগের ভাবনার স্পষ্টতা ও মৌলিকত্ব সবচেয়ে বেশি খোলে প্রবন্ধ-রচনায়। তাঁর আলোকচিত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'অন্ ফোটোগ্রাফি' এই বিষয়ে সবচেয়ে মৌলিক গ্রন্থ হিশেবে সমাদৃত ও পুরস্কৃত হয়েছে। বলা যায়, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন-এর পর সুজান সোনটাগ-ই আলোকচিত্র সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মৌলিক সমালোচক।

এ বইয়ে তাঁর মূল বক্তব্য হল : ফোটোগ্রাফি কোন শিল্প নয়, তা একটা ভাষা, একটা নিরপেক্ষ, ব্যবহারিক মাধ্যম। 'ভাষার সাহায্যে তৈরি করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সরকারি স্মারকলিপি, প্রেমপত্র, বাজারের ফর্দ ও বাল্‌জাকের প্যারিস। তেমনি ফোটোগ্রাফির সাহায্যে তৈরি করা যেতে পারে পাসপোর্ট ছবি, আবহাওয়ার ফোটো, যৌনচিত্র, এক্স-রে প্লেট, বিবাহের ছবি ও Atget-এর প্যারিস।' শব্দের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহার অনুসারে অর্থ, ফোটোগ্রাফও তেমনি, একই ছবি 'আর্ট গ্যালারিতে, রাজনৈতিক সভায়, পুলিশের ফাইলে, আলোকচিত্রের পত্রিকায়, সাধারণ সংবাদপত্রে, বইয়ের ভেতর, বসার ঘরের দেয়ালে' কোথায় ও কী ভাবে দেখা হচ্ছে সেই অনুসারে বিভিন্ন অর্থ পায়।

জনসাধারণ শিল্প হিশেবে ফোটোগ্রাফিকে ব্যবহার করে না, করে নাচ বা যৌনতার মতো ব্যক্তিগত প্রমোদ হিশেবে, যে কোন গণমাধ্যমের মতো, মূলত, একটা সামাজিক আচার রূপে। ফলে তা আমাদের বাস্তব সম্পর্কে ধারণা, আমাদের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তা বাস্তবকে শুধুই সংরক্ষিত করে রাখার বদলে বাস্তবকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করে। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, এবং প্রায়ই 'ডিস্টার্বিং' প্রকাশরূপের জন্য ফোটোগ্রাফি যতটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশি অধিবাস্তবের রূপকার।

যাঁরা ফোটোগ্রাফিকে শিল্পমাধ্যম রূপে গ্রহণ করেন তাঁদের এই সুবিধা রয়েছে যে, এ-মাধ্যমটির কলাকৌশলগত ও শিল্পগত চাহিদা অন্য অনেক শিল্পমাধ্যম অপেক্ষা কম, অনুশীলনের জন্য এটি অনেক সহজ শিল্প। আস্বাদনের বেলাতেও এ-কথা সত্যি।

'আধুনিক উল্লেখযোগ্য ফোটোগ্রাফির সঠিক আস্বাদনের জন্য ফোটোগ্রাফির ইতিহাস না জানলেও চলে। কিন্তু আধুনিক উল্লেখযোগ্য চিত্রকলার সঠিক আস্বাদনের জন্য চিত্রকলার ইতিহাস কিছুটা জানা চাই ।' শিল্পের মধ্যে এই স্বাচ্ছন্দ্য, সরলতা, বিনোদন ও কিছুটা শ্লেষ খুঁজে পাবার চেষ্টা আধুনিক জীবনযাত্রারই ফল । সেই জন্যই আরো ফোটোগ্রাফি আধুনিক জগতের উপযুক্ত মাধ্যম । ফোটোগ্রাফি মানুষের আধুনিক চিন্তাভাবনা ও অনুভূতির মূল্যায়নের একটা পদ্ধতি । সোনটাগের এ-বই তাই শুধু ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে নয়, আধুনিকতা সম্পর্কেও, আধুনিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে ।

'অন ফোটোগ্রাফি'-কে বলা হয়েছে সাহিত্যগুণমণ্ডিত পুস্তক । আমার মনে হয় ক্যামেরার দ্ব্যর্থবোধক চোখের মতো এ-বইও দুটি স্তরে গ্রহণযোগ্য—একটি স্তরে ফোটোগ্রাফির নান্দনিক বিচার, আরেকটি স্তরে তার সামাজিক ভূমিকা । সোনটাগের মতে ফোটোগ্রাফি নিয়ে সব চেয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন মার্কসবাদী বা সম্ভাব্য মার্কসবাদী সমালোচকেরা । বেঞ্জামিন ছিলেন অধিবাস্তববাদী । সোনটাগ নিজে ?

ফোটোগ্রাফির ভবিষ্যত

অখ্যাত এক ফোটোগ্রাফারের বিবৃতি—

"With both feet in shit, one hand in the fire, the other in water, and my head in the clouds, I am presently proceeding into the future, which could just as well be the past."

"দুই পা গাদে আর আবর্জনায়, এক হাত আগুনে রাখা, আরেক হাত জলে ডোবানো, আর মাথা অনেক উঁচুতে আকাশের মেঘ ছুঁয়েছে, এইভাবে ধীরে ধীরে আমি হেঁটে চলেছি ভবিষ্যতের দিকে, সামনের পানে,আর তা অতীতের দিকে, পেছনের পথেই কিনা কে জানে !"

ধীমান দাশগুপ্ত

ফোটোগ্রাফির কলাকৌশল

ইতিহাস

'Conquering, holding, daring, venturing as we go the unknown ways, Pioneers, O pioneers !' —Walt Whitman

যন্ত্রসভ্যতার যুগে, যে ফোটোগ্রাফিকে বাদ দিয়ে চলা আজ প্রায় অসম্ভব তার বয়স কিন্তু মাত্র শ'দেড়েক বছর । এর কোন একক আবিষ্কারক নেই, নেই কোন অদ্বিতীয় পথ-প্রদর্শক । বহুদিন ধরে অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটু একটু করে ফোটোগ্রাফির উদ্ভব ও প্রচলন হয়েছে, তার ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর প্রয়োগ ঘটেছে ।

গণতন্ত্রের প্রসারের যুগে আবির্ভূত ফোটোগ্রাফি সত্যিই ছিল একটি বহুলাংশে গণতান্ত্রিক মাধ্যম ।

'ফোটোগ্রাফি' কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিদ ও রসায়নবিদ স্যার John Herschel, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে William Henry Fox Talbot-কে লেখা একটি চিঠিতে । তার ঠিক আগের বছর ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটিতে ফক্স ট্যালব্রবট এক টুকরো কাগজের ওপর সিলভার ক্লোরাইড ($AgCl$) মাখিয়ে তার ওপর ছোট কোন জিনিষ রেখে আলো ফেলে কি ভাবে নেগেটিভ (আজ যাকে বলা হয় ফোটোগ্রাম) করা যায় তা প্রদর্শন করেছিলেন । স্যার হার্শেল কথাটি পেয়েছিলেন দুটি গ্রীক শব্দ 'ফোটো' অর্থাৎ 'আলো' এবং 'গ্রাফ' অর্থাৎ 'অঙ্কন' একত্র করে । আমরাও ঐ অর্থ অনুসারে বাংলা প্রতিশব্দ করেছি 'আলোকচিত্র' । আক্ষরিক অর্থে আলোকের সাহায্যে অঙ্কন ।

আমরা সকলেই জানি, প্রাথমিক ভাবে ফোটোগ্রাফিতে দুটি জিনিষের প্রয়োজন । এক, আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহার করার জন্য একটি যন্ত্র অর্থাৎ ক্যামেরা । দুই, একটি আলোকসংবেদনশীল বস্তু যার ওপর ক্যামেরার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত আলো ফেলে কোন কিছু অঙ্কন করা সম্ভব অর্থাৎ ফিলম্ । এর মধ্যে প্রথমটিতে যন্ত্রবিজ্ঞান ও দ্বিতীয়টিতে রসায়নবিদ্যার প্রধান ভূমিকা । এবং উভয় ক্ষেত্রেই দৃক্‌বিজ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য । এই জন্য ফোটোগ্রাফিকে বলা হয়ে থাকে একটি optical-mechanical-chemical

মাধ্যম ।

ক্যামেরা ও ফিল্ম—এই দুটি জিনিষ একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারার অনেক আগে থেকেই আলাদা আলাদা ভাবে বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় ছিল । প্রখর রৌদ্রালোকিত বস্তুর প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ (image) যে নিয়ন্ত্রিত আলোকের সাহায্যে পাওয়া যায়, এ খবর মানুষ জানতে পেরেছে সম্ভবত যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৫/৬ শ' বছর আগে । ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় প্রথমে চীনদেশে ও তারপর আরিস্ততলের সময় গ্রীসে এবং নবম বা দশম শতাব্দীতে আরবে মানুষের জানা ছিল যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করা আলোকের সাহায্যে প্রখর রৌদ্রালোকিত বস্তুর বিপরীত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় । ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে আরবের বিখ্যাত আলোক বিজ্ঞানী Alhazen (ইবন-আল-হায়থাস) -এর লেখায় এমন একটি যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে যার সাহায্যে আলোকিত বস্তুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় এবং তিনি লিখেছেন যে তাঁর সময়ের পূর্ব থেকেই এই যন্ত্রটি আরবদেশে পরিচিত ছিল ।

এই যন্ত্রটি, যাকে বলা হয়েছে 'camera obscura' বা dark chamber, তার প্রথম সুবিন্যস্ত বর্ণনা মেলে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের Roger Bacon-এর লেখায় । ত্রয়োদশ/চতুর্দশ শতাব্দীতে Levi Ben Gershon এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে Leonardo da Vinci তাঁর ডায়েরিতেও এই যন্ত্রের কথা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন । ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ক্যামেরা অবস্কুরাতে সূক্ষ্ম ছিদ্র বা pinhole-এর বদলে উত্তল (convex) লেনস বসানো হয়, Girolamo Cardano যার উল্লেখ করেছেন । ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে Giovanni Battista d. Porta এতে একটি উত্তল দর্পণ বসানোরও প্রস্তাব করেন । তাঁর লেখাতে এই যন্ত্রটির প্রথম বিশদ বিবরণও মেলে । 'ক্যামেরা' কথাটিও গ্রীক শব্দ 'kamara' থেকে এসেছে যার অর্থ চারপাশ ঢাকা স্থান এবং অন্ধকার বোঝাতে 'অবস্কুরা' কথার ব্যবহার । অর্থাৎ চারপাশ ঢাকা অন্ধকার স্থান । বাংলা ভাষাতেও আমরা 'কামরা' কথাটি ঘর অর্থে ব্যবহার করে থাকি ।

প্রাথমিক অবস্থায় এটি সত্যিই ছিল চারপাশ ঢাকা একটা অন্ধকার ঘর বা তাঁবু যার একদিকে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আসা আলোর সাহায্যে ঐ অন্ধকার ঘর বা তাঁবুর উল্টোদিকের দেয়ালে রাখা কাগজে বাইরের বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়তো । এই প্রতিচ্ছবি অবশ্য খুব স্পষ্ট বা পরিষ্কার নয় । পরে আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিদ্রের পরিবর্তে একটি সাধারণ চশমার কাঁচ (short sight) অর্থাৎ উত্তল লেন্‌স লাগিয়ে ঐ প্রতিচ্ছবি আরও একটু পরিষ্কার ও স্পষ্ট করা গেল । এইভাবে পাওয়া প্রতিচ্ছবির সাহায্যে শিল্পীদের ছবি আঁকার কাজে খুব সুবিধে হত । এরপর সাধারণ উত্তল লেন্‌সের বদলে একটি যুগ্মোত্তল (bi-convex) লেন্‌স ব্যবহার করে এবং তার সামনে একটি ঢাকনির (diaphragm) মুখ কেটে আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরো সুচারু করে প্রতিচ্ছবিকে আরো খানিকটা উন্নত করা গেল । ইতিমধ্যে অবশ্য তাঁবু বা ঘরের বদলে বড় বাক্স ব্যবহার করা শুরু হয়েছে । ধীরে ধীরে ঐ বাক্সের আরো উন্নতি হল । বাক্সের মধ্যে

একটি আয়না লাগিয়ে উল্টোনো প্রতিচ্ছবিকে সোজা করা গেল । তখন এই যন্ত্রটির কাজ ছিল শিল্পী ও কারিগরদের অনুপাত ও পরিমাপনের কাজে সাহায্য করা এবং সাধারণ মানুষকে ম্যাজিক দেখিয়ে আনন্দ দেওয়া । কিন্তু তখনও এটি আকারে এত বড় যে তা সহজে বহনযোগ্য ছিল না । একে একটি মোটামুটি বহনযোগ্য আকার দিতে ১৬২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল । ১৬৭৬ -এ J. Strun এই যন্ত্রটির ভেতর লেনসের ৪৫° কৌণিক অবস্থানে একটি আয়না লাগিয়ে রিফ্লেক্স ক্যামেরা অবস্কুরা গঠন করলেন। এতে সাধারণ কাগজের বদলে অর্ধস্বচ্ছ অয়েল পেপারের ওপর প্রতিচ্ছবি ফেলা হত ও প্রতিচ্ছবি সব সময়ে বাক্সের ভেতরেই পাওয়া যেত ।

১৬৮৫-তে Johann Zahn ছোট বাক্সে উত্তল লেনসের বদলে যুগ্ম লেন্স (combination of lens), অয়েল পেপারের বদলে ঘষা কাঁচ এবং বাক্সের ভেতরে আয়না বসিয়ে বাক্সের বাইরে প্রতিচ্ছবি পাবার ব্যবস্থা করলেন । এটাকে একটা সত্যকার বহনযোগ্য ক্যামেরা অবস্কুরা বলা যেতে পারে। এরপর বহুদিন এর আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি । এই পর্যন্ত হল ফোটোগ্রাফির যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রাক্-ইতিহাস ।

ক্যামেরা অবস্কুরার পরিপূরক যন্ত্র হিসেবে পরবর্তীকালে 'ক্যামেরা লুসিডা'র (অর্থ লাইট চেম্বার) প্রচলন হলো । William Hyde Wollaston ১৮০৭ সনে ক্যামেরা লুসিডাকে একটি বহনযোগ্য অঙ্কন-যন্ত্রের রূপ দেন যার সাহায্যে শুধু ছবি আঁকার কাজেই সুবিধা হত না, বিশেষ করে প্রাকৃতিক দৃশ্যের তাম্রপাত খোদাই এবং এচিংয়ের কাজও করা যেত । তিনি ১৮১২ সনে যুগ্মোত্তল লেন্সের গোলীয় ত্রুটি (spherical aberration) সংশোধন করে এইসব ক্যামেরাতে মেনিস্কাস লেনস ও সঠিক স্থানে একটি ঢাকনি ব্যবহার করে প্রতিচ্ছবিরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটালেন । এর আগেই ১৭৮৬ সনে Gilles Louis Chretien সিলুএট্ পদ্ধতিতে ছায়া-পরিলেখ অঙ্কনের একটি উন্নত সংস্করণ 'ফিজিয়োট্রেস' আবিষ্কার করেছিলেন । এর সাহায্যে শুধু একটি চিত্র নয়, তাম্রপাতের ওপর একটা নিখুঁত খোদাই পাওয়া যেত, যাকে রি-এচিং করে একই প্রতিরূপের, বিশেষত প্রতিকৃতির, একাধিক কপি মুদ্রণ করা সম্ভব হত ।

দৃক-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিভিন্ন অগ্রগতির পাশাপাশি রাসায়নিক বা আজকের ভাষায় আলোক-রাসায়নিক সমস্যার সমাধান নিয়েও গবেষণা হচ্ছিল। সূর্যালোকে যে বস্তুর রঙের পরিবর্তন ঘটে এটা মানুষের গোচরে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই । মানুষ লক্ষ্য করেছিল যে সূর্যালোকে গায়ের চামড়ার রঙের পরিবর্তন হয়, গাছের পাতা সবুজ হয়, একই বস্তুর খানিকটা অংশ সূর্যালোকে ও বাকি অংশ অনালোকিত থাকলে রঙের তারতম্য ঘটে । অনেকে বলেন, দু'হাজার বছর আগে চীনে নাকি আলোক-সংবেদনশীল রাসায়নিক লাগিয়ে চীনামাটির পাত্রের ওপর নানা রকম কারুকাজ করা হত ।

যাই হোক সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে Angelo

Sola জানতে পারেন যে সূর্যালোকে সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) কালচে হয়ে যায়। ১৬৬৩-তে ইংলণ্ডে Robert Boyle, ১৭২৫-এ জার্মানীতে Johann H. Schulze এবং ১৭৫৭-য় ফ্রান্সে B. Beccario আলাদা আলাদা ভাবে জানতে পারেন যে সূর্যালোকে বিভিন্ন সিলভার লবণের রঙের পরিবর্তন ঘটে। শ্যুলজ্ এও আবিষ্কার করেন যে সিলভার লবণের এই কৃষ্ণতা ও বিবর্ণতার কারণ লবণের ওপব সূর্যরশ্মির বিশেষ ক্রিয়া, তাপের প্রভাব নয়। আলোক-সংবেদনশীল বস্তু সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা দিয়েও এঁরা কেউ কিন্তু সজ্ঞানে তাকে প্রতিচ্ছবি তোলার কাজে ব্যবহার করার কথা ভাবেন নি।

১৭৭৭-য়ে সুইডেনে C. W. Scheele আবিষ্কার করলেন যে সূর্যালোকেব বর্ণালিব সমস্ত রঙ সিলভার ক্লোরাইডকে সমান কালো করে না। বর্ণালির বেগনি ও নীল রশ্মি সিলভার ক্লোরাইডকে অধিকতর দ্রুত কালো করে এবং অপরিবর্তিত সিলভার ক্লোরাইড থেকে রৌদ্রালোকে কালো হয়ে যাওয়া সিলভার ক্লোরাইডকে অ্যামোনিয়ার সাহায্যে পৃথক করা যায়। তবে সিলভার নাইট্রেটের আলোক-সংবেদনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে কাগজের ওপর প্রতিচ্ছবি তোলার প্রথম চেষ্টা করেন Thomas Wedgwood ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। তিনি কাঁচের ওপর আঁকা চিত্রকে সিলভার নাইট্রেট বা সিলভার ক্লোরাইড মাখানো কাগজ অথবা চামড়ার ওপর রেখে আলো ফেলে নেগেটিভ তৈরি করলেন। তখন কিন্তু এইভাবে পাওয়া ছাপকে স্থায়ী (fixed) করার উপায় জানা যায় নি, তাই এই নেগেটিভকে অন্ধকারেই রাখতে হত ও মোমবাতির স্বল্পালোকেই এগুলি দেখানো যেত।

ফোটোগ্রাফির দুটি দিক, অর্থাৎ আলোকের দৃক্-প্রতীতি (optical principles), যাব ফলস্বরূপ বহনযোগ্য ক্যামেরা অবস্কুরা এবং আলোকের রাসায়নিক প্রতীতি (chemical principles), যার ফলস্বরূপ কাগজের ওপর ছাপ বা নেগেটিভ—এই দুয়ের ফলপ্রসূ সমন্বয় ঘটালেন এক ফরাসী ভদ্রলোক, Joseph Nicephore Niepce। ১৮১৬-য় সম্ভবত সিলভাব নাইট্রেট মাখানো কাগজের ওপর ক্যামেরার সাহায্যে তিনি প্রথম ছবি তুললেন। সময়ের দিক থেকে এটা ছিল 'দাগ্যেরোটাইপ'-এব প্রায় কুড়ি বছর পূর্ববর্তী। অবশ্য আলোকপাতের ফলে কালো হয়ে যাওয়া (exposed) সিলভার লবণ থেকে অপরিবর্তিত সিলভার লবণকে ঠিকভাবে পৃথক করতে না পারায় তিনি নেগেটিভকে ভালভাবে স্থায়ী করতে সক্ষম হলেন না। পরে তিনি সিলভার লবণের বদলে ব্যবহার করলেন অ্যাসফল্ট বা বিটুমিন জাতীয় দ্রব্য যা আলো লাগলে অদ্রবণীয় হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যামেরার সাহায্যে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলেন যা তুলতে প্রখর রৌদ্রালোকে তাঁর আট ঘন্টার মত সময় লেগেছিল। তাই তিনি এই পদ্ধতির নামকরণ করেছিলন 'হেলিওগ্রাফ' বা রৌদ্রাঙ্কন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল লিথোগ্রাফি ছাপার জন্য পাথরের ওপর আঁকা-ছবির প্রতিচ্ছবি তোলা—যাতে কবে পাথরের ওপর হাতে আঁকতে না হয়। ১৮২৭ নাগাদ তিনি ক্যামেরার সাহায্যে ধাতুর পাতের ওপরও ছবি তুলতেন। তিনি তাঁর তোলা নেগেটিভ প্রতিচ্ছবিকে পজিটিভ চিত্রে,

অর্থাৎ যাতে ছবিতে আলোকিত অংশগুলি প্রকৃতই আলোকিত ও অন্ধকার অংশগুলি প্রকৃতই অন্ধকার দেখায়, রূপান্তরিত করার জন্য যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন ।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি Jacques Mande Daguerre নামে প্যারিসের এক দৃশ্যাঙ্কন শিল্পীর সঙ্গে অংশীদারিতে একটি ব্যবসা শুরু করেন । ইনিও কয়েক বছর ধরেই ক্যামেরার মাধ্যমে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ছবি তোলার চেষ্টা করছিলেন । আলোকসম্পাত সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল । ১৮২২-য়ে প্যারিসে তিনি 'ডায়োরামা' নামে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন, সেখানে বিশাল পটের ওপর আড়ম্বরপূর্ণ বিষয় নিয়ে আঁকা বহুস্তর চিত্রমালা দেখানো হত, ক্রমাগত পরিবর্তিত আলোকসম্পাতের ফলে যার মধ্যে গতির বিভ্রমের সৃষ্টি হত । ভবিষ্যতের মুভি ফোটোগ্রাফির জন্য এ একটা ইঙ্গিত ।

নীপসে-র বিটুমিন পদ্ধতি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ বলে দাগেয়ার তাকে বাদ দিয়ে, ফের সিলভার লবণ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন এবং সাধারণ লবণের সাহায্যে প্রতিচ্ছবিকে স্থায়ী করার একটা উপায় খুঁজে পান । তিনি আরও দেখলেন চোখে দেখতে পাবার মত প্রতিচ্ছবির জন্য বহুক্ষণ সময় ধরে আলো লাগাবার প্রয়োজন নেই । তার চেয়ে অনেক কম সময়েই যে অদৃশ্য ছাপ পড়ে তা উপযুক্ত রাসায়নিকের সাহায্যে পরিস্ফুট (develop) করে নিলেই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় । তাঁর পদ্ধতি ছিল প্রথমে একটা তামার পাতের ওপর রূপার জল ধরিয়ে খুব ভালভাবে পালিশ করে আয়নার মত চকচকে করা । তারপর এই পাতটিকে একটি আয়োডিন ভরা বন্ধ পাত্রে রেখে দিয়ে সিলভার ও আয়োডিন গ্যাসের সংযোগের ফলে আলোক-সংবেদনশীল সিলভার আয়োডাইডে (AgI) পরিণত করা । এই পাতটির ওপর ক্যামেরার সাহায্যে মাত্র ১০/১৫ মিনিটের মত সময়ের মধ্যে যে ছবি তোলা হত তা প্রথমে অদৃশ্য থাকত । কিন্তু পাতটিকে পারদের মধ্যে রেখে উত্তাপ দিলেই অদৃশ্য ছবি ঐ পাতের ওপর ফুটে উঠত । অর্থাৎ সিলভার আয়োডাইডের আলো-লাগা অংশে উত্তপ্ত পারদ লেগে যেত । এরপর পাতটিকে হাইপোর সাহায্যে স্থায়ী করে পরিশ্রুত জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই সুন্দর ছবি পাওয়া যেত । ইতিমধ্যে ১৮১৯ নাগাদ স্যার হার্শেল হাইপো আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে স্থায়ী করার সমস্যার সমাধান হয়েছিল । নীপসে ১৮৩৩-এ মারা গেলেন । মারা যাবার আগে তিনি ফোটোগ্রাফির পক্ষে অত্যাবশ্যক আরও দুটি জিনিষ আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন । ক্যামেরাতে আইরিস ডায়াফ্রামের ব্যবহার ও ফোকল লেংথ অনুসারে ক্যামেরার আকার ।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলের সঙ্গে অংশীদারিতে দাগেয়ার ব্যবসা শুরু করলেন । তাঁর এই পদ্ধতি, যাকে বলা হয় 'দাগেয়োরোটাইপ', কাউকে জানাতেন না । কিন্তু ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ ব্যবসা চালাতে না পেরে, জনসাধারণের কাছে তাঁদের পদ্ধতি প্রকাশ করে দেবেন এই শর্তে তাঁরা ফরাসী সরকারের কাছ থেকে পেনশন্ নিতে স্বীকৃত হলেন । এবং ঐ বছরের ১৮ই আগস্ট তাঁদের পদ্ধতি ফ্রান্সের সায়েন্স আকাদেমিতে প্রকাশ করে দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথায় ছবি তোলা পৃথিবীর নানান জায়গায় শুরু

হয়ে গেল। এতদিন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি উঠেছে, এই সময়েই প্রথম মানুষের ছবিও তোলা হল। যে সমস্ত দাগ্যেরোটাইপ পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই অকিঞ্চিৎকর ছবি, কিছু বিষয়বস্তুর দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বা তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান আর অল্প কয়েকটি সত্যকার সৃজনশীল কাজ। যাই হোক ফোটোগ্রাফি এই সময় থেকেই শিল্পী, কারিগর, বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষকে প্রায় সমভাবে প্রভাবিত করা শুরু করে।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনটি জিনিষের আবিষ্কার ছবি তোলার সময়কে খুবই কমিয়ে এনেছিল। ইংলণ্ডে John F. Goddard ব্রোমিনের মাধ্যমে সিলভার ব্রোমাইডের (AgBr) ব্যবহার ঘটালেন। দ্বিতীয়ত, আমেরিকায় A. S. Walcott ক্যামেরাতে আয়না বসিয়ে আলোর প্রক্ষেপকে তীব্রতর করলেন। তৃতীয়ত, হাঙ্গেরীর Josef Petzval নতুন ধরনের শক্তিশালী লেনস বার করলেন, যা এ-যাবত ব্যবহৃত মেনিস্কাস লেন্সের বদলে ব্যবহৃত হতে লাগল। এই লেন্স ছিল প্রতিকৃতি তোলার পক্ষে খুব উপযুক্ত। এই সময়ে লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ায় প্রতিকৃতি তোলার বহু স্টুডিও পরপর চালু হয়ে যায় এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার ও ছবি তোলানোর প্রচণ্ড চাহিদার ফলে প্রতিটি স্টুডিওই ভাল ও লাভজনক ব্যবসা করতে সক্ষম হয়।

দাগ্যেরের প্রথায় ছবি তোলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও এর প্রধান অসুবিধা ছিল : ১. পদ্ধতিটি কষ্টসাধ্য ২. নেগেটিভ পদ্ধতিতে না হয়ে সোজাসুজি পজিটিভ ছবি হত বলে একাধিক কপি পাওয়া যেত না ও ৩. ছবির উপরিভাগ সহজেই নষ্ট হয়ে যেত।

এদিকে ফক্স ট্যালবট ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই আলোক-সংবেদনশীল বস্তুর জন্যে সিলভার লবণ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন যে সিলভার ক্লোরাইড সিলভার নাইট্রেট অপেক্ষা অধিকতর আলোক-সংবেদনশীল এবং সিক্ত অবস্থায় এই সংবেদনশীলতা আরও বেশি। তিনি তাই ছবি তোলার কাগজে সিলভার নাইট্রেট মাখানোর আগে তাকে সোডিয়াম ক্লোরাইডে সম্পৃক্ত করে নিতেন। তিনি এও জেনেছিলেন যে সাধারণ ব্যবহারযোগ্য লবণের সাহায্যে প্রতিচ্ছবিকে স্থায়ী করা যায়। ১৮৩৫-য়ে মোটামুটি চিনতে পারা যায় এরকম একটি জানলার ছবি তিনি তুলতে পেরেছিলেন। যেহেতু এটি একটি নেগেটিভ, তাঁর মাথায় আসে এটিকে আর একটি আলোক-সংবেদনশীল কাগজের ওপর রেখে ছাপ তুলতে পারলে একটা পজিটিভ ছবি পাওয়া যাবে। ১৮৩৯-এর গোড়ায় দাগ্যের-এর প্রথায় ছবি তোলার কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রয়াল সোসাইটিতে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে পাঠ করেন (জানুয়ারি ১৮৩৯) যার উল্লেখ আমরা প্রথমেই করেছি।

পরের বছর তিনি সিলভার আয়োডাইডের সাহায্যে কাগজকে আবো সংবেদনশীল করে ছবি তুলে গ্যালিক অ্যাসিডের সাহায্যে পরিস্ফুট করলেন। এর নাম 'ক্যালোটাইপ' (সুচিত্র) দিয়ে তিনি এই পদ্ধতির পেটেন্ট নেন। এই পদ্ধতিতে ছবি তুলতে রৌদ্রালোকে ১ মিনিট ও রৌদ্রালোকিত আকাশের নিচে খোলা ছায়াতে ৪/৫ মিনিট সময় লাগত।

এই পদ্ধতি মোটেই জনপ্রিয় হয় নি কারণ অর্ধস্বচ্ছ কাগজের নেগেটিভের জন্য দাগ্যেরের ছবির মত স্পষ্ট ও পরিষ্কার হত না । তা সত্ত্বেও তাঁর নিজের তোলা যে সমস্ত ছবি পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দর যা থেকে বলা যায় ফক্স ট্যাল্‌বট শুধু ফোটোগ্রাফির কলাকৌশলের ক্ষেত্রে অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন না, ফোটোগ্রাফির শিল্পরূপের ক্ষেত্রেও তিনি এক বিশেষ কর্ণধার । বোধহয় তাঁকেই প্রথম 'মাস্টার ফোটোগ্রাফার' বলা যায় । অবশ্য ফোটোগ্রাফির ইতিহাসে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান এই যে তিনি একটি একক নেগেটিভ থেকে অসংখ্য পজিটিভ চিত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন । নেগেটিভ, পজিটিভ কথা দুটিও স্যার হার্শেলের দেওয়া । প্রথমদিকে এই নেগেটিভ/পজিটিভ পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা ছিল আলোক-সংবেদনশীল বস্তুটির স্বচ্ছতা বাড়ানো । কাগজে মোম লাগিয়ে বা ডিমের কুসুম মাখিয়ে স্বচ্ছতা বাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল । কাঁচের ওপর সিলভার লবণ ধরানো যাচ্ছিল না বলে পুরোপুরি স্বচ্ছ নেগেটিভ পাওয়া যাচ্ছিল না ।

ক্যালোটাইপ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ ঘটেছিল ১৮৪৩ থেকে ৪৯-এর মধ্যে অঙ্কনশিল্পী David Octavius Hill ও তাঁর সহকারী Robert Adamson-এর চিত্রকর্মে । তাঁদের তোলা কয়েকখানি অসাধারণ প্রতিকৃতি ও অন্যান্য চিত্র আমরা পেয়েছি । অক্তাভিয়াস হিলের কৃতিত্বের মূল কারণ তাঁর প্রায়োগিক দক্ষতা নয়, অনুপাত, কম্পোজিশন ও রূপারোপ সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ বোধ ।

দাগ্যের, ফক্স ট্যাল্‌বট ও নীপ্‌সের প্রচেষ্টা ও গবেষণা থেকে নিরপেক্ষভাবে আরও এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ছবি তোলার কাজে সফল হয়েছিলেন, তাঁর নাম Hippolyte Bayard, তিনি তাঁর ছবির নাম দেন 'ফোটোকেমিক্যাল ড্রয়িং' । কিন্তু দাগ্যের-এর ক্রমবর্ধমান ও কিছুটা সাজানো খ্যাতি ও প্রতিপত্তির চাপে পড়ে তিনি ধীরে ধীরে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যান ও সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর ন্যায্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত থাকেন ।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Frederick Scott Archer কাঁচের ওপর শক্ত ও স্বচ্ছ ভূমি (base) তৈরি করার জন্য পটাসিয়াম আয়োডাইডের (KI) সঙ্গে কলোডিয়ন (সেলুলজ নাইট্রেট ও অ্যালকহল) লাগিয়ে সিলভার নাইট্রেটে ডুবিয়ে সিক্তাবস্থায় ছবি তুলে অত্যন্ত ভাল ফল পেলেন । যেহেতু এই কাঁচের প্লেট শুকিয়ে গেলে পরিস্ফুট করা যেত না তাই সিক্তাবস্থায় ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে পাইরোগ্যাললে পরিস্ফুট করতে হত । যার জন্য এই পদ্ধতিকে 'ওএট কলোডিয়ন' বলা হয় । এর প্রধান অসুবিধা ছিল অন্য কোথাও ছবি তুলতে গেলে তাঁবুর মত ডার্করুম সঙ্গে নিয়ে যেতে হত, যাতে করে প্লেট তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে পরিস্ফুট করা সম্ভব হয় । অর্থাৎ ফোটোগ্রাফারকে ৭০ থেকে ১২০ পাউণ্ড ওজনের সাজসরঞ্জাম সব সময়ে সঙ্গে করে বয়ে বেড়াতে হত । এই পদ্ধতিতে ছবির গুণগত মান ছিল অত্যন্ত উঁচু, ছবি তোলার সময়ও কমই লাগত, দাগ্যেরের প্রথায় ছবি তোলার চেয়ে খরচ কম ছিল এবং যত খুশি কপি পাওয়া যেত ।

ফলে দাগ্যেরের প্রথায় ছবি তোলা ক্রমশঃ কমতে থাকলো এবং দশ বছরের মধ্যে তা পুরোপুরি লোপ পেয়ে গেল। পরবর্তী প্রায় তিরিশ বছর সময় ওএট কলোডিয়ন পদ্ধতির কাল। এই পদ্ধতির পেটেন্ট নিয়ে স্কট আর্চার বিপুল অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বিনা শর্তে ও নিঃস্বার্থভাবে তাঁর পদ্ধতি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেন।

ক্যালোটাইপ পদ্ধতিতে নেগেটিভ থেকে সিলভার ক্লোরাইড মাখানো কাগজে প্রিন্ট করা হত এবং কড়া রৌদ্রালোকে মুদ্রণের জন্য প্রতিচ্ছবি অপরিষ্কার হত। এ্যলবুমেন মাখানো কাগজে ফল ভাল হতে লাগলো। এবং প্রিন্টের জন্য এ্যলবুমেন মাখানো তৈরি কাগজ বাজারে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রি হতে আরম্ভ করলো। ইতিমধ্যে ফোটোগ্রাফির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আর কয়েকটি আবিষ্কার হয়েছিল। ১৮৬০-এ J.C. Maxwell প্রমাণ করলেন, লাল, সবুজ ও নীল আলোকের বিভিন্ন সমবায়ের মাধ্যমে অন্য প্রায় সমস্ত রঙ তৈবি করা সম্ভব। আমাদের চোখও মাত্র এই তিনটে মুখ্য বা প্রাথমিক রঙের প্রতিই অনুভূতিসম্পন্ন, এছাড়া আমরা আর যে রঙ দেখি বা দেখি বলে মনে করি তা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। ১৮৬৬-তে ইংলণ্ডের J. H. Dallmeyer ৫০° কৌণিক ক্ষেত্র সম্বলিত এফ-৮ লেনস প্রবর্তন করলেন। অচিরেই ফ্রান্সে রঙীন ছবির জন্য নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে একই ছবির লাল, নীল ও সবুজ কাঁচের নেগেটিভকে পবপর প্রতিফলিত করে পরীক্ষা করা হয়। ১৮৭০-এ প্যারিসে Nadar (ছদ্মনাম) ম্যাগনেসিয়াম পাউডার ব্যবহার করে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রের ছবি তুললেন। বোধ হয় তাঁকেই প্রথম পরীক্ষামূলক আলোকচিত্রী বলা যায়। ফোটোগ্রাফির অপ্রতিহত জনপ্রিয়তা যখন ফ্রান্সে চিত্রশিল্পী, ছাপাই ছবির কারিগর ও ভাস্করদের পক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষতিব কারণ হল ও তাঁরা ফোটোগ্রাফির শৈল্পিক স্বীকৃতির বিরুদ্ধে একজোট হলেন তখন নাট্যকার ও প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নাদার ফোটোগ্রাফিকে একটা বিশেষ মর্যাদার আসন দিতে পেরেছিলেন। তিনি এই মাধ্যমটিতে এক ধরনের সমকালীনতা আরোপ করে ফোটোসাংবাদিকতারও সূচনা করেছিলেন। এরপর ১৮৭৩-এ জার্মানীতে H. W. Vogel ফোটোগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিকে মেশাবার জন্য উপযুক্ত রঙ আবিষ্কার করলেন। এইভাবে ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে ফোটোগ্রাফির অগ্রগতি হতে লাগলো। নেগেটিভ/পজিটিভ-এর ব্যবহার, লেন্সের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ওএট কলোডিয়নের স্বচ্ছ নেগেটিভ, পজিটিভ প্রিন্টের জন্য এ্যলবুমেন পেপার, কৃত্রিম আলোর সাহায্য গ্রহণ, রঙীন ছবির জন্য রঙীন অবদ্রবের (emulsion) আবিষ্কার প্রভৃতি আলোকচিত্রকে একটা মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় কবিয়ে দিল।

১৮৫৩ সালে ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অব লণ্ডন, এখন যার নাম রয়াল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি--তার জন্ম হয় এবং পরপর আরও নানা জায়গায় এই ধরনের শুধুমাত্র ফোটোগ্রাফির উদ্দেশ্যেই নিবেদিত বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪ সালে ব্রিটিশ জার্নাল অব ফোটোগ্রাফি পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং আজও তা প্রতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন গবেষকের ফোটোগ্রাফি বিষয়ক

লব্ধ জ্ঞান এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জ্ঞান ও গবেষণাকে আরও এগিয়ে দেয় ।

দাগ্যেরোটাইপের তুলনায় ওএট কলোডিয়ন প্রথা সব দিক দিয়ে সুবিধের হলেও এর প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, নেগেটিভের জন্য প্লেট তৈরি, ছবি তোলা ও পরিস্ফুটন সবই সঙ্গে সঙ্গে করতে হত । এই অসুবিধা দূর করার জন্য ড্রাই প্লেট আবিষ্কার করার নানা প্রচেষ্টা শুরু হয় । প্রথমে ডিমের কুসুমের সঙ্গে কলোডিয়ন এবং পরে জিলেটিনের সঙ্গে কলোডিয়ন মিশিয়ে ড্রাই প্লেট তৈরির চেষ্টা খুব ফলপ্রসূ হয়নি । ১৮৭১-এ R. L. Maddox জিলেটিনের সাহায্যে ড্রাই প্লেট তৈরির যে বর্ণনা দেন তার সংবেদনশীলতা মোটেই ওএট কলোডিয়নের মত ছিল না । এর দুবছর পরে Burgess জিলেটিনের সাহায্যেই আরও একটু উন্নত ধরনের ড্রাই প্লেট তৈরি করলেন । এর সাহায্যে বেশ ভাল ছবি তোলা গেল । এই ড্রাই প্লেট বাজারে বেরোলেও ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে নি । কিন্তু জিলেটিন অবদ্রবের সংবেদনশীলতা বাড়াবার চেষ্টা চলতেই থাকলো । অবশেষে ১৮৭৮ সনে Charles Bennett আবিষ্কার করলেন যে জিলেটিন অবদ্রবকে গরম করলে তার সংবেদনশীলতা অনেক বেড়ে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিলেটিন ড্রাই প্লেট ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, জার্মানী ও আমেরিকায় উৎপাদন শুরু হয়ে যায় । ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই তা ওএট কলোডিয়নের স্থান দখল করে নিয়েছিল । জিলেটিনের সঙ্গে ক্যাডমিয়াম ব্রোমাইড (CdBr) ও সিলভার নাইট্রেট মিশিয়ে যে ড্রাই প্লেট তৈরি হল তার সাহায্যে ১/২৫ সেকেণ্ডে ছবি তোলা সম্ভব হওয়ায় হাতে-ধরা-ক্যামেরায় ছবি তোলার ব্যাপারে আর কোন অসুবিধা রইলো না । এখন ছবি তোলার অনেক আগেই প্লেট ক্যামেরায় ভরে রাখা যেত, এবং ছবি তোলার অনেক পরে সুবিধামত সময়ে পরিস্ফুট করারও কোন অসুবিধা ছিল না । এর ফলে আলোকচিত্রীকে ছবি তোলার জন্য নিজের প্লেট নিজেকেই তৈরি করার বা পরিস্ফুট করার বাধ্যবাধকতা থাকলো না ।

জিলেটিন ড্রাই প্লেটের আবির্ভাব ফোটোগ্রাফিতে আমেরিকার বিশেষ প্রাধান্য এনে দিল। প্রথমত প্রযুক্তিগত ভাবে । ফোটোগ্রাফির সাজসরঞ্জামের উৎপাদন এই প্রথম বৃহৎ ও ভারি শিল্পের আওতায় চলে এল । দ্বিতীয়ত ব্যাপকভাবে ড্রাই প্লেট ও তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ক্যামেরার উৎপাদন ও বিক্রয় হতে ফোটোগ্রাফি ধীরে ধীরে একটা গণমাধ্যম হয়ে উঠতে লাগলো । তৃতীয়ত প্রযুক্তি ও প্রসারের যৌথ প্রভাবে ফোটোগ্রাফির যে অর্থনৈতিক ভূমিকা সৃষ্টি হল তার ফলে সমস্ত শিল্প বা গণমাধ্যমই এখন থেকে ক্রমে ক্রমে আর্থিক কারণের দ্বারা (পেশাদারী বা ব্যবসায়িক যে কোন অর্থে) কমবেশি নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করলো । এর ফলে, চতুর্থত শিল্পচর্চার ভরকেন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই একটু একটু করে আমেরিকার দিকে সরে যেতে লাগল । এমনকি আমেরিকার ইষ্টম্যান কোম্পানি কিছুদিন পর ফোটোগ্রাফির যে রোল ফিলম বাজারে ছাড়লো তার নামকরণ করা হল 'আমেরিকান ফিল্ম' ।

মূলত জর্জ ইষ্টম্যান এবং তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক জনের প্রচেষ্টায় নেগেটিভ থেকে

পজিটিভ ছবির জন্য ব্রোমাইড, ক্লোরাইড এবং ক্লোরোব্রোমাইড কাগজ তৈরির পদ্ধতিও প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৮৪ সাল থেকেই বিশেষত ইষ্টম্যান খুব ভাল মানের ব্রোমাইড কাগজ তৈরি শুরু করে। এই কাগজ প্রধানত ছবি পরিবর্ধন (enlarge) করার জন্যই ব্যবহৃত হত। Leo Bakeland-এর সাহায্যে ১৮৯১ সালে কনট্যাক্ট প্রিন্টের জন্য 'Velox' কাগজ তৈরি হবার পর কৃত্রিম আলোয় ছবির মুদ্রণ বা পরিবর্ধন সম্ভব হল। এই কাগজ ক্রমশঃ এ্যলবুমেন অথবা কলোডিয়ন জিলেটিন প্রথায় তৈরি কাগজের স্থান দখল করে নিল। ১৮৮৫ সালে ফিলাডেলফিয়ায় Carbutt নেগেটিভের জন্য কাঁচের প্লেটের বদলে সেলুলয়েড শিট ব্যবহার করে শিট ফিল্‌ম তৈরি করলেন। এর তিন বছরের মধ্যে ইষ্টম্যান কোডাক কোম্পানি সেলুলয়েডের রোল ফিল্‌ম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি করে ফোটোগ্রাফিতে যুগান্তর আনলো। সেই সঙ্গে ঐ রোল ফিল্‌ম ব্যবহারের উপযুক্ত 'Kodak' নামে নতুন ধরনের বক্স ক্যামেরাও বার করলো। এর মাপ ছিল ৬ $^{১}/_{২}$" (দৈর্ঘ) x ৩ $^{১}/_{২}$" (প্রস্থ) x ৩ $^{১}/_{২}$" (উচ্চতা)। এই বক্স ক্যামেরার মধ্যে একশটি ছবি তোলার উপযুক্ত ফিল্‌ম ভরে বিক্রি করা হত এবং সমস্ত ছবি তোলা হয়ে যাবার পর ক্রেতা কোম্পানিতে ফিলম ফেরত দিলে কোম্পানি ফিল্‌ম পরিস্ফুট করে কাগজে প্রিন্ট করে ক্রেতাকে দিয়ে দিত। এতে ২ $^{১}/_{২}$" ব্যাসবিশিষ্ট মাপের ছবি উঠতো। এর পরই বিভিন্ন কোম্পানি ফোল্ডিং রোল ফিল্‌ম ক্যামেরা তৈরি করে এবং ১৮৯৮-এ কোডাক ফোল্ডিং পকেট ক্যামেরা বার করে।

এইভাবে ফোটোগ্রাফি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসে। সাধারণ মানুষ বলতে অবশ্যই জনসাধারণ নয়, সমাজের মধ্যবিত্ত মানুষ। দ্রুত ও সস্তা, অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও মূলত প্রাযুক্তিক এই মাধ্যমটির সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেকে যথাযথভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। ফোটোগ্রাফি ছিল তাদের অস্তিত্বের তথ্যমূলক প্রমাণ। এই মাধ্যমের পরবর্তী বিভিন্ন আবিষ্কার পরপর এইভাবে ঘটে—

১৮৮০ ফিল্‌ম পরিস্ফুটনে হাইড্রোকুইননের ব্যবহার ও টুইন লেন্‌স ক্যামেরার প্রচলন।

১৮৮২ ফোটো রাসায়নিকে সোডিয়াম সালফাইটের (Na_2So_3) ব্যবহার।

১৮৮৮ প্রথম সিঙ্গল লেন্‌স রিফ্লেক্স (SLR) ক্যামেরার পেটেন্ট নিলেন S.D. Mckeller, যাতে ঠিক ছবি ওঠার মুহূর্তে আয়নাটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে সরে যেত এবং Schroeder কর্তৃক প্রথম গোলীয় ত্রুটিমুক্ত এককেন্দ্রী (concentric) রস লেন্‌সের প্রবর্তন, পূর্বে ব্যবহৃত মেনিস্কাস বা পেজভাল লেনস এই ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না।

১৮৯০ প্যানক্রোমেটিক ফিল্‌ম বা প্লেটের প্রচলন, আগেই বলেছি সিলভার লবণ বেগনি ও নীল রঙের ক্ষেত্রে অধিকতর সংবেদনশীল, ফলে এ-যাবত ব্যবহৃত প্লেট বা ফিল্‌মে ছবি তুললে হলুদ, কমলা ও লাল এই উজ্জ্বল রঙগুলি ছবিতে অধিকতর কালো দেখাতো। প্যানক্রোমেটিক ফিল্‌মে উজ্জ্বল রঙগুলি উজ্জ্বল

ভাবেই প্রতিভাত হল। এই সময়েই ফিল্ম পরিস্ফুটনে সময়-তাপমাত্রা-সমন্বয় পদ্ধতির প্রবর্তন হয়।

১৮৯২ ক্রোমোস্কোপ নামে বহনযোগ্য ম্যাজিক লণ্ঠনের ব্যবহার যার সাহায্যে লাল, নীল ও সবুজ রঙের তিনটি ট্রান্সপেরেন্সি একসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত করে রঙীন ছবি দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৮৯৩ H. D. Taylor ২টি পজিটিভ ও ১টি নেগেটিভ লেন্স একত্র ব্যবহার করে শক্তিশালী ট্রিপলেট লেন্স গঠন করলেন। এর দৃক্‌গত ত্রুটিও ছিল অনেক কম। একই সময়ে John Joly রঙীন ছবির জন্য তিনটি পৃথক নেগেটিভের বদলে একটি মাত্র নেগেটিভ দিয়েই যুত (additive) পদ্ধতিতে রঙীন ছবি তোলার প্রবর্তন করলেন।

১৮৯৫ ফ্রান্সে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক সিনেমাটোগ্রাফের প্রবর্তন। আলোকচিত্রের আবিষ্কারের ৫৫ বছরের মধ্যে আর একটি নতুন প্রাযুক্তিক মাধ্যম চলচ্চিত্রের আবির্ভাব থেকে বোঝা যায় প্রযুক্তির অগ্রগতি হচ্ছিল কত কম সময়ে ও কী দ্রুত গতিতে। আলোকচিত্রের চাইতেও চলচ্চিত্র আরও বেশি করে শিল্প ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্যটাকে কমিয়ে দিল এবং অর্থনীতির ভূমিকাকে আরও বড় করে তুলে শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যসনের চেয়ে উপযোগকে মুখ্য করে তুললো।

১৮৯৮ P. Rudolph ছবি তোলার টেলিফোটো লেন্স বের করলেন। M. Q. ডেভেলাপারও তাঁর আবিষ্কার।

১৯০২ একই ব্যক্তি কর্তৃক শক্তিশালী 'অ্যানাসটিগমেট ট্রিপ্‌লেট জেইস টেসার লেন্স'-এর (f 4·5/50") প্রবর্তন।

১৯১২ আমেরিকার George P. Smith-এর প্রথম ৩৫ মি. মি. স্টীল ক্যামেরা।

১৯১৪ কোডাক কোম্পানির দু'রঙের বিযুত (subtractive) পদ্ধতির রঙীন ফিল্ম কোডাক্রোম। জার্মানীর Oscar Barnack-এর আবিষ্কার প্রথম ৩৫ মি. মি. লাইকা ক্যামেরা যাতে ৩৬টি ছবি তোলার উপযুক্ত রোল ফিল্ম ব্যবহার করা হল। অবশ্য এ ক্যামেরা বিক্রয় করার মত উপযোগী হয়ে বাজারে আসে ১৯২৫-এ। এই লাইকা মডেল 'এ' ক্যামেরাকে সত্যকারের একটি ভাল মিনিয়েচার ক্যামেরা বলা যেতে পারে। এই সময়েই ২খানা পজিটিভ ও ২ খানা নেগেটিভ লেন্স দিয়ে তৈরি কোয়াড্রুপ্লেট লেনস বের হয়। মোটামুটি এইসময় নাগাদ মাইক্রোফোটোগ্রাফিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজে তার প্রয়োগও ঘটেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় কাগজের ওপর মাইক্রো-ফোটোগ্রাফিক প্রিন্ট মুদ্রণে প্রথম সফল হয়েছিলেন ফক্স ট্যালবট। তিনি মূল বস্তুকে ২৮৯ গুণ পরিবর্ধিত করে তার ছবি তোলেন।

১৯২৮ আধুনিক বিখ্যাত টুইন লেন্স ক্যামেরা রোলিফ্লেক্স।

১৯২৯ অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রেখে ছবি তোলার কৃত্রিম আলো ।
১৯৩০ আলোর শক্তি ও তীব্রতা পরিমাপ করার জন্য এক্সপোজার মিটার ।
১৯৩১ দ্রুতগতি-সম্পন্ন জিনিষের ছবি তোলার জন্য ইলেক্‌ট্রনিক আলোর ব্যবহার ।
১৯৩৫ P. Rudolph কর্তৃক Zeiss-এর উন্নত ধরনের টেলিফোটো লেন্‌স এবং কোডাক-এর আরও পরিশীলিত তিন রঙের বিযুত পদ্ধতির কোডাক্রোম ফিল্‌ম এবং M. Laporte-এর ইলেকট্রনিক সাদা আলোর ফ্ল্যাশলাইট ।

আধুনিক ফোটোগ্রাফির জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান আবিষ্কারগুলি মোটামুটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাধ্যম হিসেবে ফোটোগ্রাফির অন্তর্নিহিত শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা যে কতখানি তা বিশেষ করে বোঝা গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। আলোকচিত্র তখন সামরিক কর্মের ও গুপ্তচর বৃত্তির অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠলো। বিশেষ করে আণ্ডারওয়াটার ফোটোগ্রাফি ও রেডিও ফোটোগ্রাফিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে থাকলো । Yousuf Karsh-এর তোলা চার্চিলের দৃঢ়সংকল্প ও অনমনীয় প্রতিকৃতিরূপ মিত্রপক্ষের অদম্য মনোবলের প্রতীক এবং রোনাল্ড টথেরোর হাতে উন্মাদ হিটলারের ব্যঙ্গাত্মক চিত্ররূপ প্রতিপক্ষকে হাস্যকর করে তোলার সফল প্রচেষ্টা হিসেবে সুদূরপ্রসাবী হতে পারলো ।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ফোটোফিলমে, আলোকরাসায়নিকে, লেন্‌সে ক্যামেরায় রঙের ব্যবহারে আরও অনেক উন্নতি হয়েছে এবং প্রতিদিনই হচ্ছে । তার মধ্যে মুভি ও টেলিভিশনের অগ্রগতি তো বিস্ময়কর । এছাড়া বিজ্ঞানের সাহায্যে ফোটোগ্রাফিতে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ শাখারও উদ্ভব হয়েছে । এই সমস্ত শাখায় বিশেষজ্ঞ গবেষকরা বিশেষ ধরনের কলাকৌশলের ও নানা ধরনের প্রয়োগেরও আবিষ্কার করে চলেছেন । বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ফোটোগ্রাফিরও যান্ত্রিক ও প্রাযুক্তিক উন্নতি এবং শৈল্পিক ক্রমবিকাশ ক্রমাগত হয়ে চলেছে ।

প্রাথমিক অবস্থায় ফোটোগ্রাফির উদ্দেশ্য ছিল বস্তুর হুবহু প্রতিচ্ছবি তৈরি করা । সেটা যখনই পারা গেল, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, তখনই ফোটোগ্রাফির ব্যবহারিক ও শিল্পগত দিক নিয়ে নানা জনে নানাভাবে কাজ করতে লাগলেন । এর মধ্যে কয়েকজনের সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এর অল্প পরেই মহিলা আলোকচিত্রী Julia Margaret Cameron-এর তোলা কয়েকটি অসামান্য 'ক্লোজ-আপ' শিল্পগত দিক থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তিনি ফোটোগ্রাফিকে একটা 'স্বর্গীয় শিল্প' বলে মনে করতেন ও তাঁর তোলা ছবিতে অনুভূতির সেই সুষমা আনতে চাইতেন । এরই পাশাপাশি নির্জলা বাস্তব নিয়েও ছবি তোলা হচ্ছিল । ওই প্রাথমিক যুগেই যুদ্ধের বিবিধ কারণ ও ভয়াবহতার ছবি তুলে সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলেন যে কয়েকজন আলোকচিত্রী তাঁরা হলেন—

Roger Fenton

ইনিই প্রথম যুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যুদ্ধের ছবি তোলেন

(ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ছবি) । এই দুঃসাহসী আলোকচিত্রশিল্পী শুধু রণাঙ্গনের ছবি নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের বিভিন্ন মর্মস্পর্শী বিষয়ের ছবির মধ্য দিয়েও সশস্ত্র সংগ্রামের ভয়াবহতা ও ট্র্যাজিডি তুলে ধরেছিলেন ।

Mathew Brady

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ছবি তুলেছিলেন । তাঁর তোলা জেফারসন ডেভিস ও আব্রাহাম লিঙ্কন-এর মত সাহসী মানুষদের প্রতিকৃতিতে তাঁদের শৌর্য, সংবেদনশীলতা ও ব্যক্তিত্বের মিলন ঘটেছে ।

Alexandar Gardner

একসঙ্গে কাজ করার জন্য ব্র্যাডি তাঁকে স্কটল্যাণ্ড থেকে নিউইয়র্কে নিয়ে আসেন । দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্র্যাডি ও গার্ডনার আদর্শ জুটি হিসেবে কাজ করেছিলেন । গার্ডনার ছিলেন পরিবর্ধনের কাজে বিশেষজ্ঞ ।

অপরদিকে সমসাময়িক অন্য ধারার ফোটোগ্রাফারদের মধ্যে ছিলেন—

Timothy O' Sullivan

অপিরিচিত স্থান ও সুদূর অঞ্চলের পরিচয় মেলে তাঁর ছবিতে । এইসব ছবিতে প্রকৃতির রুক্ষ, বলিষ্ঠ, পুরুষালি ও তবুও সম্মোহনকারী রূপ । তাঁকে প্রথম ভূতাত্ত্বিক আলোকচিত্রী বলা যায় ।

Gustav Rejlander

একাধিক ছবির সম্মেলনে বা সংমিশ্রণে তিনি বাস্তবাতীত, কল্পনাসমৃদ্ধ ও ভাবপ্রবণ ছবির সৃষ্টি করেছিলেন । এই ধরনের ছবিকে ফোটোকোলাজ বা ফোটোমনতাজ বলা হয় । তাঁর ছবিতে কাহিনীমূলকতা বা রূপকতার বিশেষ স্থান রয়েছে । তিনি ডাবল এক্সপোজারেরও আবিষ্কর্তা ।

Henry Peach Robinson

রেজল্যাণ্ডার-এর মত একই ধারার আলোকচিত্রশিল্পী । আলোকচিত্রের শিল্পরূপ নিয়ে বোধহয় তিনিই প্রথম বিস্তারিত লেখালেখি করেন । তাঁর এই বিষয়ে লেখা তিনটি বই বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে ।

সাধারণভাবে প্রথম দিকে শিল্পসম্মত ছবির ঝোঁক ছিল তেলরঙা ছবির নকলে ছবি করার দিকে । অনুকরণ ছাড়া, আবার কিছু কিছু অপব্যবহারও হয়েছে, অনেকে কৃত্রিম সাজানো জিনিষের ছবি তুলে মিথ্যাচরণও করেছে । তবে যে কোন শক্তিশালী জিনিষই সাধারণের হাতে এলে কিছু অপব্যবহারের সম্ভাবনা থেকেই যায়, আর তা আজও আছে । সমাজব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ফলে সামাজিক ও জীবনযাত্রার যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে ও সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরার জন্য ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফির যে উদ্ভব তা ফোটোগ্রাফির একটা বড়, জীবনমুখী সাফল্য । আলোকচিত্র তার নিজস্ব শিল্পভাষা খুঁজে পেতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। আর বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ সে নিজেকে অন্য সমস্ত শিল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে তার নিজস্ব স্বতন্ত্র জগৎ ও প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক দর্শন খুঁজে পায় ।

আলো

'And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not'.
—New Testament

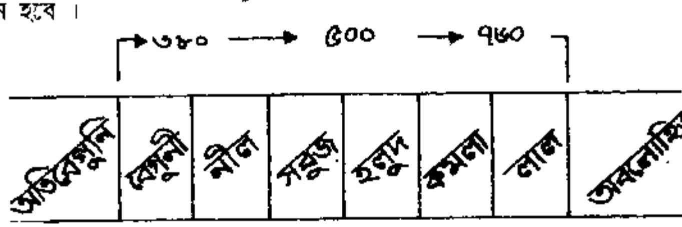
ফোটোগ্রাফির মূল উপাদান হল আলো । এই আলোকিত পৃথিবীতে আলো আমরা পাই স্বাভাবিকভাবে সূর্য, চন্দ্র, তারকা থেকে, আর কৃত্রিম আলো আমরা তৈরি করে নিই মোমবাতি, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অসংখ্য জিনিষের সাহায্যে । কোন বস্তু আলো ছাড়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে পারে না । দৃশ্য-ইন্দ্রিয়ের প্রধান অবলম্বন হল আলো । দৃশ্যবস্তু ও দৃষ্টির মধ্যে আলোই হচ্ছে যোগাযোগের একমাত্র সেতু । কোন বস্তুর ওপর পড়া আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়লে তবেই আমরা সেই বস্তুকে দেখতে পাই ।

দেখার জন্য চাই বিকীর্ণ শক্তি (radiant energy) । বিকীর্ণ শক্তি হল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের বা ঝলকে ঝলকে সূক্ষ্ম কণার আকারে বিচ্ছুরিত শক্তি । এই শক্তির উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যে কোনটা হতে পারে। ফলে বিকীর্ণ শক্তি নানা ধরনের হয়ে থাকে, যেমন বেতার ও টিভি সঙ্কেত, বিকীর্ণ তাপ ও রঞ্জনরশ্মি । কিন্তু সব ধরনের বিকীর্ণ শক্তিই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না । অথবা বলা যায়, দেখার জন্য বিশেষ এক ধরনের বিকীর্ণ শক্তিরই প্রয়োজন, আর তাকেই সহজ ভাষায় বলা হয় আলোকশক্তি । অর্থাৎ আলো হচ্ছে সেই ধরনের বিকীর্ণ শক্তি যা বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে নির্দিষ্ট সংবেদন জাগায় ।

এই আলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তরঙ্গাকারে চারপাশে ধাবিত হয় । বায়ুশূন্য স্থানে সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল গতিতে । আর পুকুরের জলে এক টুকরো ইঁট ফেললে যেমন বৃত্তাকার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সেই রকম তরঙ্গাকারে । নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন আলোকের মধ্যেও শক্তির ব্যাপক তারতম্য রয়েছে । সূর্য থেকে আসা সাধারণ আলো, যা আমরা সাদা দেখি, তা আসলে বিভিন্ন শক্তির আলোকসমূহের, অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের একগুচ্ছ আলোকরশ্মির সমষ্টির ফল । নিউটন সূর্য থেকে আসা সাদা

আলোকে একটা প্রিজমের (কমপক্ষে তিনটি তল বিশিষ্ট স্বচ্ছ কাঁচখণ্ড) মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মি দেখতে পান যা থেকে প্রমাণিত হয় সাদা সূর্যালোক বিভিন্ন বর্ণের মৌলিক আলোকরশ্মির সমন্বয়ের ফলে গঠিত । এখন প্রিজমের ওপর পড়লে রশ্মিগুলির আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণ বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। ফলে তারা প্রিজম কর্তৃক বিভিন্ন ও অসম ভাবে প্রতিসরিত হয়ে থাকে । এইভাবে সাদা আলোর বিভাজনের ফলে আমরা মোটামুটি যে রঙগুলি দেখতে পাই তা হল লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল ও বেগনি । ফলে এই কটি বর্ণের নির্দিষ্ট মিলনের ফলে সাদার সৃষ্টি ।

এই রশ্মিগুলির তরঙ্গ দৈর্ঘও মাপা হয়েছে । কোন পর্যাবৃত্ত তরঙ্গ প্রতিটি একক পরিক্রমায় যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ । এটা মাপা হয় তরঙ্গের একটি শীর্ষ থেকে পরের শীর্ষ অবধি যে দূরত্ব তার সাহায্যে । বর্ণালির পূর্বোক্ত রঙ কটিই আমরা দেখতে পাই কারণ আমাদের চোখ তরঙ্গ দৈর্ঘের একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সংবেদনশীল । বর্ণালির যে বেগনি রঙ আমাদের চোখে ধরা পড়ে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ হল ৩৮০ মিলি মাইক্রন ও তার ওপরে । এক মিলি মাইক্রন হল এক মিলিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ, তার মানে কল্পনাতীত ক্ষুদ্র এক পরিমাপ । আবার বর্ণালির অপর দিকে লালের যতটা আমরা দেখতে পাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ হল ৭৬০ মিলি মাইক্রন ও তার নিচে । অর্থাৎ আমাদের চোখের সংবেদন-ক্ষমতা ৩৮০ থেকে ৭৬০ মিলি মাইক্রন তরঙ্গ দৈর্ঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ । সেই জন্য ৩৮০ মি. মা-র কম তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো অতিবেগনি বা আলট্রাভায়োলেট এবং ৭৬০ মি. মা.-র বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো অবলোহিত বা ইনফ্রারেড আলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না । মনুষ্যেতর প্রাণী মৌমাছির চোখে কিন্তু অতিবেগনি ধরা পড়ে । আবার ৫০০ মি. মা. থেকে ৭৬০ মি. মা. পর্যন্ত তরঙ্গ দৈর্ঘের আলোগুলি আমাদের অক্ষিপটে ও তার সংলগ্ন স্নায়ুতন্ত্রে অধিকতর উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, ফলে ঐ তরঙ্গ দৈর্ঘের রঙগুলি অর্থাৎ সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল আমাদের চোখে বেশি উজ্জ্বল দেখায় । কিন্তু ফোটোফিল্ম বেগনি ও নীল রঙের প্রতি বেশি সংবেদনশীল । ফলে একই নাক্ষত্র মণ্ডলের একটা নীল তারা ও একটা লাল তারার মধ্যে খালি চোখে লাল তারাকে বেশি উজ্জ্বল ও ফোটোতে নীল তারাকে বেশি উজ্জ্বল মনে হবে ।



আবার বিভিন্ন বস্তুর যে বিভিন্ন রঙ আমরা চোখে দেখি তার কারণ বিভিন্ন বস্তু থেকে আগত আলোর প্রতি আমাদের চোখ ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া । রঙ বস্তুর

কোন গুণ বা ধর্ম নয়, বস্তু থেকে আগত আলোকের গুণ বা ধর্ম। প্রতিটি পার্থিব বস্তু নিজের বর্ণের আলোকরশ্মিকে অন্যান্য আলোকরশ্মির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিফলিত করে এবং প্রতিফলিত আলোকে বিশেষ বর্ণের আলোর প্রাধান্য ও আধিক্যের জন্য নিজস্ব বর্ণ অর্জন করে। একই রোদের আলো পড়া গাছের পাতা আমরা সবুজ দেখি আর তার ফুল দেখি লাল। সাদা সূর্যালোকে উদ্ভাসিত গাছের পাতা সবুজ ছাড়া আর সব রঙের রশ্মিকে শোষণ করে সবুজকে প্রতিফলিত করে বলেই আমরা গাছের পাতা সবুজ দেখি। লাল ফুল কেবল লাল রশ্মিটিকে প্রতিফলিত করে বাকিগুলিকে শোষণ করে তাই তাকে লাল দেখি। এক টুকরো সাদা কাগজ তার ওপর পড়া সমস্ত আলোকে প্রতিফলিত করে দেয় বলে তা সাদা আর একটা কালো কষ্টিপাথর কোন আলো প্রতিফলিত না করে সমস্ত আলো শোষণ করে নেয় বলেই তা আমাদের চোখে কালো। ফলে রঙ বলতে আমরা দুটো ভিন্ন জিনিষকে বোঝাই—১. মানুষের চোখ ও মস্তিষ্কে বিশেষ কোন আলো থেকে রঙের বিষয়ে যে অনুভব প্রাপ্ত হয় ২. বস্তুর বিশেষ ধর্ম, যে ধর্মের ফলে বস্তুটির নির্দিষ্ট বর্ণের আলোককে প্রতিফলিত বা প্রেরণ করার প্রবণতা দেখা যায়। সুতরাং বস্তুটিকে যদি এমন কোন আলোয় দেখা হয় যাতে ঐ নির্দিষ্ট বর্ণের আলোটি অনুপস্থিত তাহলে বস্তুটি কখনোই ওই বর্ণের বলে মনে হবে না। এদের প্রথমটিকে দৃশ্যানুভূতি অনুসারে বর্ণ ও দ্বিতীয়টিকে বস্তুবর্ণ বলা যেতে পারে। রঙীন ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এই প্রতীতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

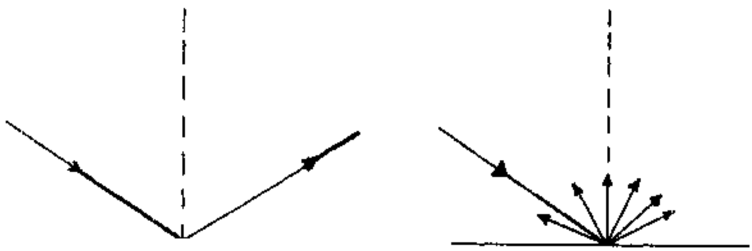
এখন সবুজ গাছের পাতা, লাল ফুল, সাদা কাগজ আর কষ্টিপাথর যদি একটা ঘরের মধ্যে রেখে সেই ঘরের আলো ক্রমশঃ কমাতে থাকি তবে প্রত্যেকটি বস্তুই আমাদের চোখে ক্রমশঃ ধূসর থেকে ধূসরতর (অর্থাৎ একই রকম রঙের দেখাবে) হয়ে শেষে দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। আলো পর্যাপ্ত না হলে রঙ চেনা যায় না, এটাকে বলা হয় বর্ণানুভূতির চরম প্রান্তসীমা। রঙ বোঝার একটি অন্তিম সীমাও আছে। আলো যখন খুবই প্রখর, চোখ তখন আবার রঙ বুঝতে পারে না, সব জিনিষকে সাদা মনে হয়।

আমরা প্রথমেই বলেছি আলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তরঙ্গাকারে চারপাশে ধাবিত হয়। এত ক্ষুদ্র তরঙ্গাকারে যে কাজের সুবিধার জন্য ধরা যায় কোন সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরল রেখাতেই ধাবিত হয়। কোন একটি বন্ধ অন্ধকার ঘরের একদিকের একটি ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যদি আলোকরশ্মি পাঠানো হয় তা হলে ঐ আলোকপথের মধ্যের ধূলিকণাগুলি একটা সরলরেখায় আমাদের চোখে পড়বে। বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে তার গতির তারতম্যও হয়ে থাকে। বাতাসহীন স্থানে আলো যত দ্রুতগতিসম্পন্ন বাতাসের মধ্যে আলোর গতি তার চাইতে অপেক্ষাকৃত কম এবং জলের মধ্যে তার গতি আরও অনেক কম। আলোর আর একটি ধর্ম এই যে, আলোকিত বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের তীব্রতা উৎস থেকে আগত আলোর শক্তির সঙ্গে সমানুপাতিক এবং আলোর উৎস থেকে আলোকিত অংশের দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়। আমরা জানি আলো বাতাস, জল, কাঁচ এমনকি বায়ুশূন্য স্থানের মধ্য

দিয়েও যেতে পারে । আলোর বিভিন্ন বিচিত্র ক্রিয়া গুনে শেষ করা যাবে না : সঞ্চরণ বিশোষণ প্রতিফলন প্রতিসরণ বিচ্ছুরণ ব্যতিচার সমাবর্তন আলোকপ্রভা । কাঁচের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে তার যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া হয় তা ফোটোগ্রাফির পক্ষে বিশেষ মূল্যবান বলে আমরা আলোর এই প্রতিক্রিয়াগুলির বিষয়ে মোটামুটি জেনে নেব ।

প্রতিফলন (Reflection) :

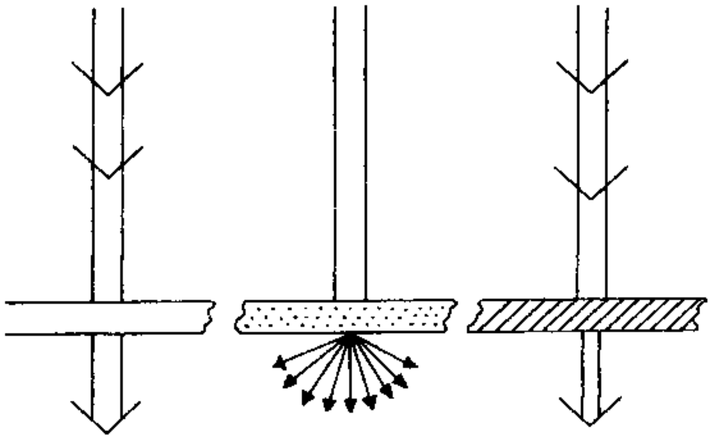
কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আলোকরশ্মি যখন দ্বিতীয় কোন মাধ্যমের পৃষ্ঠের ওপর পতিত হয়ে আবার প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে তখন তাকে আলোর প্রতিফলন বলা হয় । প্রতিফলন দুভাবে হতে পারে—১. দ্বিতীয় মাধ্যমটির পৃষ্ঠভাগ যদি চক্‌চকে বা গ্লসি হয় ও ২. পৃষ্ঠভাগ যদি খস্‌খসে বা ম্যাট হয়। প্রতিফলনের সূত্র অনুসারে উভয় ক্ষেত্রেই আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি একই তলে থাকবে । প্রথম ক্ষেত্রে আপতন কোণ (angle of incidence) ও প্রতিফলন কোণ (angle of reflection) পরস্পরের সমান । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকবে না । প্রতিফলিত আলো সব দিকে প্রতিফলিত হয়ে যাবে । আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্বিত কোন বস্তুর বা জলে প্রতিফলিত কোন দৃশ্যের ছবি তুলতে গেলে বা ছবি তোলার কাজে রিফ্লেক্টর ব্যবহার করতে হলে প্রতিফলন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার ।



সঞ্চরণ (Transmission)

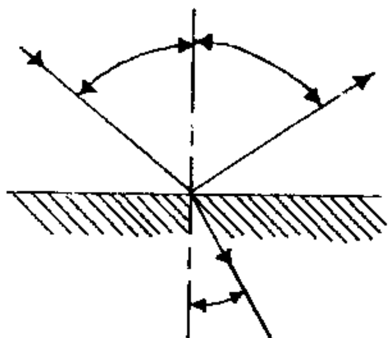
সঞ্চরণের প্রকৃতি অনেকটা প্রতিসরণের মত এবং তা তিনভাবে হতে পারে— ১. আলো যদি এক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দ্বিতীয় কোন মাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে তার মধ্য দিয়ে কোন দিক পরিবর্তন না করেই সোজাসুজি সঞ্চারিত হয়ে যায় তবে তাকে আমরা আলোর সরাসরি সঞ্চরণ বলে থাকি । যে কোন স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে এই সঞ্চরণ হতে পারে । ২. ঈষদ্‌চ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে যখন আলো সঞ্চারিত হয় তখন তা সোজাসুজি সঞ্চারিত না হয়ে চারপাশে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে । যেমন পাতলা প্লাষ্টিক শিট বা গ্রাউণ্ডগ্লাসের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলো । ৩. কোন রঙীন বস্তুর মধ্য দিয়ে যখন আলো সঞ্চারিত হয় তখন ঐ বিশেষ রঙের বস্তুটি তার নিজস্ব রঙের আলোক রশ্মিটিকেই কেবল সঞ্চারিত করে এবং বাকি রশ্মিগুলিকে শোষণ করে নেয় । যেমন রঙীন কাঁচ । কোন বস্তু থেকে আগত আলো যখন কোন লেন্‌সের ওপর পতিত হয় তখন সেই আলোর

একাংশ শোষিত ও একাংশ প্রতিফলিত হয়ে যায় । আলোর অবশিষ্ট অংশ লেন্সের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে ফিল্মের ওপর বস্তুর প্রতিচ্ছবি গঠন করে । সর্বাধুনিক ক্যামেরায় একাধিক লেনস ব্যবহৃত হওয়ায় সঞ্চারিত আলোর পরিমাণ কখনই মূল আলোর শতকরা ৭৫/৮০ ভাগের বেশি হতে পাবে না ।



প্রতিসরণ (Refraction)

প্রতিসরণকে এক বিশেষ ধরনের সঞ্চরণ বলা যেতে পারে । আমরা জেনেছি যে আলো তরঙ্গাকারে ধাবিত হয় এবং বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে বস্তু অনুসারে তার গতিরও তারতম্য ঘটে । সুতরাং কোন আলোকরশ্মি স্বচ্ছ এক মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় কোন মাধ্যমে যদি সোজাসুজি (অর্থাৎ ৯০° কোণে) প্রবেশ না করে তির্যকভাবে প্রবেশ



করে তবে আলোক তরঙ্গের প্রথমাংশ মাধ্যমকে আগে স্পর্শ করে এবং স্বভাবতই তরঙ্গের শেষাংশ অপেক্ষা তার গতি অনেক কমে যায়, ফলে আলোকরশ্মির গতিপথ দ্বিতীয় মাধ্যমে বেঁকে যায় । আলোকপথের এই নমন বা বাঁককে আলোকের প্রতিসরণ বলা হয় । আলোকরশ্মি কতটা বাঁক নেবে তা নির্ভর করছে তিনটে জিনিষের

ওপর। ১. আলোকরশ্মির আপতন কোণ ২. দ্বিতীয় মাধ্যমের ঘনত্ব ৩. আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ। প্রতিসরণের সূত্র অনুসারে প্রথম মাধ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণ গুণাঙ্ক ${}_1\mu_2 = \frac{\text{Sin i}}{\text{Sin r}}$ যখন i আপতন কোণ ও r প্রতিসরণ কোণ। কোন সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও অতিভুজের মধ্যবর্তী কোণটি যদি θ হয় তবে $\text{Sin } \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$। দেখা গেছে গুণাঙ্কটিকে এই ভাবেও পরিমাপ করা যায় ${}_1\mu_2 = \frac{\text{প্রথম মাধ্যমে আলোর গতিবেগ}}{\text{দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর গতিবেগ}}$। লেনসের ক্রিয়া প্রতিসরণের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

বিচ্ছুরণ (Dispersion)

যখন কোন অসমসত্ত্ব আলোকরশ্মি একটি প্রিজমের ওপর এসে পতিত হয় তখন বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘের আলোকরশ্মি অসমান ভাবে প্রতিসরিত হয়ে প্রিজম থেকে বিভিন্ন অভিমুখে বেরিয়ে আসে। এর ফলে সাদা আলোর অন্তর্গত বিভিন্ন রঙ আলাদা হয়ে যায়। আলোর এই বিভাজনকে বিচ্ছুরণ বলে। প্রিজমের সাহায্যে যে বর্ণালির সৃষ্টি হয় বা জলকণার ওপর আলো পড়লে যে রামধনু দেখা যায় তা হল বিচ্ছুরণের উদাহরণ। যেহেতু বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি কোণ বিভিন্ন সুতরাং বর্ণ অনুসারে প্রিজমের প্রতিসরণ গুণাঙ্কও বিভিন্ন হয়ে থাকে। লেন্‌স যে প্রতিচ্ছবি তৈরি করে বিচ্ছুরণের দরুন তাতে ত্রুটি থেকে যায়। এই জন্য ক্যামেরা লেনসের বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করে নেওয়া দরকার।

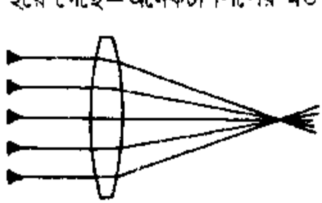
লেন্স

'Lens is a shaped, transparent optical device, generally made of fine glass, which forms within its field of view the image of an object with acceptable definition over a specified field angle by converging or diverging light rays coming from the object.'

—লেন্সের দৃক্-বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা

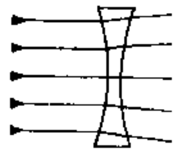
আমরা আগে বলেছি, বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর সাহায্যেই বস্তুকে আমরা দেখতে পাই । কিন্তু বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো যদি সোজাসুজি আমাদের অক্ষিপটের ওপর এসে পড়ে তবে আমরা ঐ বস্তুটিকে মোটেই দেখতে পাব না। বদলে আবছা ধূসর একটা রঙের অনুভূতি হবে মাত্র। কারণ বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো সবদিকেই প্রতিফলিত হওয়াব জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে পারে না। চোখ ঐ প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে অক্ষিপটের ওপর ফোকস করে বলেই আমরা বস্তুটিকে নির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সংহত ভাবে দেখতে পাই। আমাদের চোখের মত ক্যামেরার লেন্সও বস্তুর প্রতিটি অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রাভিমুখী করে ফোটোফিলমের ওপর এক একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ফোকস করে। প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করার পেছনে লেন্সের যে মূল ক্ষমতাটি ক্রিয়াশীল তা হল প্রতিসরণ। সুতরাং প্রতিসরণের ক্ষমতাবিশিষ্ট স্বচ্ছ বস্তুকে আমরা লেনস বলতে পারি। সাধারণত তা কাঁচ থেকেই প্রস্তুত করা হয়। তবে আজকাল তা অনেক ক্ষেত্রে প্লাষ্টিক বা ফাইবার জাতীয় বস্তু থেকেও তৈরি হচ্ছে।

লেনস প্রধানত দুধরনের হয়ে থাকে। এক ধরন যার মধ্যভাগ মোটা ও চারপাশের প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমশঃ পাতলা হয়ে গেছে—অনেকটা পিপের মত। এই ধরনের লেন্সকে



উত্তল (convex) বা পজিটিভ লেনস বলে। উত্তল লেনস আলোকরশ্মিগুলিকে বাঁকিয়ে

কেন্দ্রাভিমুখী করে বলে তাকে অভিসারী (converging) লেনসও বলা হয়ে থাকে। অপর ধরনের লেন্‌স যার চারধারের প্রান্তদেশ মোটা কিন্তু মধ্যভাগ ক্রমশঃ পাতলা হয়ে গেছে—অনকেটা ধনুকাকৃতি সেই লেন্‌সকে অবতল (concave) বা নেগেটিভ লেন্‌স বলে। এই লেন্‌স আলোকরশ্মিগুলিকে বাঁকিয়ে কেন্দ্রাভিমুখী না করে বহির্মুখী করে দেয় বলে একে অপসারী (diverging) লেন্‌সও বলা হয়ে থাকে।

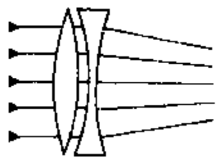


উত্তল লেনস তিন রকমের : ১. উভোত্তল (Double convex), যার উভয় দিক উত্তল ২. সমোত্তল (Plano-convex), যার একদিক উত্তল, অপরদিক সমতল ৩. যার একদিক উত্তল, অপরদিক অবতল (Concavo-convex)। একই ভাবে অবতল লেন্‌সও তিন রকমের : ১ উভাবতল (Double concave), যার উভয় দিক অবতল ২. সমাবতল (Plano-concave), যার একদিক অবতল, অপরদিক সমতল ৩. যার একদিক অবতল, অপরদিক উত্তল (Convexo-concave)। এই কটি লেন্‌সের গঠন-বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক সারণী নিচে দিলাম :

সংখ্যা			নাম	সর্বাধিক বেধ	প্রভাব
সমতল	উত্তল	অবতল			
১	১		সমোত্তল	মধ্যভাগে	অভিসারী
১		১	সমাবতল	প্রান্তভাগে	অপসারী
	২		উভোত্তল	মধ্যভাগে	অভিসারী
		২	উভাবতল	প্রান্তভাগে	অপসারী
	১	১	কনক্যাভো কনভেক্স	মধ্যভাগে	অভিসারী
	১	১	কনভেক্সো কনকেভ	প্রান্তভাগে	অপসারী

যেহেতু অবতল লেন্‌স আলোকরশ্মিগুলিকে কেন্দ্রাভিমুখী না করে বহির্মুখি করে দেয় তাই তার দ্বারা প্রতিচ্ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিচ্ছবি উত্তল লেন্‌সের সাহায্যেই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু একখানি মাত্র উত্তল লেন্‌সের সাহায্যে যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তা খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয় না । এর ধারের দিকের আলোকরশ্মিগুলি ভেঙে গিয়ে রঙগুলি আলাদা করে দেয়, ফলে প্রতিচ্ছবির মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রান্তদেশ অস্পষ্টতর হয়। একখানি উত্তল লেন্‌সের সঙ্গে অন্য ধরনের কাঁচ দ্বারা প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত কম বক্রতার একখানি অবতল লেন্‌স যুক্ত করে ঐ ত্রুটির অনেকখানিই সংশোধন করা যায়। অবশ্য ঐ যুগ্ম লেন্‌সের দ্বারা প্রতিসরিত আলোকরশ্মি অভিসারী হওয়া চাই । সরলতম ক্যামেরা-লেন্‌সে মাত্র দুটি বিষয় বিবেচ্য থাকে—লেন্‌সের আকৃতি ও শাটারের

ডায়াফ্রামের অবস্থান। কিন্তু আজকালকার ক্যামেরায় যে উন্নত মানের যৌগিক (compound) লেনস ব্যবহার করা হয় তা তৈরি হয় বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের উত্তল ও অবতল লেনস পর পর সাজিয়ে। এই সমস্ত লেনসের কাঁচ ও তাদের বক্রতাও বিভিন্ন হয়। ফলে এই প্রকার জটিল ক্যামেরা-লেনসের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ও হয় অনেক। বলে রাখা ভাল কোন যৌগিক লেনসের মধ্যে যত রকম লেনসই থাকুক না কেন, প্রতিচ্ছবি পেতে হলে শেষ পর্যন্ত তাকে অভিসারী করতেই হবে ।



কোন একক লেনস যে যথেষ্ট ভাল প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে পারে না তার কারণ লেনসের সাত রকম মূল ত্রুটি (aberration)। এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করে ভাল মানের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করার জন্যই বিভিন্ন লেনসের সম্মেলনে ও সমন্বয়ে যৌগিক লেনস তৈরি করতে হয়। আধুনিক ক্যামেরায় যে উন্নত ধরনের যৌগিক লেনস ব্যবহার করা হয় তার সৃষ্ট প্রতিচ্ছবি অতি উচ্চমানের হলেও তা শতকরা একশো ভাগ নিখুঁত নয়। বিজ্ঞানীরা এখনও সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য লেনস আবিষ্কার করতে পারেন নি। কোন লেনসের কর্মদক্ষতা নিরূপণ করা হয় তার দ্বারা গঠিত প্রতিচ্ছবির স্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতার মাত্রা, আলোক বণ্টনের সমতা, বর্ণ বিশুদ্ধির পরিমাণ ও বিভিন্ন ত্রুটি ও বিকৃতির সংশোধনের মাত্রা অনুসারে। লেনসের যথাযথ ব্যবহারের জন্য তার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার। কিন্তু সেই আলোচনা করার আগে লেনসেব কয়েকটি পরিভাষা, সূত্র ও দৃক-বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা কিছু জেনে নেব।

দৃককেন্দ্র (Optical centre)

লেনসের কেন্দ্রবিন্দু যার মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি কোন বাঁক না নিয়ে অর্থাৎ প্রতিসরিত না হয়ে সোজাসুজি সঞ্চারিত হয়ে যায়।

প্রধান অক্ষ (Principal axis)

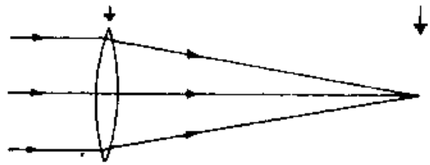
লেনসের কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করা কাল্পনিক অনুভূমিক অক্ষরেখা।

প্রধান ফোকস (Principal focus)

প্রধান অক্ষরেখার সমান্তরালে আসা আলোকরশ্মিগুলি লেনসের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে, উত্তল লেনসের ক্ষেত্রে, অক্ষরেখার যে বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা অবতল লেনসের ক্ষেত্রে, রশ্মিগুলি যে বিন্দু থেকে বহির্মুখী হয় অর্থাৎ বহির্মুখী রশ্মিগুলিকে সরলরেখা বরাবর পিছিয়ে আনলে অক্ষরেখার যে বিন্দুতে মিলিত হয়।

ফোকস দৈর্ঘ (Focal length)

অসীম দূরত্বে অবস্থিত কোন বস্তুর যে প্রতিচ্ছবি লেন্‌স গঠন করে লেন্‌সের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সেই প্রতিচ্ছবির দূরত্বকে ফোকস দৈর্ঘ বলে। সরল করে বললে তা হল লেন্‌সের



কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রধান ফোকসের দূরত্ব। সাধারণত f অক্ষর দিয়ে তা বোঝানো হয়ে থাকে। $^1/_f={}^1/_u+{}^1/_v$ যখন u হল বস্তু দূরত্ব ও v হল প্রতিচ্ছবি দূরত্ব।

বস্তু দূরত্ব (Object distance)

যে বস্তুর ছবি তোলা হবে লেন্‌সের কেন্দ্রবিন্দু থেকে তার দূরত্ব । সাধারণত u অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

প্রতিচ্ছবি দূরত্ব (Image distance)

বস্তুর প্রতিচ্ছবি থেকে লেনসের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব। v অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করা হয়। লেন্‌সের সাহায্যে যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয় তার আকার নির্ভর করে প্রতিচ্ছবি দূরত্ব ও বস্তু দূরত্বের অনুপাতের ওপর।

আকার=প্রতিচ্ছবি দূরত্ব÷বস্তু দূরত্ব=$^v/_u$=magnificaiton (বিবর্ধন)।

ফোকস তল (Focal plane)

ফোকসকে কেন্দ্র করে অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত তল।

ফোকস ক্ষেত্র (Focal field)

লেনসের দৃষ্টিকোণের ক্ষেত্র; এই সূত্র দ্বারা তা পরিমাপ করা সম্ভব : $2F \tan {}^\theta/_2=d$, যখন F =লেনসের আনুষঙ্গিক ফোকস দৈর্ঘ, θ =ওই লেন্‌সের ওপর বস্তু কর্তৃক সম্মুখিত মোট ক্ষেত্রকোণ, d=ফোটো-ফিল্‌মের কর্ণ । আমরা আগের অংশে বলেছি tan= লম্ব/অতিভুজ । ক্যামেরা-লেনসের ক্ষেত্র সাধারণত ১৫° থেকে ১৪০° -র মধ্যে হয়ে থাকে।

উন্মেষ (Aperture)

লেন্‌সের গোলীয় উপরিভাগের ব্যাসকে অ্যাপারচার বলা হয়।

আপেক্ষিক অ্যাপারচার (Relative aperture)

একজন ফোটোগ্রাফার যে অ্যাপারচারে ছবি তোলেন, সাধারণভাবে তাকেই আপেক্ষিক অ্যাপারচার বলা যায়। f-এর পাশে সংখ্যা দিয়ে একে বোঝানো হয়ে থাকে। এই সংখ্যাটি

লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ ও আপেক্ষিক ব্যাসের অর্থাৎ লেন্সের ব্যবহৃত অংশের ব্যাসের অনুপাতে নির্ণয় করা হয়। একটি ৮০মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেন্সে যদি ১০ মি. মি. আপেক্ষিক ব্যাসে কাজ করা হয়, তাহলে ৮০ + ১০ = ৮, অর্থাৎ বলা যাবে আপেক্ষিক অ্যাপারচার এফ/৮। এর সাহায্যে লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোক প্রবেশের পরিমাণকে বোঝানো হয়ে থাকে।

প্রতিচ্ছবির ঔজ্জ্বল্য (Image brightness)

প্রতিচ্ছবির উজ্জ্বলতা যে সূচকের ওপর নির্ভরশীল তার নাম f/stop, লেন্সের ফোকস দৈর্ঘকে তার অ্যাপারচার দিয়ে ভাগ করে এই সূচক পাওয়া যায়। f/stop-এর কয়েকটি নিয়মিত মান হল f/1·4, 2, 2·8, 4, 5·6, 8, 11, 16, 22, 32 ইত্যাদি। কোন্ লেন্স, কেমন তার গঠন ও কী তার কার্যকলাপ এগুলি দিয়ে তার f/stop নির্বাচন করা হয়।

হাইপার-ফোকল দূরত্ব (Hyperfocal distance)

কোন লেন্সকে অসীম দূরত্বে ফোকস করার পর লেন্সের সবচেয়ে নিকট দূরত্বের যে বস্তুটি গ্রহণযোগ্যভাবে স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে সেই দূরত্বকে ঐ লেনসের হাইপার-ফোকল দূরত্ব বলে।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাবে, কোন একটি নির্দিষ্ট ফোকস দৈর্ঘের লেনসের বস্তু দূরত্ব যদি বৃদ্ধি পায় তা হলে ঐ লেনসের প্রতিচ্ছবি দূরত্ব কমে যাবে। আবার একই ভাবে যদি বস্তু দূরত্ব কম হয় তবে প্রতিচ্ছবি দূরত্ব বেড়ে যাবে। যার জন্য ছবি তোলার সময় বস্তু দূরত্বের তারতম্য অনুসারে লেনসকে আগে পিছে করে ফোকস দৈর্ঘের তারতম্য করা হয়। তবে কমদামী বক্স ক্যামেরায় ফোকস করার যে দরকার হয় না তার কারণ বস্তুকে এমন একটি দূরত্বের মধ্যে রাখতে হয় যেখানে রাখলে ফোকস দৈর্ঘ ও প্রতিচ্ছবি দৈর্ঘ মোটামুটি একই থাকে। যার জন্য ঐ ধরনের ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের চেয়ে কাছে আনা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে ফিলমটি বক্স ক্যামেরার হাইপার-ফোকল তলে রাখা হয়। ফলে প্রতিচ্ছবির মান খুব একটা উঁচু হয় না।

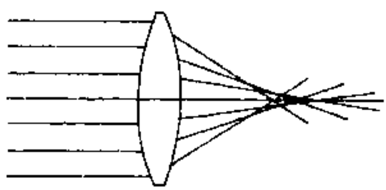
লেন্সের দ্বারা প্রতিচ্ছবি গঠন করতে গেলে লেন্সে অন্তত একটি বক্রাকার পৃষ্ঠভাগ থাকা দরকার । প্রায় সমস্ত ক্যামেরা-লেন্সে এই বক্রতা হচ্ছে গোলাকার। তার কারণ গোলাকার পৃষ্ঠভাগ ব্যাপক হারে উৎপাদন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অগোলীয় পৃষ্ঠ উৎপাদন করা খুব কঠিন, তা ব্যাপক হারে উৎপাদন করার পদ্ধতিও সুলভ নয় এবং খরচও বেশি। তাই সাধারণভাবে গোলীয় পৃষ্ঠভাগ বিশিষ্ট লেন্সই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার লেন্সের যে সমস্ত প্রধান ত্রুটি (কেননা কোন লেন্স কোনভাবেই একটি বিন্দুকে সৎ বিন্দু হিসেবে প্রতিবিম্বিত করতে পারে না) তার একটা প্রধান কারণ হল লেন্সের পৃষ্ঠভাগের এই গোলীয় আকৃতি। অন্য কারণটা এই যে উৎস থেকে আগত অধিকাংশ আলোকরশ্মিই অসমসত্ত্ব, অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মির সংমিশ্রণ।

লেন্সের ত্রুটি (Aberrations)

লেন্স কর্তৃক গঠিত প্রতিচ্ছবির ত্রুটিগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ১. জ্যামিতিক ত্রুটি ২. গাণিতিক অশুদ্ধি । প্রথম ভাগে পড়ে—পার্শ্বিক ত্রুটি 'বিকৃতি' ও অনুদৈর্ঘ ত্রুটি 'ক্ষেত্রবক্রতা'। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে গোলীয় ত্রুটি, কোমা, আলোক বর্ণালীর ত্রুটি, বিষম প্রতিরূপ ও ডিফ্র্যাকশন।

গোলীয় ত্রুটি (Spherical aberration)

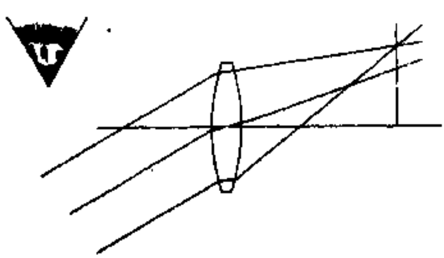
কোন লেন্সের গোলীয় পৃষ্ঠভাগের ওপর বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো যখন সমান্তরাল ভাবে এসে পড়ে. প্রতিসরিত হয়, তখন লেন্সের প্রান্তদেশের আলোকরশ্মিগুলি মধ্যভাগের আলোকরশ্মি অপেক্ষা অধিকতর প্রতিসরিত হয়ে লেন্সের অপেক্ষাকৃত কাছে অক্ষরেখা ভেদ করে, অপরদিকে মধ্যভাগের রশ্মিগুলি লেনস থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে অক্ষরেখা স্পর্শ করে। রশ্মিগুলি অক্ষরেখার একই বিন্দুতে মিলিত না হয়ে বিভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হওয়ার ফলে সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া সম্ভব হয় না। এই ত্রুটি উত্তল



লেনসের সঙ্গে অবতল লেনস যুক্ত করে এবং লেনসের আলোকপ্রবেশের পথ (ষ্টপ) ছোট করে সংশোধন করা যায়।

কোমা (Coma)

কোমাকে সামঞ্জস্যহীনতার ত্রুটি বলা যেতে পারে। একটি লেন্সের উপরের অংশ থেকে প্রতিসরিত আলোকরশ্মি নিচের অংশের দ্বারা প্রতিসরিত আলোকরশ্মির সঙ্গে

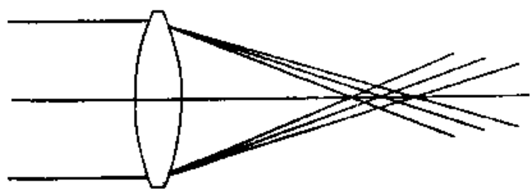


মূলরশ্মির প্রতিসরণ-পথের কিছু ওপরে মিলিত হয়। ফলে সামঞ্জস্যহীন প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়। এই ত্রুটির দরুন প্রতিচ্ছবির কিছু অংশ উজ্জ্বল ও তার চারপাশ ধূমকেতুর পুচ্ছের মত কুয়াসাচ্ছন্ন দেখায় বলে এই ত্রুটিকে বলা হয় কোমা। প্রতিচ্ছবির একপাশে আলো

ছড়িয়ে পড়ার জন্য এই দোষ অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে। এর ফলে প্রতিচ্ছবিতে সুনির্দিষ্টতা থাকে না এবং টোনের বৈপরীত্যের অভাব ঘটে। ষ্টপ ছোট করে এই ত্রুটি অনেকটা কমানো যায়।

আলোক বর্ণালীর ত্রুটি (Chromatic aberration)

আমরা জানি সাদা আলো কয়েকটি রঙের আলোর মিলিত রূপ এবং এর মধ্যেকার প্রতিটি রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন হওয়ায় তাদের প্রতিসরণও বিভিন্ন। এখন লেন্সের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সাদা আলোকরশ্মি যদি বিভিন্ন বর্ণে ভেঙে গিয়ে বিভিন্নভাবে প্রতিসরিত হয় তা হলে তারা অক্ষরেখার একই বিন্দুতে মিলিত হয় না। যেমন কোন সরল লেন্স নীল রশ্মিকে লাল রশ্মির চেয়ে বেশি প্রতিসরিত করে ; ফলে লাল রশ্মির তুলনায় নীল রশ্মির ফোকস লেনসের অধিক নিকটবর্তী হয়; অর্থাৎ আলোর বিভিন্ন রঙ একই স্থানে ফোকস করে না। ফলে ছবিতে বস্তুর চারপাশে সূক্ষ্ম রঙের ঝালরের মত সৃষ্টি হয়ে প্রতিচ্ছবি ঝাপসা ও অস্পষ্ট করে। যদিও কয়েকটি উত্তল ও অবতল লেনসের সহযোগে এই ত্রুটি অনেকখানি কমানো যায় তবু বিশেষত গোলীয়



ত্রুটির সংশোধন আলোকরশ্মির রঙের ওপর আর একভাবে নির্ভরশীল বলে অন্যান্য ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজনে আলোক বর্ণালীর ত্রুটি কিছুটা অসংশোধিত অবস্থাতেই রেখে দিতে হয়।

বিষম প্রতিরূপ (Astigmatism)

এর সহজবোধ্য সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। আমরা এতক্ষণ লেন্সের ওপর সোজাসুজি এসে পড়া আলোকরশ্মির ক্ষেত্রে যে সমস্ত ত্রুটি দেখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু বস্তু থেকে আগত সব আলোকরশ্মিই সোজাসুজি না এসে কিছু রশ্মি নৈকতলীয় (skew) ভাবে লেন্সের ওপর পড়লে তার প্রতিসরণ সোজাসুজি আসা রশ্মির প্রতিসরণের মাত্রা থেকে ভিন্ন হয়। ফলে এই দু ধরনের রশ্মির প্রতিবিম্বের মধ্যে যে তারতম্য ঘটে তাকে বিষম প্রতিরূপ জনিত ত্রুটি বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও লেন্সের মুখ ছোট করে নৈকতলীয় রশ্মির পরিমাণ কমিয়ে প্রতিচ্ছবির ত্রুটি কমানো যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাঁচের তৈরি বিভিন্ন বিচ্ছুরণ শক্তিসম্পন্ন লেন্স ব্যবহার করেও এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য ত্রুটি

বিচ্ছুরণ (Diffraction)

কোন অনচ্ছ বস্তুর তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগে পতিত আলোকরশ্মির যে নমন ঘটে তাকে আলোকের বিচ্ছুরণ বা Diffraction বলে। ছবি তোলার সময় অ্যাপারচার ব্লেডের প্রান্তভাগে পড়া আলোর বিচ্ছুরণ সামগ্রিকভাবে ছবির তীক্ষ্ণতা কমিয়ে দেয়। লেন্‌স অ্যাপারচার বেশি ছোট করা হলে ব্লেডের প্রান্তদেশে পড়া আলোকের পরিমাণ বাড়ার জন্য বিচ্ছুরণও বৃদ্ধি পায়। বিচ্ছুরণের প্রভাব সম্পূর্ণ দূর করা না গেলেও অ্যাপারচার সামান্য বড় করে খানিকটা কমানো যায়।

ফ্লেয়ার (Flare)

যৌগিক লেনসের প্রতিটি পৃষ্ঠভাগে আপতিত আলোর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ সঞ্চারিত হলেও পাঁচ ভাগ প্রতিফলিত হয়ে যায়। এই প্রতিফলিত আলোর আবার প্রতিটি পৃষ্ঠভাগে শতকরা পাঁচভাগ হারে প্রতিফলিত হবে। একই আলোর এই একাধিক বিচ্ছিন্নতা ও তাদের প্রতিফলন, বিশেষ করে পাশ থেকে আসা আলোর প্রতিফলনের জন্য ছবিতে যে সামগ্রিক ধোঁয়াটে (Haze) অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে তাকে Flare বলা হয়। বিশেষ করে আলোক উৎসের মুখোমুখি ছবি তোলার সময় অনেক সময়ই লেন্‌স অ্যাপারচারের এক বা একাধিক প্রতিরূপ ফিল্‌মের ওপর পড়ে, যা 'ঘোষ্ট ইমেজ' নামেও পরিচিত। Flare প্রতিরোধের উপায় লেনস-হুড ব্যবহার করা অথবা লেনসের দৃষ্টিক্ষেত্রের বাইরের আলো যাতে লেনসের ওপর না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। এই ত্রুটি অনেক শিল্পী সুন্দরভাবে কাজে লাগান।

ফগ (Fog)

আলোক-সংবেদনশীল ফোটো ফিলমের ওপর অবাঞ্ছিত আলো গিয়ে পড়লে তার যে প্রভাব তাকেই অপটিক্যাল ফগ বলা হয়ে থাকে।

ক্ষেত্রবক্রতা (Curvature of field)

কোন বস্তুর যখন ছবি তোলা হয়, ধরা যাক একটা গাছের ছবি, তখন গাছটি লেন্‌সের সামনে উল্লম্বভাবে (vertically) থাকায় লেনসের কেন্দ্রবিন্দু থেকে গাছের মাথার দূরত্ব গাছের কাণ্ডের দূরত্ব থেকে অনেকটা বেশি থাকে বলে গাছের মাথার প্রতিচ্ছবি-দূরত্ব গাছের কাণ্ডের প্রতিচ্ছবি-দূরত্ব থেকে কম হয়। কিন্তু সমগ্র গাছটির প্রতিচ্ছবি যেহেতু একই দ্বিমাত্রিক ফিল্‌ম তলের ওপর ফেলা হয় গাছটির প্রতিচ্ছবি তাই সোজা না হয়ে বক্র হয়ে যায়। এই বক্রতা উত্তল বা অবতল দু রকমের লেন্‌সেই হয়ে থাকে, তবে একটির বক্রতা অন্যটির বিপরীত। সুতরাং একটি উত্তল লেন্‌সের সঙ্গে একটি অবতল লেন্‌স যুক্ত করে এই ত্রুটি সংশোধন করা যায়। ক্ষেত্রবক্রতার ওপর বস্তুত স্টপের আয়তনের কোন প্রভাব নেই কিন্তু আলোকের প্রবেশ পথের আয়তন ছোট করলে ফোকসের গভীরতা বৃদ্ধি পায় বলে ক্ষেত্রবক্রতার প্রভাবও কমে যায়।

বিকৃতি (Distortion)

আমরা এতক্ষণ যে ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি তাতে লক্ষ্য করেছি লেন্সের অ্যাপারচার ছোট করে কোন কোন ত্রুটির অনেকখানি সংশোধন করা যায়। আবার এও দেখা গেছে যে অ্যাপারচারের জন্যও প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপের বিকৃতি ঘটতে পারে। অ্যাপারচার ছোট বা বড় করার জন্য যে ধাতুর পাত ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ 'ষ্টপ' তা যদি লেনস ও প্রতিচ্ছবির মধ্যবর্তী কোন স্থানে বসানো হয় তাহলে একটি চারকোণা বস্তুর প্রতিচ্ছবি অনেকটা পিনকুশনের মত বিকৃত দেখাবে। আর ষ্টপ যদি লেন্সের সামনে থাকে তবে একই বস্তুর প্রতিচ্ছবি পিপের মত বিকৃত হবে। এই বিকৃতির ফলে প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণতা ক্ষুণ্ণ হয় না, শুধু আকারের (মান, অনুপাত এবং অবস্থানানুপাত —যে কোন অর্থে) পরিবর্তন ঘটে। এই ত্রুটি দুটি লেনসের (যৌগিক) মাঝে একটু ফাঁক রেখে এবং এই ফাঁকের মধ্যে ষ্টপ ব্যবহার করে সংশোধন করা যায়। অ্যাপারচারের আয়তন ছোট বা বড় করে বিকৃতির তারতম্য ঘটানো যায় না।

ক্রিটিক্যাল অ্যাপারচার (Critical aperture)

লেনসের ত্রুটিগুলি নিয়ে আলোচনায় লক্ষ্য করা যাবে যে বহু ত্রুটি যেমন গোলীয় ত্রুটি, আলোক-বর্ণালির ত্রুটি, বিষম ত্রুটি, কোমা, ক্ষেত্রবক্রতা ইত্যাদি লেন্সের অ্যাপারচার ছোট করে সংশোধন করা যায়; আবার বিচ্ছুরণের ত্রুটি অ্যাপারচার বড় করেই কমানো সম্ভব। প্রশ্ন হতে পারে কোন অ্যাপারচারে ছবি তুললে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে । নান্দনিক কারণে অ্যাপারচার বড় বা ছোট করার প্রয়োজনীয়তার কথা বাদ দিলে যে কোন লেন্সের মাঝামাঝি অ্যাপারচারই প্রযুক্তিগত (Technical) দিক থেকে সবচেয়ে ভাল ফল দেয় । প্রত্যেকটি লেন্সের এই অ্যাপারচারকে সেরা অ্যাপারচার (optimum aperture) বা Critical aperture বলা হয়ে থাকে। যেমন, একটি ১.৪ অথবা ৩.৫ লেন্সের ক্রিটিক্যাল অ্যাপারচার সাধারণত এফ/৫.৬ ও এফ/৮ হয়ে থাকে।

লেনস সম্বন্ধে আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম তাতে বেশ বোঝা যায় যে উচ্চমানের একটি লেনস তৈরি করার প্রক্রিয়া কত জটিল। একটি লেনসে শুধু যে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান কাঁচ ব্যবহার করা হয় তাই নয়, প্রতিটি একক লেন্সের নির্দিষ্ট ঘনত্ব ও বক্রতা ঠিক রাখাও বেশ কঠিন ও শ্রমসাধ্য।

বিভিন্ন ধরনের লেন্স

বর্তমানে বহু ধরনের লেনস প্রস্তুত করা হয়ে থাকে । তবে সাধারণ ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে যে লেনসগুলি কাজে লাগে সেগুলিকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। ফোকস দৈর্ঘের তারতম্য অনুসারে তা স্বাভাবিক ফোকস দৈর্ঘের, স্বল্প ফোকস দৈর্ঘের, দীর্ঘ ফোকস দৈর্ঘের এবং পরিবর্তনক্ষম ফোকস দৈর্ঘের লেন্স। এদের যথাক্রমে ১. নরমাল লেন্স ২. ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স ৩. ন্যারো অ্যাঙ্গল লেন্স ও ৪. জুম লেন্স বলা হয়ে থাকে।

নরমাল বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা স্বাভাবিক ফোকস দৈর্ঘের লেন্স

সাধারণভাবে মানুষের চোখের দৃষ্টি ৪৫° থেকে ৫৫° কৌণিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই যে লেন্সের সাহায্যে এই স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষেত্রের ছবি তোলা সম্ভব হয় তাকেই আমরা নরমাল বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড লেনস বলে থাকি। তবে লেন্সের কৌণিক ক্ষেত্রের স্বাভাবিকতা নির্ভর করে যে ক্যামেরায় ছবি তোলা হবে তার ফিল্মের পরিমাপের ওপর। সুতরাং যে কৌণিক ক্ষেত্রের লেন্স একটি ক্যামেরায় স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষেত্রের ছবি তুলতে সক্ষম তা আর একটি অন্য মাপের ক্যামেরায় স্বাভাবিক ছবি তুলত পারবে না। যে লেন্সের সাহায্যে ছবি তোলা হবে তার ফোকস দৈর্ঘ ও ফিল্মের কোনাকুনি মাপ মোটামুটি সমান হলে আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রের স্বাভাবিক ছবি পাওয়া যাবে। সুতরাং যে ক্যামেরায় ১৬ মি. মি. মাপের ছবি তোলা হয়—যাকে চলতি কথায় বলা হয়ে থাকে হাফফ্রেম—তার নরমাল লেন্স হবে ২১ মি. মি. । ৬০ মি. মি. চতুষ্কোণ ফিল্মের ক্যামেরার ক্ষেত্রে নরমাল লেনস হবে ৮৫ মি. মি.। ৩৫ মি. মি. ক্যামেরা—যার ফিল্মের মাপ ২৪ × ৩৬ মি.মি. তার নরমাল লেনস হবে ৪৩ মি. মি.। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এইসব ফোকস দৈর্ঘের সামান্য হেরফের করা হয়ে থাকে। ৬০ মি. মি. চতুষ্কোণ ক্যামেরাতে সাধারণত ৭৫ বা ৮০ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেনস ও ৩৫ মি. মি. ক্যামেরাতে ৪০ থেকে ৫৫ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেনস নরমাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নরমাল লেন্সের প্রয়োগ-ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক বলে সাধারণত ক্যামেরায় এই লেন্সটিই একমাত্র স্থায়ী লেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যদিও এই লেন্সের সাহায্যে যথেষ্ট দূরের ও খুব কাছের বস্তুর ছবি ভাল তোলা যায় না। যেমন কোন ক্লোজ-আপ প্রতিকৃতি বা উঁচু মন্দিরের চূড়োর ছবির জন্য ৩৫ মি. মি. ক্যামেরার নরমাল লেন্স অবশ্যই আদর্শ লেন্স নয়। তবে লেনসের ফোকস দৈর্ঘ কতটা বেশি বা কম হলে তা আর নরমাল বলে গণ্য হবে না—দীর্ঘ বা স্বল্প ফোকস দৈর্ঘের লেন্স বলে ধরা হবে, তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। এটা নির্ভর করে ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর। তবু আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রের পক্ষে স্বাভাবিক ছবি পাওয়া যায় বলে নরমাল লেনসই তুলনামূলকভাবে অধিকতর প্রয়োজনীয় লেনস।

ছোট ক্যামেরার ক্ষেত্রে এফ/২ এবং বড় (৪" × ৫" মাপের) ক্যামেরার ক্ষেত্রে এফ/৫.৬ পর্যন্ত শক্তিশালী লেন্স ব্যবহার করা হয়। যত ধরনের লেন্স তৈরি হয় তার মধ্যে এই শ্রেণীর লেন্সের গুণগত মান সর্বাপেক্ষা উঁচু। এফ/২ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী লেন্স এফ/১.৮, এফ/১.৪ বা এফ/০.৯৫ প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার ফলে অত্যন্ত কম আলোয় বা আপেক্ষিক অ্যাপারচার ছোট করে ছবি তোলা সম্ভব হয় । তবে এদের গুণগত মান অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া এই উচ্চশক্তিবিশিষ্ট লেন্সগুলি আকারে বড়, ওজনে ভারী ও দামেও অধিক।

ফোটোগ্রাফারের হাতে থাকে ক্যামেরা, ক্যামেরায় বসানো থাকে লেন্স। লেনসের ক্ষমতা অনুসারে তো ফোটোগ্রাফার নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না (পিটার পোলক-এর

ভাষায় 'the machine could not refuse to obey the will of its master')। তাই নরমাল লেনস যখন আর তাঁর প্রয়োজন মেটাতে বা উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না, তখন তিনি তাঁর ক্যামেরার লেনস পালটে নেন।

ওয়াইড অ্যাঙ্গল বা স্বল্প ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌স

স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষেত্রের চেয়ে বেশি কৌণিক ক্ষেত্র যে লেন্‌সের সাহায্যে ধরা পড়ে তাকে ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌স বলে। অর্থাৎ এর কৌণিক ক্ষেত্র নরমাল লেন্‌সের থেকে বেশি। ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌সের কৌণিক ক্ষেত্র যত বেশি হবে এই লেন্‌সের কাঁচ তত পুরু ও গোলাকার হবে। ফলে আলোকরশ্মি অধিকতর প্রতিসরিত হয়ে লেন্‌সের খুব কাছেই অক্ষরেখা স্পর্শ করবে। সেজন্য একে স্বল্প ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌সও বলা হয়।

ঠিক কতটা ফোকস দৈর্ঘ বা কৌণিক ক্ষেত্র থেকে কোন লেন্‌সকে ওয়াইড অ্যাঙ্গল বলা হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবু নিশ্চিতভাবে বলা যায় ফিলম ফ্রেমের যে দিকটা ছোট তার সমান বা তার থেকে কম ফোকস-দৈর্ঘের লেন্‌সকে ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌স বলে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ ৩৫ মি. মি. (২৪×৩৬ মি. মি. মাপের) ক্যামেরায় ২৪ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেনস থেকে অবশ্যই ওয়াইড ধরা যেতে পারে। যদিও অনেকের কাছেই ২৪ মি.মি. লেনস অতিরিক্ত ওয়াইড বলে মনে হয়।

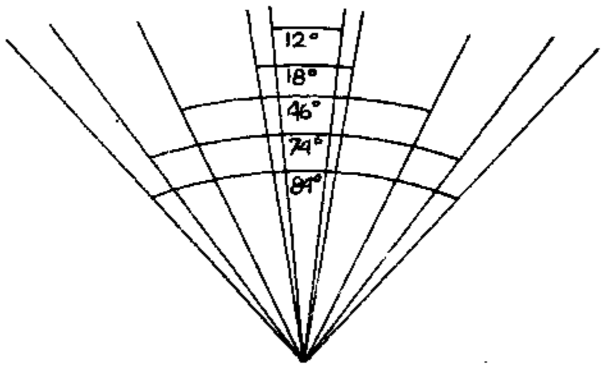
ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনসের ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতা খুব বেশি হয়। একেবারে ক্লোজ-আপ ছাড়া ক্যামেরার মোটামুটি বেশ কাছ থেকে সমস্ত ক্ষেত্রই ফোকসের মধ্যে থাকে। এর প্রধান কাজ হল বৃহত্তর ক্ষেত্রের দৃশ্যকে সংহত করে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে ধরা। নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থেকে ছবি তুলতে বাধ্য হলে বস্তু বা দৃশ্যের সমগ্র প্রতিচ্ছবিটি এই লেন্‌সের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে। দৃশ্যের যতখানি একসঙ্গে দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, সেই ৬০° থেকে ১৮০° কৌণিক ক্ষেত্রের ছবি আমরা এই লেনসের সাহায্যে দেখতে পাই।

নরমাল লেন্‌সে গঠিত প্রতিচ্ছবির ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে আনুপাতিক আয়তন হয় মানুষের স্বাভাবিক চোখ সাধারণ বস্তুকে যে রকম ভাবে দেখে সেই রকম। ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌সে দৃষ্টিক্ষেত্রের প্রসারতা অনেক বেড়ে যায় কিন্তু ফ্রেমের অন্তর্গত দৃশ্যবস্তুসমূহকে তুলনামূলকভাবে আনুপাতিক আকারে ছোট বা অসম দেখায়। অর্থাৎ বিবর্ধনের মান এখানে একের কম। লেনসের এই পদ্ধতি গ্যালিলিও-র টেলেস্কোপ কনভারটর পদ্ধতির বিপরীত। ১৮, ২৪ ও ২৮ মি. মি. লেন্‌সকে সাধারণত ওয়াইড বলে ধরা হয়।

বৃহত্তর কৌণিক ক্ষেত্রের ছবি পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই লেন্‌স তৈরি করা হয় বলে এর ত্রুটিও বেশ প্রকট। এর বিস্তৃত ক্ষেত্রের সমস্ত স্থানেই আলোকরশ্মি সমানভাবে পড়ে না এবং প্রতিচ্ছবির বিকৃতিও বেশ স্পষ্ট। তা ছাড়া বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে আকার, মাপ ও দূরত্বের সম্বন্ধ ও অনুপাতও অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অনুভূমিক রেখা ও উল্লম্ব রেখা বাঁকা দেখায়। চরম ওয়াইড অ্যাঙ্গল—যার কৌণিক ক্ষেত্র ১৮০°—চলতি কথায় যাকে 'ফিস আই' লেন্‌স বলে তার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে যে বৃহৎ

ক্ষেত্রের ছবি পাওয়া যায় তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও উদ্ভট দেখায়। লেন্‌সের এই সব নানান ত্রুটি—অনুপাতের সামঞ্জস্যহীনতা, প্রতিচ্ছবির অস্বাভাবিক বিকৃতি প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত সৃজনশীল শিল্পীরা এই ত্রুটিগুলিকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবাতীত বা বক্তব্য-গভীর শিল্পমণ্ডিত ছবি সৃষ্টি করতে পারেন। আবার অমোঘ প্রয়োগের বদলে অনেকের হাতে তা গিমিক বা প্রদর্শনপ্রিয়তাও হয়ে ওঠে।

যাই হোক, বর্তমানে ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌সের ব্যবহার যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং এমন বহু ফোটোগ্রাফার আছেন যাঁরা অনতিরিক্ত ওয়াইড অ্যাঙ্গলকে তাঁদের স্বাভাবিক লেন্‌স হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। দুই থেকে দুশো ফুট দূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি থেকে স্পষ্ট ফোকস উৎপাদনক্ষম ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃতি বা অসমতা সৃষ্টিক্ষম যে চূড়ান্ত



বিভিন্ন লেন্‌সের কৌণিক ক্ষেত্র : ন্যারো, নরম্যাল ও ওয়াইড

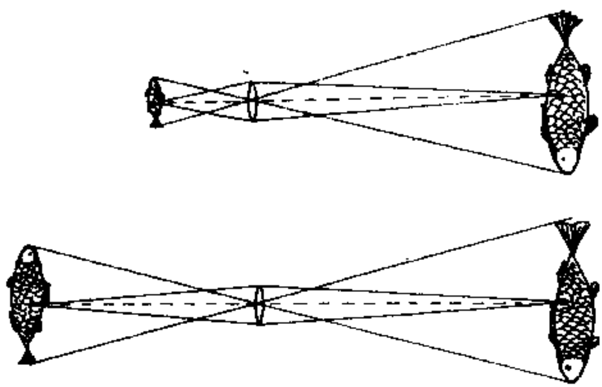
পদ্ধতির ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌সের দ্বারা সম্ভব, বিজ্ঞাপন, প্রযুক্তি ও চলচ্চিত্রে তার ফল বিস্ময়কর। চলচ্চিত্রে এই লেন্‌সের ব্যবহার, নাটকীয় সংঘাত তৈরির জন্য এক ফ্রেম থেকে কেটে অন্য ফ্রেমের উপাদানে যাবার প্রচলিত পদ্ধতির বদলে, ফ্রেমের দৃশ্যপরিধি বাড়িয়ে একই ফ্রেমের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানকে সংহত করতে পেরেছিল।

ন্যারো অ্যাঙ্গল বা দীর্ঘ ফোকস দৈর্ঘ্যের লেন্‌স

স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষেত্রের যতটা অংশ আমাদের চোখে পড়ে তার থেকে কম অংশের প্রতিচ্ছবি এই লেন্‌সের সাহায্যে পাওয়া যায়। এই লেন্‌সের কৌণিক ক্ষেত্র সাধারণ কৌণিক ক্ষেত্র অপেক্ষা ছোট হয় এবং প্রতিচ্ছবি-দূরত্ব বেশি হয় বলে একে ন্যারো অ্যাঙ্গল বা দীর্ঘ ফোকস দৈর্ঘ্যের লেন্‌স বলে। এর সাহায্যে বস্তুর প্রতিচ্ছবি অপেক্ষাকৃত বড় আকারে পাওয়া যায়। ফিল্‌ম ফ্রেমের দৈর্ঘ্যের ৩ গুণ ফোকস দৈর্ঘ্যের লেন্‌সকে দীর্ঘ ফোকস দৈর্ঘ্যের লেন্‌স বলা যেতে পারে। ৩৫মি. মি. (২৪ × ৩৬ মি. মি. মাপের)

ক্যামেরায় ৩৬ × ৩ =১০৮ মি. মি. ফোকস_দৈর্ঘ্যের লেন্স ন্যারো অ্যাঙ্গল লেন্স। ১০০, ১৫০ ও তারও অধিক (এমনকি ১০০০ মি. মি. পর্যন্ত) লেন্স এর অন্তর্ভুক্ত।

দূরের বস্তুর ছবি কাছে আনাই এর প্রধান কাজ। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বস্তুর খুব কাছে যাওয়া যায় না বা কাছে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয় সে সব ক্ষেত্রের বস্তুকে সহজেই এর সাহায্যে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। এই লেন্সের দৃশ্যক্ষেত্রের গভীরতা খুব সীমিত। ফলে ঠিক যে বস্তুটির ছবি চাই তাকে ফোকসের মধ্যে ধরলে অবাঞ্ছিত পুরোভূমি ঝাপসা হয়ে বস্তুটিকে যেন আলাদাভাবে ও বড় করে আমাদের কাছে এনে দেয়। অর্থাৎ বিবর্ধনের



মান এখানে একের বেশি। ন্যারো অ্যাঙ্গল লেন্স এইভাবে ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্সের ঠিক বিপরীত।

ওয়াইড অ্যাঙ্গলে বস্তুর অবস্থানানুপাতের যে তারতম্য ঘটে, ন্যারো অ্যাঙ্গলেও একই ভাবে ঠিক তার বিপরীত তারতম্য ঘটে থাকে । ওয়াইড অ্যাঙ্গল বস্তুর মধ্যে গভীরতা আনে, ন্যারো অ্যাঙ্গলে বস্তুর মধ্যে নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায়। এই দু'ধরনের লেন্সেই যেহেতু স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না তাই উভয় লেন্সের ছবিতেই বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ওয়াইড অ্যাঙ্গলের বিকৃতির কথা প্রায়ই শোনা যায় অথচ ন্যারো অ্যাঙ্গলের বিকৃতির কথা তেমন শোনা যায় না। টিভি বা পত্রপত্রিকাতে যখন খেলাধূলার ছবি বা বন্যপ্রাণীদের দৃশ্য দেখি তখন এই বিকৃতি বেশ ভাল ভাবেই চোখে পড়ে।

বিশেষ ধরনের ন্যারো অ্যাঙ্গল লেন্সকে—যার দূরকে নিকট করার ক্ষমতা আরও বেশি—তাকে টেলিফোটো লেন্স বলে। সুদূর ১৮৫১ সন থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ প্রতিচ্ছবি বর্ধিত করার কাজে যে অবতল লেন্স ব্যবহার করছিলেন, সেই পদ্ধতিকে সাধারণ ফোটোগ্রাফিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে, এই ধারণা থেকেই টেলিফোটো লেন্সের উদ্ভব। এই লেন্সের এক প্রান্তে কতকগুলি অবতল লেন্স পরপর এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে ফোকস দৈর্ঘ অনুসারে প্রতিচ্ছবি যতটা

দূরত্বে রাখা দরকার ততটা দূরত্বে রাখতে হয় না। ফলে সমগ্র লেন্সটিকে লম্বায় অনেকটা ছোট করা সম্ভব হয়। এবং তার জন্য প্রতিচ্ছবির আকারের কোন তারতম্য হয় না। সাধারণত ৩০০ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেন্স যার কৌণিক ক্ষেত্র ৮° বা আরও কিছু কম তা এইভাবে প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া ৫০০ মি. মি. বা তার চেয়েও বেশি মাপের লেন্সের মধ্যে ফোল্ডিং আয়না ব্যবহার করে লেন্সকে ছোট রাখা হয়। এর নাম 'ক্যাটাডাইঅপট্রিক লেন্স'। এই সব লেন্সের সাহায্যে যখন খুব দূরের বস্তুর ছবি তোলা হয় তখন বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত আলোকরশ্মিকে লেন্সে এসে পৌঁছবার আগে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হয়। ওই পথে আপাত অদৃশ্য বস্তুকণা—ধুলো, জলীয় বাষ্প প্রভৃতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের সরলরৈখিক গতিপথ ব্যাহত হয় ও ডিফ্র্যাক্শনের দরুন প্রতিচ্ছবিতে টোনের বৈপরীত্যের ও সূক্ষ্ম ডিটেলে তীক্ষ্ণতার অভাব ঘটে। ওয়াইড অ্যাঙ্গলের ক্ষেত্রে যেমন ১৮০° লেন্স আছে বিপরীত ভাবে তেমনি এই ক্ষেত্রে ২০০০ মি. মি. ক্যাটাডাইঅপট্রিক লেন্সও আছে যার কৌণিক ক্ষেত্র মাত্র ১°। এই লেন্সের ক্ষেত্র-গভীরতা অত্যন্ত কম এবং এদের ডায়াফ্রাম থাকে না। একমাত্র শাটারস্পীড বা ফিল্টার ব্যবহার করেই এদের এক্সপোজার নিয়ন্ত্রিত করা হয়। যদিও টেলিফোটো হল অতিরিক্ত ন্যারো অ্যাঙ্গল লেন্স, বর্তমানে সমস্ত ন্যারো অ্যাঙ্গলকেই এই নামে অভিহিত করার প্রবণতা দেখা যায়। ওয়াইড বা টেলিফোটো লেন্সের শক্তি বা গুণগত মান নরমাল লেন্সের তুলনায় কিছু কম।

জুম (Zoom) বা পরিবর্তনক্ষম ফোকস দৈর্ঘের লেন্স

আমরা যে তিন ধরনের লেনসের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম জুম লেন্সে সেই তিন প্রকার লেনসের সুযোগ সুবিধাই কিছু কিছু করে সমন্বিত হয়েছে। এই লেন্স প্রতিচ্ছবিকে ধারাবাহিক ভাবে ফোকসে রেখে নিজের ফোকস দৈর্ঘের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কোন যৌগিক লেনসের ক্ষেত্রে তার ফোকস দৈর্ঘের সূত্র হল: $F=\dfrac{f_1 f_2}{f_1+f_2-S}$, যখন F= যৌগিক লেন্সটির ফোকস দৈর্ঘ, f_1 ও f_2 যথাক্রমে কম্পোনেন্ট লেনস দুটির ফোকস দৈর্ঘ এবং S তাদের মধ্যকার ব্যবধান। সুতরাং যদি এই মধ্যকার ব্যবধান ধারাবাহিক ভাবে পরিবর্তিত করা যায় তাহলে সংযুক্ত লেনসটির ফোকস দৈর্ঘও ক্রম পরিবর্তিত হবে। লেন্সের জুম প্রক্রিয়ায় কটি কম্পোনেন্ট রয়েছে তার ওপর নির্ভর করে বস্তু বা ক্যামেরাকে স্থানান্তরিত না করে ফোকস দৈর্ঘের কতটা পরিবর্তন সম্ভব।

ফোটোগ্রাফিতে লেন্সের ক্ষেত্রে জুম লেন্স সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংযোজন। চল্লিশ দশকের শেষভাগে লেন্স-কোটিং কৌশলের ব্যাপক উন্নতি ঘটতে জুম লেন্সের দ্রুত অগ্রগতি হল। আগেই বলেছি এই লেন্সের কোন নির্দিষ্ট ফোকস দৈর্ঘ নেই, তা ইচ্ছামত বাড়ানো বা কমানো যায়। অধিকাংশ জুম লেন্সের সর্বাধিক ফোকস দৈর্ঘ সাধারণত সর্বনিম্ন ফোকস দৈর্ঘের দুই থেকে তিন গুণের মধ্যে হয়ে থাকে। বর্তমানে

জুম লেন্স পাওয়া যায় ওয়াইড অ্যাঙ্গল, মিডিয়াম ও ন্যারো অ্যাঙ্গল অংশ বরাবর।

জুমকে বলা যেতে পারে অলস ব্যক্তির লেন্স। একটি মাত্র লেন্সের সাহায্যে অবস্থানের কোন পরিবর্তন না করে বস্তুর ক্লোজ-আপ থেকে লং শট পর্যন্ত যে কোন ছবি চটপট তোলা যায়। লেন্স পালটাতে হয় না। সময়, অর্থ ও পরিশ্রম সমস্ত বাঁচে। ফ্রেমিংয়ের এত সুবিধা আর কোন লেন্সের সাহায্যেই পাওয়া সম্ভব নয়। সাদা-কালো ছবির ক্ষেত্রে ততটা না হলেও রঙীন ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে জুমের ব্যবহার অবশ্যই শিল্পগত ভাবেও ফলপ্রদ।

ব্যবহারিক অসুবিধার মধ্যে এই লেন্স এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র ৩৫ মি. মি. ক্যামেরার জন্যই পাওয়া যায় এবং তা তুলনামূলকভাবে আকারে বড় ও ওজনে ভারী। তাছাড়া এর গুণগত মানও অপেক্ষাকৃত নিচু। লেন্সের সমস্ত প্রধান ত্রুটিও জুম লেন্সে দেখা যায়, উপরন্তু ত্রুটির হার হয় আরও বেশি। জটিল গঠন প্রক্রিয়ার জন্য এই ত্রুটি সংশোধন করাও খুব কঠিন। সবচেয়ে ব্যাপক ত্রুটি হল বিকৃতি—ওয়াইড অ্যাঙ্গল প্রান্ত বরাবর ব্যারেল বিকৃতি থেকে ন্যারো অ্যাঙ্গল প্রান্ত বরাবর পিনকুশন বিকৃতি পর্যন্ত। তবে দিন দিন এর আরও উন্নতি হচ্ছে, ও আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই লেন্সই প্রধান লেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

এছাড়া আরও কয়েক ধরনের লেনস বিশেষ কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

ম্যাক্রো (Macro) লেন্স

খুব কাছের বস্তুর ছবি তোলার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আনুষঙ্গিক ত্রুটি যথাসম্ভব কমিয়ে এই লেন্স গঠন করা হয়। ফলে এর দ্বারা দূরের ছবি তোলা গেলেও তার স্পষ্টতা সাধারণ লেন্সের মত হয় না। যদিও ম্যাক্রো কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল বস্তুর বাস্তব আকারের চেয়ে বৃহদাকার ফিল্ম-প্রতিচ্ছবি তবু অধিকাংশ তথাকথিত ম্যাক্রো লেন্স বস্তুর যে প্রতিচ্ছবি গঠন করে তার আকার বস্তুর বাস্তব আকারের মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ।

অতিবেগনি লেন্স (U. V. Lens)

বৈজ্ঞানিক বা প্রাযুক্তিক ফোটোগ্রাফির জন্য, বিশেষ করে যেখানে অতিবেগনি রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলতে হয়, সেখানে ঐ রশ্মি যাতে ছবির কোন ক্ষতি না করতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই লেন্স তৈরি করা হয়।

সফট ফোকস (Soft focus) লেন্স

এই লেন্সের গোলীয় ত্রুটি সংশোধন করা হয় না। ফলে ছবির মধ্যভাগ তার চারপাশ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট দেখায় এবং ছবিতে টোনের বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য বেশ কম হয়। মধ্যভাগের স্পষ্টতা যেন চারপাশের অস্পষ্টতা দিয়ে ঘেরা—সেজন্য অনেকে এই লেন্সের সাহায্যে প্রতিকৃতি তোলা পছন্দ করেন। এই প্রতিকৃতির একটা অন্য আবেদন

আছে। তাছাড়া চরম বৈপরীত্যকেও এর সাহায্যে কমনীয় করে আনা যায়। বিগত যুগের পেজভাল লেন্‌স এই কারণেই জনপ্রিয় ছিল।

আণ্ডার-ওয়াটার লেন্‌স

জলের তলায় ছবি তোলার জন্য যে লেন্‌স প্রস্তুত করা হয় তার সম্মুখ ভাগ জলের সংস্পর্শে এলেই তার দ্বারা স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায। এর ক্যামেরাও বিশেষভাবে প্রস্তুত করতে হয়।

এরিয়েল (Aerial) ফোটোগ্রাফির লেন্‌স

আকাশ থেকে ছবি তোলার জন্য যে লেন্‌স লাগে তার সাহায্যে কেবল অসীম দূরত্বের বস্তুর ছবিই সঠিকভাবে পাওয়া যায়। ক্লোজ, মিড, এমনকি সাধারণ লং শটও এতে ভাল আসে না। এরিয়েল ফোটোগ্রাফির লেনস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লাল ফিল্‌টার সহযোগে ব্যবহার করতে হয়। যেজন্য রঙীন ছবির ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। তাছাড়া এই লেন্‌স অত্যন্ত ভারী।

কোন যান্ত্রিক মাধ্যমে যে সব জিনিষ নিয়ে কাজ করতে হয় প্রযুক্তি তা হাতে তুলে দেয়, তাদের কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা বলে দেয় টেকনিক বা কলাকৌশল, আর কী কাজে লাগাতে হয় সেটা শৈল্পিক, নান্দনিক ও সমাজবোধের অন্তর্গত। অর্থাৎ প্রযুক্তি থেকে কলাকৌশল থেকে নন্দন। লেন্‌স তৈরির প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের চেষ্টা ছিল কিভাবে লেনসের সাহায্যে পরিষ্কার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়—তখন বস্তুর ছবি বিশ্বাসযোগ্য ভাবে পাওয়া গেলেই তার উদ্দেশ্য সফল হত। কিন্তু এরপর মানুষের চেষ্টা হ'ল কিভাবে ছবির মধ্যে তার অনুভবের প্রতিফলন ঘটানো যায়। বস্তুত যে কোন লেন্‌সের ব্যবহার ক্রমবিকাশের তিনটে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে—১. যখন তা ছিল নিতান্ত এক কারিগরি কৌশল ২. যখন তার ব্যবহারে এসেছে বিশেষ বিশেষ ভাব বা প্রভাব ও ৩. যখন তা ফোটোগ্রাফির ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়ে অনেকটা বিমূর্ত চরিত্র পেয়ে গেছে

ক্যামেরা

'It's hard to tell where you leave off and the camera begins.'

—ক্যামেরা সম্পর্কে বিজ্ঞাপন

আজ আমরা যে অর্থে 'ক্যামেরা' কথাটি ব্যবহার করি সেই ক্যামেরার জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন আলোক-সংবেদনশীল প্লেটের ওপর আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে প্রথম বস্তুর প্রতিচ্ছবি তোলা হয়। তারপর থেকে বহু বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক গবেষণার মধ্য দিয়ে আজকের উন্নত ক্যামেরা আমাদের হাতে এসেছে। ক্যামেরার এই বিবর্তনের ইতিহাসে নানাজনের নানা প্রচেষ্টার মধ্যেও জর্জ ইষ্টম্যানের ভূমিকার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কারণ তাঁর তৈরি 'রোল ফিলম ক্যামেরা'র মাধ্যমে ফোটোগ্রাফি প্রথম সাধারণ মানুষের নাগালে আসে। বর্তমানে যে বিভিন্ন আকার, পরিমাপ ও ধরনের ক্যামেরা দেখা যায় তাদের যত বৈচিত্র্যই থাক না কেন মূলগতভাবে প্রতিটি ক্যামেরাই হল একটি আলোক প্রতিরোধী বাক্স, যাতে থাকবে লেনস আর কয়েকটি যন্ত্রাংশ ও ফিলম রাখার ব্যবস্থা এবং প্রতিটি ক্যামেরারই মূল কাজ হল লেন্সের সাহায্যে আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে ফিলমের ওপর ফেলে প্রতিচ্ছবি গঠন করা। তাহলে এত বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরার প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

ক্যামেরার বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে তাকালে এ প্রশ্নের উত্তর মেলে। আদি ক্যামেরা ছিল কাঠের বাক্সের মত করে গড়া, সম্মুখভাগে একটা মাত্র সরল লেন্স, ভেতরে আলোক-সংবেদনশীল কাঁচের প্লেট, কিন্তু শাটারের কোন ব্যবস্থা নেই। কিছুদিন পর লেন্সের মুখকে ঢাকা দেওয়া ও উন্মুক্ত করার জন্য যান্ত্রিক শাটার, তারপর লেন্সের মানের উন্নতি হতে ক্যামেরায় বিভিন্ন দ্রুতি-বিশিষ্ট শাটার ও লেন্সের বিভিন্ন অ্যাপারচারের ব্যবস্থা। বেশ কম আলোতে মোটামুটি গতিশীল বস্তুর ছবি এর সাহায্যে ভাল ভাবে তোলা গেল এবং ক্রমশঃ ফোকসকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য লেন্সকে এগোনো বা পেছানোর ব্যবস্থাও করা হল। রোল ফিল্মের প্রবর্তনের ফলে ক্যামেরা আকারে ছোট ও ওজনে হালকাও হল। তারপর ১৯২৫-য়ে প্রথম ৩৫ মি. মি. ক্যামেরা, লাইকা, বাজারে আসে।

বিভিন্ন দ্রুতি-বিশিষ্ট শাটার, লেন্সের বিভিন্ন অ্যাপারচার ছাড়াও এতে একটা রেঞ্জফাইণ্ডারের ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল পরিবর্তনক্ষম লেন্স ব্যবস্থা, এই ক্যামেরা থেকে নরমাল লেন্স সরিয়ে সেখানে ওয়াইড অ্যাঙ্গল বা টেলিফোটো লেন্স বসানো যেত। এর ফলে ফোটোগ্রাফির বৈচিত্র্য ও স্থিতিস্থাপকতা বহুগুণ বেড়ে যায়। এই ধরনের ক্যামেরায় অসুবিধা ছিল এই যে, রেঞ্জফাইণ্ডার সমস্ত ধরনের লেন্সের ক্ষেত্রে সমান ভাবে কাজ করত না এবং ভিউফাইণ্ডারে যা দেখা যেত তা লেন্স যা দেখত তা থেকে একটু আলাদা। সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরার (SLR) প্রবর্তন হতে এই দুটি সমস্যারও সমাধান হল । ক্রমে, কতটা আলো গিয়ে ফিল্মে পৌঁছবে তা পরিমাপ করার জন্য ক্যামেরার মধ্যেই এক্সপোজার মিটার বসানোর ব্যবস্থা করা গেল । আধুনিক SLR-য়ে ফোটোগ্রাফারকে লেন্সের অ্যাপারচার ও শাটারের দ্রুতির যে কোন একটা বেছে নিলেই চলে, অন্যটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্বাচিত হয়ে যায়। এরপর পোলারয়েড ক্যামেরার আবিষ্কার হতে তাৎক্ষণিক ফোটোগ্রাফির প্রচলন হল। প্রথমে সাদা-কালো ও কিছুদিন পর রঙীন ছবি। ছবি তোলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা নিজেই পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ সম্পূর্ণ করে ছবি উপহার দেয়। সুতরাং ক্যামেরার এত বিভিন্ন ধরন, কারণ ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন চাহিদা এবং এক একটি ক্যামেরায় এক এক রকম সুবিধা ও অসুবিধা।

একজন ব্যবহারকারী ক্যামেরার কাছ থেকে কী চান ও ক্যামেরা তাকে কতটা দিতে পারে তা জানতে হলে ক্যামেরার অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। ক্যামেরা যন্ত্রের পাঁচটি মূল অংশ হল : ১. প্রতিচ্ছবি গঠনের জন্য একটি ছিদ্র বা লেনস ২. এক্সপোজারকে সময়গত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শাটার ৩. লেন্সের নির্বাচিত অংশের ভেতর দিয়ে ছাড়া আর কোনভাবে আলো যাতে ফিলমের ওপর গিয়ে পড়তে না পারে তার ব্যবস্থা বা ডায়াফ্রাম ৪. ভিউফাইণ্ডার যার সাহায্যে বোঝা যায় ছবিতে দৃশ্যবস্তু কতটা ও কীভাবে ধরা পড়বে ৫. ফিলম ধরে রাখার ব্যবস্থা বা হোল্ডার। ক্যামেরা যন্ত্রটির প্রধান কাজ হল দুটি—১. নির্দিষ্ট দৃশ্যবস্তুকে ক্যামেরার মধ্যে ফোকস বিন্দুতে এনে ধরা ২. সেই বস্তুর প্রতিচ্ছবি তুলে নেওয়ার জন্য সঠিক জায়গায় ফিলমকে প্রস্তুত রাখা।

শাটার (Shutter)

শাটারের বাংলা প্রতিশব্দ ঝিল্লী। জানলার ঝিল্লী খুলে আমরা যেমন ঘরের মধ্যে আলো ঢোকাতে ও বন্ধ করে আলো ঠেকাতে পারি, ক্যামেরাতে শাটারের কাজও ঠিক সেই রকম। শাটার হল সাধারণত একটা পাতলা অর্ধবৃত্তাকার চাক্‌তি যা নিজের কেন্দ্রীয় অক্ষের ওপর ঘূর্ণনক্ষম । তা এমন একটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় যার ফলে শাটার টিপলে তা নিজের স্থান থকে ঘুরে সরে গিয়ে দৃশ্যবস্তু থেকে আগত আলোকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিল্মের ওপর পড়তে দেয় ও তারপর স্বয়ংক্রিয় ভাবে আবার পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যায়। ফিল্মের ওপর মোট আলোকপাত হল অলোকপাতের

সময় (শাটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) ও আলোকপাতের পরিমাণের (অ্যাপারচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) গুণফল। ক্যামেরাতে যে রিং বা নব ঘুরিয়ে শাটার নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার ওপরের সংখ্যাগুলি শাটারটি খোলা থাকার নির্দিষ্ট সময় নির্দেশ করে। সংখ্যাগুলি সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ হিসাবে ধরা হয়। যেমন ১ লেখা থাকলে পুরো এক সেকেণ্ড সময়, ২, ৪, ৮, ১৫, ৩০, ৬০ প্রভৃতি থাকলে যথাক্রমে ১/২, ১/৪, ১/৮ সেকেণ্ড ইত্যাদি। ক্যামেরা ও শাটারের তারতম্য অনুসারে এই দ্রুতি ২০০০ (অর্থাৎ ১সেকেণ্ডের দু হাজার ভাগের এক ভাগ) পর্যন্ত হতে পারে। এই সংখ্যাগুলি এমন ভাবে সাজানো থাকে যাতে প্রত্যেকটি সংখ্যার আলোকপাতের সময় পূর্ববর্তী সংখ্যার আলোকপাতের সময়ের অর্ধেক বোঝাবে। বর্তমানে ইলেক্‌ট্রনিক শাটারের প্রবর্তনের ফলে যে কোন সময়ের জন্য শাটার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা যায়, যেমন ইচ্ছে, ও দরকার হলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ১/৪২ সেকেণ্ডের জন্যও শাটার খোলা রাখা যাবে, ১/৩০ বা ১/৬০ সেকেণ্ডের যে কোন একটাকে বাধ্য হয়ে বেছে নিতে হবে না।

আধুনিক ক্যামেরাতে প্রধানত দু ধরনের শাটার ব্যবহার করা হয়। 'বিটউইন দ্য লেন্‌স' শাটার ও 'ফোকল প্লেন' শাটার। প্রথমোক্ত শাটার দুটি লেনসের মাঝখানে (যৌগিক লেন্‌স) বসানো হয় বলে তার ওই নাম। আলোকবিজ্ঞানের দিক থেকে শাটারের এই অবস্থানকে নির্ভুল বলা হয়। তবে ছবি তোলার সময় প্রয়োজনমত লেন্‌স বদলাবার খাতিরে অনেক ক্ষেত্রে এই শাটারকে লেন্‌সের পিছনেও বসানো হয়ে থাকে। এই শাটারের গতি ১/৫০০ সেকেণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই শাটার খোলার সময়ে মধ্যাংশ থেকে খুলতে শুরু করে সম্পূর্ণ খুলে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ে খোলা থাকার পর আবার যখন বন্ধ হতে থাকে তখন স্বভাবতই মধ্যাংশটুকু সবশেষে বন্ধ হয়। ফলে ফিল্‌মের মধ্যাংশ অন্য অংশের তুলনায় অধিক সময়ের জন্য আলোকিত হয়। আলোকপাতের এই তারতম্য সাধারণত ১/৫০০ সেকেণ্ড সময়সীমা পর্যন্ত ধরা পড়ে না । কিন্তু অধিকতর গতিসম্পন্ন শাটারে এই তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয়।

ফোকল প্লেন শাটার ক্যামেরার ফোকস তলের, অর্থাৎ ফিল্‌মের ঠিক সামনে বসানো থাকে বলে এই নামে অভিহিত। এই ধরনের শাটারে পরপর দুটি পর্দা থাকে। উভয় পর্দাই ফিল্‌মের সম্মুখ দিয়ে দ্রুতগতিতে চলে যায়। প্রথম পর্দা যাত্রা শুরু করার নির্দিষ্ট সময় পর দ্বিতীয় পর্দার যাত্রা শুরু হয়। ১/৬০ সেকেণ্ড সময় পর্যন্ত শাটার দ্রুতির ক্ষেত্রে প্রথম পর্দা ফিল্‌মটি সম্পূর্ণ পেরিয়ে যাবার পর দ্বিতীয় পর্দাটি যেতে শুরু করে এবং মধ্যবর্তী উন্মেষের সময়টুকুতে ফিল্‌মের ওপর আলোকপাত ঘটে। কিন্তু অধিকতর দ্রুতগতি সম্পন্ন শাটারের ক্ষেত্রে প্রথম পর্দা ফিল্‌মটিকে সম্পূর্ণ পেরিয়ে যাবার আগেই দ্বিতীয় পর্দার যাত্রা শুরু হয়, ফলে সমস্ত ফিল্‌মটিতে আংশিকভাবে ও ক্রমান্বয়ে আলোকপাত হয়। এই শাটারের গতি ১/২০০০ সেকেণ্ড পর্যন্ত হতে পারে এবং ছবি তোলার সময়ে ক্যামেরার লেন্‌স পালটাবারও কোন অসুবিধা এতে হয় না। তবে সমস্ত ফিল্‌মটিতে একসঙ্গে আলোকপাত না করে ক্রমশঃ আংশিকভাবে আলোকপাত করে বলে এই

শাটারের সাহায্যে ১/৬০ সেকেণ্ডের বেশি গতিতে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা যায় না। তবে আজকাল এর নকসার কিছু অদল-বদল করে ১/২৫০ সেকেণ্ড পর্যন্ত সময়সীমার শাটারে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।

ডায়াফ্রাম (Diaphragm)

একই আলোকাবস্থায় একই ভাবে ছবি তুললে ছবিতে টোনের ফলাফল প্রায় একই হবে। কিন্তু বিভিন্ন আলোকাবস্থায় ছবি তুলেও ছবিতে টোনের ফলাফল প্রায় একই রকম করা যায় যদি ছবি তোলা হয় বিভিন্ন ভাবে। প্রতিচ্ছবির ঔজ্জ্বল্য ও টোনের তারতম্য নির্ভর করে আলোকপাতের ওপর। আলোকপাতকে নিয়ন্ত্রিত করে একদিকে শাটারের দ্রুতি, অন্য দিকে লেন্সের উন্মেষ। আর এই দুটি পরস্পরের সঙ্গে অনেকটা বিপ্রতীপ সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। অর্থাৎ বৃহৎ অ্যাপারচার ও দ্রুত শাটার গতির যে সংযুক্ত ফল, ক্ষুদ্র অ্যাপারচার ও মন্থর শাটার গতির সংযুক্ত ফল তার অনুরূপ। শাটারের ক্ষেত্রে, আগেই বলেছি, আলোকপাতের প্রতিটি সময় পূর্ববর্তী সময়ের অর্ধেক। অ্যাপারচারের ক্ষেত্রেও তার প্রতিটি মান পূর্ববর্তী মানের অর্ধেক। ফলে শাটার দ্রুতি অনুসারে $\frac{১}{১০০০} > \frac{১}{৫০০} > \frac{১}{২৫০} > \frac{১}{১২৫} > \frac{১}{৬০}$ ইত্যাদি আর আপারচারের মান অনুসারে $\frac{f}{১.৪} > \frac{f}{২} > \frac{f}{২.৮} > \frac{f}{৪} > \frac{f}{৫.৬} > \frac{f}{৮}$ ইত্যাদি (লেন্স দ্রষ্টব্য) সুতরাং পূর্বোক্ত সূত্র অনুসারে $\frac{১}{৬০}$ শাটার দ্রুতি ও $\frac{f}{৮}$ ষ্টপের যে মোট ফল $\frac{১}{১২৫}$ শাটার দ্রুতি ও $\frac{f}{৫.৬}$ ষ্টপের সেই ফল বা $\frac{১}{২৫০}$ শাটার দ্রুতি ও $\frac{f}{৪}$ ষ্টপের বা $\frac{১}{৫০০}$ ও $\frac{f}{২.৮}$ -এর একই ফল (আলোকপাতের বিচারে)।

লেন্সের অ্যাপারচারকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় একগুচ্ছ ব্লেডের দ্বারা যা ধাপে ধাপে ভেতর দিকে সরে যেতে পারে। এই ব্যবস্থারই নাম ডায়াফ্রাম। আমাদের চোখের রঙীন অংশটুকুও এক ধরনের ডায়াফ্রাম যা কাজ করে মনোপদার্থবিদ্যক প্রক্রিয়ায়। ক্যামেরার ডায়াফ্রাম এক ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যে রিং ঘুরিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার গায়ে ১.৪, ২, ২.৮, ৪, ৫.৬, ৮, ১১, ১৬ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি লেখা থাকে। অ্যাপারচার যত ছোট করা হয় (যাকে চলতি কথায় ষ্টপ ডাউন বলে) ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতাও তত বেড়ে যায় (দ্র. ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতা)।

ভিউফাইণ্ডার (Viewfinder)

বস্তু বা দৃশ্যের যেটুকু প্রতিচ্ছবি ফিল্মের ওপর পড়বে তা আমরা ভিউফাইণ্ডারের সাহায্যে দেখতে পাই। এবং ভিউফাইণ্ডারে চোখ রেখে ক্যামেরার অবস্থানের হেরফের ঘটিয়ে বস্তু বা দৃশ্যকে আমাদের পছন্দমত সাজিয়ে নিতে (compose) পারি।

ভিউফাইণ্ডার নানা ধরনের হতে পারে। ক্যামেরাতে যে ধরনের ভিউফাইণ্ডার থাকে সাধারণত সেই নামেই বিভিন্ন ক্যামেরা পরিচিত। যেমন ডিরেক্ট ভিশন ক্যামেরা,

রেঞ্জফাইণ্ডার ক্যামেরা, সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স বা টুইন লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা ইত্যাদি।

ভিউফাইণ্ডার ক্যামেরার গায়ে সরু তারের একটি সাধারণ ফ্রেম বসিয়ে লেন্সের কৌণিক ক্ষেত্র অনুযায়ী সরাসরি দেখতে পাওয়ার ব্যবস্থা সম্বলিত হতে পারে অথবা সরু একটি চোঙের দুই প্রান্তে দুটি সরল লেন্স লাগিয়ে ক্ষুদ্রাকারে প্রতিবিম্ব ফেলার ব্যবস্থাযুক্তও হতে পারে। যে ভিউফাইণ্ডার ফিল্মে যা ধরা পড়বে ক্যামেরাম্যানকে আইপিসে ঠিক তাই দেখার সুযোগ করে দেয় তাকে বলে রিফ্লেক্স ভিউফাইণ্ডার। এটা তখনই সম্ভব যখন ১. ক্যামেরা লেন্স ও আইপিসের দৃশ্যবিন্দু ও দৃশ্যকোণ এক হয় ও ২. উভয়ের অক্ষরেখা হয় সমান। এই পদ্ধতিতে দৃশ্যবস্তু আইপিসের পরিপ্রেক্ষিতে ফোকসে থাকলে, ফিল্মের পরিপ্রেক্ষিতেও ফোকসে থাকে। উন্নত মানের ক্যামেরায় এইভাবে ভিউফাইণ্ডারের সাহায্যে লেনস ফোকস করার ব্যবস্থা আছে।

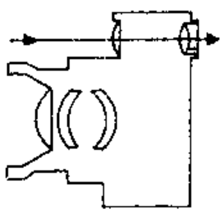
সমস্ত আধুনিক ক্যামেরাই পদ্ধতির দিক থেকে একই মৌলিক নকশা অনুসারী। তবু পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্যামেরার কয়েকটি প্রাথমিক ধরনের উদ্ভব হয়েছে, যেমন : সাবমিনিয়েচর, মিনিয়েচর, ফোল্ডিং, বক্স, রিফ্লেক্স ও টেকনিক্যাল ক্যামেরা। প্রতিটি ধরনই আবার আরো সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট হয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এবং সামুদ্রিক, আলোকযান্ত্রিক ও উৎক্ষেপ-বিষয়ক চিত্রণের কাজে প্রযুক্ত হতে পারে।

আলোচনার সুবিধার জন্য ক্যামেরাগুলিকে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে দুভাগে ভাগ করে নেব—ডিরেক্ট ভিশন ক্যামেরা ও রেঞ্জফাইণ্ডার ক্যামেরা। প্রথম ভাগে পড়বে—

বক্স ও সাধারণ রোল ফিল্ম ক্যামেরা

চৌকো বাক্সের আকারে তৈরি বলে এগুলি বক্স ক্যামেরা নামে পরিচিত। এর প্রচলিত রূপ হল একটা সাধারণ বর্গাকার বা আয়তাকার বাক্স যাতে একটা সরল লেন্স এবং সহজ শাটার, ভিউফাইণ্ডার ও রোল ফিলম রাখার ব্যবস্থা থাকে। বাক্সটি সাধারণত প্লাষ্টিক বা ধাতুর পাতে তৈরি এবং চামড়া বা প্লাষ্টিক দিয়ে মোড়া। এই ক্যামেরায় লেন্স ফোকস করার কোন ব্যবস্থা নেই, অত্যন্ত সরল ও সহজ পদ্ধতিতে তৈরি বলে লেনস ফোকস করার বা শাটার দ্রুতির বিশেষ তারতম্য করার কোন প্রয়োজনও হয় না। এই বক্স ক্যামেরায় সাধারণত মেনিস্কাস লেন্স (f/১৪) ব্যবহার করা হয়, যেজন্য এর হাইপার ফোকল দূরত্বে (৮ বা ১০ ফুট থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত) ছবি বেশ ভাল ভাবেই তোলা যায়। এই লেন্সে ষ্টপের সংখ্যা খুব বেশি হলে হয় তিনটি এবং লেন্সের বিভিন্ন ত্রুটিও বিশেষ সংশোধন করা থাকে না। এই ক্যামেরার শাটার তৈরি হয় অত্যন্ত সাধারণ একটি ধাতুর পাতের মধ্যাংশে একটা ছিদ্র করে এবং এই শাটার মাত্র দু ভাবে ব্যবহার করা যায়। হাতে ধরা অবস্থায় ছবি তোলার জন্য 'I' লেখা অবস্থানে রেখে শাটার টিপলে ১/৫০ সেকেণ্ড সময় ধরে আলোকপাত ঘটে এবং ক্যামেরাকে স্থির ভাবে বসিয়ে স্থিরদৃশ্যের ছবি তোলার জন্য বেশিক্ষণ আলোকপাতের প্রয়োজনে শাটারের 'T' অবস্থানটি ব্যবহার করা হয়। কোমর উচ্চতার উপযুক্ত এর ভিউফাইণ্ডারও খুব সাধারণ একটা ছোট

লেন্‌স ও গ্রাউণ্ডগ্লাসের সাহায্যে ছোট আকারে তৈরি এবং সাধারণত তা ডিরেক্ট ভিশন ধরনের। এর সাহায্যে প্রতিচ্ছবি খুব না হলেও মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বেশ কিছু দিন পর্যন্ত বক্স ক্যামেরা খুব প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে এইসব ক্যামেরা ৬ × ৯ সি. মি. বা তার চেয়েও বড় মাপের ছবি তোলার উপযুক্ত করে তৈরি হত এবং এর নেগেটিভের ঝকঝকে কন্‌ট্যাক্ট (contact) প্রিন্ট পারিবারিক অ্যালবামের জন্য বেশ আদরণীয় ও মানানসই ছিল। কোন কোন ক্যামেরায় একটি আলাদা লেন্‌স যুক্ত করে তিন বা চার ফুট দূরত্ব থেকে প্রতিকৃতি তোলার ব্যবস্থাও ছিল। ঠিক এই ধরনের বক্স ক্যামেরা বর্তমানে বিশেষ তৈরি হয় না। আমাদের দেশে 'ক্লিক' ক্যামেরা



এই ধরনের বক্স ক্যামেরা যাতে ১২০ নং রোল ফিলম থেকে ৬ × ৬ সি. মি. মাপের বারোখানি ছবি ওঠে। অত্যন্ত সরল ও সহজ গঠন সত্ত্বেও বক্স ক্যামেরা দিয়েও উঁচু দরের ছবি তোলা সম্ভব। যান্ত্রিক জটিলতা না থাকায় যে কেউ সামান্য চেষ্টায় এই ধরনের ক্যামেরা ভালভাবে ব্যবহার করতে পারে।

পরবর্তীকালে এই ক্যামেরার আকার, পরিমাপ ও ভিউফাইণ্ডারের পরিবর্তন ঘটে এবং সাধারণ রোল ফিলম ক্যামেরা নামে পরিচিত হয়। ৬ × ৬ সি. মি. এবং তার চেয়েও ছোট প্রচলিত ৩৫ মি. মি. আকারের ছবি তোলার উপযুক্ত ক্যামেরাই বর্তমানে বেশি জনপ্রিয়। একটি চোঙের দুদিকে দুটি সরল লেন্‌স লাগিয়ে এইসব ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডার তৈরি এবং এর সাহায্যে প্রতিচ্ছবি চোখের উচ্চতায় বেশ ভাল ও স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের এই ক্যামেরার জন্য কম ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌স ব্যবহার করা হয় বলে এর হাইপার ফোকল দূরত্ব বেশ কম হয় এবং ৫ ফুট থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত ছবি অনায়াসেই পাওয়া যায়। কোন কোন ক্যামেরায় লেন্‌সের ক্ষমতা সামান্য বাড়িয়ে তিনটি শাটার দ্রুতির—১/২৫, ১/৫০,ও ১/১০০সেকেণ্ড এবং অল্প দূরত্বের (৩ থেকে ৪ ফুট), মাঝারি দূরত্বের (৬ থেকে ৮ ফুট) এবং অসীম দূরত্বের ছবির জন্য লেনস ফোকস করার ব্যবস্থাও করা হয়। তবে শাটার বা লেনস কোন ক্ষেত্রেই কোন্ ধরনের আলোকে বা কোন্ দূরত্বে ছবি তোলা হচ্ছে তা সংখ্যা দিয়ে উল্লেখ না করে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া থাকে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্সের প্রভূত উন্নতির ফলে ছোট ৩৫ মি. মি. ক্যামেরায় ফোকস করার বা লেন্‌স ও অ্যাপারচার সেট করার কোন প্রয়োজন হয় না। আলোকের ঔজ্জ্বল্য অনুসারে স্বয়ংক্রিয় ভাবে এইসব ক্যামেরায় ছবি

তোলা যায় বলে এর পারিবারিক জনপ্রিয়তা খুব বেশি। তাছাড়া প্রায় সব ক্যামেরাতেই ফ্ল্যাশ ব্যবহার করার ব্যবস্থা থকায় কম আলোয় বা ঘরের মধ্যেকার ছবিও যে কোন সময় তোলা সম্ভব হচ্ছে। ছোট মাপের (৩৫ মি. মি.) ছবি তোলার উপযুক্ত বেশ কিছু ডিরেক্ট ভিশন ক্যামেরায় অপেক্ষাকৃত কম ফোকস দৈর্ঘের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন লেন্স এবং ১/৫০০ সেকেণ্ড সময়সীমা বিশিষ্ট বিটউইন দ্য লেন্স শাটারও ব্যবহার করা হয়। এইসব লেন্সের ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় আনুমানিক দূরত্ব অনুসারে ফোকসিং রিং ঘুরিয়ে দূরত্ব নির্দেশক সংখ্যায় এনে বেশ ভালভাবেই ছবিকে ফোকসের মধ্যে ধরা যায়। এইসব ক্যামেরায় আজকাল auto-eye এক্সপোজার মিটার থাকায় নিখুঁত আলোকপাত সম্ভব হয় এবং ছবিকে বেশ বড় আকারে পরিবর্ধিত করতেও কোন অসুবিধা হয় না।

রেঞ্জফাইণ্ডার ক্যামেরা

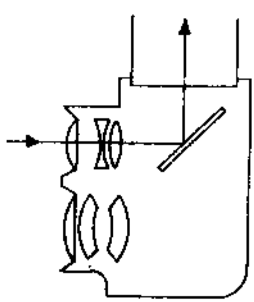
এতক্ষণ যেসব ক্যামরার কথা বলা হল তাতে ভিউফাইণ্ডারের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি ফোকস করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। রেঞ্জফাইণ্ডার ক্যামেরায় কিন্তু ভিউফাইণ্ডারে চোখ রেখে লেন্স ঘুরিয়ে নিখুঁত ভাবে ফোকস করা যায়। রেঞ্জফাইণ্ডার নানা ধরনের হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটিই একই মৌলিক তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল, তা হল—কোন একটি বস্তুকে যখন দুটি ভিন্ন অবস্থান থেকে দেখা হয় তখন দৃশ্যরেখাদ্বয় অভিসারী হয়ে একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। দৃশ্যরেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী অভিসরণ-কোণ বস্তু নিকটবর্তী হলে বৃদ্ধি পায় ও বস্তু দূরবর্তী হলে হ্রাস পায়। সাধারণত এই ভিউফাইণ্ডারের মধ্যভাগে দুটি প্রতিচ্ছবি পড়ে এবং ফোকসিং রিং ঘুরিয়ে বস্তুর ওই প্রতিচ্ছবি দুটিকে একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেই লেন্সটিও বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ফোকসড হয়ে যায়। দুটি প্রতিচ্ছবিকে এক করে ফোকস করা হয় বলে একে কাপল্ড্ রেঞ্জফাইণ্ডারও বলা হয়ে থাকে। এ হল এমন এক নিয়ন্ত্রণযোগ্য দৃক-বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যাতে রেঞ্জফাইণ্ডার ও লেন্স-ফোকসিং-এর কাজ একই সঙ্গে হয়ে থাকে এবং উভয়ে একই নিয়ন্ত্রকের দ্বারা চালিত হয়। এই ব্যবস্থায় দূরত্ব অনুমান করার কোন দরকার হয় না। বেশ কিছু রেঞ্জফাইণ্ডার ক্যামেরায় বিহাইণ্ড দ্য লেন্স বা ফোকল প্লেন শাটার ব্যবহার করে লেন্স বদলাবার ব্যবস্থা থাকে এবং প্রয়োজন মত ওয়াইড বা ন্যারো অ্যাঙ্গল লেন্স ব্যবহার করা যায়। এসব ক্ষেত্রে রেঞ্জফাইণ্ডারটিও বদলানো হয়ে থাকে অথবা ইউনিভার্সাল ভিউফাইণ্ডার ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে বিভিন্ন কৌণিক ক্ষেত্র অনুযায়ী চিহ্ন দেওয়া থাকে।

টুইন লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা

চলতি কথায় একে বলা হয় টি. এল. আর। নামেই বোঝা যাচ্ছে এতে দুটি লেন্স ব্যবহার করা হয়। একটি ক্যামেরার মধ্যেই দুটি অংশ, প্রতিটি অংশের রয়েছে নিজস্ব লেন্স। ওপরের অংশে রয়েছে ফোকসিং-এর ব্যবস্থাসহ ভিউফাইণ্ডার ও নিচের অংশে রাখা

আছে আলোক-সংবেদনশীল ফিল্ম। ওপরের লেনসটি ভিউফাইণ্ডারে পূর্ণ মাপের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়ার জন্য। অন্য লেনসটি ছবি তোলার জন্য। লেন্স দুটি এমন ভাবে ওপর নিচ করে একসঙ্গে বসানো থাকে যাতে ফোকসিং নব্ ঘোরালে দুটি লেন্সই একই ভাবে এগোবে বা পেছবে এবং দুটি লেন্স একইভাবে ফোকস করবে। ফলে ভিউফাইণ্ডারের পর্দায় বস্তুর প্রতিচ্ছবি যখন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে, বস্তুটি তখন ফিল্মের পরিপ্রেক্ষিতেও সঠিক ভাবে ফোকসড হয়ে যাচ্ছে। যে কোন রিফ্লেক্স ক্যামেরাতেই প্রতিচ্ছবি ওপরের গ্রাউণ্ডগ্লাস পর্দায় গৃহীত হয় ওপরের লেন্সটির ঠিক পিছনে ৪৫° কৌণিক অবস্থানে রাখা একটি আয়নার সাহায্যে প্রতিফলিত হয়ে। এই প্রতিচ্ছবির ওপর নিচ ঠিক মত দেখা গেলেও বাঁদিক ডানদিক উল্টোভাবে পড়ে। আয়না ইত্যাদিসহ একটা পাটাতন ওপরের অংশকে নিচে ক্যামেরার যে মূল অংশ তা থেকে পৃথক করে রাখে।

টি. এল. আর. ক্যামেরা বেশির ভাগই ৬ × ৬ সি. মি. ফিল্ম মাপের হয়ে থাকে। অল্পক্ষেত্রে এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের হয় এবং এর চেয়ে ছোট মাপের প্রায় হয় না বললেই চলে। এতে বিটউইন দ্য লেন্স শাটার ব্যবহার করা হয়। যান্ত্রিক জটিলতাহীন এই ক্যামেরা ব্যবহার করা বেশ সুবিধাজনক এবং বড ও ছোটমাপের ক্যামেরার মাঝামাঝি বলে এই ক্যামেরা উচ্চমানের কাজের প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়। ভিউফাইণ্ডার লেনসটির ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম হয় বলে প্রতিচ্ছবির উজ্জ্বলতা যেমন বাড়ে, ফোকসিং তেমনি নিখুঁত হয় এবং ছবি কম্পোজ করারও খুব সুবিধা হয়ে থাকে। আবার ভিউফাইণ্ডারের লেন্সটি পূর্ণ অ্যাপারচারে কাজ করে বলে ছবি তোলার লেন্সটিতে ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতা কত হচ্ছে তার কোন আন্দাজ পাওয়া যায় না। সেইজন্য এই ধরনের ক্যামেরায় সাধারণত ফোকস ক্ষেত্র গভীরতার একটা

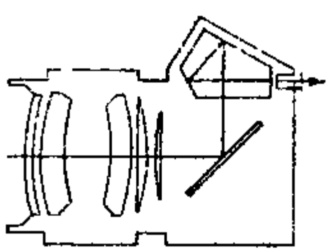


সারণী দেওয়া থাকে। যেহেতু ছবি তোলার লেন্স ও প্রতিচ্ছবি দেখার লেনসের মধ্যে ওপরনিচ বা পাশাপাশি করে প্রায় ইঞ্চিখানেক ব্যবধান থাকে তাই ঠিক যতটুকু অংশ ছবিতে উঠছে ঠিক ততটুকু অংশের প্রতিচ্ছবি ভিউফাইণ্ডারে প্রতিফলিত হয় না। ফলে

ডিরেক্ট ভিশন ক্যামেরার মত লম্বন (প্যারালাক্স) ত্রুটি থেকেই যায়। এই ত্রুটি ৭ ফুটের অধিক দূরত্বের বস্তুর ক্ষেত্রে নগণ্য, কিন্তু এর চেয়ে কম দূরত্বের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ক্লোজ-আপ ছবির ক্ষেত্রে, এই ত্রুটি বেশ ভালভাবেই ধরা পড়ে। অধিকাংশ ক্যামেরাতেই এই ত্রুটি সংশোধনের কোন না কোন ব্যবস্থা থাকে, হয় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, নয়তো আলাদা একটা বিশেষ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাউণ্ডগ্লাসে একটা দাগ দিয়েও প্রতিচ্ছবির তারতম্য বোঝানো হয়। এই ক্যামেরায় লেন্স পালটাবার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। কোমর উচ্চতার দৃষ্টিকোণের জন্য এই ক্যামেরায় তোলা প্রতিকৃতিতে ব্যক্তির চিবুক ও নিচের চোয়াল বেশি প্রাধান্য পায় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যে পুরোভূমিকে অতিরিক্ত বলে মনে হয়। আকারে বড়সড় ও ওজনে ভারী বলে এই ক্যামেরা স্থাপত্য চিত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযুক্ত নয়। কিন্তু অন্যান্য নানান কাজে এই ক্যামেরার ব্যাপক ও সার্থক ব্যবহার ঘটে। বিশেষত অনেক ধরনের প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থিরদৃশ্য, ভ্রমণচিত্র এবং ধারাবাহিক চিত্রমালার ক্ষেত্রে।

সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা

সাধারণভাবে এস. এল. আর. নামে পরিচিত এবং বর্তমানের সবচেয়ে উন্নত ধরনের ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ক্যামেরা। যে লেন্সটি ছবি তোলে সেই লেন্সটির সাহায্যেই ৪৫° কৌণিক অবস্থানে রাখা আয়নার মাধ্যমে পুরো মাপের পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি ভিউফাইণ্ডারে দেখতে পাওয়া যায় এবং তা ছবিতে যা পাওয়া যাবে ঠিক সেইমত। এই ক্যামেরার ফোকসিং পর্দাই একমাত্র ভিউফাইণ্ডার যা লম্বনত্রুটি থেকে মুক্ত। এছাড়া যে অ্যাপারচারে ছবি তোলা হবে সেই অ্যাপারচারেই ভিউফাইণ্ডারের মধ্যে ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতাটিও নিখুঁত ভাবে বোঝা যাবে। একমাত্র ঠিক ছবি তোলার সময়টিতে আয়না ওপরে উঠে গিয়ে ফিলমের ওপর আলোকপাতের পথ ছেড়ে দেয় এবং সেইজন্য



ওই সময়টুকুতে মাত্র প্রতিচ্ছবিটি দেখা যায় না। আলোকপাত হওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আয়নাটি আবার যথাস্থানে ফিরে আসে ও প্রতিচ্ছবি পুনরায় দেখা যায়। বর্তমানে এস. এল. আর ক্যামেরা ২৪ × ৩৬ মি. মি., ৪.৫ × ৬ সি. মি., ৬ × ৬ সি.মি. এবং ৬ × ৭ সি. মি. মাপের ফিল্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এদের মধ্যে ৩৫ মি. মি.

(২৪ × ৩৬ মি. মি. মাপের) ক্যামেরা সবচেয়ে জনপ্রিয়। ৩৫ মি. মি. ক্যামেরাতে সাধারণত ফোকল প্লেন শাটার ব্যবহার করা হয় এবং বিশেষ কয়েকটি (৬ × ৬ বা ৬ × ৭ সি. মি.) ক্যামেরাতে দু'ধরনের শাটারেরই ব্যবস্থা থাকে। এই ক্যামেরার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, ক্যামেরার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধের যে মান তার অন্তর্ভুক্ত এমন যে কোন ফোকস দৈর্ঘবিশিষ্ট সমস্ত লেন্সই এই ক্যামেরায় লাগানো সম্ভব। বস্তুত এস. এল. আর ক্যামেরাতে এত বিভিন্ন ধরনের লেন্স লাগানো যায় যা আর কোন ক্যামেরাতেই সম্ভব নয় এবং যে লেন্সের সাহায্যে ঠিক যে ধরনের ছবি পাওয়া যাবে তা সব সময় ভিউফাইণ্ডারের সাহায্যে দেখা যায়। ফলে একটি মাত্র এস. এল. আর. ক্যামেরা যত বিভিন্ন ধরনের ফোটোগ্রাফির প্রয়োজন মেটায় তা আর কোন একক ক্যামেরার পক্ষে সম্ভব নয়।

যে সমস্ত এস. এল. আর. ক্যামেরাতে চোখের উচ্চতায় দেখার ব্যবস্থা আছে তাতে একটি পাঁচতলবিশিষ্ট প্রিজম (Pentaprism) ব্যবহার করা হয়, যার তিন ধার পারদ লাগিয়ে আয়নার মত করা আছে। প্রতিচ্ছবি লেন্সের মধ্য দিয়ে এসে আয়নাতে পড়ে ওপরে বসানো একটি গ্রাউণ্ডগ্লাসে প্রতিফলিত হয় এবং সেখান থেকে প্রিজমের বিভিন্ন তলে প্রতিফলিত হয়ে 'আইপিসে' গিয়ে পৌঁছয়, ফলে প্রতিচ্ছবির ওপর নিচ বা বাঁদিক ডানদিক উল্টোভাবে পড়ে না এবং প্রতিচ্ছবি খুব ভালভাবে দেখার সুবিধা হয়। বর্তমানে এই ক্যামেরায় একটা আভ্যন্তরীণ ফোকসিং পরিবর্ধক ব্যবহার করা সম্ভব। কোমর উচ্চতার ভিউফাইণ্ডারে শুধুমাত্র আয়না থেকে সোজা গ্রাউণ্ডগ্লাসে পড়ে বলে প্রতিচ্ছবির ওপর নিচ ঠিক থাকলেও বাঁদিক ডানদিক উল্টোভাবে পড়ে। বহু এস. এল. আর. ক্যামেরাতে কোমর উচ্চতায় কাজ করার সুবিধার জন্য প্রিজম পালটাবারও ব্যবস্থা আছে। এস. এল. আর ক্যামেরাতে মোটর লাগিয়ে ধারাবাহিক চিত্রমালা তোলার ব্যবস্থাও থাকে। সমস্ত পদ্ধতিটি যান্ত্রিকভাবে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এর জন্য ক্যামেরাকে ব্যাটারি বা বিদ্যুতের সাহায্যে কার্যকারী করে তুলতে হয়। ক্যামেরাকে এইভাবে কর্মশক্তি যোগান দেয় যা তারই নাম মোটর। তাছাড়া এই ক্যামেরার সাহয্যে 'ক্লোজ-আপ' ছবি তোলার জন্য লেনস ও ক্যামেরার মাঝে বেলো লাগানো যায় এবং প্রয়োজন মত এটিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও লাগিয়ে দেওয়া যায়। মোটকথা এই ক্যামেরাকে বহুভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। একমাত্র ৩৫ মি. মি. এস. এল. আর ক্যামেরাতে (স্থির ক্যামেরার ক্ষেত্রে) বর্তমানে জুম লেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম মাপের ছবির অন্যান্য ক্যামেরার তুলনায় এই ক্যামেরা অপেক্ষাকৃত ভারী। এই ক্যামেরার যন্ত্রাংশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও যান্ত্রিক জটিলতা বেশি হওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে ও সাবধানের সঙ্গে এটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। শাটারের সঙ্গে একটি বড় আকারের আয়না ওঠা পড়া করে বলে এর আওয়াজ হয় বেশি। এই ক্যামেরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় গতিশীল বস্তুর ছবি তোলার জন্য অর্থাৎ যেখানে ফোকসিং-এর মন্থর পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া দুর্লভ। এস. এল. আর. ক্যামেরা শিশু ও

জীবজন্তুর ছবির ক্ষেত্রে সর্বোত্তম। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংবাদ-চিত্রের কাজে এর ব্যবহার সর্বাধিক প্রচলিত ।

১১০ পকেট ক্যামেরা

অত্যন্ত হাল আমলে 'ইনস্‌ট্যামেটিক' ক্যামেরা নামে এই ক্যামেরাগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছে। এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এর ক্ষুদ্র আকার। এর একটি ফিল্‌ম ক্যাসেট থেকে ১১০ নং (১৬ মি. মি.) ফিল্‌মে ১৭ × ১৩ মি. মি. আকারের ২০টি ছবি পাওয়া যায়। সরু ও চ্যাপ্টা, অত্যন্ত ছোট আকারের এই ক্যামেরা প্রায় একটি সিগারেটের প্যাকেটের মত পকেটে রাখা যায়। যেগুলি আভ্যন্তরীণ ফ্ল্যাশ ব্যবস্থা সহ সেগুলি লম্বায় আর একটু বড়। কোন কোন ক্যামেরায় রেঞ্জফাইণ্ডার আছে তবে বেশির ভাগই ডিরেক্ট ভিশন ভিউফাইণ্ডার । এতে সাধারণত ২৫ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌স রাখা হয়। লেন্‌সের ওপরে দুটো চিহ্ন দিয়ে মেঘলা আবহাওয়া ও রৌদ্রালু আবহাওয়ার জন্য লেন্‌সের পৃথক পৃথক অ্যাপারচারের অবস্থান নির্দেশ করা থাকে। বর্তমানে লেন্‌স ও ফিল্‌মের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় নেগেটিভ যত্ন সহকারে পরিস্ফুটন করলে ছবি ৪" × ৬" মাপ পর্যন্ত মোটামুটি ভালভাবেই পরিবর্ধন করা যায়। নেগেটিভের আকার যত ছোট, তার জন্য নির্দিষ্ট ক্যামেরার আকারও তত ছোট। বর্তমানে এমন ইনস্‌ট্যামেটিক ক্যামেরা পাওয়া যাচ্ছে যা থেকে ১১০টি নেগেটিভ পাওয়া যায়, প্রতিটির আকার আঙুলের নখের মত ছোট (মাত্র ৮ × ১১ মি. মি.)। এই ক্যামেরাগুলি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ও অধিকতর মূল্যবান। এর ১৫ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌স ৩ ফুট থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত ছবি তুলতে পারে এবং ছবি ৮" × ৬" আকার অবধি বেশ ভালই পরিবর্ধন করা যায়। সাধারণত না জানিয়ে ছবি তোলার পক্ষে এটা একটা মূল্যবান হাতিয়ার।

পোলারয়েড ক্যামেরা

আগেই বলা হয়েছে, এ হচ্ছে তাৎক্ষণিক ছবির ক্যামেরা। এতে ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে সম্পূর্ণ ছবি এসে যায়—তা সে সাদা-কালো বা রঙীন যাই হোক না কেন। এই ক্যামেরা আবিষ্কার করেন ড. এডউইন ল্যাণ্ড ১৯৪৭ সালে। যে জন্য অনেক সময় একে 'পোলারয়েড ল্যাণ্ড ক্যামেরা' বলেও উল্লেখ করা হয়। এর সব থেকে বড় সুবিধা, ছবিতে অবস্থান, আলোছায়া বা কম্পোজিশনের ত্রুটি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে নিয়ে আবার ছবি তুলে নেওয়া যায় এবং ফিল্‌মের পরিস্ফুটন ও মুদ্রণের জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থা করারও দরকার হয় না।

এই ক্যামেরাতে যে ফিল্‌ম প্যাক ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে প্রতিটি ফিলম শিটের সঙ্গে একটি করে পজিটিভ কাগজ ও খানিকটা থল্‌থলে আঠালো রাসায়নিক রাখা থাকে। ছবি তোলার পর ক্যামোরার একপাশ থেকে বেরিয়ে থাকা একটি পাত টেনে ঐ নেগেটিভ/পজিটিভ যখন বার করা হয় তখন তা ক্যামেরার মধ্যে বসানো দুটি সরু রোলারের মধ্য দিয়ে আসে এবং রোলারের চাপে ঐ রাসায়নিক নেগেটিভ ও পজিটিভ

দুটিতেই সমান ভাবে লেগে যায়। বাইরে আনার পর কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আঠালো নেগেটিভটি পজিটিভ থেকে টেনে তুলে ফেলে দেওয়া হয় এবং প্রিন্টটিও অল্প ক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। এই সব ক্যামেরার ছবির মাপ ৩$^{১}/_{৪}$" × ৩$^{১}/_{৪}$" বা তার থেকে সামান্য ছোট হয়। কোডাক পদ্ধতিতে ছবির ক্ষেত্রফল সমান হলেও, ছবি আকারে বর্গাকার হয় না, হয় আয়তাকার। এই সব ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়, ব্যাটারিচালিত ও ফ্ল্যাশযুক্ত। ভিউফাইণ্ডার সাধারণত ডিরেক্ট ভিশন ধরনের এবং কিছু ক্যামেরায় রেঞ্জফাইণ্ডার থাকে। এতে স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার কনট্রোলেরও ব্যবস্থা থাকে। এই ক্যামেরায় তোলা ছবিতে আলোছায়ার তারতম্য এমন হয় যে সমগ্র ছবিটিকেই মৃদুতর বা গাঢ়তর করা যায় কিন্তু ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে আলোছায়ার বিভিন্ন বৈপরীত্য আনা যায় না। অল্পদিন হল অত্যন্ত দামী এক ধরনের পোলারয়েড ক্যামেরা বেরিয়েছে যাতে একটি প্লাষ্টিক কার্ডে সরাসরি পজিটিভ ছবি ওঠে অর্থাৎ কোন নেগেটিভ থাকে না। এই ক্যামেরাটি এস.এল. আর। এতদিন পোলারয়েড ক্যামেরার ছবির আর দ্বিতীয় কোন কপি বা ছবির কোন পরিবর্ধন পাওয়া যেত না। যে নেগেটিভ ফেলে দেওয়া হয় তা ঠিক ভাবে পরিষ্কার করে মুদ্রণ করা ছিল খুবই অসুবিধাজনক। তবে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ছবিগুলি কপি করা বা পরিবর্ধন করা সহজ হয়েছে।

গবেষক, বিজ্ঞানী ও স্থপয়িতাদের ধারাবাহিক কাজের চাক্ষুষ তথ্য রাখার পক্ষে এটি খুবই উপযোগী ক্যামেরা। তাছাড়া অনেক অভিজ্ঞ ফোটোগ্রাফার পোলারয়েড ক্যামেরায় পরীক্ষামূলক ভাবে ছবি তুলে তারপর ওই ছবিই প্রচলিত ক্যামেরা ও ফিল্মের সাহায্যে চূড়ান্ত ভাবে তুলে থাকেন। পারিবারিক অ্যালবামের ছবির জন্য এই ক্যামেরা যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাছাড়া পাসপোর্ট ছবির প্রয়োজনে চারটি লেন্সযুক্ত পোলারয়েড ক্যামেরাও তৈরি হচ্ছে যা থেকে হুবহু একই রকমের চারটি ২" × ১$^{১}/_{২}$" মাপের ছবি বেরিয়ে আসে। বর্তমানে মুভি ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও তাৎক্ষণিক পোলারয়েড পদ্ধতি চালু হয়েছে।

টেকনিক্যাল ক্যামেরা

পুরনো আমলের ফিল্ড বা ভিউ ক্যামেরার আদলে তৈরি অত্যন্ত জটিল এই ক্যামেরা আদতে এক ধরনের যন্ত্রবিশেষ যা প্রতিচ্ছবির আকার ও অবস্থানানুপাতের সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। বিভিন্ন ক্যামেরা মুভমেন্ট, বিবিধ যন্ত্রাংশের ব্যবহার, লেন্সের নানাবিধ পরিবর্তন এবং বিভিন্ন মাপের ও উপাদানে তৈরি নেগেটিভের ব্যবহারের ফলে এই ক্যামেরার বৈচিত্র্য ও স্থিতিস্থাপকতা অসীম। ধাতুর তৈরি এই ক্যামেরা দু রকমের হয়। এক ধরন যা হাতে ধরে একেবারেই ব্যবহার করা যায় না, মনোরেল, বা একটি লম্বা মোটা টিউবের ওপর বসনো থাকে, সাধারণত ত্রিপদ বা অন্য কোন অবলম্বনের ওপর রেখে এই ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয়। ৪" × ৫" বা ৮" × ১০" মাপের ছবি তোলার উপযুক্ত এই ক্যামেরার তিনটি অংশ। সম্মুখের অংশে একটা চৌকো ধাতুর প্যাতের মধ্যে বসানো লেন্স শেষের অংশে ফোকসিং পর্দা ও ফিল্ম বা প্লেট রাখার বড় জায়গা এবং

দুটি অংশের সংযোগকারী একটি লম্বা চৌকো বেলো। এই ক্যামেরার লেন্স বদল করে প্রয়োজনমত ওয়াইড বা ন্যারো অ্যাঙ্গল লেন্স ব্যবহার করা যায়। বেলোর সঙ্গে প্রয়োজনমত আরও বেলো লাগিয়ে এবং টিউবটিকে আরও লম্বা করে ফোকস দৈর্ঘ্যের অনেকখানি তারতম্য করা যায়। এ ছাড়া আর এক ধরনের ফোল্ডিং টাইপ ক্যামেরা হয় যা ফ্ল্যাট- বেড ক্যামেরা নামে পরিচিত। এর সামনের ডালা খুলে তার ওপর বসানো দুটি চ্যানেলের ওপর দিয়ে বেলোযুক্ত লেন্সটি এগিয়ে আসে। এই ক্যামেরাটি হাতে ধরে ব্যবহার করা সম্ভব হলেও অত্যন্ত ভারী। তবে মনোরেল বা ফোল্ডিং দু ধরনের ক্যামেরার লেন্সই অনুভূমিক বা উল্লম্ব দু ভাবেই সরানো যায়। মনোরেল ক্যামেরার ফিল্মের অংশটিও প্রয়োজনমত হেলানো বা বাঁকানো যায়। ফোল্ডিং ক্যামেরাতে ডিরেক্ট ভিশন ইউনিভার্সাল ভিউফাইণ্ডার থাকে। প্রয়োজনমত দুটি ক্যামেরাতেই অ্যাডপ্টারের সাহায্যে রোল ফিল্মও ব্যবহার করা সম্ভব।

এই দুই ক্যামেরার লেন্স ও ফোকস-তলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে এতে ছবির বিকৃতি সর্বাপেক্ষা কম। স্থাপত্যচিত্র এবং বাণিজ্যিক, প্রাযুক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ছবি তোলার জন্য এ ধরনের ক্যামেরা আদর্শ। এ ক্যামেরা বড় ও ভারী হওয়ার জন্য সহজে ব্যবহার করা অসুবিধা এবং এই ক্যামেরায় যে বস্তুর ছবি তোলা হয় তা প্রায় সর্বদাই স্থির বস্তু। এ ধরনের ক্যামেরা ঠিক মত ব্যবহার করতে গেলে ফোটোগ্রাফির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সাধারণ ফোটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে যে সব ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম এবং দেখা গেল এসব ক্যামেরাও তাদের আকার, পরিমাপ ও ব্যবহারিক সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কম বিচিত্র নয়। তবে ক্যামেরা যে রকমই হোক না কেন প্রতিটি ক্যামেরাই তার নির্দিষ্ট কাজ সঠিকভাবে করে থাকে। কোন ছবির ভালমন্দ কখনই শুধু ক্যামেরার ওপর নির্ভর করে না। ক্যামেরার সাহায্যে ভাল ছবি তোলা নিঃসন্দেহে ফোটোগ্রাফারের সংবেদনশীলতা ও বোধের ওপর নির্ভরশীল, তারই সঙ্গে তা নির্ভর করে ব্যবহৃত ফিল্মের মান, ফোটোগ্রাফারের দক্ষতা (সঠিক ফোকস করা ও সঠিক এক্সপোজার দেওয়া, শাটার টেপার সময়ে হাত না কাঁপা, লেন্স ও আলোর সঠিক নির্বাচন ইত্যাদি) ও এক্সপোজড় ফিল্মের নিখুঁত পরিস্ফুটনের ওপর।

ফিল্‌ম

'Never just go out and buy a film—always choose it carefully.'

—George Hughes

আমরা জেনেছি ফোটোগ্রাফিতে আলো দুভাবে কাজ করে থাকে। একটা হল তার দৃক-প্রতীতি, যার ফলস্বরূপ ক্যামেরা ও লেন্‌স; অপরটি রাসায়নিক প্রতীতি, যার ফলস্বরূপ ফিল্‌ম ও সেই সংক্রান্ত অন্যান্য অনুষঙ্গ ।

রোদের আলোয় গায়ের চামড়া কালো হয়, কিন্তু গাছের পাতা হয় সবুজ একথা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে জানা থাকলেও ফোটোগ্রাফিতে তা বিশেষ কোন কাজে আসে নি। ১৬১৪-য় Sola প্রথম জানালেন সূর্যালোক সিলভার লবণকে কালো করে এবং এই জ্ঞানকে প্রায় দুশো বছর পর, ১৮০২-য়ে, বাস্তবে কাজে লাগালেন Wedgwood—চামড়ার বা কাগজের ওপর সিলভার নাইট্রেট মাখিয়ে তাতে কাঁচের ওপর আঁকা রেখাচিত্রের প্রথম ছবি (নেগেটিভ) তুলে। বস্তুত এই ছিল আলোকরসায়নের শুরু। এরপর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দুই প্রতীতির মিলনের মধ্য দিয়ে ফোটোগ্রাফির জন্ম হয় । নানা জনের নানা প্রচেষ্টার ফলে ফোটোগ্রাফির অগ্রগতি হতে থাকে। তবু কিছুতেই যেন পুরোপুরি দখলে আনা যাচ্ছিল না ফোটোগ্রাফিকে। সিলভার লবণের কথা জানা গেলেও, এমন কোন মাধ্যম পাওয়া যাচ্ছিল না যা লবণগুলিকে ঠিকমত ধারণ করে রাখতে পারবে। অবশেষে ১৮৭৮ সনে Charles Bennet সেই মাধ্যম হিসেবে জিলেটিনকে পেয়ে গেলেন যা ১৮৭১ সনে Dr. Richard Maddox কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল।

প্রাকৃতিক প্রোটিন গ্রুপের বস্তু জিলেটিনকে সংগ্রহ করা হয় জীবজন্তুর চামড়া ও হাড় থেকে। এটি কোন সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক যৌগ নয়, এবং এর মধ্যে বিভিন্ন আণবিক ওজনের বিবিধ অণু ও নানা ধরনের অ্যামিনো-অ্যাসিড দ্রব্য থাকে। এর দ্রবণ উত্তপ্ত অবস্থায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জেলির আকার নেয় ও তার আসঞ্জনশক্তির ফলে ফোটোগ্রাফিক অবদ্রবের অন্তর্গত সিলভার লবণের কেলাসগুলিকে ঠিকমত ধারণ করে রাখতে পারে। সিলভার লবণগুলিকে ধরে রাখার জন্য এতদিন মাধ্যম হিসেবে যে

কলোডিয়ন বা সেলুলোজ নাইট্রেট ব্যবহার করা হত তার তুলনায় জিলেটিনের, শুধু আসঞ্জনশক্তি নয়, সংবেদনশীলতাও অনেক বেশি এবং জিলেটিনের সাহায্যে প্রস্তুত অবদ্রব শুষ্ক অবস্থাতেও সংবেদনশীল।

জিলেটিনের মাধ্যমে ড্রাই প্লেট-এর আবির্ভাব হতে শুরু হল আধুনিক ফোটোগ্রাফির যুগ। ১৮৮৯-তে ইষ্টম্যান স্বচ্ছ সেলুলয়েডকে ব্যবহার করলেন ভূমি হিসেবে। তারপর থেকে ফিলমের ভূমি, আধার ও উপাদানের সামান্য অদল বদল করতে করতে আজকের ফিল্ম আমাদের হাতে এসেছে। আজ যে নেগেটিভ ফিল্ম আমরা ব্যবহার করি সেই ফিলমের যে অংশটির ওপর দৃশ্যবস্তুর লীন প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে তার নাম অবদ্রব (Emulsion), ফিল্মের সবচেয়ে মূল্যবান ও সংবেদনশীল অংশ। এই আলোক সংবেদনশীল রাসায়নিক অবদ্রব গঠিত হয় জিলেটিন ও কেলাসাকার সিলভার হ্যালাইডে। হ্যালোজেন শ্রেণীর পদার্থ (ফ্লুয়োরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন)-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে সিলভার যে সমস্ত যৌগ গঠন করে তাদের সম্মিলিত নাম হল সিলভার হ্যালাইড। এর মধ্যে সিলভার ক্লোরাইড, সিলভার ব্রোমাইড ও সিলভার আয়োডাইড আলোক-সংবেদনশীল এবং তার ফলে ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে মূল্যবান। নেগেটিভ ফিল্মের অবদ্রবের সিলভার হ্যালাইড মূলত সিলভার ব্রোমাইড ও তা তৈরি হয় এইভাবে : $AgNO_3 + KBr = AgBr + KNO_3$। জিলেটিনের দ্রবণে সিলভার ব্রোমাইড ছাড়া কখনো কখনো অল্প পরিমাণে সিলভার আয়োডাইডও যুক্ত করা হয়। সিলভার হ্যালাইডের কেলাসাকার দানাগুলি জিলেটিনের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যায় না, জিলেটিনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। এই কেলাসগুলির গঠনাকার ও আয়তন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে ও তারই ওপর নির্ভর করে অবদ্রবের সংবেদনশীলতা ও তীক্ষ্ণতা। জিলেটিন শুধু যে কেলাসগুলিকে ঠিক মত ধারণ করে রাখে তাই নয়, জিলেটিন সিলভার হ্যালাইডের কেলাসকে অধঃক্ষিপ্ত হবার মত যথেষ্ট বড় হতেও দেয় না অর্থাৎ কেলাসের গঠন ও আয়তনকেও নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রিন্টের কাগজের সিলভার হ্যালাইড হল মূলত সিলভার ক্লোরাইড। ফিল্ম বা কাগজ যে কোনটির ক্ষেত্রেই মাত্র এক বর্গসেন্টিমিটার স্থানে লক্ষ লক্ষ হ্যালাইড দানা থাকে। তবে কাগজের অবদ্রবের দানাগুলি ফিলমের অবদ্রবের দানাগুলি অপেক্ষা ছোট হয়। আলোক-সংবেদনশীল অবদ্রবে আলোকপাত করলে সিলভার হ্যালাইড দানাগুলি ভেঙে গিয়ে কালো বর্ণের ধাতব সিলভারের পরমাণু সৃষ্টি করে যাকে রাসায়নিকের সাহায্যে বহুগুণ সম্প্রসারণ করা হয়। আসলে আলোকপাতের ফলে সিলভার হ্যালাইড যে অদৃশ্য প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে, রাসায়নিকের সাহায্যে তাকে কালো ধাতব সিলভারে পরিণত করে দৃশ্যমান করা হয় এবং অনালোকিত অংশ সাদা থেকে যায়, ফলে আমরা নেগেটিভ পাই। এই জন্য ফিল্মের ভূমি—যার ওপর অবদ্রব লাগানো থাকে— স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রাপ্ত নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলো ফেলে আমরা সিলভার হ্যালাইড মাখানো কাগজে পজিটিভ প্রিন্ট পেতে পারি। যে অবদ্রবে যথেষ্ট পরিমাণে সিলভার

আয়োডাইড মেশানো থাকে তার ক্ষেত্রে পরিস্ফুটনের পর প্রতিচ্ছবি স্থায়ী হতে প্রচুর সময় লাগে।

আলোক-রাসায়নিক অবদ্রবে জিলেটিনকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার কারণ জিলেটিন একই সঙ্গে স্বচ্ছ, শক্ত ও নমনীয় এবং তাকে ভূমির ওপর খুব পাতলা করে (সাদা-কালো ফিলমের ক্ষেত্রে অবদ্রবের বেধ হয় .০০৫ থেকে .০০২ ইঞ্চি) ও সমানানুপাতে লাগানো যায় যার সামান্য অন্যথা হলে সংবেদনশীলতার তারতম্য ঘটতে পারে। জিলেটিন সিলভার হ্যালাইডের কেলাসগুলিকে এমন সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত ও ধারণ করে রাখতে পারে যাতে পরিস্ফুটন বা ধৌত করার সময়ে তাদের সমগ্র কোষের মধ্যে তরল রাসায়নিক প্রবেশ করলেও ধাতব সিলভারের পরমাণুগুলো ভেঙে যায় না ও রাসায়নিকের সাহায্যে সুষম ভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে। বর্তমানে ফিল্‌ম তৈরির জন্য যে জিলেটিন ব্যবহার করা হয় তা খুবই উচ্চ মানের ও বিশুদ্ধির এবং তাতে বিভিন্ন সংবেদক যৌগ পদার্থ নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে মেশানো থাকে। সম্প্রতি মাধ্যম হিসেবে জিলেটিনের পরিবর্তে কৃত্রিম পলিমারও ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফোটোগ্রাফির ফিলম নানা ধরনের হতে পারে এবং তাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য নিম্নলিখিত গুণাবলীর এক বা একাধিক ক্ষেত্রে : দ্রুতি (speed), বর্ণসংবেদনশীলতা (colour sensitivity), বৈষম্য ও ক্রমায়ণ (contrast and gradation), কণাময়তা (graininess), বিশ্লিষ্ট করার ক্ষমতা (resolving power), পরিস্ফুটন গুণাবলী (development characteristics), অবদ্রবের ভৌত ধর্মাবলী এবং ব্যবহৃত ভূমির প্রকৃতি। এই সমস্ত গুণই কোন্ ফিলম কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যের পক্ষে কতটা কার্যকর তা নির্ধারণ করে থাকে। স্থিরচিত্রের ফিল্‌ম নানা ধরনের হলেও তা চারটে নির্দিষ্ট রূপে পাওয়া যায়—রোল ফিল্‌ম, পারফোরেটেড ফিল্‌ম, শিট ফিল্‌ম ও ফিল্‌ম প্যাক। এছাড়া আছে বিভিন্ন মাপের মুভি বা সিনে ফিলম।

নেগেটিভ ফিলম ও প্রিন্টের কাগজের অবদ্রব প্রস্তুত প্রণালী মূলত একই রকম। তবে প্রথমটির ক্ষেত্রে অবদ্রব মাখানো হয় স্বচ্ছ প্লাষ্টিক বা সেলুলোজ অ্যাসিটেট (ট্রাই অ্যাসিটেট)-এর নমনীয় ভূমির ওপর এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কাগজের ওপর। এই ভূমির বেধ হয় .০০৩ থেকে .০১ ইঞ্চির মধ্যে। ফিল্‌মের ধরন অনুযায়ী তার ভূমির বেধ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। স্বচ্ছতা ছাড়াও ফিল্‌মের ভূমির আর কয়েকটি ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, যেমন, তা দৃক-বিজ্ঞানগত ভাবে সমসত্ত্ব হবে এবং বর্ণহীন কিন্তু দৃশ্যমানভাবে নিখুঁত হবে। তাকে হতে হবে শক্ত, দৃঢ়, কুঞ্চন ও আঁচড়প্রতিরোধী এবং মাত্রিকভাবে স্থায়ী। এছাড়াও অত্যন্ত সংবেদনশীল অবদ্রবের প্রতি নিরাসক্ত, ফোটোগ্রাফিক রাসায়নিক কর্তৃক অপ্রভাবিত ও আর্দ্রতা প্রতিরোধী।

জিলেটিন ও অ্যালকালি হ্যালাইডের দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মিশিয়ে প্রাপ্ত সিলভার হ্যালাইডকে প্রথম তরল জিলেটিনে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে গরম করে ঠিকমত পরিণত (ripe) করে সিলভার হ্যালাইড কেলাসগুলিকে নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন দেওয়া হয়। এর ফলে তাদের আলোক-সংবেদনশীলতা বাড়ে ও বৈষম্য কমে। এরপর অবদ্রবটি

দ্রুত ঠাণ্ডা করে শুকিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা জলে ভালভাবে ধুয়ে অতিরিক্ত হ্যালাইড ও দ্রাব্য লবণ অপসারিত করা হয়। এবার অবদ্রবটিকে বিভিন্ন সংবেদকের উপস্থিতিতে পুনরায় গরম করা হয় ও উত্তপ্ত অবস্থায় একটি বিশেষ ধরনের ডাই সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে বর্ণসংবেদনশীল করা হয়।

এরপর এই চূড়ান্ত ও সংবেদনশীল অবদ্রবকে ফিল্মের ভূমির ওপর (৯৫০ ইঞ্চি) × (৫৩০০০ ফুট) এই মাপে সমানভাবে মাখিয়ে দেওয়া হয়। এই কোটিংয়ের বেধ ও সমতা সূক্ষ্মতমভাবে নিখুঁত হওয়া চাই। অবদ্রবের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা এবং কোটিংয়ের গতি এই বেধ ও সমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভূমির ওপর লাগানো অবদ্রব ঠাণ্ডা হয়ে শুকিয়ে যাবার পর প্রয়োজনমত মাপে কেটে নেওয়া হয়। প্রস্তুত প্রণালীর সমগ্র কার্যক্রমটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে অথবা অবদ্রবের তারতম্য অনুযায়ী নিরাপদ আলোকের সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

যে ভূমির ওপর অবদ্রবটি ঢালা হয় তার অপর দিকে, ফিল্ম যাতে কুঁচকে না যায় অথবা ফিল্মের ওপর পড়া আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আলোকবৃত্তের (halation) সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য কুঞ্চন প্রতিরোধী একটি রাসায়নিক ও আলোকবৃত্ত প্রতিরোধী রঙ লাগানো হয়। যেজন্য ফিল্মের পিছনের দিকটি কালচে বেগনি দেখায়। পরে পরিস্ফুটনের সময় এই রঙ ধুয়ে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে যায়। অবদ্রবটি মাখাবার আগে অবদ্রবকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেবার উদ্দেশ্যে ঐ ভূমির ওপর সেলুলোজ বা বিশুদ্ধ জিলেটিনের একটা পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন স্টেবিলাইজার ও হার্ডেনারের সাহায্য নেওয়া হয়। সবশেষে অবদ্রবটির সুরক্ষার জন্য অবদ্রবের উপর জিলেটিনের আবার একটি পাতলা প্রলেপ দিয়ে দেওয়া হয়।

মূলগতভাবে সিলভার হ্যালাইড অবদ্রব বর্ণালির অতিবেগনি থেকে বেগনি, নীল ও অংশত নীল-সবুজ অবধি সংবেদনশীল কিন্তু দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ হলুদ, কমলা, লাল ও অবলোহিতের প্রতি সংবেদনশীল নয়। এর সাহায্যে সাধারণ সাদা-কালো ড্রইং কপি করা যায়। বর্ণসংবেদনশীলতার প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে বিভিন্ন ডাইয়ের সাহায্যে। কিছু অবদ্রবকে সবুজ পর্যন্ত সংবেদনশীল করে প্রস্তুত করা হয় যাকে অর্থোক্রোমোটিক ফিলম বলা হয়ে থাকে। তা লাল আলোর প্রতি সংবেদনশীল নয় বলে এর ক্ষেত্রে লাল আলোকে নিরাপদ আলো হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সাধারণ ভাবে ব্যবহার্য সমস্ত ফিল্মই প্যানক্রোমেটিক যা সমস্ত রঙের প্রতি সংবেদনশীল, ফলে সম্পূর্ণ অন্ধকার ছাড়া তা নিয়ে কাজ করা যায় না।

আলোক-রাসায়নিক অবদ্রবের যে সব গুণাবলীর কথা বলেছি তার মধ্যে দ্রুতি হল অবদ্রবের আলেক-সংবেদনশীলতার মানের এক প্রকার প্রকাশ । সিলভার হ্যালাইড কেলাসগুলির গঠনাকার, আয়তন ও পরিমাণের তারতম্য করে তা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। কেলাস যত সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র হয় আলোক-সংবেদনশীলতা তত কম হয়। অপর পক্ষে কেলাস বৃহৎ ও স্থূল হলে আলোক-সংবেদনশীলতা বেশি হয়ে থাকে। বৈষম্য

হল প্রতিচ্ছবির এক অংশ থেকে অন্য অংশের মধ্যে দৃশ্যগত ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য। প্রাপ্ত প্রতিচ্ছবিতে টোনের তারতম্য বা বৈষম্যের মাত্রা ক্রমায়ণের সাহায্যে বোঝানো হয়ে থাকে। দ্রুতি ও ক্রমায়ণের মধ্যে এই সম্পর্ক রয়েছে যে, দ্রুতি হ্রাস পেলে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় ও দ্রুতি বৃদ্ধি পেলে বৈষম্য হ্রাস পায়। ফোটোগ্রাফিতে প্রতিচ্ছবি গড়ে ওঠে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে। কণাময়তা চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবির রূপ নির্দেশ করে থাকে। দ্রুতি বৃদ্ধি পেলে সাধারণত কণার আকারও বৃদ্ধি পায়। ফলে উচ্চ দ্রুতি ফিল্‌মে তোলা ছবির কণাময়তা অনেক বেশি স্পষ্ট। কোন অবদ্রবের বিশ্লিষ্ট করতে পারার ক্ষমতা বলতে বোঝায় কোন ক্ষুদ্র অনুপুঙ্খকে প্রতিচ্ছবিতে ধরতে পারার ক্ষমতা। কণাময়তার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। কণার আকার ছোট হলে বিশ্লিষ্ট করতে পারার ক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিম্ন দ্রুতি ফিলমের এই ক্ষমতা সাধারণত বেশি।

দ্রুতি অর্থাৎ ফিলমের সংবেদনশীলতার মান গাণিতিক নিয়মে সংখ্যার দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রচলিত ফিল্‌মে মার্কিন পদ্ধতি অনুযায়ী এ. এস. এ. (American Standards Association) সংখ্যা ও জার্মান পদ্ধতি অনুসারে ডি. আই. এন. (Deutsche Industrie Norm) সংখ্যার উল্লেখ করে সংবেদনশীলতার মান বোঝানো হত। এর মধ্যে ফিল্‌ম দ্রুতির এ. এস. এ. পদ্ধতি পাটিগাণিতিক ও ডি. আই. এন. পদ্ধতি লগারিদ্‌মিক। ফলে সংবেদনশীলতা দ্বিগুণ হলে এ. এস. এ. সংখ্যা দ্বিগুণ হয় এবং ডি. আই. এন. সংখ্যার মান তিন বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে যে G. O. S. T. পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাও ছিল পাটিগাণিতিক; সংবেদনশীলতা দ্বিগুণ হলে 'গোস্ট' সংখ্যাও দ্বিগুণ হত। এই মাপকাঠি প্রায় এ. এস. এ. মাপকাঠিরই অনুরূপ। বর্তমানে International Standard Organisation বা I. S. O. উল্লেখ করে ফিল্‌মের দ্রুতি বোঝানো হয়—যাতে ASA ও DIN উভয় সংখ্যারই উল্লেখ থাকে।

একই সংবেদনশীলতা বিশিষ্ট ফিল্‌মের ক্ষেত্রে তিন পদ্ধতির তিনটি পৃথক সংখ্যা উল্লেখ করলে বোঝার সুবিধা হবে—

এ. এস. এ.	ডি.আই. এন.	আই. এস. ও.
১২	১২°	১২/১২°
২৫	১৫°	২৫/১৫°
৫০	১৮°	৫০/১৮°
১০০	২১°	১০০/২১°
১২৫	২২°	১২৫/২২°
১৬০	২৩°	১৬০/২৩°
২০০	২৪°	২০০/২৪°
৪০০	২৭°	৪০০/২৭°

নেগেটিভ ফিল্‌ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত দ্রুতিই হল প্রধান বিবেচ্য (প্রিন্টের

কাগজের ক্ষেত্রে অবশ্য বৈষম্য ও ক্রমায়ণের গুরুত্ব অধিক)। ফিল্মের সংবেদনশীলতা যত বেশি হয়, সিলভার হ্যালাইডে আলোর ক্রিয়া তত দ্রুত হয়। সেইজন্য সংবেদনশীলতাকে দ্রুতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সাধারণ ফোটোগ্রাফিতে আমরা যেসব ফিল্ম ব্যবহার করে থাকি দ্রুতি অনুযায়ী সেগুলিকে চার ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়—ধীর দ্রুতি, মধ্য দ্রুতি, উচ্চ দ্রুতি ও অতি উচ্চ দ্রুতি। বিভিন্ন দ্রুতিসম্পন্ন ফিল্মের মধ্যে, আগেই বলেছি, কেবল যে আলোক-সংবেদনশীলতার তারতম্য হয় তাই নয়, প্রতিচ্ছবির কণাময়তা, বৈষম্য, সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ ধরতে পারার ক্ষমতা প্রভৃতিরও তারতম্য হয়ে থাকে। গাণিতিক সূত্র অনুসারে দ্রুতি = ধ্রুবক ÷ আলোকপাত, আলোকপাত এখানে বেদনমাপক আলোকপাত অর্থে, যা সময় ও আলোর তীব্রতার গুণফলের সমান। ফিলমের দ্রুতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে ব্যবহৃত অবদ্রবের বেধ, ঘনত্ব ও রসস্ফীতির ওপর।

ধীর দ্রুতি ফিল্ম (Slow speed film)

সাধারণত এ. এস. এ. ৫০ পর্যন্ত ফিল্মকে 'ধীর দ্রুতি' ফিলম বলে উল্লেখ করা হয়। এর অন্তর্গত হ্যালাইড কেলাসগুলি অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হয় এবং অবদ্রব ভূমির ওপর অত্যন্ত পাতলা করে লাগানো থাকে। সেজন্য এর প্রতিচ্ছবিতে কোন কণা দেখা যায় না, বেশ সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ ধরা পড়ে এবং বৈষম্যের মাত্রা হয় বেশি। তবে আলোকপাত অত্যন্ত নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। আলোকপাতের সামান্য হেরফের হলে ছবি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আলোকিত স্থানের বহির্দৃশ্য ছাড়া ক্যামেরাকে সাধারণত ত্রিপদে ব্যবহার করার দরকার হয়। অতিসূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ সহ প্রতিচ্ছবি ও খুব বড় আকারের বিবর্ধনের প্রয়োজনে এই ফিলম বেশ কার্যকারী। তবে এতে বিষয়বস্তুর নির্বাচন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, কেননা অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ধরে আলোকপাতের প্রয়োজন হয়। শাটার দ্রুতি ও লেন্সের উন্মেষ যেমন আলোকপাতকে দ্বিগুণ বা অর্ধেক করে অগ্রসর হয়, ফিল্মের দ্রুতিও অনুরূপভাবে দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ফলে যে দৃশ্যের জন্য ২০০ এ. এস. এ. ফিলমে f/৮-য়ে ১/৩০ সেকেণ্ড অলোকপাত লাগে তার জন্য ৪০০ এ. এস. এ. ফিল্মে f/৮-য়ে ১/৬০ সেকেণ্ড আলোকপাতের দরকার হবে বা f/১১-য় ১/৩০ সেকেণ্ড আলোকপাতের।

মধ্য দ্রুতি ফিল্ম (Medium speed film)

এ. এস. এ. ৬৪ থেকে এ. এস. এ. ১৬০ পর্যন্ত ফিল্মকে 'মধ্য দ্রুতি' ফিল্ম হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর দ্রুতি, কণাময়তা, বৈষম্য ও অনুপুঙ্খ ধরতে পারার ক্ষমতা—এগুলির মধ্যে একটা সুন্দর, কার্যকারী সামঞ্জস্য থাকায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ফিল্মের উপযোগিতা খুব বেশি। ধীর দ্রুতি ফিল্ম অপেক্ষা এর আলো-ছায়ার বৈষম্য কম হয় এবং আলোকপাতের সামান্য তারতম্য হলেও ছবি পেতে কোন অসুবিধা হয় না। যত্ন করে পরিস্ফুটন করলে অনুপুঙ্খসহ ছবি অনায়াসেই আট গুণ পর্যন্ত বড় করা যায় যাতে দৃষ্টিগোচর কোন ত্রুটি থাকে না।

উচ্চ দ্রুতি ফিল্ম (High speed film)

এ. এস. এ. ২০০ থেকে ৫০০ বা ৬৪০ পর্যন্ত ফিল্মকে 'উচ্চ দ্রুতি' ফিল্ম বলা যায়। কম আলোয় বা গতিশীল বস্তুর ছবির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী এই ফিল্ম। এতে কালো-সাদার বৈষম্য বেশ কম হয় বলে যেসব দৃশ্যবস্তুতে আলোছায়ার তারতম্য বেশি সেসব ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট আলোকপাত অপেক্ষা দুধাপ বেশি বা কম আলোকপাতেও ছবি পেতে কোন অসুবিধা হয় না। সাধারণ আলোর ছবির ক্ষেত্রে লেন্সের উন্মেষ কমানো যায় বলে ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতাও অনেকটা বাড়ে। পরিস্ফুটনের সময় বা রাসায়নিকের পরিমাণ বাড়িয়ে এই ফিলমের দ্রুতিকে আরও বাড়ানো যায়। এর ছবিতে আট গুণ বিবর্ধনে স্পষ্ট কণাময়তা দেখা দেয়। ফিলমের দ্রুতি যত বেশি তার ছবির কণাময়তা তত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, ফলে বিবর্ধনের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে। উচ্চ দ্রুতি ফিল্মের মধ্যে ৪০০ এ. এস. এ. ফিল্ম বিশেষত প্রাকৃতিক বহির্দৃশ্যের ছবির জন্য খুব জনপ্রিয় কেননা তা কম আলোর পক্ষেও (যেমন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়) উপযুক্ত এবং এতে ক্রমায়ণের মাত্রাও যথেষ্ট ভাল হয়, কোন কোন ধরনের প্রতিকৃতিও এতে খুব ভাল আসে।

অতি উচ্চ দ্রুতি ফিল্ম (Ultrafast film)

ফিল্মের বিভিন্ন দ্রুতির যে উল্লেখ এখন পর্যন্ত করেছি তা ধারাবাহিক টোনবিশিষ্ট সাদা-কালো নেগেটিভের ও দিনের আলোর পরিপ্রেক্ষিতে। সেই মাপকাঠিতে এ. এস. এ. ৮০০ বা তার ওপরের ফিলম 'অতি উচ্চ দ্রুতি' পর্যায়ে পড়ে। বর্তমান এই ফিলম এ. এস. এ ১৬০০পর্যন্ত পাওয়া যায়। নিচে বিভিন্ন দ্রুতির বিপরীতে আপেক্ষিক বেদনমাপক আলোকপাতের প্রয়োজনীয় সংখ্যা দেওয়া হল :

এ. এস. এ.	প্রয়োজনীয় আপেক্ষিক আলোকপাত
৮০০	৪
১,০০০	৩.২
১,৩০০	২.৫
১,৬০০	২

প্রয়োজনে বিশেষ পরিস্ফুটনের (Push development) মাধ্যমে এই ফিল্মের দ্রুতি দুই থেকে তিন গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়াও যায়। এর অবদ্রব বেশ মোটা প্রলেপে লাগানো হয় এবং হ্যালাইড কেলাসগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ও পরিমাণে অধিক হয়। যে জন্য এর ছবিতে কণাময়তা বেশ স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয় এবং অনুপুঙ্খও কমে যায়। গভীর ছায়াযুক্ত বহির্দৃশ্যে, অত্যন্ত কম আলোয় ঘরের মধ্যে অথবা রাত্রে সাধারণ আলোয় ছবি তোলার ক্ষেত্রে এই ফিল্ম অত্যন্ত উপযোগী। এমনকি এর সাহায্যে একটা মাত্র মোমবাতির আলোতেও ভাল ছবি তোলা যেতে পারে, সেই ছবিতে শুধু কিছু সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খের ঘাটতি থাকবে। বহির্দৃশ্যে সাধারণ আলোয় ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাতে একটি নিউট্রাল ডেন্সিটি ফিল্টার ব্যবহার করার দরকার হয়। দৃশ্যগত কারণে বা ছবিতে

কোন একটি বিশেষ মাত্রা আনার প্রয়োজনে এই ফিল্মের সাহায্যে বড় কণাযুক্ত ছবি তোলা হয়ে থাকে। কণাময়তা যদি অসুবিধার কারণ না হয় তবে এই ফিল্মে অত্যন্ত কম আলোয় অ্যাক্শনের দৃশ্য তোলা সম্ভব।

এই সাধারণ ব্যবহারোপযোগী ফিল্ম ছাড়াও অনুলিপি করার জন্য সাদা-কালো অনুলিপি ফিল্ম (Copying film) পাওয়া যায়। হাতে আঁকা বা ছাপা কোন ছবি অথবা সোজাসুজি কোন ফোটোগ্রাফ থেকে অনুলিপি করার প্রয়োজনে এই ফিল্ম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রঙীন কোন ছবি থেকে সাদা-কালো অনুলিপির জন্য প্যানক্রোমেটিক অনুলিপি ফিল্ম ও সাদা-কালো ছবি থেকে সাদা-কালো অনুলিপির জন্য অর্থোক্রোমেটিক অনুলিপি ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনমত ফিল্টার ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই ফিল্ম দু ধরনের হয়ে থাকে; একটি সাধারণ বৈষম্যের, যাতে সাদা ও কালোর মাঝে ধূসরতার অনেকগুলি স্তর বা টোন পাওয়া যায়। অপরটি উচ্চ বৈষম্যের যাতে পরিষ্কার সাদা ও ঘন কালো ছাড়া আর কোন স্তর বা টোন থাকে না। এগুলি কালি কলমে আকা রেখাচিত্র বা টোন-বিহীন কোন চিত্রের অনুলিপির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এই ফিলমকে লাইন ফিল্ম বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আরও উচ্চ বৈষম্যযুক্ত ফিলম যাকে লিথ ফিল্ম (Lith film) বলা হয়ে থাকে তা সাধারণ ও অন্য ফিলমে ব্যবহারকারী রাসায়নিকে পরিস্ফুটন করা হয় না। অতি সূক্ষ্ম দানাযুক্ত এই অবদ্রবের প্রলেপ অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ খুব ভালভাবে ধরা পড়ে। এই ফিল্মে সাদা-কালো ছাড়া অন্য কোন টোন ধরা পড়ে না। তা সাধারণত বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপনের কাজের জন্য অটোস্ক্রীন (Auto screen)—যাতে আগে থেকেই সমানভাবে বিন্দু বসানো থাকে এবং কনট্যুর ফিল্ম (Contour film)—যাতে ছবি তুললে কিছু অংশ নেগেটিভের মত ও কিছু অংশ পজিটিভের মত দেখায়, তা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও আছে কালো- সাদা রিভার্সাল ফিল্ম যাতে ছবি তুললে ফিলমের ওপর সরাসরি পজিটিভ ছবি ওঠে এবং তা প্রক্ষেপের কাজে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ ধরনের অবদ্রব ব্যবহার করার ফলে এটা সম্ভব হয়। চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবিটি গঠিত হয় অবদ্রবের মধ্যে। প্রথম আলোকপাত ও পরিস্ফুটনের পরও, যে সিলভার লবণ অবশিষ্ট থেকে যায় তার সাহায্যে।

এগুলি ছাড়া আরও যেসব বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম প্রস্তুত করা হয় তাও সবই বিশেষজ্ঞদের বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য। ইনফ্রারেড ফিল্ম অবলোহিত আলোতে ছবি তুলতে সক্ষম; তা আমাদের দেশে জনসাধারণের জন্য পাওয়া যায় না । সাধারণত অন্য আলো সরিয়ে রখার জন্য এতে লাল ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। এক্স-রে ফিল্ম অতিবেগনি ও এক্স রশ্মিতে ছবি তোলে, যা সাধারণত চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাইক্রো এবং মাইক্রোফিচ্ ফিল্ম (Micro/Microfiche film) যা দিয়ে বইয়ের পাতার বা ফাইলের চিঠিপত্রের অতি ক্ষুদ্র নেগেটিভ করে অত্যন্ত ছোট স্থানে সংরক্ষিত করে রাখা সম্ভব । মাইক্রো ফিল্মের ক্ষেত্রে এই সংকোচনের হার ১:১০

অনুপাত থেকে ১:৪০ অনুপাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ফিল্‌মের অবদ্রব সাধারণত প্যান্‌ক্রোমেটিক প্রকৃতির, তার দানা খুবই সূক্ষ্ম ও মিহি এবং তার অতি সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ ধরতে পারার ক্ষমতা খুব বেশি। অসাধারণ ধারণক্ষমতার জন্য মাইক্রো ফিল্‌মকে বলা হয়েছে ফিল্‌ম কম্পিউটার। এ ছাড়াও বহু ধরনের ফিল্‌ম রয়েছে কিন্তু সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে।

রঙীন ফিল্‌ম

যে সমস্ত ফিল্‌ম সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হল তা সবই সাদা-কালো ফিল্‌ম যার সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুবর্ণের তারতম্য সাদা-কালো স্তরের ক্রমায়ণের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তুর রঙীন প্রতিরূপ পেতে হলে রঙীন ফিল্‌মের প্রয়োজন। ফোটোগ্রাফির ইতিহাসে কালো-সাদা ছবি পাবার অল্প কিছুদিন পর থেকেই রঙীন প্রতিচ্ছবি পাবার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। জে. সি. ম্যাক্সওয়েল ১৮৫৫ সালে প্রথম রঙীন ফোটোচিত্র দেখাতে সক্ষম হলেন। তিনি বিভিন্ন রঙের ফিল্‌টারের সাহায্যে একই বস্তুর পর পর কয়েকটি ছবি তুললেন। সেই নেগেটিভগুলি থেকে কালো সাদা স্লাইড তৈরি করে তা তিনটে প্রোজেক্টরের সাহায্যে পর্দায় একই সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত করলেন। প্রতিটি প্রোজেক্টরের স্লাইড যে রঙের ফিল্‌টারের সাহায্যে তোলা হয়েছিল, সেই প্রোজেক্টরের আলোতেও ঐ একই ফিল্‌টার ব্যবহার করা হল। তিনটি প্রোজেক্টরের প্রক্ষিপ্ত ছবি একত্রে মিশে একটি রঙীন ছবি দেখতে পাওয়া গেল। এই ছবির মান অবশ্য আজকের ছবির তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট ছিল। তবে মনে রাখতে হবে তখনও প্যান্‌ক্রোমেটিক ফিল্‌মের জন্ম হয় নি, সুতরাং লাল ও সবুজ রঙের প্রতি সংবেদনশীল ফিল্‌মও ছিল না। আজকের বিচারে এই পরীক্ষা হয়ত অপ্রয়োজনীয় ভাবে জটিলও ছিল। তা সত্ত্বেও এই পরীক্ষার প্রধান তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, যে, লাল, সবুজ ও নীল আলোকের বিভিন্ন সমবায়ের মাধ্যমে অন্য প্রায় সমস্ত রঙ তৈরি করা সম্ভব। যেজন্য তিনটে পৃথক উৎস থেকে রঙীন আলোকরশ্মি একত্রে একটি ঈষদচ্ছ পর্দার যেখানে লাল ও সবুজ রশ্মির মিলন হবে সেখানে হলুদ রঙ, যেখানে নীল ও সবুজ রশ্মির মিলন হবে সেখানে নীলাভ-সবুজ রঙ এবং যেখানে লাল ও নীল রশ্মির মিলন হবে সেখানে ম্যাজেন্টা রঙ দেখা যাবে। যেখানে, পর্দার কেন্দ্রস্থলে, লাল, সবুজ ও নীল, তিন রশ্মির মিলন হবে সেই অংশটি দেখাবে সাদা। দৃশ্য-ইন্দ্রিয় অনুসারে রঙের ক্ষেত্রে তাই লাল, সবুজ ও নীলকে বলা হয় মুখ্য বা প্রথমিক রঙ। ম্যাক্সওয়েলের এই ত্রিবর্ণতত্ত্ব-ই রঙীন ফিল্‌ম তৈরির মূল ভিত্তি এবং আধুনিক কালে রঙীন আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রসারের কারণ।

একদিকে যেমন প্রাথমিক তিনটি রঙের সংযোগে অন্যান্য বিভিন্ন রঙ সৃষ্টি হতে পারে আবার সাদা আলো থেকে বর্ণালির কিছু রঙ নির্বাচিত ভাবে তুলে নিয়েও বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমটিকে যুত (additive) পদ্ধতি ও দ্বিতীয়টিকে বিযুত

(subtractive) পদ্ধতি বলা হয়। যুত পদ্ধতিতে কোন্ কোন্ রঙ মিশিয়ে আমরা কী রঙ পাই তা একটু আগেই বলেছি। অপর দিকে বিযুত পদ্ধতি অনুযায়ী সাদা আলো থেকে যদি নীল তুলে নিতে চাই, তা হলে আলোর সামনে একটা হলুদ ফিল্টার ব্যবহার করলেই ঐ হলুদ মাধ্যমটি আলোর নীল রশ্মিকে শোষণ করে নেবে এবং লাল ও সবুজ রশ্মিকে তার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে যেতে দেবে। সবুজ রশ্মিকে অপসারিত করতে হলে ম্যাজেন্টা ফিলটার ও লাল রশ্মিকে অপসারিত করতে হলে নীলাভ-সবুজ (cyan) ফিলটার ব্যবহার করলেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে প্রাথমিক রঙ নীল, সবুজ ও লালের পরিপূরক (complementary) হল হলুদ, ম্যাজেন্টা ও নীলাভ সবুজ ।

রঙীন আলোকচিত্রের প্রচলনের প্রথম যুগে রঙীন ছবির পরিস্ফুটন ও মুদ্রণের পদ্ধতি ছিল জটিল ও শ্রমসাধ্য। যেজন্য প্রাযুক্তিক ও ব্যবহারিক ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রেই রঙের ব্যবহার ঘটত। সাদা-কালো ছবির সেরা আলোকচিত্রশিল্পীরা রঙে ছবি তুলতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। রঙীন ছবির প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল, নিতান্ত, প্রাকৃতিক রঙের বিশ্বস্ত অনুকরণ। ১৮৬৮ সনে Du Hauron কাগজের ওপর রঙীন ছবি তৈরির কিছু কলাকৌশল উদ্ভাবন করলেন। ১৯১৫/১৬ নাগাদ রঙীন ছবি তোলার টেকনিকালার পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত হল। রঙীন ছবির ক্রমবিবর্তনে টেকনিকালার ফিলম হল এক মধ্যবর্তী ও সাময়িক পর্যায়। এই ফিলম তখন তিনটি প্রাথমিক রঙের মধ্যে লাল ও সবুজ এই দুটির প্রতি সংবেদশীল ছিল। ১৯৩২-য়ে অপর প্রাথমিক রঙ নীল এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হল। বিশেষ ভাবে নির্মিত টেকনিকালার ক্যামেরায় আলোকরশ্মিকে তিনটি প্রাথমিক বর্ণের আলোয় বিভাজিত করে প্রতিটি বর্ণের জন্য পৃথক্ নেগেটিভ প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা হত। ১৯৩৮-য়ে একই নেগেটিভ ফিলমকে তিনটি প্রাথমিক বর্ণের প্রতিটির প্রতি সংবেদনশীল করে প্রস্তুত কোডাক্রোম ও আগফাকালার ফিলম বাজারে আবির্ভূত হল। রঙীন ছবির ব্যাপক প্রসার শুরু হল সেই থেকে। ১৯৫০ থেকে রিভার্সাল ফিলম এক্টাক্রোম-এর প্রচলন হতে ফোটোগ্রাফাররা নিজেরাই রঙীন ছবির পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ সহজে করে উঠতে পারলেন। ষাটের দশকে আলোর ত্রিবর্ণতত্ত্বের বদলে নতুন তত্ত্বের প্রস্তাব করলেন এডউইন ল্যাণ্ড।

আধুনিক কালের উন্নত ও সমৃদ্ধ রঙীন নেগেটিভ ফিল্মে (মাল্টিলেয়ার ফিল্ম, ট্রাইপ্যাক, মনোপ্যাক প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত) একই নেগেটিভে লাল, সবুজ ও নীল তিনটি বর্ণের প্রতিটির প্রতি সংবেদনশীল একটি করে অবদ্রবের স্তর অন্তর্ভুক্ত করে নেগেটিভকে রঙীন আলোকচিত্রের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হয়। একটা নির্দিষ্ট ভূমির ওপর অবদ্রবের তিন স্তর পরপর বসানো থাকে। জিলেটিনের দুটি সহস্তর এই তিন স্তরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এই সহস্তর এক ধরনের শোষক হিসেবেও কাজ করে যার মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ বর্ণের আলো সঞ্চারিত হতে পারে না। আলোক রাসায়নিক অবদ্রব তার প্রকৃতির দিক থেকে মূলত নীলের প্রতি সংবেদনশীল। ফলে

নীল-নিবেশনী-অবদ্রবটি বহুস্তর ফিল্‌মের সবচেয়ে ওপরে থাকে। তার নিচে থাকে নীল-শোষণকারী (হলুদ) ফিল্‌টার যা অবশিষ্ট নীল আলোকে সবুজ ও লালের প্রতি সংবেদনশীল অবদ্রবের পরবর্তী দুটি স্তরে পৌঁছতে দেয় না। হলুদ সহস্তরের নিচে থাকে সবুজ-নিবেশনী-অবদ্রবের স্তর। তার নিচে সবুজ-শোষণকারী সহস্তর। তার নিচে লাল-নিবেশনী-অবদ্রবের স্তর। সবচেয়ে তলায় থাকে স্তরগুলিকে ধারণ করে রেখেছে যে ভিত্তিভূমি সেই ভূমিটি। তারও নিচে আলোকবৃত্ত প্রতিরোধী একটি প্রলেপ। অবদ্রবের প্রতিটি স্তরে বর্ণানুসারে দৃশ্যবস্তুর পৃথক পৃথক নিবেশন ঘটে ও তিনটে পৃথক লীন প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে ও সংলগ্নতায় পজিটিভ প্রিণ্টে রঙীন প্রতিবিম্ব পুনর্গঠিত হয়। এর জন্য অবদ্রবের বিশেষ কিছু ভৌত, রাসায়নিক ও ফোটোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। ভূমির অংশটুকু বাদ দিয়ে রঙীন নেগেটিভ ফিল্‌মের বেধ সাধারণত .০০১ ইঞ্চি হয়ে থাকে। তার মধ্যে অবদ্রব স্তরগুলির বেধ .০০০২ থেকে .০০০৫ ইঞ্চি করে, প্রত্যেক দুটি অবদ্রব স্তরকে পৃথক করে রেখেছে মধ্যবর্তী যে জিলেটিন স্তর বা ফিল্‌টার তার বেধ .০০০১ ও .০০০২ ইঞ্চি হয়ে থাকে। মধ্যবর্তী স্তর দুটিকে সবচেয়ে কার্যকারী ও সক্রিয় করার জন্য ডাই ও সিলভার লবণও ব্যবহার করা হয়। আজ অনেক বহুজাগতিক সংস্থা রঙীন নেগেটিভ ফিল্‌ম তৈরি করছেন, এক এক সংস্থার ফিল্‌মের রঙের টোন ও মুডের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য। কোন্ ভৌগোলিক অঞ্চলে ও জলবায়ুতে ব্যবহার করা হবে সেই অনুসারেও ফিলমের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য করা হয়ে থাকে।

অবদ্রবের এই স্তরগুলি স্বচ্ছ হওয়া দরকার নতুবা আলোকরশ্মি এক অবদ্রবের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে পরবর্তী অবদ্রবে পৌঁছতে পারবে না। এই তিনটি অবদ্রবের সংবেদনশীলতা বা দ্রুতিও কম বেশি করতে হয়। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হওয়ার ফলে আলোকের তীব্রতা কমে যেতে থাকে। সুতরাং সবার ওপরে যে নীল-সংবেদনশীল অবদ্রব থাকে তার দ্রুতি অপেক্ষা সবুজ-সংবেদনশীল অবদ্রবের দ্রুতি বেশি করতে হয় এবং সবার পিছনের লাল-সংবেদনশীল অবদ্রবের দ্রুতি স্বভাবতই আরও বেশি করার দরকার হয়। তবে ফিল্‌মের দ্রুতি নীল-সংবেদনশীল অবদ্রবের দ্রুতি হিসাবেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে রঙীন ছবির কলাকৌশলগত জটিলতা অধিক ও এতে খরচও বেশি, তবু সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছবি রঙে তোলাই আস্তে আস্তে নিয়ম হয়ে যাচ্ছে। এর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য।

আমরা আগেই জেনেছি যে বস্তুর কোন নিজস্ব রঙ নেই। বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর রঙকেই বস্তুর রঙ বলে ধরা হয়। সুতরাং বস্তুর ওপর পতিত আলোকরশ্মির বর্ণের তারতম্য অনুসারে বস্তুবর্ণেরও তারতম্য হবে। তবে এই তারতম্য অনেক সময় আমাদের চোখে ধরা পড়ে না—কারণ আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কিছু ধারণা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মানসিক চেতনা এই তারতম্যের একটা সামঞ্জস্য করে নিয়ে বস্তুবর্ণকে একইভাবে দেখে। একে বর্ণানুবর্তিতা বলা হয়। দিনে সূর্যের আলোয় একটা লাল ফুলকে

আমরা যেমন লাল দেখি, রাতে বাল্‌বের আলোয় তাকে আমরা একই রকম লাল দেখি কিন্তু এই দুই লালের মধ্যে আসলে অনেক তফাৎ। তেমনি রোদের আলোর সাদা আর বাল্‌বের আলোর সাদার মধ্যে যে বিস্তর তফাৎ তা আমাদের বোধে ধরা পড়ে না। কিন্তু এই তফাৎ রঙীন ফিল্‌মে ধরা পড়ে—কারণ ফিল্‌মের কোন মানসিক চেতনা নেই যার সাহায্যে সে রঙের একটা সামঞ্জস্য করে নিতে পারে। তাই ফিল্‌মের সাহায্যে অনেক সময় এমন রঙীন প্রতিরূপ পাওয়া যায় যা বৈজ্ঞানিক ভাবে নিখুঁত কিন্তু আমাদের চোখে অস্বাভাবিক। সেজন্য কোন্ আলোয় ছবি তোলা হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে নিয়ে ফিল্‌ম তৈরি করা হয়। যেমন দিনের আলো বা ফ্ল্যাশের তুলনায় কৃত্রিম আলোর ক্ষেত্রে দীর্ঘতর আলোকপাত ও হ্রস্বতর পরিস্ফুটন সময়ের দরকার।

অপর দিকে আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে রঙের সঙ্গে তাপমাত্রার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একটা কালো লোহাকে উত্তপ্ত করলে প্রথমে এটি অনুজ্জ্বল লাল দেখাবে, ক্রমশঃ যত বেশি উত্তপ্ত করা হবে ততই তার রঙ ক্রমশঃ উজ্জ্বল লাল, কমলা, হলুদ, সাদা, নীল ইত্যাদি হতে থাকবে। একটি কালো বস্তুকে ক্রমশঃ উত্তপ্ত করে বিভিন্ন তাপমাত্রায় যে বিভিন্ন রঙ পাওয়া যায় রঙগুলিকে সেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে। এই অনুষঙ্গটিকে বলা হয় আলোকের 'বর্ণ তাপমাত্রা'(Colour temperature)। আলোর পরিমাণকে যেমন পরিমাপ করা যায়, আলোর গুণ বা ধর্মকেও তেমনি পরিমাপ করা যায়। বর্ণ তাপমাত্রা হল এই গুণ বা ধর্মের একটা দিক। আলোর পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান ছবিতে সঠিক আলোকপাতে সাহায্য করে আর আলোর গুণ বা ধর্ম সম্পর্কে ধারণা ছবিতে নির্দিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব করে। সেন্টিগ্রেড ডিগ্রির সঙ্গে ২৭৩ যোগ করে বর্ণ তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং তা কেলভিন ডিগ্রি বা K° বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রঙীন ফিল্‌ম যা পাওয়া যায় তার গায়ে এই কেলভিন ডিগ্রির উল্লেখ করা থাকে যাতে বোঝা যায় ঐ ফিল্‌মটি কোন্ ধরনের আলোয় ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অনেক সময় কেলভিন ডিগ্রি উল্লেখ না করে, 'দিনের আলো', 'কৃত্রিম আলো' বা 'টাংস্টেন আলো' ইত্যাদিও লেখা থাকে। যে সমস্ত সাধারণ উৎসের জন্য রঙীন ফিল্‌ম তৈরি করা হয় সেগুলি হল—১. দিনের আলো ২. ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ ৩. ব্লু কেমিক্যাল ফ্ল্যাশ ৪. স্বচ্ছ কেমিক্যাল ফ্ল্যাশ ৫. ফোটোফ্লাড ল্যাম্প ৬. ষ্টুডিও ল্যাম্প।

মোটামুটি একটা ধারণার জন্য, সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত এই সমস্ত আলোক-উৎসের উত্তাপের পরিমাণের কেলভিন মাপ নিচে দেওয়া হল—

উৎস	তাপমাত্রা
সাধারণ রৌদ্রালোকিত দিনের আলো	৫৫০০—৬০০০°
সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ে রৌদ্রালোক	৬৮০০—৮২০০°
ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ	৪৮০০—৬০০০°
ব্লু কেমিক্যাল ফ্ল্যাশ	৬০০০°
স্বচ্ছ কেমিক্যাল ফ্ল্যাশ	৪০০০°

উৎস	তাপমাত্রা
সাধারণ ফ্ল্যাশ বাল্‌ব	৩৮০০°
১০০ ওয়াট ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব	২৯০০°
ফোটোফ্লাড ল্যাম্প	৩৪০০°
কোয়ার্টজ আয়োডিন ল্যাম্প	৩৪০০°
ষ্টুডিও ল্যাম্প	৩২০০°

দিনের আলোয় ব্যবহার করার জন্য তৈরি ফিল্‌ম যদি টাংস্টেন আলোয় (সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব) ব্যবহার করা হয় তবে ছবিতে একটা লাল আভা দেখা যাবে, আবার টাংস্টেন আলোয় ব্যবহার করার জন্য তৈরি ফিল্‌ম যদি দিনের আলোয় বা ইলেক্‌ট্রনিক ফ্ল্যাশের আলোতে (এই দুই আলোর বর্ণ তাপমাত্রা খুব কাছাকাছি) ব্যবহার করা হয় তবে ছবিতে একটা নীল আভা দেখা যাবে। অভিযোজনের দরুন, ছায়া থেকে আলোয় এসে ছায়ায় অভ্যস্ত চোখ আলোয় মানিযে নেয় বা আলো থেকে ছায়ায় গিয়ে আলোয় অভ্যস্ত চোখ ছায়ায় মানিয়ে নেয়। অভিযোজন আলো ছায়ার বদলে রঙ থেকে রঙের ক্ষেত্রেও হতে পারে। রঙীন ফিল্‌মের এই ক্ষমতা নেই, সুতরাং সাদা-কালো ছবির তুলনায় রঙীন ছবিতে বৈষম্যের মাত্রা কম হয়।

ফিল্‌মের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, ফিল্‌ম প্রস্তুত করা, বিশেষ করে রঙের ভারসাম্য (colour balance) বজায় রেখে ফিল্‌ম প্রস্তুত করা খুব সহজসাধ্য নয়। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা প্রয়োজন, প্রস্তুত হওয়ার পর ফিল্‌মের রঙের ভারসাম্য ঠিকমত আসতে কিছু সময় লাগে এবং ফিল্‌ম প্রস্তুতকারকরা রঙের ভারসাম্য সঠিক মাত্রায় না আসা পর্যন্ত—যাকে 'Maturity aging' বলে—ফিল্‌ম বাজারে ছাড়েন না। সাধারণের ব্যবহার্য রঙীন বা সাদা-কালো ফিল্‌মের কার্টনে কার্যকারিতার মেয়াদ শেষের তারিখ (Expiry date) ও উত্তাপ থেকে রক্ষা করার নির্দেশ থাকলেও সাধারণ তাপমাত্রায় রাখা হয় বলে পরিস্ফুটন না হওয়া পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্‌মের গুণমান ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। রঙীন ফিল্‌মের ক্ষেত্রে রঙের ভারসাম্য নষ্ট হয়, সাদা-কালো ফিল্‌মের ক্ষেত্রে দ্রুতি ও বৈষম্য হ্রাস পায়। আর্দ্রতা ও উচ্চতর তাপমাত্রা এই পরিবর্তনকে দ্রুত করে। ক্রয় করার পর, ব্যবহারের আগে পর্যন্ত আর্দ্রতা প্রতিরোধক মোড়কে ভরে রেফরিজারেটারে রাখলে কেনার সময় ফিল্‌ম যে গুণমানে থাকে, অন্তত সেটুকু গুণমান বজায় রাখা সম্ভব হয়।

ফিল্‌মের গুণমানের এই পরিবর্তন শখের আলোকচিত্রীরা লক্ষ্য করেন না বা যে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাতে খুব একটা কিছু যায় আসে না। কিন্তু পেশাদারী কাজের ফিল্‌ম-এর গুণমান সর্বোচ্চ স্তরে থাকা অত্যন্ত জরুরি। পেশাদার আলোকচিত্রীরা ফিল্‌ম থেকে প্রতিটি রঙ সুনির্দিষ্ট মাত্রায় আশা করেন এবং ছবি তোলার সময় সুনির্দিষ্ট ভাবেই তাঁরা আলোকের ব্যবহার করে থাকেন। Maturity aging-এর পর ক্রেতার হাতে আসার আগে 'প্রোফেশনাল' ফিল্‌ম নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকে

এবং কার্টনগুলির গায়ে মেয়াদ শেষের তারিখ ছাড়াও ৫৫° ফা./১৩° সে. তাপমাত্রার নিচে রাখার নির্দেশ ও 'Professional' কথাটিও লেখা থাকে। বেশিদিন রাখার প্রয়োজন হলে ফিল্মকে হিমায়িত (freeze) করে রাখলে মেয়াদ শেষের পরও তা ব্যবহারযোগ্য থাকতে পারে। তবে রেফরিজারেটর থেকে বার করে, ব্যবহার করার আগে বেশ কিছুক্ষণ (অন্তত ঘণ্টা তিনেক) সাধারণ তাপমাত্রায় রাখার পরই ফিলমের মোড়ক খোলা উচিত; নচেৎ তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তনে ফিল্মটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ফিলটার

রঙীন ফিল্মের এই সমস্ত কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা সংশোধন করার প্রসঙ্গে আমরা ফিলটারের কথায় আসছি। ফিলটার হল জিলেটিন, অপটিক্যাল বা সলিড কাঁচ, প্লাষ্টিক, বা বিশেষ কোন তরল ভূমির ওপর স্থাপিত এক সূক্ষ্ম, সমসত্ত্ব, শুষ্ক, স্বচ্ছ প্লেট যা দৃশ্যবস্তু থেকে আগত বর্ণালীর অংশ বিশেষ শোষণ করে নিতে পারে। যে কোন ফিলটার দৃশ্যবস্তু থেকে আগত আলোর পরিমাণকে দুভাবে কমিয়ে দেয়—বিশেষণের মাধ্যমে নির্বাচিত ভাবে (যেটা নির্ভর করে ফিলটার প্রস্তুতির সময় কী ধরনের ডাই ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর) ও সাধারণ ভাবে পৃষ্ঠ প্রতিফলনের মাধ্যমে (যা মূলত ডাইবিহীন নিরপেক্ষ ফিলটারের কাজ)। ফলে ফিলটার ব্যবহার করে দৃশ্যবস্তুর রঙ ও টোনের বিন্যাস নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করা সম্ভব। বস্তুর ওপর পতিত আলোকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আলোর উৎসমুখে অথবা ক্যামেরা লেনসের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলোকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য লেনসের সম্মুখে ফিলটার ব্যবহার করা যায়। প্রথমটিকে ল্যাম্প ফিলটার ও পরেরটিকে ক্যামেরা ফিলটার বলা হয়। তবে ফিলটার লেনসের সঙ্গে ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলে এই ব্যবহারটিই বেশি প্রচলিত। ফিলটার ফিল্মের ওপর গিয়ে পড়া আলোর পরিমাণ কমিয়ে দেয় বলে তা ব্যবহার করা হলে আনুপাতিক হারে আলোকপাতও বৃদ্ধি করতে হয়। এটা আলোকপাতের সময় বাড়িয়ে বা লেনসের অ্যাপারচার প্রশস্ত করে যেকোন ভাবে সম্ভব। সাদা-কালো আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে আলোকপাত প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কিছু কম করেও পরিস্ফুটন কাল অপেক্ষাকৃত বাড়িয়ে ফিলটারকে আরও ফলপ্রদ করে তোলা হয়।

ফিলটারের বেধ নির্ভর করে তার ভূমি কী দিয়ে তৈরি তার ওপর। এই বেধ জিলেটিন ভূমির ক্ষেত্রে ০.১ মি. মি. হলে কাঁচের ভূমির ক্ষেত্রে ৬ মি. মি. পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ প্রয়োজনে যখন দুই বা ততোধিক ফিলটারকে একত্র করে ব্যবহার করা হয় তখন বেধ স্বভাবতই বেড়ে যায়। ফিলটারের কর্মক্ষমতাকে প্রকাশ করা হয় ফিলটার ফ্যাক্টর-এর সাহায্যে, তা কোন ধ্রুবক সংখ্যা নয়, তা নির্ভর করে ফিলটারের বর্ণ ও বেধের ওপর এবং ফিল্মের বর্ণসংবেদনশীলতা, আলোকের বর্ণ ও বস্তুবর্ণের ওপর। সাদা-কালো ছবির ক্ষেত্রে ফিলটার ফ্যাক্টর ৩০/৩৫ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু রঙীন ফিল্মের ক্ষেত্রে তা কদাচিৎ বেশি হয়ে থাকে, কেননা সাধারণত অল্প পরিমাণ সংশোধন

ও পরিবর্তনেরই সেখানে প্রয়োজন হয়।

কালো-সাদা বা রঙীন যে কোন ফিল্মে ফিল্টার ব্যবহার করার পাঁচটি মূল কারণ থাকতে পারে— ১. ফিল্মের অশুদ্ধ বর্ণসংবেদনশীলতা সংশোধন করা ২. বিশেষ বিশেষ বর্ণকে প্রয়োজনমত উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল করে, বস্তুর বর্ণঔজ্জ্বল্যের তারতম্য সঠিকভাবে ধরে প্রতিচ্ছবিতে স্বাভাবিক-বর্ণসমতা আনা, বা, বিশেষ প্রভাব সৃষ্টির জন্য বর্ণদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা ৩. আলোর বর্ণতাপমাত্রাকে পরিবর্তিত করা ৪. একটিমাত্র বর্ণের আলোর সাহায্যে চিত্রগ্রহণ ও ৫. সমাবর্তিত আলোয় চিত্রগ্রহণ বা ছবিকে সমাবর্তিত আলোর প্রভাব থেকে মুক্ত করা।

এইভাবে ফিল্টার ব্যবহার করে একজন আলোকচিত্রশিল্পী প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক রঙের বিমূর্তকরণ ও শৈল্পিক পরিবর্ধন করতে পারেন, ছবিতে সৃষ্টি করতে পারেন অসাধারণ পরিবেশ বা বিশেষ মেজাজ ও রস এবং প্রকাশ করতে পারেন নিজস্ব বক্তব্য। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই এ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। আমরা এখন কয়েকটি ফিল্টার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করে ফিল্টার বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা গ্রহণের চেষ্টা করব।

ইউ. ভি. ফিল্টার (Ultraviolet filter)

অতিবেগনি ফিলটার সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে একটু বেশি উচ্চতায় অর্থাৎ পাহাড়ের ওপর যেখানে অতিবেগনি রশ্মির প্রভাব বেশি সেখানেই ব্যবহার করা হয়। অতিবেগনি রশ্মির জন্য অধিক উচ্চতায় দূরের দৃশ্যে যে অস্পষ্টতা থাকে এবং রঙীন ফিল্মে যে অতিরিক্ত নীল রঙ ধরা পড়ে তা এই ফিল্টারে কেটে যায়। অতিবেগনি রশ্মি যেখানে নেই বা অত্যন্ত কম, সেখানে এই ফিল্টার কোন কাজ করে না। এটির কোন রঙ নেই, সেজন্য এক্ষেত্রে আলোকপাত বাড়াবার কোন দরকার হয় না। অনেকে ক্যামেরার মূল্যবান লেনসকে ধূলোবালি বা ময়লা থেকে রক্ষা করার জন্য এই ফিল্টার সবসময় ব্যবহার করেন। তবে ক্যামেরা লেনসের বিভিন্ন ত্রুটি লেন্সের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে-ই সংশোধন করা থাকে, সেক্ষেত্রে কোন ফিল্টারের অতিরিক্ত ব্যবহার লেনসের সর্বাধিক কর্মদক্ষতাকে ব্যাহত করতে পারে। তাছাড়া ফিলটারের নিজস্ব দৃক-বিজ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি তো আছেই। ফলে ফিল্টার, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে, ব্যবহার না করাই ভাল। একথা ইউ. ভি. ফিলটারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পোলারাইজিং ফিল্টার (Polarizing filter)

এই ফিল্টারকে পোলাস্ক্রীনও বলা হয়ে থাকে । কাঁচ , জল, পালিশ করা কাঠ বা ধাতুর মত যে কোন চকচকে পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত চোখ-ধাঁধানো আলো (glare) এর সাহায্যে দূর করা যায়। এই ফিল্টারে সমান্তরালভাবে অতিসূক্ষ্ম অসংখ্য কেলাসাকার বিন্দু থাকে এবং চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রতিফলিত আলোর কৌণিক অবস্থানের সঙ্গে সমান্তরাল রেখাকে সমকোণে এনে গ্লেয়ার কাটানো হয়। রিফ্লেক্স ক্যামেরায় লাগিয়ে ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। এতে সাধারণত ৪০° থেকে ৭০°

কৌণিক অবস্থানের গ্লেয়ার ভালভাবে কাটে। রঙীন ফিল্মের ক্ষেত্রে এই ফিল্টার আলো এবং ক্যামেরার ৯০° কৌণিক অবস্থানের নীল রঙকে গাঢ়তর করে। সাধারণত আলোকপাত এক ষ্টপ বাড়াতে হয়। খুব ঘন ফিল্টার হলে কখনো কখনো আলোকপাত তিন গুণ (অর্থাৎদেড় ষ্টপ)-ও বাড়াতে হতে পারে।

এন. ডি. ফিলটার (Neutral density filter)

এই ফিলটার কেবল আলোকের তীব্রতা কমায়। অত্যন্ত বেশি আলোতে অধিক দ্রুতির ফিলম ব্যবহার করার সময় এই ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। রঙের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয় না। আলোকপাত ঠিক করতে হয় ফিল্টারের ঘনত্ব অনুপাতে। ধূসর ফিল্টার সমস্ত রঙের আলোকেব তীব্রতা সমানভাবে ও রঙীন ফিলটার বর্ণানুসারে কোন কোন রঙের আলোব তীব্রতা কমিয়ে থাকে। এন. ডি. ফিল্টার হল ধূসর ফিলটার প্রকৃতির। এখানে বলা দরকার, মূল ফিলমের দ্রুতিকে ব্যবহৃত ফিলটারের ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করলে কার্যকাবী দ্রুতি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ৩ ফিলটার ফ্যাক্টর-এর ক্ষেত্রে, ১০০ এ. এস. এ. ফিলমেব নতুন, কার্যকারী দ্রুতি হবে ৩৩ এ. এস. এ.। সাদা-কালো ফিল্মের ক্ষেত্রে ফিলটার ফ্যাক্টর-এর সঙ্গে অ্যাপারচার পরিবর্তনের সম্পর্কের তালিকাটি নিচে দেওয়া হল—

ফিলটার ফ্যাক্টর	১ ১/২	২	৩	৪	৫-৬	৭-৯	১০-১৩	১৪-১৮	২০-২৭	৩০-৩৫
অ্যাপাবচার বৃদ্ধি	১/২	১	১ ১/২	২	২ ১/২	৩	৩ ১/২	৪	৪ ১/২	৫ ষ্টপ

হালকা হলুদ ফিলটার

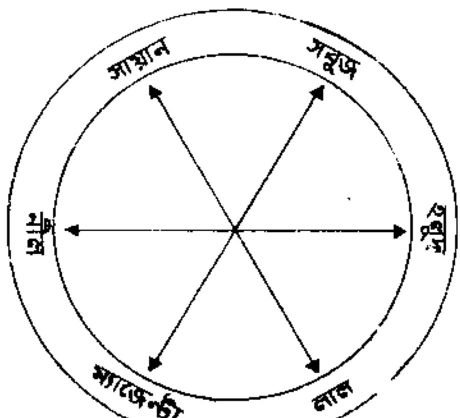
সাধারণত প্রাকৃতিক দৃশ্যে নীল আকাশকে গাঢ়তর এবং সবুজ গাছপালাকে স্বাভাবিক করাব জন্য এই ফিলটার ব্যবহার করা হয়। আকাশ গাঢ়তব হলে সাদা মেঘগুলিকেও বেশি উজ্জ্বল দেখায়। তাছাড়া সাধারণ কালো-সাদা প্যানক্রোমেটিক ফিলমে বিভিন্ন রঙের তারতম্য মোটামুটি ভাল ধরা পড়লেও, বিভিন্ন রঙের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য সঠিকভাবে ধরা যায় না। নীল অপেক্ষাকৃত হালকা এবং হলুদ ও সবুজ অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়, সেজন্য হলুদ ফিলটার ব্যবহার করে একই সঙ্গে নীল আকাশকে গাঢ়তর ও সবুজ গাছপালাকে হালকা করে রঙেব মাত্রার সমতা আনা যায়। রঙীন ফিল্মের ক্ষেত্রে পোলারাইজিং ফিলটাবের ব্যবহার একই ফল দেবে। সমস্ত আকাশকে গাঢ় নীল দেখাবে, শুধু দূর দিগন্তে হালকা নীল। হলুদের পরিবর্তে হলুদ-সবুজ ফিলটার ব্যবহাব করে আকাশ ও গাছপালার সম্পর্কের মধ্যে অধিক বৈষম্যও সৃষ্টি করা সম্ভব।

স্কাই ফিলটার (Sky filter)

এই ফিলটারের মাঝখান থেকে ওপরের অর্ধেক হালকা হলুদ থেকে ক্রমশঃ গাঢ় হলুদ হয়ে গেছে। সাধারণত প্রাকৃতিক বা সমুদ্রতীরবর্তী দৃশ্যে যেখানে নীল আকাশ থেকে খুব বেশি আলো প্রতিফলিত হয়, সেখানে এই ফিল্টার আকাশ ও পুরোভূমির মধ্যে চমৎকার সমতা আনে । এর নিচের অর্ধেক অংশে কোন রঙ থাকে না, সেজন্য আলোকপাত বৃদ্ধি করারও দরকার হয় না। এছাড়া কালো-সাদা ফিল্মে ব্যবহাব করার

জন্য কমলা, লাল ও সবুজ ফিল্টারও আমরা কাজে লাগাতে পারি। এই ধরনের প্রতিটি ফিলটারই রঙের সমতাকে অনেকখানি পালটে দেয়। লাল ফিল্টার নীল আকাশকে যেমন রাত্রির আকাশের মত কালো করে দিতে পারে তেমনি লাল ফুলকে সম্পূর্ণ সাদা করেও দিতে পারে। সবুজ ফিলটার আবার নীল ও লাল উভয়কেই কালো করে দিয়ে থাকে। তবে ফিল্টার সম্বন্ধে যে কথাটা মনে রাখা দরকার তা হল, যে রঙের ফিল্টার ব্যবহার করা হচ্ছে, কালো-সাদা ছবির ক্ষেত্রে সেই রঙকে সে হালকা বা মৃদু করবে এবং তরঙ্গ দৈর্ঘের দিক থেকে যে রঙগুলি তার বিপরীত তাদের কৃষ্ণতর করবে আর রঙীন ছবির ক্ষেত্রে সেই রঙকে আরও গাঢ় করবে এবং তার বিপরীত রঙগুলিকে অস্বাভাবিক করে তুলবে। প্রত্যেকটি গাঢ় রঙের ফিলটাব ছবির টোনের ভারসাম্য নষ্ট করে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে বলা দবকার, সাদা-কালো ছবিতে চিত্ররস সৃষ্টি হয় টোনের বৈষম্যের ফলে কেননা বিভিন্ন রঙ ধূসরের বিভিন্ন মাত্রায় ধরা পড়ে আর রঙীন ছবিতে বর্ণস্বাতন্ত্র্যের ফলে।

ফিল্টার ব্যবহার করার সময় আমরা যদি মনে রাখি যে আলোর পরিপূরক রঙগুলি প্রাথমিক রঙগুলির বিপরীতে অবস্থান করে তাহলে টোনের প্রয়োজনীয় মাত্রার জন্য কোন্ রঙের ফিলটার ব্যবহার করতে হবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখানে এই চিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে হলুদ ফিলটার ব্যবহার করলে নীল রশ্মিকে সে



পুরোপুরি আটকে দেবে এবং সবুজ ও লালকে মাঝামাঝি ভাবে প্রবেশ করতে দিয়ে তাদের একটা মাঝারি, হালকা টোন দেবে। একইভাবে ম্যাজেন্টা ফিল্টার সবুজ রশ্মিকে ও সায়ান বা নীল সবুজ ফিল্টার লাল রশ্মিকে আটকে দেবে। তবে রশ্মিগুলি কতটা পরিমাণে আটকাবে তা নির্ভর করবে ব্যবহৃত ফিল্টারের ঘনত্বের ওপর।

রঙীন ফিল্মে অনেক রকম ফিল্টার ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। আগেই বলেছি, রঙীন ফিল্ম বিভিন্ন উৎসের আলোর বর্ণতাপমাত্রা অনুযায়ী, কেলভিন ডিগ্রির হিসাবে, তৈরি হয়ে থাকে। দিনের আলোতে ব্যবহার করার জন্য যে ফিল্ম তৈরি হয় তার বর্ণতাপমাত্রা ৫৫০০ থেকে ৬০০০ কেলভিন ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর কৃত্রিম আলোর ক্ষেত্রে, ফোটোফ্লাড আলোয় ব্যবহার করার জন্য টাইপ এ ফিল্ম (৩৪০০ কে°) ও ষ্টুডিও আলোয় ব্যবহার করার জন্য টাইপ বি ফিল্ম (৩২০০ কে°) বাজারে পাওয়া যায়। কৃত্রিম আলোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার আলো পাওয়া যায় বলে সেই তাপমাত্রার ফিল্মে রঙ বেশ ভালই পাওয়া যায় । কিন্তু দিনের আলোর বর্ণতাপমাত্রা কখনই একরকম থাকে না । সেজন্য ছবির রঙও অনেক সময় সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব হয় না। নেগেটিভ ফিল্মের ক্ষেত্রে অল্প স্বল্প তারতম্য ছবি প্রিন্ট করার সময় প্রিন্টার লেনসের সঙ্গে ফিলটার ব্যবহার করে ঠিক করে নেওয়া যায়, কিন্তু রিভার্সাল ফিল্মের ক্ষেত্রে সে সুযোগ থাকে না। রঙীন ছবির ক্ষেত্রে আলোর বর্ণতাপমাত্রার এই তারতম্য একমাত্র ফিলটারের সাহায্যেই সংশোধন করা যায়। যে ফিলম ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কত বর্ণতাপমাত্রার আলোতে ব্যবহারের উপযোগী এবং যে আলোতে ব্যবহার করছি তার বর্ণতাপমাত্রা কত তা যদি জানা থাকে তা হলে নির্দিষ্ট ফিলটার ব্যবহার করে সেই তারতম্যটুকু অনায়াসে সংশোধন করে নিয়ে ছবিতে প্রয়োজনীয় বর্ণসমতা আনা সম্ভব। তবে নির্দিষ্ট আলোতে ব্যবহারের উপযোগী নির্দিষ্ট ফিল্মে ছবির মান যত ভাল হয়, ফিলম ও আলোর বর্ণতাপমাত্রার তারতম্য ফিলটার দিয়ে সংশোধন করে নিয়ে ছবি তুললে ছবির মান তত ভাল হয় না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কম বর্ণতাপমাত্রার আলো থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি বর্ণতাপমাত্রার আলো পর্যন্ত, যাতে আমরা ছবি তুলে থাকি, কেলভিন ডিগ্রির হিসাব অনুযায়ী তাদের তফাৎ অনেকখানি। একটি মোমবাতির উজ্জ্বল হলুদ শিখার এই তাপমাত্রা ২০০০ কে° এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল উত্তর আকাশের আলোর এই তাপমাত্রা ২৭০০০ কে° । যাকে আমরা সাধারণ ভাবে বলে থাকি দিনের আলো, তার বর্ণতাপমাত্রাও, অঞ্চল ও সময় বিশেষে, ৪৮০০ কে° থেকে ৭৫০০ কে° পর্যন্ত যা কিছু হতে পারে। উচ্চতর বর্ণতাপমাত্রার আলোর ক্ষেত্রে ৩০০ বা ৪০০ কে° তারতম্য ছবিতে খুব দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু নিম্নতর বর্ণতাপমাত্রা ২০০ কে° তারতম্যেই ছবির রঙ বদলে যায়। এই প্রসঙ্গে আলোর মিরেড মানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মিরেড হল ইংরাজি Micro-reciprocal degrees কথার সংক্ষিপ্ত রূপ। আলোর বর্ণতাপমাত্রা দিয়ে দশ লক্ষকে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাই হল তার মিরেড মান। অর্থাৎ ৫০০০ কে° মানে ১,০০০০০০÷৫০০০=২০০ মিরেড! আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের আলোর কেলভিন ডিগ্রি মাপের সঙ্গে মিরেড মান দিয়ে রঙীন ছবিতে ফিল্টার ব্যবহার করার রীতি বোঝাবার চেষ্টা করছি।

আমরা কিছু আগেই বিভিন্ন উৎসের আলোর বর্ণতাপমাত্রার হিসেব দিয়েছি। তার

মধ্যে প্রাসঙ্গিক তিনটির আবার এখানে উল্লেখ করছি।

উৎস	বর্ণতাপমাত্রা	মিরেড সংখ্যা
উজ্জ্বল সূর্য, নীল আকাশের রৌদ্রালোক	৬২০০ কে°	১৬০
উজ্জ্বল মেঘলা আকাশ	৬৭০০–৭০০০ কে°	১৫০
৫০০ ওয়াট ফোটোফ্লাড	৩৪০০ কে°	২৯৪
৫০০ ওয়াট ষ্টুডিও লাইট	৩২০০কে°	৩১৩

এই তিন রকম আলোর জন্য তিন রকমের ফিল্ম পাওয়া যায়—

দিনের আলোর ফিল্ম : মিরেড সংখ্যা ১৬০

টাইপ এ ফিল্ম : মিরেড সংখ্যা ২৯৪

টাইপ বি ফিল্ম : মিরেড সংখ্যা ৩১৩। এই ফিল্মের সঙ্গে ব্যবহৃত আলোর সমতা আনার জন্য যে ফিল্টার সাধারণত ব্যবহার করা হয় তাদের সিরিজ নম্বর, ডেকামিরেড সংখ্যা (মিরেড সংখ্যাকে ১০ দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত) ও আনুষঙ্গিক আলোকপাত বৃদ্ধির অনুপাত নিচে দেওয়া হল।

ফিল্মের মিরেড সংখ্যা থেকে আলোকের মিরেড সংখ্যা কম হলে ব্যবহার্য ফিল্টার তালিকা—

	সিরিজ নং	ডেকামিরেড সংখ্যা	আলোকপাত বৃদ্ধির অনুপাত
লালচে ফিল্টার	৮১	১	১/৩
	৮১ এ	১.৮	১/৩
	৮১ বি	২.৭	১/৩
	৮১ সি	৩.৫	১/২
	৮১ ডি	৪.২	২/৩
	৮১ ই	৪.৭৫	২/৩
	৮১ ই-এফ	৬	২/৩
	৮১ জি	৬.৫	১

[illegible]

তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো—

	নং	ডেকামিরেড সংখ্যা	আলোকপাত বৃদ্ধির অনুপাত
নীলচে ফিলটার	৮২	১	১/৩
	৮২ এ	২	১/৩
	৮২ বি	৩	২/৩
	৮২ সি	৫	২/৩
	৮২ সি + ৮২	৬	
	৮২ সি + ৮২ এ	৭	
	৮২ সি + ৮২ বি	৮	১ ১/৩
	৮২ সি + ৮২ সি	৯	১ ১/.

ব্যবহৃত ফিল্মের সঙ্গে যে আলোয় ছবি তোলা হচ্ছে তার সমতা আনার জন্য, পূর্বোক্ত তালিকা থেকে ঠিক ফিলটারটি বেছে নিতে হলে, ফিলম ও আলোর ডেকামিরেড সংখ্যার পার্থক্য জানতে হবে। আলোর মিরেড সংখ্যা যদি ফিল্মের মিরেড সংখ্যা থেকে বেশি হয় তাহলে ৮২ নম্বর সিরিজ অর্থাৎ নীল রঙের ফিলটার শ্রেণী থেকে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ফিলটার বেছে নিতে হবে। অপর দিকে ফিলমের মিরেড সংখ্যা আলোর মিরেড সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে লাল রঙের ফিলটার শ্রেণী অর্থাৎ ৮১ নম্বর সিরিজ থেকে ফিলটার বাছতে হবে। ধরা যাক আমরা দিনের আলোর ফিলম ব্যবহার করছি যার ডেকামিরেড সংখ্যা ১৬০ ÷ ১০ = ১৬ এবং ছবি তুলছি উজ্জ্বল মেঘলা আকাশের নিচে যার ডেকামিরেড সংখ্যা ১৫০ ÷ ১০ = ১৫, এখানে ফিল্মের ডেকামিরেড সংখ্যা ১ বেশি, অতএব লাল রঙের ফিলটার শ্রেণী থেকে ৮১ নং ফিলটার ব্যবহার করব যার ডেকামিরেড সংখ্যা ১ এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক আলোকপাতও এক তৃতীয়াংশ বাড়াতে হবে।

এছাড়া আরও বহু রঙের ফিলটার শ্রেণী রয়েছে। যেমন, ৮০ নম্বর সিরিজের ফিলটার, যার সাহায্যে দিনের আলোর ফিল্মে ঘরের ভিতর কৃত্রিম আলোয় ছবি তোলায় কোন অসুবিধা হয় না। বা ৮৫ নম্বর সিরিজের ফিলটার, যার সাহায্যে এ-টাইপ বা বি-টাইপ ফিলমে দিনের আলোয় বা ফ্ল্যাশে ছবি তোলার কোন অসুবিধা হয় না। এগুলি হলুদাভ থেকে কমলাভ (amber) রঙের। যে কোন ফিলটারের সঙ্গে প্রস্তুতকারকের চার্ট থাকে, তাতে আলো ফিলম দৃশ্যবস্তু ও ফিলটার—এই কটির পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত সম্ভাব্য পরিস্থিতির উদ্ভব হ'তে পারে তাদের কথা মনে রেখে আনুষঙ্গিক ফিলটার ফ্যাক্টর-এর তালিকা দেওয়া থাকে, যা অনুসরণ করে ছবিতে রঙের সমতা আনা যায়।

বর্ণসমতা আনার জন্য সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় সংশোধক ফিলটার ব্যবহারের তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দিলাম—

আলোর উৎস		ফলাফল	
জল, তুষার, পর্বত—দূরের দৃশ্য	ডেলাইট	নীলচে আভা	ইউ. ভি. ফিল্টার
ঝাপসা দূরের দৃশ্য	ডেলাইট	নীলচে আভা	হালকা খড় রঙ (ঝাপসা
ঝাপসা আকাশের আলোয়—বাইরে (৭৫০০—৮৪০০ কে°)	ডেলাইট	নীলাভ, শীতল বর্ণ	হালকা খড় রঙ
নীল আকাশের নিচে—ছায়ায় (১০,০০০—১২,০০০ কে°)	ডলাইট	নীল	খড় রঙ
সকাল বা সন্ধ্যার সূর্যালোক (৫০০০—৫৫০০ কে°)		রঙ	নীল
সাধারণ দিনের আলো	কৃত্রিম আলোর ফিল্ম (টাইপ এ বা বি)	নীল	হলুদাভ থেকে কমলাভ অ্যামবার
ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ	ডেলাইট	নির্ভুল	—
কামক	ডেলাইট	হলদেটে আভা	নীলচে রূপান্তরের ফিল্টার
”	টাইপ এ এবং বি	অল্প নীলচে আভা	হলুদাভ রূপান্তরের ফিল্টার
	ডেলাইট	হলদেটে আভা	নীলাভ রূপান্তর
	টাইপ এ	নির্ভুল	—
	টাইপ বি	খুব অল্প নীলচে আভা	খুব হালকা হলুদ
	ডেলাইট	হলুদ আভা	নীলাভ রূপান্তর
	টাইপ এ	অল্প হলুদ আভা	হালকা নীল
	টাইপ বি	নির্ভুল	—
	টাইপ এ এবং বি	হলুদ আভা	জাম রঙ
		গাঢ় কমলা আভা	এত বেশি ত্রুটি যে ফিলটারের সাহায্যে ঠিকভাবে সংশোধন করা অসম্ভব।

রঙীন ছবির ক্ষেত্রে কালো-সাদা ছবির চেয়ে আরও বেশি মাত্রায় বর্ণসমতা নষ্ট করে দিয়ে বাস্তবাতীত ধরনের ছবি সৃষ্টি করা যায়। সেজন্য একই ফিল্টারের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে একই ছবির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের আভা আনা যায় অথবা মধ্য অংশ পরিষ্কার রেখে চারপাশ রঙীন করে অথবা মধ্য অংশ অপরিবর্তিত রেখে চারপাশ ঝাপসা করে নানা ধরনের ফিলটার তৈরি করা হয়। আরও কয়েক ধরনের ফিল্টার রয়েছে যেগুলোকে ঠিক ফিল্টার বলা যায় না। এগুলো ছবিতে বিশেষ বিশেষ এফেক্ট সৃষ্টি করার উপযোগী দৃক-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যেমন বস্তুর রঙকে ভেঙে দেওয়া, উজ্জ্বল আলোক-উৎসকে আলোর তারাতে পরিণত করা, প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত করে একই বস্তুর একাধিক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা, ছবিতে সফ্ট ফোকসের প্রভাব নিয়ে আসা ইত্যাদি। উৎসাহী আলোকচিত্রীরা এসব নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। চলচ্চিত্রে পর্যাপ্ত আলো নিয়ে রাত্রিকালে শ্যুটিং করা সম্ভব না হলে বিশেষ ফিল্টারের সাহায্য নিয়ে দিনের বেলায় শ্যুটিং করে তাকে রাত্রির দৃশ্য হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। শুধু দৃশ্য গ্রহণের সময় নয়, শব্দ গ্রহণ ও পুনর্যোজনের সময়ও বিশেষ কম্পাঙ্কের শব্দ ও ধ্বনিকে নির্বাচিত করা এবং অন্য কম্পাঙ্কের শব্দ ও ধ্বনিকে বাতিল করার কাজে ফিল্টারের ব্যবহার ঘটে।

ফ্ল্যাশলাইট

অত্যন্ত উচ্চ দ্রুতির ফিল্ম ও শক্তিশালী লেন্সের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের আলোয় ছবি তোলা সম্ভব হলেও ফ্ল্যাশলাইটের প্রয়োজনীয়তা আলোকচিত্রে কম নয়। ফ্ল্যাশলাইটের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা তার সহজ বহনযোগ্যতা এবং এর সাহায্যে যে কোন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রিত আলোকের ব্যবহার। অত্যন্ত কম আলোয় ছোট অ্যাপারচার ব্যবহার করে ফোকস গভীরতা বাড়াবার পক্ষে ফ্ল্যাশ লাইট যেমন কার্যকারী ভূমিকা পালন করে অপর দিকে পাশ থেকে বা পিছন থেকে পড়া আলো বস্তুর ওপর যে গভীর ছায়া ফেলে তাকেও প্রয়োজনে আলোকিত করে ছবিতে নির্দিষ্ট টোন আনে। তবে ছবি তোলার সময় আলোকসম্পাতের সঠিক ফলাফল কী হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। ক্যামেরার শাটারের সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইটের বৈদ্যুতিক যোগাযোগ সমন্বিত করা থাকে যাতে শাটার খোলার নির্দিষ্ট মুহূর্তটিতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো জ্বলে ওঠে। বর্তমানে তিন ধরনের ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করা হয়ে থাকে—ফ্ল্যাশ বাল্‌ব, কিউব ও ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ ইউনিট।

ফ্ল্যাশ বাল্‌ব

প্রতিটি বাল্‌ব একবার মাত্র ফ্ল্যাশ করে বা জ্বলে। এই বাল্‌বের মধ্যে ম্যাগনেসিয়ম, অ্যালুমিনিয়ম বা জিরকোনিয়মের মত অত্যন্ত দাহ্যশীল পদার্থে বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটিয়ে অত্যুজ্জ্বল আলোকের সৃষ্টি করা হয়। এই আলোক সধারণ সূর্যালোকের কেলভিন তাপমাত্রার অনুরূপ হালকা নীলাভ আলো। এই আলোর স্থায়িত্ব ১/২৫ থেকে ১/২০০ সেকেণ্ডের মধ্যে। বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য এই ফ্ল্যাশলাইটে সাধারণ ব্যাটারি ব্যবহার করা

হয়ে থাকে। বাল্‌বের পিছনে একটি রিফ্লেক্টরের ব্যবহার এর আলোকের তীব্রতা বাড়ায়।

কিউব

একটি কিউবের মধ্যে একসঙ্গে চারটি আলাদা রিফ্লেক্টরসহ চারটি বাল্‌ব থাকে। এবং প্রতিটি কিউব আলোকসম্পাতের জন্য চারবার ব্যবহার করা যায়। এ কিউবও ব্যাটারির সাহায্যে জ্বালানো হয়।

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ ইউনিট ব্যাটারি অথবা সাধারণ গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে থাকে। একটি ক্যাপাসিটর নিজের মধ্যে শক্তি সংগ্রহ করে রাখে এবং প্রয়োজনের সময় শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসপূর্ণ টিউবের মধ্যে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রেরণ করে আলোকের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস এত উজ্জ্বল আলোকের সৃষ্টি করে যে জ্বলে ওঠার (flash) মতই মনে হয়। একটি সাধারণ ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের আলোর স্থায়িত্ব ১/৮০০ থেকে ১/২০০০ সেকেণ্ডের মধ্যে। এবং একটি ইউনিট কয়েক হাজার বার আলোক সৃষ্টি করতে সক্ষম । ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের আলোর স্থায়িত্ব দ্রুততম শাটার অপেক্ষাও কম হওয়ার জন্য শাটারের সাহায্যে এই আলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এই আলো নিয়ন্ত্রিত করা হয় লেন্‌স অ্যাপারচার ছোট বা বড় করে। সে হিসাবে যে কোন শাটার দ্রুতিতেই ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে বিটউইন দ্য লেন্‌স শাটারে তা করাও যেতে পারে । ফোকল প্লেন শাটারে একটি নির্দিষ্ট দ্রুতির পর সম্পূর্ণ শাটার এক সঙ্গে খোলে না, সেজন্য ফোকল প্লেন শাটার যুক্ত ক্যামেরাতে সম্পূর্ণ শাটার খোলার নিরিখে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া থাকে। ফোকল প্লেন শাটারযুক্ত ক্যামেরায় সাধারণত ১/৬০ সেকেণ্ড দ্রুতিই ফ্ল্যাশের জন্য নির্দিষ্ট। কতকগুলি ক্যামেরাতে ১/১২৫ সেকেণ্ড দ্রুতিতেও ফ্ল্যাশ ব্যবহার করার সুবিধা পাওয়া যায়। তবে ফ্ল্যাশে ছবি তোলার সময় শাটার দ্রুতির বিশেষ কোন প্রভাব নেই।

ফ্ল্যাশ থেকে বস্তুর দূরত্ব যত বেশি হয়, বস্তুর ওপর আলোকসম্পাতের তীব্রতাও তত কমে। তাই সঠিক আলোকপাতের জন্য ফিল্‌মের দ্রুতির সঙ্গে বস্তু থেকে ফ্ল্যাশের দূরত্ব বিবেচনা করেই অ্যাপারচার স্থির করা হয়। ফ্ল্যাশের ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক অ্যাপারচার বা এফ সংখ্যা স্থির করার জন্যে প্রতিটি ফ্ল্যাশের একটি নির্দিষ্ট গাইড নম্বর (জি. এন) থাকে। এই জি. এন. সাধারণত, অন্য কোন কিছু উল্লেখ করা না থাকলে, ফিল্‌ম দ্রুতি ১০০ এ. এস. এ.-র জন্য ও এর বস্তু-দূরত্ব ফুটে হিসাব করে উল্লেখ করা থাকে। জি. এন. সংখ্যাকে দূরত্ব (ফুটের হিসাবে) দিয়ে ভাগ করে যে এফ সংখ্যা (অ্যাপারচার) পাওয়া যায় তাই হল ১০০ এ. এস. এ. ফিল্‌ম দ্রুতির ক্ষেত্রে সঠিক আলোকপাতের অ্যাপারচার। যে ফ্ল্যাশের জি. এন. সংখ্যা ৮০, সেই ফ্ল্যাশে ১০০ এ. এস. এ. ফিল্‌মে ১০ ফুট দূরত্বে কোন বস্তুর ছবি তুলতে হলে ৮০ ÷ ১০ = এফ ৮ অ্যাপারচার ব্যবহার করে সঠিক আলোকপাত করা যাবে। তাছাড়া প্রতিটি ফ্ল্যাশের গায়ে বিভিন্ন ফিল্‌ম দ্রুতি ও বিভিন্ন দূরত্ব অনুযায়ী এফ সংখ্যা উল্লেখ করে তালিকা

দেওয়া থাকে। তা অনুসরণ করে সহজেই প্রয়োজনীয় এফ সংখ্যা ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায় এবং তখন জি. এন. সংখ্যার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কোন কারণে যদি প্রয়োজনীয় এফ সংখ্যা অর্থাৎ লেন্‌স অ্যাপারচার পরিবর্তন করতে হয় তবে প্রদত্ত গাইড নম্বরও নিচের তালিকা অনুযায়ী পালটে নিতে হয়:

লেন্‌স অ্যাপারচারের পরিবর্তন	গাইড নম্বরের পরিবর্তন
১ ষ্টপ বেশি	প্রদত্ত জি. এন. × ০.৭০
১/২ ষ্টপ বেশি	প্রদত্ত জি. এন. × ০.৮৪
১ ষ্টপ কম	প্রদত্ত জি এন. × ১.৪
১/২ ষ্টপ কম	প্রদত্ত জি. এন. × ১.২

বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের প্রচলনও খুব বেড়েছে। এই স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ যা কমপিউটারাইজড ফ্ল্যাশ নামেও পরিচিত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোকসম্পাতের সময় নিয়ন্ত্রণ করে। এই ফ্ল্যাশের গায়ে একটি আলোক-সংবেদনশীল সেল এমনভাবে বসানো হয় যাতে ছবি তোলার সময় সেলটি বস্তুর সামনাসামনি থাকে। শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে এই সেল বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর পরিমাপ করে আলোকসম্পাতের সময় প্রয়োজনমত কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে দেয়। কাছের বস্তুর ওপর আলোকসম্পাতের স্থায়িত্ব কম হয়। দূরের বস্তু অথবা অপেক্ষাকৃত গাঢ় বস্তুর ওপর আলোকসম্পাতের সময় বেশি । সাধারণ ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ অপেক্ষা স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের পুনরায় শক্তিসংগ্রহ (recycling) করার সময় অনেক কম লাগে সেজন্য একবার ফ্ল্যাশ ব্যবহার করার পর পরবর্তী ফ্ল্যাশের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা হয় না। তাছাড়া স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাশে সবসময় পূর্ণশক্তি ব্যবহৃত হয় না বলে একসেট ব্যাটারির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যায় ফ্ল্যাশ করা যায়। স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাশের আর একটি বড় সুবিধা এই যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বস্তুর দূরত্বের পরিবর্তন হলে অ্যাপারচার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাশের আলোকসম্পাতের স্থায়িত্ব অনেক সময়ই ১/৪০,০০০ সেকেণ্ডেরও কম হয় সেজন্য এই ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে অত্যন্ত গতিশীল বস্তুরও স্থিরচিত্র তোলা সম্ভব।

কোন কোন ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের হেড এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ব্যবহার করার ব্যবস্থা থাকে যাতে ফ্ল্যাশের তীব্র আলোকে সোজাসুজি ব্যবহার না করে ঘরের ছাদ বা দেয়াল থেকে প্রতিফলিত করে ব্যবহার করার সুবিধা হয়।

সাধারণ ফ্ল্যাশের আলোকসম্পাতের কৌণিক ক্ষেত্র মোটামুটি ৪৫°। আধুনিক কালে প্রচলিত স্বয়ংক্রিয় জুম-হেড ফ্ল্যাশে আলোকসম্পাতের কৌণিক ক্ষেত্র প্রয়োজনমত বাড়ানো বা কমানো যায়। ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌স ব্যবহার করার সময় কৌণিক ক্ষেত্র বাড়িয়ে এবং ন্যারো অ্যাঙ্গল লেন্‌স ব্যবহার করার সময় কৌণিক ক্ষেত্র কমিয়ে অপেক্ষাকৃত দূর পর্যন্ত আলোকসম্পাত করার সুবিধা এই ফ্ল্যাশে রয়েছে। ফলে জুম লেন্‌স ব্যবহারে সময় জুম-হেড ফ্ল্যাশ অত্যন্ত কার্যকারী ভূমিকা পালন করে।

দৃশ্যরস ও কম্পোজিশন

'We can work wonders, but not miracles.'—H. Gotze

আদিযুগে মানুষ তার হাত পা নেড়ে বা অনির্দিষ্ট শব্দ করে পরস্পরের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করত। ক্রমশঃ সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি হল ভাষা, লিপি ও সংখ্যার। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য-চেতনা এই মাধ্যমগুলিকে নিছক ব্যবহারিক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে এগুলিকে বিভিন্ন উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে সৃষ্টি করল নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতি শিল্পের। একই ভাবে দৃশ্যবস্তুর প্রতিরূপ পাবার উদ্দেশ্যে যে ফোটোগ্রাফির জন্ম তার মধ্যেও মানুষ খুঁজে পেল তার শিল্পীসত্তা প্রকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম। ফোটোভাষাকে কেবল ব্যবহারিক কাজে লাগিয়েই ছেড়ে দেওয়া হল না, অন্যান্য শিল্পের মত তাকেও সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে প্রয়োগ করা হল। ফোটোগ্রাফির মধ্যে মিলন হল উপযোগ, আগ্রহ ও সৌন্দর্যের।

সৌন্দর্য সৃষ্টি সমস্ত শিল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও তাদের প্রত্যেকের আবেদন আলাদা। চিত্রশিল্পের সঙ্গে ফোটোশিল্পের আপাত ও প্রাথমিক মিল কিছু থাকলেও তাদের প্রকৃতি ও আবেদনের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। ফোটোগ্রাফিতে যদিও নেই সঙ্গীতের বিমূর্ত শিল্পগুণ বা সাহিত্যের বিশ্লেষণক্ষমতা, বা নাটকের ত্রিমাত্রিক রূপারোপ বা নৃত্যের গতি তবু নৃত্যের ছন্দ, চিত্রকলার দৃশ্যতা, স্থাপত্যের গঠন, সঙ্গীতের পরিবেশ, কাহিনীর বর্ণনা ও জীবনের বাস্তবতা এ সমস্ত নিয়েই ফোটোগ্রাফি। চলচ্চিত্রকে বাদ দিলে সর্বাপেক্ষা আধুনিক ও যন্ত্রনির্ভর এই মাধ্যমটিকে শিল্প সৃষ্টিতে কাজে লাগাতে হলে ক্যামেরার ব্যবহার (যন্ত্রকৌশল) ও তার উপযুক্ত প্রয়োগ (কারিগরি) সম্বন্ধে বেশ খানিকটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেই হিসাবে ফোটোগ্রাফিকে কলাকৌশল (technique), কারিগরি, (craft) ও শিল্পের (art) এক সমন্বয় বলা যেতে পারে যা বাস্তব জীবনের সেই সত্যতার ওপর আলোকপাত করে যে সত্যতা সৃজনশীল ব্যাখ্যা বা মূল্যায়নের যোগ্য। ফোটোগ্রাফির

যন্ত্রগত ও প্রযুক্তিগত দিক দুটি নিয়ে আমরা বেশ খানিকটা আলোচনা করেছি, প্রযুক্তিগত দিকটি নিয়ে পরে আরো আলোচনা করব। যন্ত্রগত দিকটি অব্‌জেকটিভ এবং তা সম্পূর্ণ নিয়মনির্ভর। অপরদিকে শিল্পগত দিকটি সম্পূর্ণ সাব্‌জেকটিভ যা কোন নিয়মে আবদ্ধ নয়। সুতরাং এটি শিল্পসম্মত, এটি অশৈল্পিক এভাবে আলাদা করে নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করা যায় না। তা নির্ভর করে ব্যক্তিমানুষের শিক্ষাদীক্ষা, রুচিবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। এর একদিকে রয়েছে শিল্পীর অনুভব ও তার প্রকাশ, অন্যদিকে রয়েছে দর্শকের প্রতিক্রিয়া। শিল্পী তাঁর শিল্পবোধ ও জীবনানুভূতিকে এমন ভাবে প্রকাশ করবেন যাতে তাঁর অনুভব দর্শকের আবেগ ও চেতনাকে স্পর্শ করে। আর শিল্পী সেই চেষ্টা করে থাকেন তাঁর ছবির রেখা, টোন বা মাত্রা ও রঙের সুসংবদ্ধ সমন্বয়ে—এক কথায় যাকে বলা হয় ছবির সংস্থিতি বা কম্পোজিশন। ছবির মধ্য দিয়ে ঠিক কোন্ অনুভব বা বক্তব্য প্রকাশ করতে চাই, তার ওপর নির্ভর করে ছবির সংস্থিতি। এবং সেই নির্দিষ্ট অনুভব বা বক্তব্য নিজের মত করে প্রকাশ করতে হলে, ছবিতে কোন্ জিনিষটি বর্জন করে কোন্‌টি রাখব বা রাখলে কোন্ অবস্থানে ও মাপে তা থাকবে, তা নির্ভর করে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শিল্পবোধ ও জীবনানুভূতির ওপর।

উজ্জ্বল সবুজ পাতার ভেতর একগুচ্ছ চমৎকার লাল গোল্যাপ : একটা সুন্দর দৃশ্যবস্তু। কিন্তু সাদা-কালোয় ছবি তুললে, চমৎকার লাল ও উজ্জ্বল সবুজ দুটি বিষম রঙই ধূসরে রূপান্তরিত হয়ে তার সৌন্দর্যকে ব্যাহত করবে। আবার একসারি সুউচ্চ ইউক্যালিপটাস গাছ। রঙীন ফিল্‌মে ছবি তুলেও দেখা যেতে পারে তাদের খুব সাধারণ লাগছে । এখানে ব্যাহত হচ্ছে দৃশ্যবস্তুর সৌন্দর্য নয়, তার স্বাদ। মাপে ছোট হয়ে গিয়ে গাছগুলো বিরাটিত্বের আস্বাদ হারিয়েছে। তাদের দৈর্ঘ্যের সঠিক অনুপাত বোঝাবার জন্য এখানে কোন পরিচিত বস্তুকে মাপদণ্ড রূপে ছবিতে স্থান দিতে হত। তেমনি মোটরগাড়ি রেসে অতি দ্রুত ছুটে চলা গাড়ির দৃশ্য। সর্বোচ্চ শাটার দ্রুতিতে ছবি তুলে গাড়ির স্পষ্ট ছবি পেয়েও মনে হতে পারে—ঠিক হল না। ছবিতে যা নেই তা হল গতির ছোঁয়া। দৃশ্যবস্তুর প্রতি আগ্রহের মূল কারণটিই ছবি থেকে হারিয়ে গেছে। গাড়িগুলির ছবি ঝাপসা হলে বরং গতির বিভ্রমের সৃষ্টি হত।

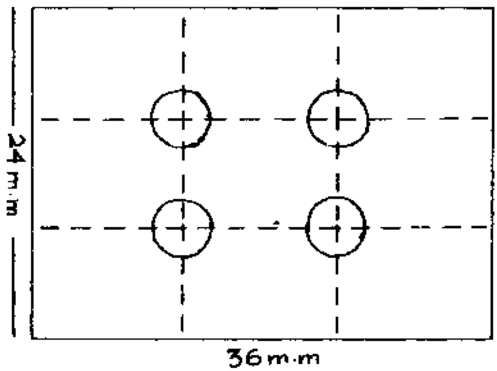
যদিও শিল্প কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন নয়, তবু ছবির উদ্দেশ্য ও মূল সুর অনুসারে যে জিনিষগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর একটি ছবির কম্পোজিশন নির্ভর করে সেগুলি সম্বন্ধে আমরা কিছুটা আভাষ দেব, যাতে একটা সূত্র অবলম্বন করে আমরা খানিকটা এগিয়ে যেতে পারি। একটি ছবির কম্পোজিশনের মূল উপাদান—রেখা, মাত্রা ও রঙ—এর ভূমিকা অনেকটা মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে। রেখাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে কম্পোজিশনের আকৃতি (shape)। আমাদের সম্মুখভাগের স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং দৃষ্টিপথ বাঁদিক থেকে ডানদিকে অনুভূমিক রেখা বরাবর বাধাহীনভাবে অগ্রসর হয়। ফলে আয়তক্ষেত্রের আকৃতি আমাদের চোখে

স্বাভাবিক বলে মনে হয়। জ্যামিতিক দিক থেকে ছবির কম্পোজিশনকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে নিতে পারি—১. আয়তক্ষেত্র বা ইংরেজী L আকৃতি ২. ত্রিভুজ বা পিরামিড আকৃতি ৩. বৃত্তাকৃতি ও ৪. বর্গাকৃতি। আকৃতির এই ভিন্নতার নান্দনিক/মনস্তাত্ত্বিক আবেদনও বিভিন্ন। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অনুভূমিক সরলরেখা ধীর ও শান্ত ভাবের দ্যোতক, অনুভূমিক বক্ররেখা গতি ও চঞ্চলতার। তেমনি ত্রিভুজাকৃতি অদম্য শক্তি ও বলিষ্ঠতার, বৃত্তাকৃতি গতির এবং বর্গাকৃতি স্থবিরতার প্রতীক রূপেই সাধারণত আমাদের মনে সাড়া জাগায়। ছবির মধ্যে আকৃতির ওপর প্রয়োজন মত কম বা বেশি জোর দেবার উদ্দেশ্যে পটভূমিকে অত্যন্ত সাধারণ রাখা যেতে পারে অথবা পিছনে আলো ফেলে পুরোভূমির অনুপুঙ্খ কমিয়েও তা হতে পারে। বস্তুর আকৃতি ছাড়াও আর একটা বিষয় রয়েছে—গঠন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অধিকাংশ জিনিষ—পাথর, মেঘ, পাহাড়, মানুষের শরীর—গঠনে মূলত উত্তল। সেইজন্যই হয়তো আমাদের চোখ উত্তল গঠন বেশি পছন্দ করে। চোখ আকৃতির ক্ষেত্রে পছন্দ করে সরলতাকে, আর গঠনের ক্ষেত্রে রহস্যকে। এবং রঙের ক্ষেত্রে প্রাথমিক রঙ—লাল, সবুজ, নীল, হলুদের মধ্যেই সর্বাধিক সৌন্দর্য খুঁজে পায়। কম্পোজিশনের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সিলুয়েট ছবিতে কেবল আকারই থাকে, আলোছায়ার কোন ক্রমায়ণ থাকে না। শুধু আকৃতির সাহায্যেই ছবির সৌন্দর্য ও বক্তব্য ফুটিয়ে তোলা হয়। তাই এখানে আলো, ছায়া ও রঙ প্রতিটিকেই সুষম ভাবে গুরুত্ব দিতে হয়। আলো সঠিক তীব্রতা ও সম্পৃক্তির মাধ্যমে বর্ণকে সুতীব্র ঔজ্জ্বল্য বা ছায়ার মাধ্যমে তাকে স্পন্দনশীল নমনীয়তা দিতে পারে। এর জন্য দৃশ্যবস্তুর যথার্থ স্থানে সঠিকভাবে আলো গিয়ে পড়া চাই। সেই আলোর গুণ বা ধর্ম এবং নিশানা এমন হওয়া চাই যাতে ছবির বক্তব্য, চরিত্র ও পরিবেশের পক্ষে তা যথাযোগ্য ও উপযুক্ত হয়।

রেখা কেবল ছবির কম্পোজিশন-ই তৈরি করে দেয় না, ছবির বক্তব্য বা চরিত্রের দিকে দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণও করে থাকে। সেজন্য ছবির মূল বিষয়বস্তুকে এমন অবস্থানে রাখতে হয় যাতে দর্শকের চোখ সহজেই সেই দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। মূল বিষয়টি ছবির কেন্দ্রস্থলে থাকলে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তা একঘেয়ে বা বিরক্তিকর লাগতে পারে, তাই সাধারণত মূল বিষয়টিকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছবির কেন্দ্রের বাইরে রাখা হয়। প্রাচীন অংকন শিল্পীরা লক্ষ্য করেছিলেন পটের ২ : ৩ অনুপাত অবস্থানে প্রধান বস্তুকে রাখলে ছবির গঠনে সুসংবদ্ধতা আসে ও ছবি চিত্তাকর্ষক হয়। পটের এই বিভাজন 'সোনালি বিভাজন' নামে প্রচলিত। আয়তক্ষেত্রকে নয়টি সমানভাগে ভাগ করে মধ্যবর্তী চারটি বিভাজনের যে কোনটির ওপর মূল বিষয়কে রাখা যেতে পারে। যদিও এই নিয়মটি সব সময়ে কাজে লাগেনা । তবে গতির ক্ষেত্রে এই রীতি ও বস্তুর কোনাকুনি অবস্থান প্রায় সব সময়েই কাজে লাগে। গতিশীল বস্তুর সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিলে দর্শকের মনে বস্তুটি সম্পর্কে অবাধ গতির ধারণা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া

অনেক সময় বস্তু ও তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটিকে স্পষ্ট ও অপরটিকে ঝাপসা করেও গতিশীল বস্তুর গতি বোঝানো যেতে পারে।



আলোছায়ার টোনের তারতম্যের ফলে সৃষ্ট বুনন বা texture-ও, ছবির বক্তব্য বা ভাব প্রকাশে, ছবির কম্পোজিশনে একটা প্রধান ভূমিকা নেয়। ত্রিমাত্রিক ছবির প্রতিরূপ আমাদের ধরতে হয় দ্বিমাত্রিক একটি সমতল ক্ষেত্রের ওপর। সুতরাং বস্তুর বেধ বা গভীরতা এবং স্পর্শের সাহায্যে যে বস্তুকে বুঝতে হয় তার বৈশিষ্ট্য আমরা একমাত্র আলোছায়ার টোনের পার্থক্যের মাধ্যমেই পেতে পারি। তা ছবির কম্পোজিশনে দৃঢ়তা বা কমনীয়তা সৃষ্টি করে দৃশ্যবস্তুটি নরম না শক্ত, মসৃণ না কর্কশ—এই স্পর্শ বৈশিষ্ট্য বোঝাতে পারে। বিশেষ করে তির্যক আলোয় এই বুননকে স্পষ্টাকারে ধরা যায়। এখানে বলা দরকার, টোনের তারতম্য বৈষম্য থেকে উঠে আসে। এই বৈষম্য আবার দু ধরনের হতে পারে—বস্তুর নিজস্ব বৈষম্য ও আলোকসম্পাতের বৈষম্য। দু ধরনের বৈষম্যের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। কখনো কখনো দুই বৈষম্যের সমন্বয়ও ঘটতে পারে। ক্যাম্পফায়ারের আলোয় নৈশকালীন ফোটোগ্রাফের মত উচ্চ বৈষম্যের দৃশ্য অল্প অতিরিক্ত আলোকপাত ও স্বল্প পরিস্ফুটন কাল দাবী করে। আবার উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় সমুদ্রতীরবর্তী দৃশ্যের মত স্বল্প বৈষম্যের ছবির জন্য অল্প কম আলোকপাত ও দীর্ঘ পরিস্ফুটন কালের প্রয়োজন। মানুষের চোখ পঞ্চাশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ—এত সূক্ষ্ম অনুপাত পর্যন্ত বৈষম্যকে চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ফোটো ফিল্মের অবদ্রব মাত্র ১৩০ : ১—এই অনুপাত পর্যন্ত বৈষম্যকে ধরতে পারে। আর চূড়ান্ত ছবিতে বৈষম্যের রূপায়ণ হয়, সর্বোচ্চ হলেও, ৫০ : ১—অনুপাতের এই সীমা পর্যন্ত।

নকশা বা pattern ও স্থান বিভাজন বা spacing ছবির কম্পোজিশনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। নকশার সাহায্যে ছবিতে মোটিফ সৃষ্টি করা যায়। মোটিফ ছবির মূল বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে। সাধারণত একই আকৃতির

অনেকগুলি বস্তুর বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা ছবি এই নকশা সৃষ্টি করে। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ এমনভাবে বাছতে হয় যাতে বস্তুগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হয়। ছবির বিষয় অনুসারে স্থানের কার্যকারী ব্যবহার ছবির বক্তব্য বা ভাবকে যেমন জোরালো করতে পারে আবার স্থানকে নানা জিনিষে অযথা ভারাক্রান্ত করলে ছবির বক্তব্যকে আড়াল করেও দিতে পারে। চোখ যেমন ভাবানুষঙ্গ অনুসারে প্রাসঙ্গিক দৃশ্যানুষঙ্গকেই দেখার জন্য বেছে নেয়, লেন্‌স তো তা করতে পারে না, সুতরাং ছবিতে কোন্ কোন্ উপাদান ও অনুপুঙ্খকে গ্রহণ করা হবে এটা যেমন দরকারি, তেমনি কোন্ কোনটিকে বর্জন করা হবে এটাও সমান দরকারি। মূল চরিত্র বা বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করবে এমন অনুপুঙ্খই ছবিতে রাখা হয়। তবে খেয়াল করতে হবে যে অনুপুঙ্খ আলাদা ভাবে যত সুন্দর বা আগ্রহকরই হোক না কেন তা যেন কোন ক্রমেই মূল বিষয়কে ছাড়িয়ে না ওঠে, মূল বিষয়ের সঙ্গে যেন তাদের অমোঘ সম্পর্ক থাকে। 'টোটাল ফোটোগ্রাফি'-ই হল ভালো ফোটোগ্রাফির গোপন কথা। স্থানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আলোছায়ার বৈষম্য বা সাদৃশ্যও যেন ছবির ভাবাবহকে ফুটিয়ে তুলতে বা বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তুলতেই সাহায্য করে। স্থানবিভাজন এমন ভাবেও হতে পারে যে ছবির এক অংশ অন্য অংশের তুলনায় জোরালো হয়ে গিয়ে দর্শককে সরাসরি ছবির মূল বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে। অংশ বিশেষকে জোরালো করার জন্য আলোছায়ার তারতম্য বা লেনসের ফোকস গভীরতার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

ভালো কম্পোজিশন বলতে তাহলে অনেক কিছুর সমন্বয়কে বোঝায়। তা প্রথমত আগ্রহ, রহস্য ও সৌন্দর্যের খোরাক যোগাবে, দ্বিতীয়ত তাতে উপাদানের ঐক্য এবং উপাদান ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যুক্তিযুক্ত ও কার্যকারী সম্পর্ক থাকবে আর তৃতীয়ত তার জ্যামিতিক সমতা (balance) ছবির অর্থব্যঞ্জনা ও ভাবতাৎপর্যের সহায়ক হবে। রঙীন ছবির কম্পোজিশনের মূল সূত্র সাদা-কালো ছবি থেকে খুব একটা আলাদা না হলেও রঙের জন্য ছবির নকশায় কিছু তারতম্য হয় যা ছবির কম্পোজিশনের একটা বড় উপাদান। একটি ছবিতে কালো-সাদার টোনের বৈষম্য, অপর ছবিতে রঙের স্বাতন্ত্র্য। রঙের দরুন টোনের যে বৈষম্য কালো-সাদা ছবিতে তা খুব বেশি যেমন হতে পারে তেমনি খুব কমও হতে পারে।

কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আকৃতির মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গের কথা আগে বলেছি, রঙের মনস্তাত্ত্বিক/নান্দনিক অনুষঙ্গও রঙীন ছবিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। তাছাড়া একজন দর্শকের কাছে রঙের আবেদন অনেক বেশি গভীর । অপ্রিয় রঙে রঞ্জিত কোন প্রিয় আকৃতিকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অপ্রিয় বলেই মনে হবে। বিভিন্ন প্রকারের উদ্দীপকের প্রতি দর্শকের চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়া ও তার ফলে উদ্ভূত আবেগগত ও অনুভবগত প্রতিক্রিয়া —এই দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েই রঙের মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, দর্শকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মানসিকতা ও প্রবণতাই প্রধান। তবু সাধারণ ভাবে বলা যায়,লাল, হলুদ ও কমলা রঙ আমাদের সবচেয়ে বেশি অকর্ষণ করে ও

একই আয়তনের নীল ও সবুজ রঙের চেয়ে তুলনায় বড় ও নিকটতর মনে হয়। সমগ্র ছবির মধ্যে এই রঙগুলি প্রকৃতপক্ষে যতটুকু অংশ জুড়ে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি অনুপাতে দর্শকের দৃষ্টি টেনে নেয়। সুতরাং এই রঙ ব্যবহার করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মূল বিষয়বস্তুর পটভূমিতে বা আশেপাশে উপস্থিত থেকে ছবিকে ব্যাহত না করে। জোরালো রঙকে ফোকসের বাইরে ঝাপসা করে রাখলেও তার আকর্ষণ করার ক্ষমতা কমে না, বরং আরও বেশি অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে কারণ ফোকসের বাইরে থাকার ফলে রঙের আয়তন খানিকটা বেড়ে যায়। জোরালো রঙের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে যে ভালো ছবি সৃষ্টি করা যায় না তা নয়, তবে খুবই সন্তর্পণে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে ছবি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য এই জোরালো রঙগুলিকে সাধারণ ভাবে পটভূমিতে ব্যবহার করা হয় না।

লাল, হলুদ ও কমলাকে আমরা উষ্ণতা ও প্রাণশক্তির রঙ হিসেবে দেখে থাকি আর নীল ও সবুজকে শান্ত ও শীতল রঙ বলে মনে করি। নীল হল দূরত্ব বা অসীমতার এবং সবুজ হল উদ্ভিদ্ জগতের রঙ। সুতরাং এই রঙগুলিকে পটভূমিতে ব্যবহার করলে বা অস্পষ্ট রাখলে ছবিতে গভীরতার সৃষ্টি হতে পারে। পুরোভূমিতে লাল বা হলুদ এবং পটভূমিতে নীল বা সবুজ ব্যবহার করে ছবির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় যা আমাদের চোখে বা বোধে কোন আঘাত সৃষ্টি করে না। সঠিক বর্ণবিন্যাসের প্রথম কথা হল, রঙগুলিকে এমনভাবে নির্বাচিত, উপস্থাপিত ও বিন্যস্ত করতে হবে যাতে দর্শকের মনে অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত অনুভূতির জন্ম না হয়। বিন্যাস এমন হওয়া দরকার যাতে উপাদানগুলির মধ্যে ভারসাম্য ও ব্যবহৃত শক্তিগুলির ভেতর যথানুপাত থাকে। বর্ণসঙ্গতি ও বর্ণবৈষম্য বর্ণবিন্যাসেরই দুটো বিশেষ অবস্থা ।

ছবিতে বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করতে হলে হলুদ ও নীলাভ লাল, সবুজ ও লাল, অথবা নীল ও কমলা একই সঙ্গে ব্যবহার করে তা করা যেতে পারে। উপাদানের বৈষম্য ব্যবহৃত উপাদানগুলিকেই আরো কার্যকারী করে। যেমন নীল তার পাশে কমলা থাকলে কমলার উষ্ণতাকে জোরালো করে। লাল ও বেগনি যদিও বর্ণালির দুই প্রান্তে অবস্থান করে তবু এই দুটি রঙের মধ্যে বৈষম্য অনেক কম, কারণ উভয়েই বর্ণালির বাইরের রঙ ম্যাজেন্টার সঙ্গে যুক্ত। রঙের সাহায্যে শুধু বৈষম্যের বিভিন্নতা নয় সঙ্গতি বা সাদৃশ্যকেও ধরা যেতে পারে। বর্ণসঙ্গতির বেলায় সাধারণত ব্যবহৃত বর্ণগুলি একক ভাবে প্রত্যেকে যত মনোরম, তাদের সম্মেলন থেকে উদ্ভূত বিন্যাস তত বেশি মনোরম হওয়া স্বাভাবিক। প্রতিটি রঙই আমাদের কাছে কোন না কোন ভাবের দ্যোতক। তাই ছবির মেজাজ সৃষ্টিতে রঙের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা রঙকে ছবির মধ্যে সুসঙ্গত ভাবে ব্যবহার করে ছবির ভাব দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। তবে মনে রাখা দরকার জটিল বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে, ব্যবহৃত বর্ণের সমবায়ের চাইতে নকশা ও আকৃতির সম্মেলন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দর্শকের আবেগগত ও প্রভাবগত প্রতিক্রিয়াকে তখন নকশার বিন্যাসই বেশি করে নিয়ন্ত্রিত করে। রঙ সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আঙ্গিকের সঙ্গে

অঙ্গাঙ্গি। আর গুরুতর বিষয়বস্তুর ছবির ক্ষেত্রে রঙকে হতে হয় বিষয়ের সাথেই অঙ্গাঙ্গি।

এইভাবে কম্পোজিশন আঙ্গিকের এবং আঙ্গিক বিষয়বস্তুর অঙ্গ, বিষয়বস্তুর যে রূপায়ণ নির্ভর করে আলোকচিত্রীর শিল্পব্যক্তিত্ব ও জীবনদৃষ্টির ওপর। একজন শিল্পী ও তার ছবির দর্শকের মাঝে রয়েছে ক্যামেরা। মানুষের চোখ আর ক্যামেরার লেন্‌স একই ভাবে দেখে না। আমাদের দেখার মধ্যে দূরত্বের বোধ আছে, ক্যামেরার লেন্‌সের সেই বোধ নেই। আমাদের চোখ বস্তুকে কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে দেখে না, কিন্তু লেন্‌স বস্তুকে একটা নির্দিষ্ট সীমা (frame)-র মধ্যে ধরে। তাছাড়া শিল্পী বা দর্শকের দেখার পেছনে একটা মানসিকতা কাজ করে, কিন্তু আগেই বলেছি, লেন্‌সের সেই মানসিকতা নেই। আমরা আমাদের আগ্রহ, বোধ ও ব্যক্তিগত সামাজিক অবস্থা অনুসারে যে কোন জিনিষের প্রতি আমাদের সেই সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি বা দেখার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করি। কিন্তু লেন্‌স এইভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে না। সেজন্য শিল্পীকে খেয়াল রাখতে হবে তাঁর দেখা লেন্‌সের মাধ্যমে কি রূপ নেবে। ফোটোগ্রাফি সময়ের ক্ষণ মুহূর্তকে ধরে, যার ফলে গতির স্তব্ধ ভঙ্গি আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যা খালি চোখে অদৃশ্য ফোটোগ্রাফি তাও বিবর্ধনের মাধ্যমে আমাদের দেখার সুযোগ করে দেয়। এই ভাবে একজন সচেতন ও সংবেদনশীল আলোকচিত্রী দর্শকের দৃশ্য অভিজ্ঞতা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারেন। তাঁর সামনে সুযোগ এলেই তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসকিতা অনুযায়ী ছবিতে রূপ দেন। আর তাঁর কাছেই সুযোগ আসে কারণ তাঁর মন সহজেই সেই সুযোগকে দেখতে পায়। তিনি চার পাশে তাকিয়ে প্রতিনিয়ত দেখতে পান বৈচিত্র্য ও ঐক্য, ছন্দ ও ভারসাম্য, গতি ও স্থিতি। প্রকৃতি-সৃষ্ট-গতি ও মনুষ্য-সৃষ্ট-গতি। প্রকৃতি-সৃষ্ট-স্থিতি ও মনুষ্য-সৃষ্ট-স্থিতি। তিনি তাঁর পছন্দ ও মানসিকতা মত এই গতিশীল সুরের বা স্থিতিশীল ছন্দের খণ্ড মুহূর্তকে ধরেন। এই প্রবহমান জীবনের খণ্ড মুহূর্ত ছবিতে প্রাণের প্রকাশ বা শক্তির বিকাশ ঘটায়। ছবির মধ্যেও বিভিন্ন ছন্দ, গতি ও বলের দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টি হয় ছবির বক্তব্য বা ভাবব্যঞ্জনা।

একজন শিল্পী প্রথমে একটা বিষয়কে বোধে আনেন, তারপর তাকে দৃশ্যের মাধ্যমে রূপ দেন। অপরদিকে একজন দর্শক আগে দৃশ্যটি দেখেন, তারপর তাকে বোধে নেন। একজন নির্বিশেষ থেকে বিশেষে আসেন। অন্যজন বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যান। একজন ভাবরস থেকে দৃশ্যরসে অন্যজন দৃশ্যরস থেকে ভাবরসে। তবে ফোটো-শৈলী ও ফোটো আস্বাদন উভয়ই উঠে আসে ব্যক্তির জীবনযাপন প্রণালী ও পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সুতরাং ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে কলাকৌশল একটা উপায় মাত্র, তা কখনো চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। লক্ষ্য হল ফোটোগ্রাফ, যে ছবি তোলা হচ্ছে তা। আর যে কোন শিল্পীর ফোটোগ্রাফির উদ্দেশ্য হল, তা হতে হবে তাঁর জীবনানুভূতির প্রকাশ, তাঁর আত্মার প্রকাশ।

বিষয়বস্তু

'Unless a subject interests me, I'll pass it over and save my film for better things.'
—Andreas Feininger

ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে যে কোন শিল্পগত আলোচনা তিনভাবে হতে পারে। এক. ফোটোগ্রাফির কলাকৌশল ও তত্ত্বের বিবর্তনের ভিত্তিতে। দুই. বিখ্যাত আলোকচিত্রীদের শিল্পী জীবনের অর্থাৎ তাঁদের তোলা ছবির ইতহাসের ভিত্তিতে। তিন. ফোটোগ্রাফির বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তাদের মধ্যকার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে। ফোটোগ্রাফির প্রতি আলোকচিত্রীদের যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যেও মোটের ওপর দুটি ধরন লক্ষ্য করা যায়। একটি হল কলাকৌশল কেন্দ্রিক প্রবণতা, অন্যটি বিষয়বস্তু মুখী প্রবণতা। ফোটোগ্রাফির বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে সুলভ না দুর্লভ, এবং তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ না কঠিন এই বিচারে সাধারণ ভাবে দুটি স্তরে ভাগ করা সম্ভব। প্রথম ভাগে পড়বে প্রতিকৃতি ও লোকজন, শিশু, ভ্রমণ-দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, রাস্তাঘাট, গৃহপালিত জীবজন্তু এবং কিছুটা সীমাবদ্ধতা সহ খেলাধুলো, নাটক/নৃত্য ও ন্যুড়স্। দ্বিতীয় ভাগে পড়বে স্থাপত্য, ফ্যাশন, বিমূর্ত/পরীক্ষামূলক, ক্লোজ-আপ ও টেলি এবং প্রাযুক্তিক ফোটোগ্রাফি ও আকাশ থেকে তোলা ও নৈশকালীন বহির্দৃশ্য ইত্যাদি।

এখন ছবির ভাল-মন্দ, শিল্প-অশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, তা নির্ভর করে যিনি ছবি তুলছেন ও যিনি দেখছেন তাঁদের ব্যক্তিগত শিক্ষা, রুচি, বোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। তবু সাধারণ ধারণা তৈরির জন্য আমাদের একটা কিছু মাপকাঠি ধরে এগিয়ে যেতে হবে। তাই বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ বিভিন্নতা ছাড়াও আমরা আলোচনা করব ফোটোগ্রাফির পক্ষে আবেদনমূলক ও আবেদনহীন বিষয়, ফোটোগ্রাফির পক্ষে উপযুক্ত ও সাহিত্য-গুণমণ্ডিত বিষয়, বাস্তব ও বিমূর্ত বিষয়, অতি সাধারণ বিষয় ও গিমিক, এবং ফোটোগ্রাফির পক্ষে প্রায় অসম্ভব ও ফোটোগ্রাফির পক্ষে অনুপযুক্ত বিষয় প্রভৃতি নিয়েও।

জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই ফোটোগ্রাফিতে ক্যামেরার

সাহায্যে দর্শকের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। যে ছবি যত ভাল ভাবে তা প্রকাশ করতে পারে সে ছবিকে তত সার্থক ও রসোত্তীর্ণ বলে ধরা যেতে পারে। এই প্রকাশযোগ্যতার জন্য যে বিষয়গুলি আমাদের সঠিকভাবে জানা থাকা দরকার, তা হল, ১. কোন কিছু দেখা বা জানার পর আমাদের সঠিক অভিজ্ঞতাটি কি ? ২. ছবির মধ্যে কোন্ জিনিষ কতটা রাখলে বা কিভাবে রাখলে (composition) আমাদের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ঠিকমত প্রকাশ পাবে এবং ৩. কোন্ ক্যামেরা বা লেন্সের সাহায্যে এই কাজ ঠিকমত করা সম্ভব। ক্যামেরার লেন্সের দেখার ক্ষমতা আমাদের দেখার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি হলেও কোন একক ক্যামেরার পক্ষে আমাদের দর্শনজাত সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিষয় অনুসারে দৃষ্টিভঙ্গির যেমন তারতম্য হয়, প্রকাশভঙ্গি অনুসারে তেমনি বিভিন্ন ক্যামেরা বা লেন্সেরও প্রয়োজন হয়। তবে ক্যামেরা নির্বাচনে কেবল মাত্র ছবির নিখুঁত মানই একমাত্র বিবেচ্য নয়। যে বিষয়েরই ছবি তুলি না কেন, ক্যামেরা সম্বন্ধে যেগুলি আমাদের বিবেচনা করা দরকার তা হল ছবির প্রয়োজনীয় মাপ, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত ব্যবহারোপযোগিতা, বহনযোগ্যতা ইত্যাদি। সাধারণভাবে আমরা যেসব ছবি তুলে থাকি প্রত্যক্ষ বিষয়ভিত্তিক ভাবে সেগুলি আলাদা করে নিয়ে আলোচনা করে দেখবার চেষ্টা করব যে আমাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি কোন্ ক্যামেরা ও কি কলাকৌশলের সাহায্যে সঠিক ভাবে প্রকাশ করা যায়।

প্রাকৃতিক দৃশ্য (Landscape)

প্রথম ছবি তুলতে আরম্ভ করে, নিজের প্রিয়জনের পরই যে ছবি তুলতে মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহী হয়, তা হল প্রাকৃতিক দৃশ্য । সাধারণত যাঁরা ছবি তোলেন না তাঁরাও বাইরে বেড়াতে গেলে সঙ্গে একটি ক্যামেরা রাখেন, যাতে যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি স্মারক হিসাবে তুলে আনতে পারেন।

এক টুকরো অন্তর্দেশীয় দৃশ্য (inland scenery)—এই হল ল্যাণ্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংজ্ঞা। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু ছাড়াও, মানুষের হাতে তৈরি বিভিন্ন বস্তু (ঘরবাড়ি, হাওয়াকল, রেলগাড়ি ইত্যাদি) ও মানুষের বিশেষত কৃষি সংক্রান্ত কাজকর্ম (চাষ করা, ফসল কাটা ইত্যাদি) প্রাকৃতিক দৃশ্যের অংশবিশেষ হতে পারে। ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি জায়গার কিছু না কিছু নিজস্ব বিশেষত্ব থাকে। আবার একই প্রাকৃতিক দৃশ্য বিভিন্ন ঋতুতে, দিনের বিভিন্ন সময়ে এবং রৌদ্রালোক, ঝড়বৃষ্টি বা তুষারপাতের মত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ নেয়। তা কখনো প্রকৃতির দৃশ্যরূপ, কখনো ভাবব্যঞ্জনা । যেমন সবুজ গাছ্গাছালির মধ্যে আলোছায়ার নক্শা হয়ত একটু রহস্যের ছোঁয়া আনে, বা আকাশ-ছোঁয়া ধুধু প্রান্তর মনকে মুগ্ধ করে, নয়ত শেষ বিকেলের হলুদ রোদের লম্বা ছায়ায় একটা বিষণ্ণতা জাগে।

ছবিতে আমরা যে রূপ বা ভাবই প্রকাশ করতে চাই না কেন, ঠিকমত তা প্রকাশ করতে হলে আমাদের সঠিকভাবে বিভিন্ন জিনিষ গ্রহণ ও বর্জন করতে হবে। ছবির

মধ্যে সব কিছুকে রাখার লোভ অবশ্যই ত্যাগ করা দরকার, কেননা, তা ছবিকে অনাবশ্যক জটিল করে ছবির মূল ভাবকে নষ্ট করে, যার ফলে ছবিটি তার অকর্ষণ-ক্ষমতা হারায়। ভাল ল্যাণ্ডস্কেপ ছবির মূল কথাটিই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত সরলতা, আঙ্গিক এবং রঙ উভয় দিক থেকেই শুধুমাত্র অপরিহার্য অনুষঙ্গগুলির উপর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে জোর দেওয়া। সরলতা সেখানে বিশালত্ব বা মহত্ত্বেরই অন্য নাম। এক টুকরো প্রকৃতি সম্পর্কে শিল্পীর সামগ্রিক অনুভব বা ধারণা অথবা একাধিক কার্যকারী অনপুঙ্খের সমাবেশ—যে কোন ভাবেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রায়ণ হতে পারে । সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি একক অনুপুঙ্খ বা অনুষঙ্গের ওপর জোর দেয় না। কিন্তু কখনো সমগ্র দৃশ্যের বদলে দৃশ্যের কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর গুরুত্ব হয়ত বেশি । হতে পারে তা একটি গাছের শাখার বিশেষ কোন বিন্যাস বা ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে আসা তির্যক আলোর ঝর্ণা। তখন ঐ বিশেষ গাছটিকে বা ঐ আলোর ঝর্ণাকেই ছবির মধ্যে সঠিক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আবার কখনো কোন একক অনুষঙ্গ মোটিফ হয়ে উঠে সমগ্র দৃশ্যটিকেই পূর্ণতর করে। ধুধু প্রান্তরের শূন্যতা বোঝাতে ফ্রেম-জোড়া প্রান্তরের শেষে আকাশের পটভূমিতে হয়ত একটা গাছ রাখলাম, শূন্যতা আরও স্পষ্ট হল। হিমালয়ের অভ্রভেদী উচ্চতার সামনে দাঁড়িয়ে তার বিরাট মহিমময় গম্ভীর আকৃতি মনকে বিহ্বল করল। ছবিতে ধরলাম উত্তুঙ্গ পাহাড়ের পাদদেশে পিঁপড়ের সারির মত মানুষ চলেছে, বিরাটত্ব আরও প্রকট হল।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল কম্পোজিশন—পটভূমি, পুরোভূমি ও আকাশের মধ্যে সম্পর্কের বিন্যাস। অন্য যে কোন ছবির মত প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতেও একটা প্রধান বা কেন্দ্রীয় বস্তু থাকা দরকার যা সাধারণত দূর বা মাঝারি দূরত্বে অবস্থান করে। প্রধান বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত আর একটি ছোট বস্তু সামান্য দূরত্বে রেখে প্রধান বস্তুর উপস্থাপনা জোরালো করা যেতে পারে। সরল কিন্তু বলিষ্ঠ ও সুষম আকৃতি এবং রঙ বা বুননের সূক্ষ্ম ও নমনীয় বৈষম্যকে চিহ্নিত ও অনুভব করার ক্ষমতা থাকলে কম্পোজিশনের ব্যাপারে সফল হওয়া যায়। আলো ও ছায়ার বৈষম্যের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ছবির মধ্যে দুটি সমান গুরুত্বপূর্ণ সাদা অংশ (highlight) বা দুটি সমান গুরুত্বপূর্ণ ছায়াবৃত অংশ (deep shadow) থাকলে, দর্শকের দৃষ্টি নির্দিষ্ট অংশের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে যেতে পারে। ক্যামেরা দূরত্ব, দৃষ্টিকোণ ও ক্যামেরার উচ্চতা সমস্তই কম্পোজিশনকে ও তার ফলে ছবির দৃশ্যরস বা দৃশ্যগত আবেদনকে প্রভাবিত করে।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি যে কোন নর্মাল বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড লেন্স যুক্ত ক্যামেরার সাহায্যেই তোলা যায় । তবে উন্মুক্ত প্রান্তরের অসীম দূরত্বের ছবি ৩৫ মি. মি. অপেক্ষা ছোট মাপের ক্যামেরায় না তোলাই ভাল। ছবি খুব বড় আকারের (১৫´´ × ১২´´ বা ১৬´´ × ২০´´) করতে হলে ৬ × ৬ সি. মি বা ৬ × ৯ সি.মি. মাপের ফোল্ডিং রোল ফিল্ম ক্যামেরা, টুইন লেন্স বা সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা বিশেষ উপযুক্ত । ছবি খুব বড় করার প্রয়োজন না হলে যে কোন ৩৫ মি. মি. ক্যামেরাতেই বেশ ভাল মানের ছবি পাওয়া সম্ভব । বহির্দৃশ্যে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলতে হলে ক্যামেরার বহনযোগ্যতার

কথা বিবেচনা করা দরকার। দানার সূক্ষ্মতা ও আলোছায়ার বৈষম্যের মাত্রার কথা বিবেচনা করে বহির্দৃশ্যের এইসব ছবি মধ্য দ্রুতির ফিল্‌মের সাহায্যেই সবচেয়ে ভাল পাওয়া যায়। তবে প্রখর রৌদ্রের দৃশ্যে আলোছায়ার বৈষম্য অতিরিক্ত বেশি থাকলে অধিক দ্রুতির ফিলম এন. ডি. ফিল্‌টারের সাহায্যে ব্যবহার করে আলোছায়ার বৈষম্য কমানো যায়। প্রকৃতিতে দৃশ্যের বিভিন্ন তলের মধ্যে স্বাভাবিক বিভেদ থাকে, রঙীন ফিল্‌টার ব্যবহার করে এই বিভেদকে দরকাব মত কমানো বা বাড়ানো যায়। ক্যামেরায় লেনস পালটাবার ও বিভিন্ন লেন্‌স পরাবার ব্যবস্থা থাকাও খুব জরুরি। সিঙ্গল লেন্‌স রিফ্লেক্স বা কয়েক ধরনের রেঞ্জফাইণ্ডার ক্যামেরায় এই সুবিধা আছে ।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাস্তব সম্মত ছবি ছাড়াও অনেক আলোকচিত্রশিল্পী লেন্‌স ফিল্‌টার ও আলোকপাতের বিশেষ ব্যবহারে স্বাভাবিক দৃশ্যের রূপান্তর ঘটান। যেমন, শিল্পী কোন দৃশ্যে নর্মাল লেনসের বদলে একটি মাঝারি ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনস ব্যবহার করলেন, ছবির দর্শকের অনুভূতি হবে যেন তিনি শারীরিকভাবে ঐ দৃশ্যটির মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। তাছাড়া ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনস ছবির মধ্যকার বিভিন্ন বস্তুর অবস্থানের দূরত্ব অনেক বাড়িয়ে দেয় এবং এর ফোকস গভীরতা বেশি হওয়ায় পুরোভূমি ও পটভূমি সবটাই স্পষ্ট হয়। ছবিতে বিশেষ ভাব সৃষ্টি করার জন্য আকাশের রূপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবিতে আকাশকে কতটা স্থান দেওয়া হবে সেটাও খুব জরুরি। উভয় ক্ষেত্রেই ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনসের বিশেষ ভূমিকা আছে। অপরদিকে দীর্ঘ ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌স ঠিক এর বিপরীতে দর্শকের সঙ্গে দৃশ্যের দূরত্ববোধ সৃষ্টি করে, ছবির মধ্যেকার বিভিন্ন বস্তুর অবস্থানকে ঘনসন্নিবদ্ধ করে এবং ফোকস গভীরতা অনেক কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ একটিতে দৃশ্যক্ষেত্র প্রসারিত করে দিয়ে বিস্তৃতির ধারণা আনা হয়, অন্যটিতে স্থানিক গভীরতা সংকুচিত করে আয়তন বা ভার বোধ সৃষ্টি করা যায়।

ফিল্‌টারের সাহায্যে বস্তুর রঙের পরিবর্তন করে কালো-সাদা টোনের মাত্রা বদলে দেওয়া একটা স্বীকৃত প্রথা। যেমন, কমলা ফিল্‌টার যে শুধুমাত্র আকাশকে গাঢ়তর করে তাই নয়, পাথর ও জলের মধ্যেও নাটকীয়তা আনে। লাল ফিল্‌টার নীল আকাশকে সম্পূর্ণ কালো করে দিয়ে রৌদ্রালোকিত দিনের দৃশ্যকে চন্দ্রালোকিত রাতের দৃশ্যে পরিবর্তিত করে। রঙীন ছবির ক্ষেত্রেও ফিল্‌টার বা ড. ক্রিমের সাহায্যে, একইভাবে দৃশ্যবস্তুকে স্বাভাবিক রঙে না রেখে আলোকচিত্রী শুধুমাত্র রঙের পরিবর্তনে সৃষ্টি করতে পারেন একটি বিশেষ নিজস্ব জগৎ—স্বপ্নময় বা ভীতিপ্রদ। ফিল্‌টারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোকপাত কমিয়ে ছবির বৈষম্য বাড়ানো একটি বহুল প্রচলিত উপায়। বিভিন্ন লেন্‌স বা ফিল্‌টার ছাড়াও প্রাকৃতিক দৃশ্যকে যা সর্বাপেক্ষা বেশি নিয়ন্ত্রণ করে এবং যার সুযোগ একজন সৃষ্টিশীল শিল্পী সব সময়ে নিয়ে থাকেন তা হল সূর্যের অবস্থান। সোজাসুজি আসা আলোয় যে দৃশ্যকে এক রকম দেখি পাশ থেকে আসা আলো (sidelight) বা পিছন থেকে আসা আলোয় (backlight) তাকে একেবার অন্য রকম দেখি। দৃশ্যের আলোকিত অংশ ও ছায়াবৃত অংশের তারতম্য চোখ যে ভাবে গ্রহণ করে লেন্‌স সেভাবে

গ্রহণ করে না, ছায়াবৃত অংশ আলোর বিপরীতে সম্পূর্ণ কালো হয়ে যেতে পারে—বিশেষ করে প্রখর রৌদ্রালোকে। সুতরাং পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে চোখে দেখা আলোছায়ার বৈপরীত্য ও ছবিতে পাওয়া আলোছায়ার বৈপরীত্য—এই দুয়ের তারতম্যের একটা মান ঠিক করে নিতে হবে। এই দক্ষতার ওপর ছবির সমগ্র টোন নির্ভর করে। এজন্য আলোকিত অংশ ও ছায়াবৃত অংশকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অভ্যাস করা দরকার। কাজের সুবিধার জন্য যাঁরা নতুন ছবি তুলছেন তাঁরা যদি আলোকিত অংশকে যা দেখছেন তার দ্বিগুণ সাদা এবং ছায়াবৃত অংশকে দ্বিগুণ কালো হিসাবে কল্পনা করেন, তাহলে ছবিতে পাওয়া বৈষম্যের একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়।

আলোছায়ার সাহায্যেই দ্বিমাত্রিক ছবিতে ত্রিমাত্রিক বোধ আনা সম্ভব হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক দৃশ্যে আলোর সুযোগ নেবার জন্য প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। শুধু সূর্যের অবস্থান বা সূর্যালোকের তীব্রতা নয়, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তও ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে মূল্যবান, তা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চমৎকার বিষয়। এই সময়ের আলোতে হলুদ, লাল ও কমলা রশ্মির ভাগ বেশি। তখন ফিলটার ব্যবহার করে কোনো লাভ নেই, কেননা আলোর একাংশ ইতিমধ্যেই শোষিত হয়ে গেছে। রঙীন ডেলাইট ফিলম্ ফিলটার ছাড়া ব্যবহার করে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের ছবি সবচেয়ে ভাল পাওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য রাখা দরকার ক্যামেরার লেনস যাতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে। সূর্যাস্তের দৃশ্য প্রাকৃতিক ভাবেই আলো থেকে অন্ধকারের এক স্বাভাবিক ক্রমায়ণ, তখন বৈষম্যের মাত্রা হয় খুব বেশি। ফলে সূর্যাস্তের ভাল ছবি তোলা খুবই সহজ। পুরোভূমিতে জলভাগ থাকলে সূর্যাস্তের দৃশ্যের সৌন্দর্য বাড়ে।

অন্য যে কোন ছবির মত ল্যাণ্ডস্কেপ ছবির ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত শিল্পবোধের ব্যাপারটাই জরুরি। এই বোধ কখনো দৃশ্যরূপের স্তরে আবদ্ধ থাকতে পারে, কখনো শিল্পদর্শনের পর্যায়ে উঠে যেতে পারে। উদাহরণ দেওয়া যাক। নদীর ধারে একটি লোক বসে আছে, নদীতে একটি পালতোলা বড় নৌকো চলে যাচ্ছে। পুরোভূমিতে মানুষটিকে ছোট আকারে রেখে গতিশীল নৌকোটিকে বেশ ভালভাবেই ছবির মধ্যে ধরা হল। এখন এই মানুষটির দৃষ্টি যদি নৌকোর ওপর বা নৌকোর গতির দিকে না হয়ে একেবারে উল্টোদিকে হয় তাহলে ছবিটির সুর কেটে যাবে। দর্শকের দৃষ্টি ঐ লোকটির দৃষ্টি অনুসরণ করে নৌকোর গতির উল্টোদিকে আকৃষ্ট হবে। আবার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে বর্ষাকালে প্রাকৃতিক বহির্দৃশ্যের ছবি রঙীন ফিলমে তোলা হলে যথেষ্ট ভাল নাও লাগতে পারে কেননা ছবিতে টানা, একঘেয়ে সবুজের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিন্তু যদি ছবির একটু ডান ধারে পুরোভূমিতে একটা গাছে একটা উজ্জ্বল হলুদ ফানুষ লেগে থাকে তবে ছবিটা আবার জমে যাবে। বিখ্যাত আলোকচিত্রীদের ছবি ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁরা কীভাবে ছবির মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান, আলোকের অবস্থানের তারতম্য, বৈষম্য ও ক্রমায়ণের ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন করছেন। নিজে ছবি তুলেও নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখা দরকার।

এ গেল দৃশ্যরূপ বা দৃশ্যরসের কথা। শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীরা প্রত্যেকেই সক্ষম ও সফল শিল্পী। কিন্তু যা তাঁদের পরস্পর থেকে পৃথক করে তা হল নিজস্ব শিল্পদর্শন। এর ফলেই কেউ আকাশ ও সমুদ্রের ছবিকে করবেন সরল, কেউ করবেন রহস্যময়। কেউ জোর দেবেন দৃশ্যের সুষমার ওপর, কেউ বলিষ্ঠতার ওপর। কারও কাছে প্রকৃতি আদিম শক্তিময়, কারও কাছে সমাধুনিক ভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ, কারও কাছে তার বিশৃঙ্খলার মধ্যেই রয়েছে শৃঙ্খলা—order in chaos। কেউ মনে করেন এই বিপুল বিরাটত্বের কোন মাত্রা নেই, কোন সসীম মান নেই, মানুষ তার কাছে অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক। কেউ মনে করেন মানুষের জন্যে এই প্রকৃতি, মানুষকে নিয়েই তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতি কারও কাছে নারীর মত, কারও কাছে জননীর মত। কেউ বা সেই একই সত্তার দুটি বিপরীত উপাদান বা ভাবকে মেলাতে চান—যেমন শূন্যতার সঙ্গে পূর্ণতার, রুক্ষতার সঙ্গে উর্বরতার বা নিয়মের সঙ্গে অনিয়মের। সত্যিকার ভাল ছবি সৃষ্টি হয় শিল্পীর দর্শনে, ক্যামেরা তাকে দৃশ্যরূপ দেয় মাত্র। সেই দৃশ্যরূপ কলাকৌশলগত ভাবে নিখুঁত ও দৃশ্যগত ভাবে বিশুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট—এই পর্যায় ছাড়িয়ে বিমূর্ত অনুভবের স্তরে উঠে যায়।

স্থাপত্য (Architecture)

অন্যান্য নানা বিষয়ের মত স্থাপত্যও ফোটোগ্রাফির পক্ষে একটি আকর্ষণীয় বিষয়। ঘরবাড়ি, মন্দির-গির্জা, স্মারকস্তম্ভ প্রভৃতি যে কোন স্থাপত্য প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে তৈরি হলেও তার দৃশ্যরূপ একজন আলোকচিত্রীর কাছে যথেষ্ট লোভনীয়। স্থাপত্য তার আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য বা অন্তর্ক্রিয়ার সঙ্গে তার বাইরের রূপের যে সুষম সমন্বয় সাধন করে, যুক্তি ও আবেগের মধ্যে যে যথানুপাতিক সমতা সৃষ্টি করে, তা যে কোন আলোকচিত্রীর পক্ষে ছবিতে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের যোগ্য। অন্য যে কোন শিল্প মাধ্যমের চেয়ে স্থাপত্য অনেক কম ব্যক্তিগত ও অনেক বেশি সমষ্টিগত মাধ্যম। লোক ঐতিহ্য থেকে আঞ্চলিক ঐতিহ্য, তা থেকে জাতীয় ঐতিহ্য, তা থেকে আন্তর্জাতিকতা—বিবর্তনের এই ধারা অনুসরণ করে স্থাপত্য আজ, সম্ভবত, পৃথিবীর সবচেয়ে সার্বজনীন মাধ্যম। সুতরাং আর একটি যথেষ্ট সার্বজনীন মাধ্যম ফোটোগ্রাফি তার প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হবে।

একটি স্থাপত্যের আকর্ষণ ঐতিহাসিক বা পুরাকীর্ত্তির কারণে হতে পারে তার সুন্দর কারুকাজ বা নকশার কারণে হতে পারে, অথবা তার গঠনরূপ বা শৈলীর জন্যও হতে পারে। একটি স্থাপত্যচিত্র একটা সম্পূর্ণ স্থাপত্যকে দেখাতে পারে, তার ভেতরের বা বাইরের একটা মাত্র অংশকে দেখাতে পারে, অথবা ক্লোজ-আপে দেখাতে পারে তার বিশেষ কোন অনুষঙ্গ বা অনুপুঙ্খকে।

প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে ছবি তুলতে হলে একজন আলোকচিত্রীর দৃষ্টিকোণ অনেকটা সীমিত হয়। তিনি ইচ্ছামত দৃষ্টিকোণের যথেষ্ট হেরফের ঘটিয়ে

খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে বা খানিকটা অংশ অন্যভাবে দেখিয়ে ছবি তুলতে পারেন না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য এখানে সাধারণ, স্বাভাবিক যা আছে স্থাপত্যের সমস্ত অনুপুঙ্খসহ বিকৃতিহীনভাবে একটি দলিল হিসাবে তা উপস্থাপিত করা। এই ধরনের ছবির জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হল ক্যামেরাকে নির্দিষ্ট লেভেলে রাখা, যার অর্থ ফিল্ম ও দৃশ্যবস্তু যেন সম্পূর্ণ সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে। কোন কারণে অবস্থান সমান্তরাল না হলে স্থাপত্যের উল্লম্বরেখা তির্যক ও বিকৃত দেখাবে। ফোটোগ্রাফির ভাষায় একে বলা হয় অভিসারী উল্লম্বরেখা (converging verticals)-র সমস্যা। বিরাটাকার গৃহের বহির্ভাগ বা অভ্যন্তরের ছবির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনসের প্রয়োজন হয়। ফিলমকে লেভেলে রেখে প্রয়োজনীয় দৃশ্যের সবটুকু পেতে হলে এমন ক্যামেরা ব্যবহার করা দরকার যার লেন্সকে দরকার মত ওপর নিচ বা বাম দিক ডান দিক করে সরানো যায়। সেজন্য সঠিক অনুপুঙ্খসহ সত্যিকার ভাল স্থাপত্য চিত্রের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্যামেরা হল মনোরেল ভিউ ক্যামেরা। তবে এই ধরনের ক্যামেরা, আমরা আগেই বলেছি (ক্যামেরা দ্রষ্টব্য), সহজে বহনযোগ্য নয় এবং এর ব্যবহার পদ্ধতিও বেশ জটিল। এর পরিবর্তে ৩৫ মি. মি. এস. এল. আর. ক্যামেরাতে ওয়াইড অ্যাঙ্গল এবং পারস্পেকটিভ কনট্রোল লেনস ব্যবহার করেও বেশ ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। স্থাপত্যের অনুপুঙ্খ ছবিতে ভালভাবে রাখার জন্য অ্যাপারচার যথা সম্ভব ছোট রাখা ও দরকারমত কমলা ফিলটার ও কখনো কখনো সুবজ ফিল্টার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কেননা এই সব ফিলটার সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খগুলিকে তাদের পটভূমির তুলনায় স্পষ্ট করে দেখাতে পারে। ভিউ ক্যামেরা ব্যবহার করে নিখুঁত ভাবে ছবি পেতে হলে সমস্ত ধরনের ক্যামেরা মুভমেন্টের জন্য একটি ত্রিপদ, বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরাকোণের জন্য ক্যামেরায় লেন্স পরিবর্তনের ব্যবস্থা, একটি এক্সপোজার মিটার, একটি শাটার রিলিজ কেবল্, অনুভূমিক ও উল্লম্বরেখা সঠিক রাখার জন্য একটা স্পিরিট লেভেল এবং অভিসারী উল্লম্বরেখা সমস্যার সমাধানের জন্য পারস্পেকটিভ কনট্রোল লেন্সের প্রয়োজন হয়।

স্থাপত্যে কারুকাজ বা নকশার প্রাধান্যও কম নয়। স্থাপত্যের মালমশলা, স্থানীয় পদ্ধতি, বা প্রাচীন ঐতিহ্য এইসব নকশা বা কারুকাজকে প্রভাবিত করে থাকে। সুতরাং নকশার নির্বাচন, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ ও আলোর ব্যবহারের সাহায্যে তার পারিপার্শ্বিকতাকেও ছবিতে প্রতিফলিত করা যায়। বস্তুত স্থাপত্যচিত্রের ক্ষেত্রে পটভূমি বা পুরোভূমির প্রাসঙ্গিক উপাদানসহ সঠিক অবস্থানানুপাত ছবির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। কেন না স্থাপত্যে অনেকগুলো ফর্মাট একসঙ্গে মেলে। যেমন আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যের কারুকর্মের, শৈলীর ও ছাঁচের ফর্মাট। স্থাপত্যের কারুকর্ম দলিলচিত্র হিসাবে প্রয়োজন না হলে আলোকচিত্রী ইচ্ছামত দৃষ্টিকোণ পালটাতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি ভিউ ক্যামেরার পরিবর্তে অন্য ক্যামেরাও ব্যবহার করতে পারেন। অনেক সময় প্রাসাদ বা মন্দিরের খুব উঁচুর দিকে যে সমস্ত কারুকাজ থাকে তার অবস্থানানুপাত ঠিক রেখে ছবি তোলার প্রয়োজনে টেলিফোটো বা লং ফোকাস লেন্সের প্রয়োজন হয়।

মনে রাখা দরকার কারুকাজ বা নকশার এই সমস্ত ছবি নিতান্ত অন্য কোন সম্পূর্ণ শিল্পকর্মের উপস্থাপনা মাত্র নয়, তা নিজেও এক ধরনের সৃজনকর্ম, অন্য কোন শিল্পের প্রয়োজনে তা তোলা হয়ে থাক কি ছবির প্রয়োজনেই তোলা হয়ে থাক। এর জন্য ব্যবহৃত মালমশলার চরিত্র ও কারুশৈলীর অন্তর্সত্যকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা দরকার। যেমন ব্যবহৃত কাঁচামাল যদি হয় পাথর তবে শীতলতা ও বলিষ্ঠতার ধারণা আসে, যা এক ধরনের ধ্রুপদী পরিবেশ তৈরি করতে পারে। কিন্তু কাঁচামাল যদি হয় কাঠ তবে উষ্ণতা ও কমনীয়তার ধারণা আসে, যা এক ধরনের ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি করতে পারে। আবার ধরা যাক, আমাদের কোন কোন মন্দিরের মিথুনমূর্তিগুলির কথা, তাদের রূপ ও রীতির অন্তর্সত্য কি আসক্তিতে না নিরাসক্তিতে, ছবিতে আলোকচিত্রীর নিজস্ব ধারণার প্রতিফলন ঘটা চাই ।

গঠনরীতির দিক থেকেও কোন একটি স্থাপত্য তার জ্যামিতিক রূপ এবং বলিষ্ঠতা বা সুষমা নিয়ে কোন একটি বিশেষ সময়ের মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। স্থাপত্যে অনুপাত ও বুননের সৌন্দর্য এবং আলো ও ছায়ার চমৎকার বৈষম্যের সুযোগ থাকলে আলোকচিত্রীর কাজ সহজ হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর পছন্দমত দৃষ্টিকোণ বেছে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছা ছবি তুলতে পারেন। কখনো ঊর্ধমুখী ক্যামেরায় জ্যামিতিক গঠনরেখাকে ফ্রেমে কোনাকুনি ধরে ত্রিভুজ সৃষ্টি করে স্থাপত্যে গভীরতা ও শক্তির প্রকাশ দেখান। কখনো পুরনো ধ্বংসোন্মুখ স্থাপত্যকে নরম আলোয় বা সফট ফোকাসে ধরে তার বিষাদকে ফুটিয়ে তোলেন। তবে যে ভাবেই তুলুন না কেন স্থাপত্যশৈলীর জ্ঞান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাস্তব বিবেচনাবোধ স্থাপত্যচিত্রকে অন্য মাত্রা দেয়। ছবিটি কীভাবে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা হবে তাও নির্ভর করে স্থাপত্যটির মূল উদ্দেশ্য কি তার ওপর। একটি মন্দির বা গির্জার সুউচ্চ ধনুকাকৃতি খিলান বাদ দিলে স্থাপত্যটির গঠনরীতির অনেকখানি না বলা থেকে যায়।

মৃত্যু, ধর্ম ও দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগিতা—এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে স্থাপত্য যুক্ত। সেই অনুসারে স্মৃতিসৌধ, ধর্মীয় স্থাপত্যকর্ম ও দৈনন্দিন ব্যবহারের অট্টালিকা যথাক্রমে যুক্ত মৃত ব্যক্তি, অলৌকিক বস্তু ও জীবিত মানুষের সঙ্গে। স্থাপত্যের গঠনশৈলীও সেই অনুসারে নিরূপিত হয়।

ধর্মীয় বা প্রাচীন কোন ঐতিহাসিক পুরাকীর্তির ওপর শুধুমাত্র নজর না দিয়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের ঘরবাড়ির দিকেও তাই লক্ষ্য দেওয়া দরকার। তা হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারি। শহরের পথঘাট, বাড়িঘর, স্বাভাবিকভাবে আমরা যা দেখি, একজন শিল্পী কেবল দৃষ্টিকোণ পালটে বা বিশেষ আলোকসম্পাতে তাকে একেবারে অন্যভাবে দর্শকের সামনে উপস্থিত করেন । গতানুগতিকতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে ছবিতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই বহু পরিচিত স্থাপত্য বা নগরদৃশ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব।

ঘরবাড়ির অভ্যন্তরভাগের ছবির জন্য সাধারণত ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স ও আলোর

সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। দরজা বা জানলার মধ্য দিয়ে আসা আলোর সঙ্গে কৃত্রিম আলোর মিশ্রিত ব্যবহার এ বিষয়ে খুব দরকারি। অভ্যন্তরভাগের ছবির ফ্রেমে ঘরের মেঝে ঘরের ছাদ অপেক্ষা বেশি রাখলে অনেক স্বাভাবিক দেখায়, এতে রিলিফও বেশি পাওয়া যায়। আবার দমবন্ধকর অবস্থা বোঝাতে ঘরের ছাদ বা সিলিংকে প্রকট করা যেতে পারে। উচ্চতা ও গভীরতার প্রতি আমাদের অবচেতনে স্বাভাবিক ভীতি আছে। ঘরের ছাদ সেই অসীম উচ্চতা থেকে এবং ঘরের মেঝে সেই অতল গভীরতা থেকে বাড়িকে রক্ষা করে। সুতরাং ছাদ ও মেঝের প্রতীকী অনুষঙ্গ থাকবে এটা স্বাভাবিক। ঘরের আসবাবপত্রের দিকেও ভালভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। কোন আসবাব ক্যামেরার খুব কাছে চলে এসে ছবির ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। বা তার আকৃতি অন্য আসবাবের সঙ্গে বা দরজা জানলা ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হতে পারে। যত্ন সহকারে সেগুলি বেছে, প্রয়োজনমত দু একটি বাদ দিয়ে বা অবস্থানের পরিবর্তন করে ঠিক প্রয়োজনীয় দৃশ্যটি ধরা দরকার। একটি ঘরের চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা, দেয়ালে ঝোলানো ছবি, বুকশেলফ, ম্যান্টলপিসে রাখা ঘড়ি বা ফুলদানি সমস্ত কিছুই সেই ঘরের মানুষটির মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। সুতরাং এ সবগুলিই ছবি তোলার সময় বিবেচ্য।

কোন একটি ঘর বা বাড়ি প্রথমে হয়ত তার গঠনরূপ বা সৌন্দর্য বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য আলোকচিত্রীকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তারপর তা থেকে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনের নানা তথ্য ও কাহিনী বেরিয়ে আসতে থাকে। বাস্তব অনুপুঙ্খ বা অনুষঙ্গের মধ্যে তিনি বাস্তবাতীত ব্যঞ্জনা খুঁজে পান। যেমন যথেষ্ট পরিপূর্ণ একটা ঘরের মধ্যে হঠাৎ কোথাও একটা অস্বাভাবিক শূন্যতা বা যথেষ্ট ফাঁকা একটা ঘরের মধ্যে ভাবগম্ভীর পূর্ণতা। দৃশ্যগত সংবেদনশীলতা এই ভাবে শুধু আলোকচিত্রীর নয়, সাধারণ মানুষেরও দৈনন্দিন জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

একইভাবে একটি শহরের ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটও সেই শহরবাসীদের সম্পর্কে অনেক কথা বলে। এই কলকাতা শহরেই বিভিন্ন এলাকার বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন এলাকার মানুষকে চিহ্নিত করে। নগরদৃশ্য (Cityscape)-এর অত্যন্ত তুচ্ছ অনুপুঙ্খ—একটি জানলা বা একটি দরজার হাতল বা বারান্দার রেলিংয়ের কোন বিশেষত্ব অথবা দেয়ালচিত্র বা লিখন এ-সবই অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ছবিতে নির্দিষ্ট পরিবেশ তুলে ধরে। সিটিস্কেপের দৃশ্যে কেউ নগরের নিরন্তর চলমানতাকে ধরেন, কেউ তার স্থিতিছন্দের ওপর জোর দেন (যেমন Brassai), কেউ শিল্পনগরীর আধুনিক জীবনযাত্রার মধ্যে কবিত্ব খুঁজে পান (যেমন Frank Sutcliffe), কেউ যন্ত্রযুগের যুক্তিবাদী, জ্যামিতিক জগতকে স্পন্দনশীল ও রহস্যময় করে তোলেন (যেমন Andreas Feininger) স্থাপত্যচিত্রে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকলেও সরাসরি উপস্থাপনাই বোধহয় সবচেয়ে ফলপ্রদ। প্রখ্যাত স্থাপত্যচিত্রশিল্পী Frederick Evans বলেছিলেন স্থাপত্য বিষয়ক ফোটোগ্রাফি হওয়া উচিত 'the straightest of straight photography.' স্থাপত্যচিত্রের উদ্দেশ্য ও শৈলী কী হবে সে বিষয়ে স্থাপত্যের জ্ঞান, আগেই বলেছি, যথেষ্ট সাহায্য করে,

Feininger-এর ছবি তার প্রমাণ, তিনি ছিলেন স্থাপত্যের ছাত্র।

স্থাপত্যের বহির্অংশের চিত্রগ্রহণে ফোটোগ্রাফাররা সাধারণত মধ্য দ্রুতির ফিল্ম ব্যবহার করেন তবে অভ্যন্তর-দৃশ্যের জন্য অধিক দ্রুতি ফিল্ম বেশি উপযুক্ত কেননা দরজা, জানলার মধ্য দিয়ে আসা আলো অভ্যন্তর ভাগের সমস্ত স্থান সমানভাবে আলোকিত করে না ফলে আলো ও অন্ধকারের বৈষম্য কমিয়ে টোনের সমতা আনার জন্য অধিক দ্রুতির ফিলম প্রায় ক্ষেত্রেই দরকার হয়। স্থাপত্যচিত্রে আজও কলাকৌশলের এবং পেশাদারী প্রবণতার বিশেষ প্রাধান্য। অপেশাদারী সহজতার সুযোগ সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অপেশাদারী ফোটোগ্রাফারের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের নতুনত্বের সঙ্গে পেশাদারী ফোটোগ্রাফারের জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় হলে তবেই স্থাপত্যের মত একটি সার্বজনীন বিষয়ের চিত্ররূপও প্রকৃতই সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারবে।

প্রতিকৃতি (Portrait)

আলোকচিত্রে প্রথম ছবি জড় পদার্থের, কারণ কয়েক ঘন্টা সম্পূর্ণ স্থির হয়ে রোদে বসে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম যখন মানুষের ছবি তোলা সম্ভব হল, তখনও তার মাথা ক্ল্যাম্পের সাহায্যে আটকে স্থির রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এইভাবেই ফোটোগ্রাফিতে প্রতিকৃতির সূত্রপাত। এত কষ্ট করেও মানুষ যে তার নিজের ছবি তোলাত তার কারণ মানুষের নিজের প্রতি ভালবাসা—যাকে বলা হয়ে থাকে narcicism, আত্মপ্রীতি। এতদিন আত্মপ্রতিকৃতি সংগ্রহের একমাত্র উপায় ছিল চিত্রশিল্পীকে দিয়ে নিজের ছবি আঁকানো, যা আরো বেশি সময়সাপেক্ষ ও খুবই ব্যয়বহুল উপায়। কিন্তু ফোটোগ্রাফি প্রতিকৃতিকে আপেক্ষাকৃত সুলভ করে প্রচণ্ডভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং আলোকচিত্রীরাও প্রতিকৃতিকে আলোকচিত্রের মাধ্যমে স্বয়ংনির্ভর শিল্পরূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বলে রাখা দরকার, কোন আলোকচিত্রীর কাছে প্রতিকৃতি হল একই সঙ্গে সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে কঠিন বিষয়, সবচেয়ে নীরস ও সবচেয়ে সংবেদনশীল কাজ। পাসপোর্ট ফোটোর কথা ভাবলেই তা বোঝা যায়।

সাধারণভাবে প্রতিকৃতি বলতে বোঝায় মানুষের অবয়বের—প্রধানত মুখাবয়বের ছবি। অবশ্য শরীরের অন্য কিছু অংশও আনুষঙ্গিক হিসাবে ছবির মধ্যে থাকতে পারে, যা ঐ মুখের অভিব্যক্তিকেই জোরালো করে মানব চরিত্রকে প্রকাশ করে। মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি বহুকাল থেকেই সাহিত্য, নাটক ও চিত্রকলার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু এবং আলোকচিত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের মনের বিভিন্ন অনুভূতি ও আবেগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখের মাংসপেশীতে যে সাড়া জাগায়, তাই হল তার ভাবের অভিব্যক্তি। মানুষের সমাজিক অবস্থা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই অভিব্যক্তিরও তারতম্য হয়। রাগ দুঃখ আনন্দ বিষাদ প্রভৃতি মানবিক অনুভূতিগুলি সমস্ত মানুষের মধ্যে থাকলেও ব্যক্তি হিসাবে তাদের প্রকাশ ভিন্ন। এই স্বাভাবিক অনুভূতিগুলির সূত্রে একদিকে যেমন সমস্ত মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত আবার অপরদিকে প্রতিটি মানুষ তার মানসিকতায়

স্বতন্ত্র ও একক। মানুষের এই অন্তর্বৈচিত্রকেই শিল্পী ক্যামেরার সাহায্যে নানাভাবে প্রকাশ করেন। এরজন্য শিল্পীর কল্পনাশক্তিসম্পন্ন দূরদৃষ্টি থাকা চাই কিন্তু তা যেন প্রদর্শনপ্রিয়তা না হয়, তিনি যেন যাঁর ছবি তুলছেন তাঁর সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত ধারণা ছবিতে না চাপান, বরং যাঁর ছবি তুলছেন তাঁর কোন আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে এমন কিছুই যেন ছবিতে ধরেন । এর জন্য বিষয়বস্তুর খাতিরে আলোকচিত্রীকে হয়ত নিজস্ব আঙ্গিককে একটু খাটো করতেও হতে পারে। অভিব্যক্তি প্রকাশের ভিন্নতা অনুযায়ী, মানুষের প্রতিকৃতিগুলিকে আমরা এইভাবে ভাগ করে নেব—(ক) ব্যক্তিচরিত্রের ছবি (খ) ব্যক্তির মাধ্যমে কোন গোষ্ঠী বা সমাজের ছবি (গ) ব্যক্তির তাৎক্ষণিক বা বিশেষ কোন মেজাজের ছবি।

ব্যক্তিচরিত্রের ছবি

যে ছবি একটি ব্যক্তিমানুষের একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও তার ছদ্ম উপস্থিতি দর্শকের সামনে তুলে ধরে। ছবি থেকে ব্যক্তিটির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যেন আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। আমরা সোজাসুজি চরিত্রটির সঙ্গে পরিচিত হই। অনেকের মতে একমাত্র এই ধরনের ছবিকেই সঠিক অর্থে প্রতিকৃতি বলা যায়। তা শুধু মুখের মানচিত্র হতে পারে, আবক্ষ প্রতিকৃতিও হতে পারে, সামান্য ক্ষেত্রে পূর্ণাবয়ব চিত্রও হতে পারে। এই প্রকার ছবি তোলা খুব কঠিন ও যথেষ্ট অনুশীলনসাপেক্ষ। কেননা সঠিক প্রকাশময়তাই এই প্রকার প্রতিকৃতির প্রধান শক্তি। এর জন্য মুখাবয়বের বিভিন্ন মাংসপেশীর সঠিক অবস্থান এবং অনুভূতির বিভিন্নতা অনুযায়ী পেশীগুলির সঞ্চালনের ফলে মুখাবয়বের পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোকচিত্রীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। যে ব্যক্তির ছবি তিনি তুলবেন, তাঁকে নানা পরিস্থিতিতে, নানা অবস্থায়, নানা ভাবে ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে ধৈর্য্য সহকারে লক্ষ্য করে তাঁর চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি একটা নির্দিষ্ট ধারণায় আসবেন। এইসব বৈশিষ্ট্যের কোনটি ব্যক্তিটির পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রতিনিধিস্বরূপ হবে তা ঠিক করে কোন ভঙ্গি বা অভিব্যক্তির সাহায্যে সেই বৈশিষ্ট্যটি সঠিকভাবে প্রকাশ পাবে তাও তাঁকে স্থির করতে হবে। এরপর তাকে ভাবতে হবে কীভাবে এবং কোন্ পরিবেশে তিনি ছবি তুলবেন। এইসব ছবি অধিকাংশ সময় শিল্পীর স্টুডিওতে অথবা কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে নিয়ে ব্যক্তিটির নিজস্ব পরিবেশে তোলা হয়ে থাকে। স্টুডিওতে তোলা হলে প্রায়ই দেখা যায় ব্যক্তির আত্মসচেতনতার দরুন ছবি কৃত্রিম হয়ে যাচ্ছে। সেই তুলনায় নিজস্ব পরিবেশে মানুষ অনেক সহজ বোধ করে বলে ছবি স্বতঃস্ফূর্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। ব্যক্তির সঠিক অভিব্যক্তিটির জন্য আলোকচিত্রীকে পর পর কয়েকদিন কয়েকটি করে ছবি তুলতে হতে পারে। তাঁর যে কোন মানুষের সঙ্গে সহজে মেশবার ক্ষমতা, বাকপটুত্ব ও নানাবিষয়ে খুব গভীর না হলেও মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার, কারণ যে ব্যক্তির ছবি তিনি তুলছেন তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে, তাঁর পছন্দ মত কথা বলে তাঁকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ রাখার দায়িত্বও আলোকচিত্রীর ।

ভাল প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে দুটো সম্পর্ক কার্যকারী। একটা ব্যক্তি ও আলোকচিত্রীর, অন্যটা ব্যক্তির প্রতিকৃতি ও দর্শকের। দ্বিতীয় সম্পর্কটি প্রকৃত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হতে পারে একমাত্র তখনই যখন প্রতিকৃতির মধ্য থেকে ব্যক্তির দুই চোখ সরাসরি দর্শকের প্রতি নিবিষ্ট। প্রতিকৃতির কোন কোন ছবি অ্যালবামে রাখা হয় আর কোন কোন ছবি পরিবর্ধিত করে দেয়ালে টাঙানো হয়, তা বহুবার বহুলোকর চোখে পড়ে, সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ব্যক্তির পোষাক ও মহিলা হলে তাঁর মেক-আপের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

এবার ছবির কলাকৌশলগত দিকের কথা। ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত হবে তাঁর প্রতিকৃতির টোন। বলা হয়, আলোছায়ার বৈষম্য মুখাবয়বে মডেলিং-এর কাজ সম্পূর্ণ করে, তা মুখাবয়বকে নির্দিষ্ট রূপ দেয় ও তার ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি করে। দৃঢ়তা, শক্তি, পৌরুষ প্রভৃতি বোঝাতে যেমন বৈষম্য বাড়াতে হতে পারে, তেমনি দয়ামায়া, ভালবাসা, কমনীয়তা প্রভৃতি বোঝাতে বৈষম্য কমানোরও প্রয়োজন হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ছবিতে পটভূমিকে কালো বা সাদা বা ধূসর রাখা হয়, তবে যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব পরিবেশে গিয়ে ছবি তোলা হয়, তখন পটভূমিতে অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশটুকুই মাত্র রাখা হয়। কখনো কখনো ছবির ভারসাম্য বা চরিত্রের বিশেষ কোন দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনে সামান্য কোন আনুষঙ্গিক বস্তু—যেমন পড়াব বই বা ধূমপানের পাইপ ইত্যাদি—রাখা যেতে পারে, কিন্তু অনুষঙ্গ কখনোই যেন অতি সরল বা অতি প্রকট না হয়ে যায়। কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান প্রতিকৃতিকে সহজতর করতে পারে।

ব্যক্তিচরিত্রের ছবিতে আলোকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত আলোক ছাড়া চরিত্রের সঠিক চিত্রায়ণ প্রায় অসম্ভব। কারণ মুখাবয়বের মাংসপেশীর সমান্য কুঞ্চন বা সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত আলোক ছাড়া যথাযথ ভাবে ধরা যায় না। মানুষের অবয়ব সমতল নয়, অথচ ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ থেকে সোজা আলো পড়লে অবয়ব সমতল দেখাবে ও টোনের কোন মাত্রাভেদ থাকবে না। সেজন্য বিভিন্ন দিক থেকে আলো ফেলে আলোছায়ার বৈষম্য, অবয়বের সমোত্তলতা ইত্যাদি ঠিক করতে হয়। তীব্র আলোয় আলোছায়ার বৈষম্য বাড়ে, নরম ছড়ানো আলোয় টোনের মাত্রা হ্রাস পায়। আলোর বিপরীতে রিফ্লেক্টর ব্যবহার করেও অনালোকিত অংশকে হালকা টোন দেওয়া যায়। সাধারণত এই ধরনের প্রতিকৃতিতে তিন থেকে চারটি আলোর ব্যবহার ঘটে। প্রধান তীব্র আলোটি চরিত্রটির মূল মুখাবয়বের ওপর ফেলা হয়, দ্বিতীয় ও নরম ছড়ানো আলোটি প্রধান আলোর বিপরীতে অনালোকিত অংশে হালকা টোনের জন্য, তৃতীয় আলোটি সাধারণত অবয়বের ত্রিমাত্রিকতার বোধ সৃষ্টির জন্য এবং চতুর্থটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রয়োজনে, যেমন কোন বিশেষ স্থানকে অপেক্ষাকৃত জোরালো করার জন্য, ব্যবহার করা হয়। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ আলো দুটি হালকা স্পট হিসাবেই থাকে। এছাড়া শিল্পী তাঁর পছন্দমত এই আলো দুটির কোনটি বাদ দিয়ে অথবা রেখে মাথার ওপর থেকে অথবা

ব্যক্তির পেছন থেকেও আলো ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনমত সরাসরি আলোকের বদলে প্রতিফলিত আলোকও ব্যবহার করা যায়। তবে আলো যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন তা যেন ব্যক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সামান্যও বিঘ্ন না ঘটায়—অর্থাৎ একদিকে আলো যেন ব্যক্তির বিরক্তি বা অস্বস্তির কারণ না হয়, অন্যদিকে আলোকসম্পাতের ফলে উদ্ভূত ছায়া যেন ব্যক্তির মুখ বা শরীরের প্রয়োজনীয় অনুপুঙ্খকে অস্পষ্ট করে না ফেলে। পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় নকশা ও আকর্ষণীয় আলোকসম্পাতই প্রধান কথা।

অত্যন্ত প্রাণবন্ত ব্যক্তির প্রতিকৃতি বড় ক্যামেরাতে সবচেয়ে ভালভাবে ধরা গেলেও একটি বিরাটাকৃতি ক্যামেরার সামনে অনেক মানুষই স্বাভাবিক হতে পারেন না। সেজন্য এক্ষেত্রে ৬ × ৬ সি.মি. ক্যামেরাই উপযুক্ত বলে ধরা যেতে পারে। তবে ক্যামেরাকে কোন সময়ই ব্যক্তির খুব কাছে আনা চলে না। মোটামুটি ভাবে স্ট্যাণ্ডার্ড লেন্স যুক্ত ক্যামেরার ক্ষেত্রে ব্যক্তি থেকে ৯/১০ ফুট দূরত্বে ক্যামেরা রাখলে অধিকাংশ প্রতিকৃতি ভালই আসবে। ক্যামেরা বেশি কাছে থাকলে অবয়বে বিকৃতিও ঘটে। সেজন্য ৬ × ৬ সি. মি. ক্যামেরাতে ১০৫ মি.মি. লং ফোকস অথবা ৩৫ মি.মি. ক্যামেরাতে ৮৫ মি. মি. লং ফোকস লেন্স ব্যবহার করে ক্যামেরাকে দূরে রাখা যেতে পারে। বিকৃতি এড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায় হল ব্যক্তিকে একটি তলের মধ্যেই আবদ্ধ রেখে ছবি তোলা। ছবিতে টোনের মাত্রা সঠিকভাবে (বিশেষ করে লো কী ছবিতে) রাখার জন্য মধ্য দ্রুতির ফিল্ম সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। চরিত্রের বলিষ্ঠতা প্রকাশ করার জন্য লো কী ছবিতে ফিল্মে সঠিক আলোকপাত এবং ফিল্মের শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ কম পরিস্ফুটন দরকার, অপরদিকে হাই কী ছবিতে ফিল্মের শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ অধিক পরিস্ফুটনে ছবিতে টোনের মাত্রা কমিয়ে কমনীয়তা আনা যেতে পারে। রঙীন ছবির ক্ষেত্রে রঙকেও চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সাহায্য করার জন্যই ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে গ্ল্যামার জগতের ব্যক্তিদের প্রতিকৃতিতে রঙ সুনির্দিষ্ট পরিবেশ তৈরি করে। তবে কালো-সাদা অপেক্ষা রঙীন ছবিতে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। রঙের সামান্য অমনোযোগী ব্যবহার প্রতিকৃতির অনেকখানি ক্ষতি করতে পারে। প্রতিকৃতিকে শুধু বর্ণই নয়, বর্ণের সম্পৃক্তিও অনেকটা প্রভাবিত করে। সুতরাং রঙের সঠিক, যথাযথ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার ঘটা চাই। এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, কোন শিশুর মুখাবয়বের ছবিকে সঠিক অর্থে প্রতিকৃতি বলা যায় না, কারণ শিশুর অভিব্যক্তির মধ্যে তার চরিত্রের সার্বিক প্রতিফলন হয় না, শুধুমাত্র কোন সাময়িক, তাৎক্ষণিক ভাব প্রকাশ পায়। সুতরাং শিশুদের প্রতিকৃতি শিশু—এই মূল বিষয়টিরই একটি অংশ। তাদের কোন কোন প্রতিকৃতি অবশ্যই আমাদের তৃতীয় ভাগের অর্থাৎ তাৎক্ষণিক মুহূর্ত বা বিশেষ কোন ভাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

প্রথমেই বলেছিলাম যে ব্যক্তিচরিত্রের প্রতিকৃতি তোলা বেশ কঠিন, কারণ ফোটোগ্রাফির কলাকৌশলগত জ্ঞান ছাড়াও এর জন্য প্রয়োজন হয় মুখাবয়বের অ্যানাটমি

ও মনস্তত্ত্বের জ্ঞান। এই ধরনের প্রতিকৃতির শিল্পী সারা পৃথিবীতেই অত্যন্ত কম। তার মধ্যে Julia Margaret Cameron-এর নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর শান্ত,নমনীয়, কমনীয়, প্রায় আধ্যাত্মিক প্রতিকৃতিগুলির জন্য। এরপর আসে Yousuf Karsh-এর কথা, ৮´´ × ১০ ´´ ক্যামেরায় তোলা তাঁর ছবিগুলি সংহত বলিষ্ঠতা, মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও প্রতীকী গুণের জন্য বিখ্যাত। একটু অন্য ধরনের হলেও Arnold Newman-এর প্রতিকৃতির কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। অপূর্ব নকশা-বিশিষ্ট এই সমস্ত ছবিতে ব্যক্তি ছাড়াও তাঁর জীবনের প্রধান কর্ম বা অবলম্বনের প্রতীক এমন কোন বস্তু বা অনুষঙ্গকে উপস্থিত করে অসাধারণ চরিত্র চিত্রণ করেছেন।

ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজ বা গোষ্ঠীর ছবি

এই প্রতিকৃতি, ব্যক্তিচরিত্রের প্রতিকৃতির মত কোন একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এখানে কোন একটি বিশেষ সমাজ বা গোষ্ঠীর সামষ্টিক বিশেষত্ব সেই সমাজ বা গোষ্ঠীর যে কোন একজন মানুষের অভিব্যক্তির সাহায্যে ছবিতে প্রকাশ করা হয়। এই প্রকার প্রতিকৃতি তেমন কঠিন ও অনুশীলন-সাপেক্ষ নয়। এইসব ছবি সাধারণত ষ্টুডিওতে তোলা হয় না। মানুষটির পরিবেশ এইসব ছবিতে একটি চরিত্র হিসাবে কাজ করে, সেজন্য ঐ পরিবেশকে ছবিতে পুরোভূমি বা পটভূমি সহ কম বা বেশি রাখা দারকার। কারখানার শ্রমিক, ক্ষেতে কর্মরত কোন চাষী বা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত গৃহিণীর ছবি—শ্রমিক, চাষী বা সাধারণ গৃহিণীদের সমষ্টিগত ভাবে প্রকাশ করে। এই ধরনের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত ব্যক্তিমানুষটিকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থের প্রতি নিবেদিত হয়। তাতে ব্যক্তির ছবি সাধারণত পূর্ণাবয়ব হয়ে থাকে। ছবির সামগ্রিক নকশা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আলোকেই কাজে লাগানো হয় তবে প্রয়োজনে সাহায্যকারী আলো হিসাবে রিফ্লেক্টর, একটি ফ্লাড বা ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের অভ্যন্তরভাগে যে কোন প্রতিকৃতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম আলো অপেক্ষা স্বাভাবিক আলোর ব্যবহারিক সুবিধা অনেক বেশি। এই ধরনের প্রতিকৃতির জন্য ৬ × ৬ সি.মি. বা ৩৫ মি. মি. ক্যামেরা ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। Margaret Bourke-White-এর ছবির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁর তোলা প্রাণবন্ত প্রতিকৃতিগুলিকে বলা হয়েছে 'Subjective interpretation of some objective reality'।

ব্যক্তির বিশেষ কোন ভাব বা মেজাজের ছবি

এ ছবি তাৎক্ষণিক মুহূর্তের ছবি, এদের ক্যানডিড ছবি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। মুখাবয়বের কোন আকস্মিক ভঙ্গি, মানুষের কোন বিশেষ আচরণ বা অপ্রত্যাশিত, সাময়িক অভিব্যক্তি আলোকচিত্রীকে কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই এই সব ছবি তুলতে প্ররোচিত করে। স্বতঃস্ফূর্ততাই এদের প্রধান গুণ। এই ছবিতে মানুষটির সমগ্র বৈশিষ্ট্য নয়, একটি বিশেষ মুহূর্তের তাৎক্ষণিক মেজাজ প্রতিফলিত হয় যা সজীব, তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতধর্মী হতে পারে। যে আলোতে আলোকচিত্রী মানুষটিকে দেখেন, সেই আলোই ছবির পক্ষে সবচেয়ে মানানসই। এইসব ছবি ৬ × ৬ সি. মি. বা ৩৫ মি. মি. এস.

এল. আর. ক্যামেরাতে ভালভাবে তোলা গেলেও ৩৫ মি. মি. রেঞ্জফাইণ্ডার ক্যামেরা, অতি দ্রুত ব্যবহার করা যায় বলে, সবচেয়ে উপযুক্ত । এই প্রসঙ্গে Henri Cartier-Bresson-এর ছবির কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর ছবি থেকে বুঝতে পারি মুহূর্তের ভগ্নাংশ সময়ের সবিশেষ অভিব্যক্তিটিই এই প্রকার ছবির প্রাণ, সময়ের একচুল এদিক ওদিক হলে সেই ব্যঞ্জনা হারিয়ে যেত। ব্রেসঁ একে বলেছিলেন চূড়ান্ত বা চরম মূহূর্তের (decisive moment) ছবি ।

যে তিন ধরনের প্রতিকৃতির কথা আমরা আলোচনা করলাম তার মধ্যে প্রথম দু ধরনের ছবিকে ফর্মাল প্রতিকৃতি ও তৃতীয়টিকে ইনফর্মাল প্রতিকৃতি বলা যায়। এই তিনটে ধরনই প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে বাস্তবতাবাদী বা স্বাভাবিকতাবাদী। কিন্তু এর বিপরীতে শিল্পী মানুষের মুখাবয়বকে অবলম্বন করে বাস্তবাতীত সৃষ্টিও করতে পারেন। শিল্পী একজন মানুষের মুখ বা অবয়বকে তাঁর প্রায়োজনমত বিকৃত করতে পারেন, বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাতের তারতম্য করে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে পারেন। সার্রিয়ালিস্ট ফোটো বা কার্টুন ফোটো এই পর্যায়ে পড়ে। এস. এল. আর. ক্যামেরাই এ ব্যপারে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কারণ নির্দিষ্ট বিকৃতি ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ওয়াইড অ্যাঙ্গল বা অ্যানামরফিক্ লেন্স এই ক্যামেরাতে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া যে কোন ক্যামেরায় তোলা সাধারণ ছবিও ডার্করুমে নানাবিধ কৌশল করে (যেমন Tone separation, Sabattier, Reticulation পদ্ধতি, ইত্যাদি) সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া যায়। এই প্রকার বিকৃতি যদি নিছক কৌতুক সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে তবে বলার কিছু নেই, কিন্তু যে কোন দৃশ্যগত বিকৃতিকে আমাদের মন মনস্তাত্ত্বিক বা প্রতীকী অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে নেয় বলে এই ধরনের প্রতিকৃতি চরিত্রহননের কাজও করে ফেলতে পারে, সেইজন্য নৈতিকতার প্রশ্নটি এখানে খুব জরুরি।

প্রতিকৃতি প্রসঙ্গে আমরা দুটি সম্পর্কের কথা বলেছিলাম—ব্যক্তি ও ফোটোগ্রাফারের সম্পর্ক এবং ব্যক্তির প্রতিকৃতি ও দর্শকের সম্পর্ক। এবার তৃতীয়টির কথা—ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রতিকৃতির সম্পর্ক। অনেক সময়ই এই সম্পর্ক খুব মধুর নয়, নিজের প্রতিকৃতি দেখে অনেক মানুষই সন্তুষ্ট হতে পারেন না । আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে প্রখ্যাত ফোটোগ্রাফার Biow গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের যে যৌথ পোর্‌ট্রেট তুলে ছিলেন সেটি সম্পর্কে এক ভাইয়ের অভিযোগ হল : ছবিতে অসুস্থ রোগীর মত ভাই চেয়ারে বসে আছে আর আমি বাড়ির খানসামার মত তার পাশে খাড়া দাঁড়িয়ে আছি। অদ্ভুত! আজও অধিকাংশ মানুষের নিজের প্রতিকৃতি সম্পর্কে অভিযোগ হল : ছবি ঠিক বাস্তবসম্মত হয়নি। আসল মানুষ ও তার আলোকচিত্রিত প্রতিকৃতির মধ্যে অভিন্নতা বা আইডেনটিটির প্রশ্নটি একটি জরুরি নান্দনিক প্রসঙ্গ। মানুষ দেখতে কেমন তা সে নিজে মোটেই জানে না, আয়নায় নিজের যে রূপ সে দেখে তাও মোটেই সঠিক রূপ নয়। তাই নিজের আলোকচিত্রিত রূপ দেখে আমরা অধিকাংশ মানুষই বিস্ময় বোধ করি। মনে হয় যেন কিছুটা অজানা মানুষের সাথে মোলাকাত করছি। এ একই সঙ্গে আত্মপ্রীতি ও অন্যের

ব্যাপারে কৌতূহলের মিশ্র উদাহরণ। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক ভাবেই প্রতিকৃতি মানুষের পক্ষে দরকারি। আর প্রতিকৃতি যে ভবিষ্যৎ কালের জন্য তথ্যমূলক ও ঐতিহাসিক জরুরি উপাদান রেখে যাচ্ছে সে কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিশু (Children)

শিশুদের ছবি তোলার জন্য যত লোক ক্যামেরা কেনে, অন্য আর কোন একক বিষয়বস্তুর জন্য বোধ হয় তত ক্যামেরা বিক্রি হয় না। বিষয়বস্তু হিসাবে শিশুদের ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তাদের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। তারা মোটেই কৃত্রিমভাবে আত্মসচেতন নয়, সেজন্য তাদের সমস্ত মনোভাব আপনা আপনিই তাদের মুখে ও শরীরের ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। বস্তুত শিশুরা প্রায়ই এতটা আবেদনমূলক যে তাদের প্রায় সমস্ত আচার আচরণই ফোটোগ্রাফির পক্ষে উপযুক্ত। শিশুদের ছবি তোলার সুবিধা বা অসুবিধা অনেকখানি নির্ভর করে তাদের বয়সের ওপর। ইউনিসেফের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে বা মেয়েকে শিশু বলা যেতে পারে।

জন্মের পর থেকে প্রায় দেড় বছর বয়স অবধি, অর্থাৎ হাঁটতে শেখার আগে পর্যন্ত, একটি শিশুর ছবি যে কোন ক্যামেরার সাহায্যে খুব সহজেই তোলা যায়। প্রয়োজন কেবল স্বাভাবিক, নরম আলোর যাতে ছবিতে ছায়ার ভাগ খুব কম হয় কেননা নবজাতকদের ছবির সঙ্গে জোরালো ছায়া মোটেই খাপ খায় না। নবজাতকদের কার্যকলাপ সামান্য হাত পা নাড়ায় এবং অভিব্যক্তি মাত্র হাসি, কান্না ও ঘুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবু তাদের যে কোন ছবিই আমাদের মুগ্ধ করে—বিশেষ করে মা ও শিশু-র ছবি আবেগ ও সংস্কারগত দিক থেকেও আমাদের আকৃষ্ট করে।

ক্রমে শিশু হাঁটতে শেখে, ও তার চারপাশের নানা বস্তু তাকে কৌতূহলী করে তোলে—তার অভিব্যক্তির সীমানাও বৃদ্ধি পায়। এ-সময় তার হাঁটতে শেখা, বারবার পড়ে গিয়ে ফের ওঠা, তার স্নান, খাওয়া এমনকি তার ঘুম পর্যন্ত ছবির বিষয় হিসেবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কোন জিনিষ হাতে পেলে সে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, ও খেলা করে। ডাকলে সাড়া দেয়। সুতরাং তার নানা ভঙ্গি ও অভিব্যক্তির ছবি, একটু লক্ষ্য করে দেখলে, খুব সহজেই পাওয়া যায়। শিশুর এই স্বাভাবিক ভঙ্গি ক্যামেরায় স্বাভাবিক দৃষ্টকোণ থেকে ধরতে হলে, ক্যামেরাকে শিশুর উচ্চতায় রাখা দরকার। বলা হয় : শিশুদের ছবি তুলতে হলে নিচু হয়ে ছবি তোল, শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয়ার্থে নিচু হয়ে। সেজন্য আই-লেভেল-ক্যামেরা অপেক্ষা ওয়েষ্ট-লেভেল টি. এল. আর. বা এস.এল. আর. ক্যামেরা এক্ষেত্রে বেশি উপযোগী। ছবিতে টোনের মাত্রাও এমন হওয়া দরকার যাতে শিশুর কমনীয়তা ও তার অবয়বের ত্রিমাত্রিকতা সঠিকভাবে ধরা পড়ে। সেজন্য স্বাভাবিক নরম আলো ও উচ্চ দ্রুতির ফিল্ম ব্যবহার করা প্রয়োজন। জানলা দিয়ে আসা স্বাভাবিক আলোর বিপরীতে একটি সাদা কার্ডবোর্ড বসিয়ে শিশুর শরীরের অনালোকিত অংশে হালকা আলোকসম্পাত করে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া যায়। শিশুর ছবি তোলার জন্য

স্বাভাবিক মুহূর্তটি অনুধাবন করার ও খুব দ্রুত ছবি তুলতে পারার ক্ষমতা থাকা দরকার।

বালক-বালিকাদের ছবি তোলা তুলনামূলক ভাবে আর একটু কঠিন। তাদের ছবি তুলতে হলে তাদের সঙ্গে তাদের মত করে মিশে যেতে হবে। তাদের যে বিষয়ে আগ্রহ ও তারা যা নিয়ে ব্যস্ত, তাতে আগ্রহ প্রকাশ করে, দরকার হলে অংশগ্রহণ করে তাদের বিশ্বাসের যোগ্য হতে হবে—এভাবে তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে ও সুযোগমত ক্যামেরার সদ্ব্যবহার করতে হবে। ছবি তোলার জন্য তারা কিভাবে বসবে বা কিভাবে দাঁড়াবে এ সমস্ত নির্দেশ না দেওয়াই ভাল, কেননা সযত্ন ও আরোপিত ভঙ্গিবিশিষ্ট ছবিতে তাদের স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় না ও তাতে প্রায়ই তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটে। কোন সহজ, স্বচ্ছন্দ, নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি পেতে হলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা দরকার। একমাত্র তাহলেই তাদের মুদ্রাদোষ বাদ দিয়ে সঠিক বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরা সম্ভব। যে কোন শিশুই স্বভাবে অত্যন্ত কৌতূহলী, ফলে তাদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে থেকে ছবি তুললে কাজ অপেক্ষাকৃত নির্বিঘ্নে সারা যায়। তারা কখনো স্থির হয়েও থাকে না, সেজন্য যে দূরত্বে ছবি তোলা হবে তা আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে সেই দূরত্বে ক্যামেরা ফোকস করে রাখতে হয় এবং প্রয়োজনমত অত্যন্ত দ্রুত ছবি তুলতে হয়। এসব ক্ষেত্রেও উচ্চ দ্রুতির ফিলম ব্যবহার করা দরকার তবে আই-লেভেল-ক্যামেরা ব্যবহার করার তেমন অসুবিধা হয় না।

বয়স্ক ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের সম্বন্ধে একটু বেশি সচেতন এবং বয়স্কদের সামনে তারা অনেক সময় সামান্য সংকোচ বোধ করে। কখনো কখনো নিজেদের মনোভাব চাপা দেবার প্রয়াসটাও তাদের অভিব্যক্তির মধ্যে ধরা পড়ে। অনুষঙ্গ হিসাবে লাজুকতাও ছবিতে একটা স্বাভাবিকতা আনতে পারে। এদের স্বাভাবিক ভাবে পাওয়ার জন্য শুধু ধৈর্য নয়, খানিকটা কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন। কথাবার্তায় তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের সঙ্গে সহজভাবে মেশা যায় এবং তখন তাদের স্বাভাবিক ছবি পেতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। অভিজ্ঞ ফোটোগ্রাফাররা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে এবং খেলাধূলার বা কোন উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার সময় কিছুটা দূরে থেকে লং ফোকস লেনস—যেমন ১৩৫ মি. মি.—ব্যবহার করে প্রায়ই খুব ভাল ছবি তুলে থাকেন। তবে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করলে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যাহত হতে পারে বলে এক্ষেত্রেও স্বাভাবিক আলো ও তার ফলে উচ্চ দ্রুতির ফিলম ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকে না।

তবে একজন ক্যামেরাম্যানকে মনে রাখতে হবে কৈশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিচরিত্রের গঠন শুরু হয় এবং তার ফলাফলও নানাভাবে তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। এসময় তারা যথেষ্ট সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ থাকে। ফলে তাদের চরিত্রের মধ্যে একই সঙ্গে ভালবাসা ও নিষ্ঠুরতা, কমনীয়তা ও রুক্ষতা, আগ্রহ ও উদাসীনতার সমাবেশ ঘটে। একজন অভিজ্ঞ আলোকচিত্রশিল্পী এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করেন এবং প্রয়োজনমত নরম আলোর পরিবর্তে তীব্র আলোকসম্পাতের সাহায্যে ছবির টোনে যথেষ্ট বৈষম্য সৃষ্টি করে সঠিক ভাবটি প্রকাশ করতে পারেন।

ক্রমবিকাশের সময়টিতে শিশুদের অনুভূতি ও মনোভাব কেমন হয় তার সুন্দর প্রমাণ Jacques-Henri Lartigrue-র, আট থেকে ষোল/সতের বছর বয়সের মধ্যে তোলা শিশু এবং মহিলাদের ছবিগুলি, এগুলিতে একই সঙ্গে জীবনের প্রতি কৌতূহল ও জীবন সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। শিশুদের ছবি শুধু পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শৈল্পিক প্রয়োজন নয়, অনেক সময় সামাজিক প্রয়োজনও মেটায়। ফোটোএসেতে শিশুদের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। Riis-এর তোলা 'চিল্ড্রেন অব দি পুওর' সিরিজের ছবিগুলি আমেরিকায় বস্তিবাসীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল, Hine-এর তোলা শিশু শ্রমিকদের দুরবস্থার বিভিন্ন ছবি নিরাপত্তামূলক শিশুশ্রম আইন বলবৎ করার কাজকে ত্বরান্বিত করেছিল। Chim যুদ্ধের আতঙ্ক তুলে ধরেছিলেন অসহায় শিশুদের চোখে মুখে। শিশু—বিষয়বস্তুটির সম্ভাবনা এইভাবে সুদূরপ্রসারী।

খেলাধূলা (Games & Sports)

খেলাধূলার মূল আবেদন তার উত্তেজনা ও গতিশীলতা। সামগ্রিক ভাবে এই উত্তেজনা ও গতিশীলতার চিত্ররূপ চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই সঠিক ও ফলপ্রদভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। অথচ একজন আলোকচিত্রীকে এই সামগ্রিক ও ধারাবাহিক উত্তেজনা ও গতিশীলতার মধ্য থেকে একটি খণ্ড মুহূর্তের স্থিরচিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা প্রকাশ করতে হয়। তাকে এমন একটি মুহূর্ত বেছে নিয়ে ছবিতে ধরতে হয় যার সাহায্যে দর্শক সেই গতি ও উত্তেজনার স্বাদ পেতে পারেন অথচ চূড়ান্ত ছবিতে গতির দরুন অস্পষ্টতা সৃষ্টি না হয়। একজন স্পোর্টস ফোটোগ্রাফারকে অ্যাকশনের প্রকৃতি বুঝতে হবে, অতি দ্রুত ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে ও ছবিতে গতির দরুন অস্পষ্টতা এড়াতে হবে। অ্যাকশনের প্রকৃতি বোঝার জন্য দুটো জিনিষ জানা চাই—এক, খেলার চরম মুহূর্তটি আন্দাজ করতে পারা, যেমন একজন উচ্চলম্ফনকারী ব্যক্তির ছবি ঠিক যে মুহূর্তে তিনি উচ্চতাটি পার হচ্ছেন সেই মুহূর্তটিকে ধরবে। দুই, কারণ ও ফলাফলের (cause and effect) সূত্রটি বুঝতে পারা যাতে কারণ অর্থাৎ গতি কী ফল—যেমন বালি ছিটকে যাওয়া, চুল ওড়া বা মাংসপেশীর কম্পন—সৃষ্টি করবে তা আগে থেকেই অনুমান করা যায়, কেননা ছবিতে এইসব ফলাফল থেকেই গতির আভাস পাওয়া যাবে। ধারাবাহিক অ্যাকশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন বিশেষ চরম মুহূর্ত থাকে না, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্তটি অনুমান করা চাই। এই চরম বা নির্দিষ্ট মুহূর্তটি ঠিকঠিক ছবিতে ধরতে হবে। যে খেলার ছবি তুলতে হবে, সে খেলা সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকলে কোন্ অংশে যথার্থ উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাকশনটি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে আগেই একটা অনুমান করে নিয়ে প্রস্তুত থাকা যায়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট স্থান আগেই বেছে নিতে হয় এবং লক্ষ্য রাখতে হয় সে জায়গা থেকে ছবি তুললে পটভূমি ছবিতে কোন বাধা বা অসুবিধার সৃষ্টি করবে কিনা। নিচু দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা ছবিতে খেলোয়াড়দের অবয়বকে ভালভাবে ধরা গেলেও পটভূমিতে দর্শকদের উপস্থিতি ছবির উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ফোকস গভীরতা কম করার জন্য বড় অ্যাপারচারে ছবি তোলা দরকার। অথবা দৃষ্টিকোণ

উঁচু করে পটভূমিকে সাধারণ রেখেও অবয়বকে জোরালো করে আবেদন ফুটিয়ে তোলা যায়। কোন্ খেলায় কোন্ স্থান বেছে নিলে ফোটোগ্রাফারের সবচেয়ে সুবিধা হবে তার তালিকা দেওয়া হল :

ফুটবল : দুটো গোললাইনের কোন একটা বরাবর, ব্যাডমিন্টন : নেটের যে কোন প্রান্তে, ক্রিকেট : খেলার মাঠের উচ্চতা থেকে কিছু ওপরে, বোলার বা উইকেট কিপারের পিছন দিকে, অ্যাথলেটিক্স : খেলোয়াড়ের যথেষ্ট কাছাকাছি, দৌড় : দৌড় শেষ হবার মুখে খেলোয়াড়দের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে, ঘোড়দৌড় : সূচনা বা সমাপ্তি রেখায়, হকি : মাঠের স্ট্রাইকিং সার্কল ক্যামেরার সীমানার মধ্যে থাকা চাই, সাঁতার : যেখান থেকে সাঁতার শুরু হবে সেখানে, যাতে সমস্ত সাঁতারু একসঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই দৃশ্য তোলা যায়।

দ্রুতগতিতে কাজ করার সুবিধার জন্য খেলাধূলার ছবির ক্ষেত্রে স্প্লিট ইমেজ রেঞ্জফাইণ্ডার ক্যামেরা অত্যন্ত উপযোগী। এই কাজে এতকাল প্রেস ক্যামেরা ও ৩৫ মি. মি. ক্যামেরা বেশি ব্যবহৃত হত। তবে সাম্প্রতিককালে মোটর-ড্রাইভযুক্ত ৩৫ মি. মি. এস. এল. আর. ক্যামেরাতে স্পোর্টস ফাইণ্ডার যুক্ত করে ব্যবহার করার রীতি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। ডিরেক্ট ভিউফাইণ্ডার ক্যামেরার সাহায্যে দৃশ্যটি ফ্রেমে আসার আগে থেকেই পর্যবেক্ষণ করতে পারার সুবিধা থাকায় ক্যামেরাকে প্যান করা খুব সহজ হয়। দ্রুতগতি অ্যাকশনকে ধরার জন্য দ্রুতগতি শাটারের প্রয়োজন, ফলে উচ্চতম দ্রুতির ফিল্ম ব্যবহারও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ঘটনার স্থান হতে কিছু দূর থেকে ছবি তুলতে হয় বলে দূরত্ব অনুযায়ী লং ফোকস লেন্সের প্রয়োজন। অত্যন্ত দ্রুত ফোকসিং ব্যবস্থার জন্য ট্রিগারের সাহায্যে ফোকস করার সুবিধাসহ আয়নাযুক্ত হালকা লং ফোকস লেন্স খেলাধূলার ছবি তোলার পক্ষে আদর্শ বলা যেতে পারে। দ্রুতগতি শাটার ব্যবহার করলেও অনেক নাম করা ক্রীড়াচিত্রী কোন কোন খেলার ক্ষেত্রে মনোপড (Monopod) ব্যবহার করে থাকেন। খেলাধূলার ছবিতে ফিল্টার ব্যবহার বিশেষ ঘটে না।

স্থিরচিত্রে গতির অনুভব সাধারণত দু ভাবে প্রকাশ করা হয়: ছবিতে পটভূমিকে স্পষ্ট রেখে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়কে অস্পষ্ট ও দীর্ঘায়িত দেখিয়ে অথবা অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়কে স্পষ্ট রেখে পটভূমিকে অস্পষ্ট করে। প্রথমটির ক্ষেত্রে ক্যামেরাকে স্থির রেখে গতির তারতম্য অনুযায়ী শাটার দ্রুতি ১/৬০ বা ১/৩০ সেকেণ্ড ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে শাটার দ্রুতি একই রেখে ক্যামেরাকে খেলোয়াড়ের গতির সঙ্গে সমতা রেখে গতির অভিমুখে ধীরে ধীরে প্যান করার সময় সঠিক মুহূর্তে শাটারের বোতাম টিপতে হয়। বস্তু ক্যামেরার দিকে ঝুঁকে থাকলে অথবা ক্যামেরাকে টিল্ট করালে গতির ধারণা সৃষ্টি হয়। আর প্যানিং-এর ফলে যে গতির ধারণা সৃষ্টি হয়, তা যথেষ্ট গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রেই বিশেষত কার্যকারী। কোন্ পদ্ধতিতে গতির বোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে ছবির দৃষ্টিকোণ। ছবিতে যদি খেলোয়াড়কে স্পষ্ট রেখে পটভূমিকে ঝাপসা করা হয় অর্থাৎ একজন গতিশীল খেলোয়াড় তাঁর চোখে যা

দেখেন—তা হলে ছবিটি খেলোয়াড়ের দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা। অপরপক্ষে যদি পটভূমিকে স্পষ্ট করে খেলোয়াড়কে ঝাপসা রাখা হয় অর্থাৎ স্থির হয়ে বসে থাকা দর্শক কোন দ্রুতগতি বস্তুকে যেভাবে দেখেন—তখন ছবিটি দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা। দ্রুতগতিসম্পন্ন মোটর সাইকেল চালককে আমরা যে কোন ভাবেই ছবিতে ধরতে পারি। একজন দক্ষ ক্যামেরাম্যান কোন গতিশীল বস্তুর ছবিতে গতির ফলে যাতে সার্বিক অস্পষ্টতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতির এক বা একাধিক অবলম্বন করেন—১. এমন কোন দূরত্ব ও কোণ বেছে নেন যেখান থেকে অস্পষ্টতা হয় সবচেয়ে কম ২. সম্ভাব্য সর্বোচ্চ শাটার দ্রুতি ব্যবহার করেন ৩. বস্তুর গতির সঙ্গে সমতা রেখে ক্যামেরাকেও গতিশীল করেন ৪. বস্তুর গতির মধ্যে যদি কোন 'স্থির' বিন্দু থাকে, সেই মুহূর্তে ছবি তোলেন। ফিলমে আলোকপাতের সময় কত হবে সেটা নির্ভর করে চূড়ান্ত ছবিতে কত গুণ পরিবর্ধন দরকার হবে তার ওপর।

খেলাধূলার মধ্যে উত্তেজনা ও গতি ছাড়া অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা ও গতিভঙ্গির সৌন্দর্যও আমাদের আকর্ষণ করে। সুতরাং খেলাধূলার ছবিতে উত্তেজনা, গতি, দক্ষতা বা সৌন্দর্য—যে কোনোটিই প্রাধান্য পেতে পারে। খেলাতে শুধু খেলোয়াড়দের দ্বারাই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা নয়, অনেক সময় দর্শকদের উত্তেজনাও ছবিতে সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশ করে খেলার উত্তেজনা বোঝানো যেতে পারে। ফুটবল বা হকিতে গোলের সামনে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা যেমন প্রতি খেলাতেই দেখা যায়, গ্যালারিতে বসা উত্তেজিত দর্শকদের নানারকম অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি বা অভিব্যক্তির ছবিও আমরা প্রায়শই দেখে থাকি। বাস্তবে গতিভঙ্গি অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য আমাদের চোখে পড়ে, অনেক সময়ে পড়েও না। ছবিতে আমাদের সেই তৃষ্ণা মেটে। একজন জিমন্যাস্টের নিখুঁত ও সুন্দর ভঙ্গি ছবিতে স্পষ্ট ও স্থায়ীভাবে ধরা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে শাটার দ্রুতি বাড়িয়ে গতিময় অবয়বের সৌন্দর্যকে স্পষ্ট করা হয়।

টেবল টেনিস্, ব্যাড্‌মিন্টন, জিম্‌ন্যাষ্টিক ইত্যাদি ইনডোর খেলার ছবি তোলার সময় ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ খুব সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকলেও, তা ব্যবহার করা যায় না, কারণ এর ফলে খেলোয়াড়দের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অনুমতি নিয়ে একমাত্র তাদের অনুশীলনের সময় কিছু ছবি ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে তোলা যায়।

তবে একথাও মনে রাখা দরকার খেলাধূলার ছবি বলতে শুধু নির্দিষ্ট ক্রীড়াঙ্গনের ক্রীড়ানুষ্ঠানই নয়, খেলার আগে খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি অথবা শেষে তাদের আবেগপূর্ণ অনুভূতি (রাগ,দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, হতাশা)-কে নিয়ে আকর্ষণীয় ছবি হতে পারে। বলা হয়ে থাকে, খেলার মাঠের নাটক অপেক্ষা ড্রেসিংরুমের নাটক কোন অংশে কম নয়। তবে এই সময়ে খেলোয়াড়দের মেজাজ ও মানসিকতার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

খেলাধূলাকে জনপ্রিয় করার পিছনে খেলাধূলার ছবির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। Erich Baumann, Rupert Leser, Albrecht Gaebele ও Fred Joch-এর মত

ফোটোগ্রাফারদের তোলা অলিম্পিক গেম্‌স্‌, ওয়ার্ল্ড কাপ ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার চিত্রবিবরণী খেলাধূলার ছবিকে আজ একটা অভিজাত ঐতিহ্য দিতে পেরেছে।

বন্যপ্রাণী (Wild Life)

খেলাধূলার ছবির পর বন্যপ্রাণীর ছবি নিয়ে আলোচনা সঙ্গত হতে পারে, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই স্ন্যাপ শট অর্থাৎ দ্রুত ছবি তোলার পদ্ধতি হল সাফল্যের চাবিকাঠি। বন্য প্রাণী দু ধরনের হতে পারে—মুক্ত ও চিড়িয়াখানায় সুরক্ষিত। মুক্ত বন্যপ্রাণীরা সহজে মানুষের সম্মুখীন হতে চায় না, তারা তাদের অভ্যস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশেই আত্মগোপন করে থাকা পছন্দ করে। এ অবস্থায় তাদের ছবি তুলতে হলে যথেষ্ট ধৈর্য, সাবধানতা ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যে প্রাণীর ছবি তুলতে হবে অলক্ষ্যে থেকে তার আচার-আচরণ ও অভ্যাস ভালভাবে লক্ষ্য করে তবেই তার সঠিক ছবি তোলা সম্ভব। সেজন্য ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে বায়নোকুলার থাকা অতি আবশ্যক। হিংস্র বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতারও প্রয়োজন।

যে কোন বন্যপ্রাণীর দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ —এই তিনটে ইন্দ্রিয়ের এক বা একাধিক আমাদের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল, ফলে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে চেষ্টা করলেও,তাদের আগোচরে তাদের যথেষ্ট কাছাকাছি যাওয়া অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কাছে গিয়ে ছবি তোলার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন ফোটোগ্রাফারকে কিছুটা প্রকৃতিবিজ্ঞানী হতে হয়। বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অভ্যাস সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ফোটোগ্রাফারকে নির্দেশ করবে কোথায় কখন কোন প্রাণীর ছবি তোলার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে এবং সেই জ্ঞানই কোন জন্তুর সম্ভাব্য গতিবিধি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে সাহায্য করবে যাতে ফোটোগ্রাফার ঠিক সময়টিতে সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়েই ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন ফোটোগ্রাফারকে কিছুটা শিকারীর মত হতে হয়। তাঁকে পোশাকে ও চলাফেরায় উগ্র ও অস্থির না হওয়া শিখতে হয়, যে কোন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে জানতে হয়, প্রত্যুৎপন্নতার পরিচয় দিতে হয়। এইভাবে জঙ্গলের ওয়াটার-হোলের কাছাকাছি কোন নিরাপদ গোপন স্থান বেছে নিযে অপেক্ষা করে মাংসাশী হিংস্র বা তৃণভোজী বড় জন্তুদের ভাল ছবি পাবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বন্যপ্রাণীদের ভাল ছবি পাওয়া যদিও অনেকখানি ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তবুও বুদ্ধি ও ধৈর্য আমাদের এ কাজে খুবই সাহায্য করে। এজন্য অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়, হাতে অনেক সময় রাখতে হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে কিছুই না ঘটার পর হঠাৎ হয়ত ক্যামেরার ফোকস ক্ষেত্রের অন্তর্গত স্থানে চূড়ান্ত অ্যাকশন সংঘটিত হতে শুরু করে।

বন্যপ্রাণীদের ছবি তোলার পক্ষে বিভিন্ন ধরনের লেন্‌স পরিবর্তনের সুবিধা সহ ৩৫ মি. মি. বা ৬ × ৬ সি. মি. এস. এল. আর. ক্যামেরাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই ক্যামেরায় টি. টি. এল. (থ্রু দি লেন্‌স) মিটার থাকাও খুব দরকার, কারণ বেশির ভাগ

সময়ে আলাদা মিটার ব্যবহার করার সুযোগ থাকে না। বন্যজন্তুদের নিঃশব্দে অনুসরণ করে ছবি তুলতে হলে, ছবি তোলার সাজসরঞ্জাম যথাসম্ভব কম রাখাই ভাল। বড় আকারের, বিশেষ করে হিংস্র প্রাণীদের ছবি তোলার জন্য মিডিয়াম বা এক্সট্রিম লং ফোকস লেন্স ব্যবহার করার দরকার হয় এবং শেষোক্ত লেন্সের জন্য হালকা মনোপড বিশেষ কার্যকারী। ৪০০ মি. মি. এক্সট্রিম লং ফোকস, ১৩৫ মি. মি. ও ১৮০ মি.মি. টেলি এবং ৩৫ মি.মি. ওয়াইড অ্যাঙ্গল মুক্ত বন্যপ্রাণীর ছবির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলা যেতে পারে। বন্যপ্রাণীর ছবিতে টেলিফোটো লেন্স আদর্শ হলেও, সঙ্গে একখানা ফিশ-আই লেনসও রাখা ভাল। এছাড়া একটা ৬০ মি. মি. ম্যাক্রো লেন্সেরও দরকার হয় কেননা পোকামাকড় বা ছোটখাটো সরীসৃপের মত নিকটস্থ বস্তুর ছবিও তুলতে হতে পারে। খুব ছোটি আকারের বস্তুর জন্য ক্লোজ-আপ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন। পোকামাকড় বা সরীসৃপেরা যেহেতু সাধারণত মাটিতে থাকে, তাদের ছবি তোলার জন্য ক্যামেরায় ওয়েষ্ট লেভেল ভিউফাইণ্ডার ব্যবস্থা থাকলে খুব সুবিধা হয়, নচেৎ ক্যামেরাম্যানকে মাটিতে শুয়ে পড়ে কাজ করতে হতে পারে।

যে সমস্ত প্রাণী রাত্রে বিচরণ করে তাদের ছবি তোলার জন্য বিশেষ জায়গায় ইলেকট্রনিক ফ্লাশ রেখে বা যথাস্থানে ক্যামেরাকে রেখে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বন্যপ্রাণীর ছবি রঙীন ফিল্মেই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। প্রকৃতির বিচারে, সমস্ত স্বাভাবিক আলোকাবস্থায় কোডাক্রোম ৬৪ ফিলম সম্পূর্ণ উপযোগী, এতে উজ্জ্বল বর্ণায়ণ পাওয়া যায়, দানাও হয় খুব সূক্ষ্ম। ভোর ও সন্ধ্যায় ছবি তোলার জন্য একটাক্রোম ৪০০ ফিলমের দরকার হয়। চিড়িয়াখানায় সুরক্ষিত জীবজন্তুর ছবি ভালভাবে তোলার উদ্দেশ্যে এস. এল. আর ক্যামেরা এবং প্রায় ৬০০ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘ পর্যন্ত টেলিফোটো লেন্স আবশ্যক।

পাখিদের ছবি তোলার নিয়ম একটু অন্যরকম, এক্ষেত্রে সাধারণত পাখিরা যে গাছে এসে বসে বা বাসা বাঁধে তার খুব কাছে সাবধানে নিজেকে আড়ালে রেখে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হয়। পাখিরা যে গাছে বাসা বাঁধে, নির্দিষ্ট নিয়মে তারা সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। কয়েকদিন লক্ষ্য করে তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং ছবি তোলার সঠিক স্থান নির্বাচন করে, সে জায়গায় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটা আড়াল (hide) তৈরি করতে হয়। এই আড়ালটি একদিনে না করে কয়েকদিন ধরে ধীরে ধীরে করা দরকার যাতে কোনরকম অসুবিধা বা সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। গাছের কোন ডালপালা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তোলার পক্ষে কোন বাং হলে সাবধানে পাখিদের অগোচরে সেই ডালটিকে সরিয়ে অন্য ডালের সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়, কেটে বাদ দিলে পাখিদের সন্দেহ উদ্রেক করবে এবং একবার সন্দেহ করলে তারা ঐ বাসায় আর ফিরে আসবে না। ঐ আড়ালের মধ্যে যতটা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে প্রবেশ করে কোনরকম শব্দ না করে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হয় ফোটোগ্রাফারের পোশাক যেন উগ্র না হয় এবং অপেক্ষা করার সময় তিনি যেন ধূমপান

না করেন। ছবি তোলার সময় শাটারের আওয়াজ হলে পাখিরা ভয় পাবে। সেজন্য এস. এল. আর. ক্যামেরার মিরর লকটি নির্দিষ্ট স্থানে ফোকস করার পর আটকে দিতে হয়, যাতে মিরর পড়ার আওয়াজ না হয়। ক্যামেরার নিজস্ব আওয়াজও যাতে কোন অসুবিধার কারণ না হয় সেজন্য প্যাড দেওয়া একরকম ক্যামেরা কভার (ক্যমেরা ব্লিম্প) পাওয়া যায় যার ভেতরে ক্যামেরা রেখে শাটার টিপলে সেই শব্দ বাইরে থেকে শোনা যায় না। পাখির ছবি তোলার জন্য অবস্থানানুপাত ঠিক রেখে যতটা সম্ভব কাছে যাওয়া উচিত, সেইজন্য মিডিয়াম লং ফোকস লেন্সই সুবিধাজনক। দূর থেকে এক্সট্রিম লং ফোকস লেন্স ব্যবহার করলে পাখি ও তার পটভূমির দূরত্ব অস্বাভাবিক হ্রাস পেয়ে ছবি খানিকটা বিকৃত দেখাবে। এই লেন্স ব্যবহার করার সময়ে তাই পটভূমি সম্পর্কে যথেষ্ট বিবেচনা করা দরকার।

বন্যপ্রাণীর ছবি প্রাণীবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক কর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং একটি নতুন শাখা। বন্যপ্রাণীর বিভিন্ন আচার-আচরণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে যে বিভিন্ন তথ্য ও চিত্র এর ফলে পাওয়া যায় তা একই সঙ্গে শিক্ষামূলক সাহিত্য, জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও বিনোদনের কাজ করে। পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর নির্ভর করছে মানুষ ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। বন্য প্রাণীর ছবি পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে সরাসরি সাহায্য করে, সুতরাং তার গুরুত্ব অপরিসীম।

নগ্ন শরীর (Nudes)

মানব শরীর, বিশেষ করে নগ্ন নারীদেহের মোহময় সৌন্দর্য বহুকাল থেকেই চিত্র ও ভাস্কর্যের একটা প্রধান বিষয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাগাত্রে বা মৃৎপাত্রের খোদাই করা নারীমূর্তিতে হাত, পা বা মুখাবয়ব অপেক্ষা স্তন, উদর ও জঙ্ঘার প্রাধান্য দেখে মনে হয়, দেহসৌন্দর্য নয়, উর্বরতার প্রতীক হিসাবেই সে সময় নারীদেহ অঙ্কনের সূত্রপাত। অর্থাৎ এইসব নারীদেহ যতটা না নারীমূর্তি, তার চেয়ে বেশি মাতৃমূর্তি। তবে সভ্যতা ও শিল্পকলার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবদেহ শিল্পচর্চার একটা নিরপেক্ষ বিষয় হয়ে ওঠে এবং নগ্ন দেহ সৌন্দর্যের শিল্পমণ্ডিত ভাস্কর্য প্রাচীন গ্রীসে একটা গৌরবময় স্থান অধিকার করে। শিল্পে মানবমূর্তির রূপায়ণে গ্রীক সভ্যতা অসাধারণ সৌন্দর্যের সঙ্গে অভিজাত মর্যাদা যোগ করেছিল। এইসব মূর্তি তাদের আপাত স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও, একটা স্পষ্ট শরীরী প্রাণচঞ্চলতার আবেদন তুলে ধরে। এই আবেদন সাধারণত কোন ইন্দ্রিয়প্রবণতার নয়, তা মানবিক মুক্তি সংক্রান্ত অনুভূতি ও উপলব্ধির এক নান্দনিক প্রকাশ। কিন্তু মধ্যযুগে এই ধরনের শিল্পচর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং রেনেসাঁসের পরবর্তী কালে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পের বিষয় হিসাবে তা ফের প্রাধান্য পায়। এই সময় ফোটোগ্রাফির আবির্ভাব। আবির্ভাবের কিছুদিনের মধ্যেই ফোটোগ্রাফিতে ন্যুডের অনুশীলন শুরু হয়। প্রথম দিকে নগ্ন শরীরের আলোকচিত্রিত প্রতিকৃতি জনমানসে প্রবল বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল। তখনকার ধ্যানধারণা অনুযায়ী ফোটোগ্রাফিক ন্যুড 'অতিমাত্রায়

ন্যুড'—যা নারী সম্বন্ধে মানুষের কতকগুলি প্রচলিত ধারণাকে রূঢ় ভাবে আঘাত করেছিল। ফলে আলোকচিত্রশিল্পীরা চিত্রশিল্পের অনুকরণে নগ্নশরীরের ছবিতে নানা রকম প্রপ্ বা সেটসেটিং ব্যবহার করে অথবা সফ্‌ট ফোকস লেন্সের সাহায্যে নারীদেহকে ঝাপসা করে রোমান্টিকতা আনতে বা বাস্তবকে মৃদু করে আনতে চেষ্টা করতেন। তবু সেই আদি যুগেও ফোটোগ্রাফি তার চেয়ে অনেক পুরনো শিল্পকলা চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের দিকে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই সময় Courbet, Delacroix-এর মত প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীরা ন্যুড ফোটোগ্রাফির সাহায্য নিয়ে ছবি আঁকতেন এবং Nadar ও Durieu-এর মত ক্যামেরাম্যানদের কাছে মডেল পাঠিয়ে ছবি তুলিয়ে নিতেন যাতে করে তাঁরা সেই ছবি ভালভাবে অনুশীলন করে ছবি আঁকতে পারেন। ক্রমে ক্রমে নগ্ন নারীশরীরের ছবিতে ফোটোগ্রাফির নিজস্ব স্বকীয়তা প্রকাশ পেতে লাগল। এই বিবর্তনের পেছনে জনমানসিকতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

ন্যুড ছবি তুলতে গেলে যে দুটো বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা হল—১. নগ্ন নারীশরীরের উপস্থিতি ও ২. ফোটোগ্রাফি-মাধ্যমটির স্বাভাবিক বাস্তবতা। নগ্ন নারীশরীরের ছবি তখনই সমর্থনযোগ্য যদি তা প্রাথমিক ভাবে নান্দনিক ও চিত্রগত প্রয়োজন মেটায়। যদি উত্তেজনা সৃষ্টি তার উদ্দেশ্য না হয়। মনে রাখতে হবে, নগ্ন নারীদেহের ছবি একটি স্তরে নারীর নগ্নতা ও তার যৌন আবেদনেরই ছবি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা নারীত্বের প্রকাশ এবং নগ্নতা মাত্রই অশ্লীল নয়। শ্লীলতা বা অশ্লীলতা কোন নির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে না— তা নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত শিক্ষা, রুচি, সংস্কার আর নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর এবং অনেকটা উদ্দেশ্যের ওপর। যেমন বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন সংস্থায় নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নারীর যৌন আবেদনমূলক ভঙ্গির ছবিকে আর্ট ফোটোগ্রাফ বলে উল্লেখ করা হয়।

যাই হোক, যে কোন বিষয় বা বস্তুর মত নগ্নতার সৌন্দর্যও নির্ভর করে গঠনের রূপ ও ছন্দের ওপর। গঠন ও আকৃতিতে রূপের ছন্দ ও ছন্দের রূপ ফুটিয়ে তুলতে হলে সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন মানবদেহের অ্যানাটমির জ্ঞান। প্রতিটি মানবদেহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। একজন শিল্পীর কাজ তার শারীরবিদ্যার জ্ঞানকে যত্ন সহকারে কাজে লাগিয়ে সেই দেহের বিশেষত্বকে লক্ষ্য করা ও দেহের যে বিশেষ ভঙ্গির সাহায্যে তার দেহসৌন্দর্য সবচেয়ে ভাল প্রকাশ পাবে বা দেহরেখা এক বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠবে তাকে ছবিতে ধরা। এই কাজে শিল্পীকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ ও সঠিক আলোকসম্পাত। দৃষ্টিকোণ বা আলোকসম্পাতের সামান্য তারতম্যের ফলে একটি ছবি নান্দনিক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ হতে পারে অথবা অশ্লীল বলে গণ্য হতে পারে। আলোকসম্পাতের সাহায্যে শিল্পী তাঁর পরিকল্পনামত দেহ বা দেহরেখার কোন অংশ জোরালো করেন অথবা কোন অংশ একেবারে আগোচর করে দেন। আলোকসম্পাতের মাধ্যমে ছবির মেজাজ এবং দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে গঠন ও আকৃতি ছবিতে সমন্বিত করে ফোটোগ্রাফারের চেষ্টা হয় সৌন্দর্য বা রহস্য সৃষ্টি করা।

ন্যুড ছবির জন্য উপযুক্ত মডেল পাওয়া একটা সমস্যা হতে পারে। পাওয়া গেলেও ফোটোগ্রাফারকে বুঝিয়ে বলতে হবে মডেলের কাছ থেকে তিনি ঠিক কী চান এবং যে ছবি তোলা হবে তা দিয়ে তিনি কী করবেন, মডেলকে সেটাও জানানো দরকার। মডেলের বিভিন্ন অঙ্গ—কাঁধ বাহু হাত পা স্তন জংঘা নিতম্ব—কতটা সুন্দর বা নিখুঁত তা দিয়ে তার সামগ্রিক আকর্ষণীয়তা পরিমাপ করা যায় না। তার মুখাবয়বসহ সামগ্রিক চেহারা অনেক বেশি দরকারি বিষয়। এছাড়া চটপটে ও গতিভঙ্গিমাও সুন্দর হওয়া দরকার। মডেলকে চালনা করার জন্য ফোটোগ্রাফারের উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতাও থাকা আবশ্যক।

নগ্ন নারীর ছবিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—ইনডোর এবং আউটডোর। স্টুডিওর অভ্যন্তরে ছবি তোলা হলে ভঙ্গি ও অভিব্যক্তিই হচ্ছে প্রধান, ফলে মেক-আপ ও কেশবিন্যাসের ওপর বিশেষ নজর দিতে হয়। ইনডোর ছবিতে অনুষঙ্গ-নির্বাচন খুব সীমিত হয়ে পড়ে, তাই মডেলকে প্রাসঙ্গিক কোন কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আউটডোরে অনুষঙ্গ অনেক বেশি, মডেলকে সেখানে সাধারণত অধিক সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে পাওয়া যায়। দেখা দরকার, চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে যেন তার রূপ ও ভঙ্গি কোন বৈপরীত্যের সৃষ্টি না করে। যে কোন ন্যুড ছবির জন্যই এস. এল. আর. বা টি. এল. আর. এই দু রকমের ক্যামেরা উপযুক্ত। তবে ফর্ম্যাট একটু বড় হলে (৬ × ৬ সি. মি.) কাজ করতে বেশি সুবিধা হয়। অনেক অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান, বিশেষত রঙীন ছবির ক্ষেত্রে, ৬ × ৬ এস. এল. আর. ক্যামেরা ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে ৮'' × ১০'' ক্যামেরাতেও কাজ করেন, ন্যুড ছবি যখন স্টুডিওতে ফোটোগ্রাফারের ইচ্ছা অনুযায়ী ফরমায়েশি ভঙ্গিতে তোলা হয় তখন বড় ক্যামেরাতে কাজ করতে বেশি অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। নারীদেহের কমনীয়তা ও পেলবতার ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতের হাই-কি পদ্ধতি খুব কার্যকারী। আবার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশের জন্য লো-কি পদ্ধতিও বেশ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব। ন্যুড ছবি বস্তুত এত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যে নিম্ন দ্রুতি থেকে উচ্চ দ্রুতি পর্যন্ত সমস্ত রকমের ফিল্মই ছবি অনুযায়ী ব্যবহৃত হতে পারে তবে সাধারণভাবে, মধ্য দ্রুতির ফিল্ম ব্যবহার করা যায়।

একজন আলোকচিত্রশিল্পী নগ্ন নারীশরীরকে স্বাভাবিক বাস্তব রূপ দিতে পারেন আবার নগ্ন নারীদেহের সাহায্যে বিশেষ শৈল্পিক উদ্দেশ্য সাধন বা নান্দনিক বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। যেমন ওয়াইড অ্যাঙ্গল বা অ্যানামরফিক লেন্স ব্যবহার করে Bill Brandt পরিচিত নারীশরীরকে আপাত বিকৃত করে নতুন শারীরতাত্ত্বিক রূপ সৃষ্টি করেছেন। আবার বহু শিল্পী নগ্ন নারীশরীরের ওপর বিভিন্ন রঙের আলো ফেলে রঙীন ছবিতে বাস্তবাতীত এক অধিবাস্তব প্রতিরূপের সৃষ্টি করেছেন শিল্পীর দৃষ্টিতে কখনো মানবশরীর কিছু প্রাথমিক-গঠনরূপে পর্যবসিত—তাতে আলোছায়ার খেলা, তলের উঁচুনিচু, ছন্দের মজা ; কখনো নারীদেহ বৃহত্তর প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত—সেখানে পাহাড়, খাদ, ঢালুভূমির ইঙ্গিত ; কখনো নারীশরীরের বিশেষ অংশ বা ভঙ্গি উপমা হয়ে

উঠে কঠিন পাথরের শক্তি বা জলের প্রবহমানতা বা ফুলের পেলবতা প্রকাশ করছে; কখনো সমান্য অংশের পরিবর্ধিত রূপে একটা বিমূর্ত পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। একটি নারীদেহের গঠন ও আকারের মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রায় যে কোন বস্তুর গঠন বা আকারের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

শিল্পীর নান্দনিক ধারণাও ন্যুড ছবিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। নারীশরীর কারও ছবিতে সুন্দর, কারও ছবিতে রহস্যময়। কারও ক্যামেরা নারীর সৌন্দর্যকে সমর্পিত ভাবে তুলে ধরে, কারও ক্যামেরা তুলে ধরে কামনাকাতর ভাবে। Lucien Clergue-এর সমুদ্রে নগ্ন নারী সিরিজের ছবিগুলিতে যে নগ্নতা তা নাটকীয় ও রহস্যময়, আবার Diane Arbus-এর ধর্মীয় নগ্নিকাদের ছবিগুলিতে যে নগ্নতা তাতে শরীরের রহস্য, সৌন্দর্য বা কৃচ্ছ্রতা নেই, আছে দুর্নীতি বা উন্মাদনার প্রকাশ। নান্দনিক ধারণা শুধু শিল্পী থেকে শিল্পীতে আলাদা নয়, দেশ থেকে দেশেও আলাদা হতে পারে। আমেরিকান ফোটোগ্রাফারদের তোলা ন্যুডের পাশে জাপানি ফোটোগ্রাফারদের তোলা ন্যুড রাখলে একথা বোঝা যাবে। বস্তুত ন্যুড ছবির শৈল্পিক ও নান্দনিক অনুষঙ্গ এত বিস্তৃত, যে তা সমস্ত প্রকাশ করে বলা যায় না, তা অনেকটাই অনুভবের বিষয়।

ক্লোজ-আপ/ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফি

সাধারণভাবে মানুষের শুধুমাত্র ঘাড় ও মাথার প্রতিকৃতি এবং বস্তুর সমানাকারের (১:১) প্রতিরূপকে ক্লোজ-আপ বলে উল্লেখ করা হয়। বস্তু অপেক্ষা বড় মাপের প্রতিরূপ ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফির অন্তর্গত। ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফির সাহায্যে দশগুণ (× ১০) পর্যন্ত বড় আকারের প্রতিচ্ছবি আমরা পেতে পারি। তার চেয়ে বড় আকারের প্রতিচ্ছবি পেতে হলে ক্যামেরাকে মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়, যে পদ্ধতির নাম ফোটোমাইক্রোগ্রাফি।

কোন একক ফুলের পাপড়ি বা পতঙ্গ বা এই প্রকারের অতি ক্ষুদ্র বস্তু ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফির সাহায্যে চিত্রায়িত করা যায়। অনেক ছোট বস্তুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, বা তা আমরা সচরাচর ভালভাবে লক্ষ্য করি না, বা কোন বৃহদাকার বস্তুর অন্তর্গত ক্ষুদ্র অনুপুঙ্খও স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত না হলে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। এসব জিনিষ যখন ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফির সাহায্যে বড় আকারে আমাদের কাছে ধরা দেয়, আমরা এক নতুন জগতের সন্ধান পাই । যার রহস্য ও সৌন্দর্য আমাদের একই সঙ্গে অবাক ও মুগ্ধ করে। এমনিতেই অনুপুঙ্খের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে, অনেক সময়ে সমগ্রের চাইতে অংশের দৃশ্যগত এবং মনস্তাত্ত্বিক আবেদন বেশি। তাই সাধারণভাবে দেখা কোন বস্তুর অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ যখন বিরাটাকারে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় তখন তা আমাদের চোখে আর সেই বস্তু থাকে না। মনে অন্য একটা অনুভবের অভিজ্ঞতা আনে। ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফির সাহায্যে দৃষ্টিশক্তির সীমানা বাড়াবার এই সুযোগ একজন সৃজনশীল শিল্পী তাঁর শিল্প কর্মে পূর্ণভাবে নিয়ে থাকেন। ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফি বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, গবেষক ও প্রাযুক্তিক নকশাকারদের কাজেও যে নানাভাবে সাহায্য

করছে সে কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার।

মানুষের চোখ যখন অসীম দূরত্বে দৃষ্টিপাত করে তখন চোখের মাংসপেশীর ওপর সামান্যই চাপ পড়ে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি কোন নিকটস্থ বস্তুর ওপর নিবদ্ধ হলে, চোখের মাংসপেশীর এক সক্রিয় প্রতিক্রিয়ায়—যা 'অ্যাকোমোডেশন' নামে পরিচিত—চোখের লেন্সের আভ্যন্তরীণ ফোকসিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। একজন সাধারণ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি নিকটতম যে দূরত্বের কোন বস্তুর প্রতি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে পারেন তা হল ২৫ সি. মি.। কিন্তু বস্তুর প্রকৃতি, স্বল্প আলো, চোখের ত্রুটি ও ক্লান্তির দরুন এই সাধারণ মান হ্রাস পায়। কিন্তু ক্যামেরার এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা নেই, তাছাড়া তার বৃহত্তর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেত্র এবং উন্মেষের ও আলোকপাতের সময়ের হেরফের নিকটস্থ বস্তুর ও অনুপুঙ্খের প্রতিরূপ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ।

উন্নতমানের ক্লোজ-আপ বা ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফির জন্য বেলোযুক্ত এস. এল. আর. বা বড় ফর্ম্যাটের ভিউক্যামেরা প্রায় অপরিহার্য। সাধারণ লেন্সযুক্ত এস. এল. আর. ক্যামেরাতে ফিলম থেকে লেন্সের দূরত্ব কিছুটা বাড়িয়ে অথবা সাধারণ লেন্সের সঙ্গে আর একটি লেন্স -অংশ লাগিয়ে ক্লোজ-আপ ছবি তোলা যায়। সাধারণত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তিন বা চারটি এক্সটেনশন্ টিউবের একটি সেটের একটা, দুটো বা একসঙ্গে সবকটা টিউব ক্যামেরা ও লেন্সের মাঝে ব্যবহার করে ফিল্ম থেকে লেন্সের দূরত্ব কম বা বেশি বাড়ানো হয়। এই টিউব এস. এল. আর. ও টি. এল. আর. উভয় ক্যামেরাতেই সহজে লাগানো যায়। টিউব ও বেলো উভয় ক্ষেত্রেই ত্রিপদ ব্যবহার করা ভাল।

কিন্তু সাধাবণ লেন্স বেশি কাছ থেকে ছবি তোলার উপযুক্ত করে তৈরি করা হয় না এবং সাধাবণ লেন্সের সঙ্গে ক্লোজ-আপ লেন্স লাগিয়ে ব্যবহার করলে অনেক সময় ছবির কেন্দ্রস্থল ও প্রান্তভাগগুলি একই সঙ্গে সঠিক ফোকসের মধ্যে থাকে না, ফলে পূর্বোক্ত দুই পদ্ধতিতে তোলা ক্লোজ-আপ ছবির মান আশানুরূপ হতে পারে না। কয়েক ধরনের ক্যামেরাতে সাধারণ (নরমাল) লেন্সকে বিপরীতভাবে ব্যবহার করে ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকে, সেক্ষেত্রে লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্ব লেন্স থেকে ফিল্মের দূরত্ব অপেক্ষা কম হয় এবং মোটামুটি ভাল ছবি পাওয়া যায়। তবে উচ্চমানের তীক্ষ্ণ প্রতিচ্ছবি পেতে হলে বেলোযুক্ত এস. এল. আর. ক্যামেরায় খুব কাছ থেকে তোলার উপযুক্ত করে প্রস্তুত 'ম্যাক্রো' লেনস লাগিয়ে ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভাল। মনোরেল ভিউ ক্যামেরায় বড় ফর্ম্যাটের জন্য ছবির গুণমান আরও বাড়ে। তবে সমস্ত সাধারণ ক্লোজ-আপ ফোটোগ্রাফির্র ক্ষেত্রে এস. এল. আর. ক্যামেরা তার দ্রুত প্রত্যাবর্তনশীল আয়না, পেন্টাপ্রিজম ও স্বয়ংক্রিয় আইরিস ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া এর ভিউফাইণ্ডার পর্দায় বস্তুর ক্ষেত্রগভীরতার নির্দেশ পাওয়া যায়, তবে বেলো জাতীয় যে কোন সংযোজক ক্যামেরায় লাগানো হলে খুব ছোট লেন্স অ্যাপারচার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় এবং সেই ছোট লেন্স অ্যাপারচারে পর্দায় বস্তুর ক্ষেত্রগভীরতা যথেষ্ট আবছা হতে পারে। আর একটা সুবিধা হল লেন্সের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলোর

পরিমাপ অনুসারে আলোকপাত নির্দেশিত হয়। ৩৫ মি. মি. এস. এল. আর. ক্যামেরার উপযুক্ত ম্যাক্রো লেন্স ৪০ থেকে ৫৫ মি. মি. অথবা ৯০ থেকে ১৩৫ মি মি. ফোকস দৈর্ঘ বরাবর পাওয়া যায়, সর্বোচ্চ অ্যাপারচার হয় f/8 থেকে f/২.৮ । বেলোযুক্ত ক্যামেরাতে শর্ট ফোকস ম্যাক্রো লেন্স ব্যবহার করে প্রতিচ্ছবির বিবর্ধন বেশি পাওয়া গেলেও ক্যামেরা বস্তুর বেশি কাছে থাকার জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেজন্য অপেক্ষাকৃত দূরে ক্যামেরা রেখে লং ফোকস ম্যাক্রো লেন্স ব্যবহার করা ভাল।

ক্লোজ-আপ বা ম্যাক্রো ছবির ক্ষেত্রে সব সময়েই কয়েকটা সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয় যেমন, নিখুঁত ভাবে ফোকস করার অসুবিধা, ফোকস ক্ষেত্রের কম গভীরতা, আলোকপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি ও আলোকসম্পাতের অসুবিধা। ফোকসিং-এর অসুবিধা দুর করার জন্য, বিশেষত খুব আবছা প্রতিবিম্বের জটিল ফোকসিং-এর ক্ষেত্রে, ক্রশচিহ্ন বিশিষ্ট একটি বিশেষ ভিউফাইণ্ডার পর্দা ব্যবহার করা হয়। ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতা অত্যন্ত কম হয় বলে পটভূমি প্রায় আপনা আপনিই আউট অব ফোকস হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ বস্তুটিকে ফোকস ক্ষেত্রের মধ্যে রাখার জন্য অ্যাপারচারও বড় করা যায় না এবং ক্লোজ দৃষ্টিকোণের জন্য অবস্থানানুপাতের একটা আপাত-বিকৃতিরও সম্ভাবনা থাকে। লেন্সকে বস্তুর অত্যন্ত কাছে নিয়ে আসার জন্য বস্তুর ওপর প্রয়োজনমত সঠিক আলোকসম্পাতের কৃত্রিম আলোক উৎস স্থাপন করার মত উপযুক্ত স্থানের সমস্যা দেখা দেয় এবং আলোক উৎস থেকে নির্গত তাপ জীবন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে দৈহিক অসুবিধারও সৃষ্টি করতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে কখনো কখনো এন.ডি. ফিল্টারকে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো যায়। ম্যাক্রো লেন্সের সঙ্গে লেন্স ফিল্টার স্বাভাবিক ও প্রচলিত নিয়মেই লাগানো সম্ভব। বিষয়বস্তু অনুসারে আলোকসম্পাতের তারতম্য করাও দরকার, আলোর ব্যবহারই অনুপুঙ্খকে জোরালো বা স্তিমিত করে, যেমন বস্তুর অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুনন ধরার বা রিলিফ ধরনের ছবির জন্য জোরালো সাইড লাইটিং-এর প্রয়োজন, সুষম সম্মুখ আলোকসম্পাতে তা মার খাবে। সাধারণ নরম আলোর বিপরীতে সাদা কার্ডবোর্ড ব্যবহার করেও এক্ষেত্রে ভাল আলোকসম্পাত করা সম্ভব। ডিরেক্ট ডিফিউজ, সাইড-অ্যাক্সিয়াল, ট্র্যান্সমিটেড এবং ডার্কফিল্ড—এই পাঁচ প্রকার আলোকসম্পাতের মধ্যে ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ডিফিউজ, সাইড অ্যাক্সিয়াল এবং বিশেষত ট্র্যান্সমিটেড লাইটিং বিশেষ উপযোগী। এই ব্যাপারে রিং লাইট ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশগানও খুব উপযুক্ত। এর আলো লেন্সের চারপাশ থেকে তির্যকভাবে বস্তুর ওপর পড়ার জন্য বস্তুর মডুলেশনও পাওয়া যায় এবং সবদিক থেকে আলো আসায় গভীর ছায়াপাতও হয় না। ম্যাক্রো ছবিতে যখন ১ : ১ অপেক্ষা প্রতিচ্ছবির অনুপাত বৃদ্ধি করার দরকার হয় তখন লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্বের তুলনায় ফিল্ম থেকে লেন্সের দূরত্ব অনেক বৃদ্ধি পায় এবং আলোকপাতের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়াতে হয়। এদিকে, আগেই বলেছি, এক্ষেত্রে লেন্সের অ্যাপারচারও ছোট রাখতে হয়। একটি নির্দিষ্ট অ্যাপারচারে প্রতিচ্ছবির ১ : ০.৫ অনুপাতে যদি ১ সেকেণ্ড আলোকপাত প্রয়োজন হয় তবে ১ : ১ অনুপাতে

২ সেকেণ্ড ও ১ : ৩ অনুপাতে ৮ সেকেণ্ড আলোকপাত করা দরকার হবে। সেজন্য ম্যাক্রো ফোটোতে সঠিক আলোকপাতের জন্য টি. টি. এল. মিটারিং আবশ্যক। অথবা সাধারণ মিটারে নির্দেশিত আলোকপাতের পাঠের সঙ্গে প্রতিচ্ছবির বিবর্ধন-অনুপাতের হিসাব অনুযায়ী আলোকপাত বাড়াতে হবে। বিবর্ধন অনুসারে আলোকপাতের হিসাবের এই তালিকা ফোকল এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফোটোগ্রাফির মত যে কোন আকর গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

যে অর্থে প্রকৃতি বা প্রতিকৃতি বা নারীশরীর ফোটোগ্রাফির নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, ক্লোজ-আপ সে অর্থে কোন বিষয়বস্তু নয়, তা ফোটোগ্রাফির একটা বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে অসংখ্য বিষয়ের ছবি তোলা যেতে পারে—লতাপাতা, ফুলফল, ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক অনুপুঙ্খ, গৃহপালিত জীবজন্তু, পাখি, মথ ও প্রজাপতি, অন্যান্য কীটপতঙ্গ, অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ, ঘাড় ও মাথার প্রতিকৃতি, খেলনা ও কুটিরশিল্প সামগ্রী, মুদ্রা ও পদক, টেবলটপ, প্রতিলিপি— এ সমস্তই ক্লোজ-আপ বা ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আদর্শ বিষয়। নেচার ফোটোগ্রাফিতে ক্লোজ-আপ ছবি তোলার কোন ভাল সুযোগ, বিশেষ কোন যন্ত্রাংশ বা আলোকের ব্যবস্থা বা ক্যামেরায় যথোপযুক্ত ফিল্ম পরানো নেই বলে, হারানো উচিত নয় কেননা ওই সুযোগ পরে আর কখনো নাও পাওয়া যেতে পারে, সুতরাং তাৎক্ষণিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তক্ষুণি ছবি তোলাই ভাল।

যে সমস্ত বিষয়ের কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হল তার বাইরেও আরো অনেক বিষয় রয়েছে; কিন্তু প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে অন্য বিষয়গুলির ছবি তোলা মোটেই কঠিন নয়। তবু আমরা অন্যান্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ করছি—

লোকজন (People)

এই বিষয়টিকে এক ধরনের প্রতিকৃতির প্রসারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। শহুরে লোকজনের ক্ষেত্রে তা নগরদৃশ্যের অংশবিশেষ। অজানা দেশ বা সমাজের মানুষের চিত্রণ হলে তা ফোটোসাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত।

ভ্রমণ (Travel)

মিশ্র বিষয়। প্রকৃতি, প্রতিকৃতি, স্থাপত্য, লোকজন নানা বিষয় নিয়ে ভ্রমণচিত্র গড়ে ওঠে। পরিকল্পনাবিহীন ভাবে ছবি না তুলে একটা বিশেষ সুর বা কাহিনী অনুসারে ছবি তুলে অ্যালবামে ধারাবাহিক ভাবে রাখা ভাল।

প্যানোরামা (Panorama)

প্রকৃতি বা নগরদৃশ্যের ছবি তোলার একটা বিশেষ পদ্ধতি। একে বলা যায় একটা অত্যন্ত ওয়াইড অ্যাঙ্গল দৃষ্টিকোণ। খুব উঁচু কোন স্থান থেকে চারপাশের দৃশ্য ৩৬০° বা তার

কম ঘূর্ণনে তুললে প্যানোরামা হবে। বস্তুত অনেকগুলি পৃথক ছবি একত্র করে তা তৈরি হয়।

অনুষ্ঠান (Ceremony)

জন্মদিন, সমাবর্তন, পুরস্কার বা শপথগ্রহণ, অন্যান্য পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব এবং অবশ্যই বিবাহ। নিখুঁত কলাকৌশলজ্ঞান ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এই ধরনের ছবির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কেননা অনুষ্ঠানটির আর নতুন করে আয়োজন করা যাবে না। বিবাহের ছবির ক্ষেত্রে অনেক লোককে নিয়ে কাজ করার দক্ষতা ও 'মানবিক দৃষ্টিকোণ' বেছে নেবার অনুভবও থাকা চাই।

প্রাযুক্তিক বিষয় (Industrial)

পেশাদার ফোটোগ্রাফারদের ক্ষেত্র । নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান, অত্যুচ্চ কারিগরী দক্ষতা ও যন্ত্রকে একটা সত্তা করে তুলতে পারার মত বোধ থাকা অতি আবশ্যক। ছবি তোলার সময় বিশেষ নিরাপত্তা অবলম্বন করাও দরকার।

তথ্যমূলক চিত্র (Documentary)

ফোটোএসে, ফোটোজার্নালিজম, লোকজন, বিশেষ ধরনের প্রতিকৃতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসচেতনা, সমাজচেতনা, সমবেদনা, রসবোধ, কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ইত্যাদি নানা গুণের সমন্বয়ে একজন উল্লেখযোগ্য তথ্যমূলক আলোকচিত্রী গড়ে ওঠেন। পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতার বোধ সুদৃঢ় করার পেছনে এঁদের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে।

ব্যক্তিগত চিত্র (Subjective)

যুক্তি, ভাবনা বা মননের চেয়ে সংজ্ঞা, ব্যক্তিগত অনুভূতি ও নিজস্ব দৃষ্টিকোণ এই ধরনের ছবিতে প্রধান হয়ে ওঠে। এই ছবিতে নতুন বা অপ্রচলিত কলাকৌশল এবং নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এই ছবি যেমন মূলত স্রষ্টার ব্যক্তিগত অনুভবের ছবি, তেমনি কোন দর্শকের ওপর এর কী প্রভাব সেটাও দর্শকের ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ট্রিকস (Tricks)

এটি কোন বিষয় নয়, একটি পদ্ধতি। যে কোন বিষয়ের ছবিতেই এই পদ্ধতির — প্রতারণাময় কৌশলের সাহায্য নেওয়া যায়। এসব কৌশলের কিছু ক্যামেরার দ্বারা সংঘটিত হয়, কিছু অর্জিত হয় ডার্করুমে । ফোটোগ্রাফির প্রচলিত পদ্ধতি যেখানে উদ্দেশ্য-সাধন করছে না, একমাত্র সেখানেই ট্রিকসের আশ্রয় নেওয়া উচিত। দেখতে হবে তা যেন অর্থ ও তাৎপর্যের প্রয়োজনে আসে, যেন কৌশলের জন্যই কৌশল না হয়ে পড়ে। ভেদাভেদ বিচার করে ও সচেতনতার সঙ্গে ট্রিকস ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে ।

একই বিষয়ের ছবি এক একজন ফোটোগ্রাফারের হাতে এক এক রকম রূপ পায়। সেটা কিসের জন্য? ফোটোগ্রাফ সম্পর্কে বলা হয় তা হল 'charged with content and framed by the form.' এই ফর্ম, আঙ্গিক, শৈলী বা রীতিই বিভিন্ন শিল্পীর একই বিষয়ের ছবিকে বিভিন্ন রূপ দেয়। শৈলী শৈল্পিক প্রকাশের ওপর একটা নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। কী নিয়ে শৈলী গড়ে ওঠে? অনুসৃত পদ্ধতিগুলির সম্মেলন এবং তাদের কোনটিকে কী পরিমাণে ব্যবহার করা বা গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হবে এই নির্বাচন শৈলীকে গড়ে তোলে। কোন নির্দিষ্ট শৈলীর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে বিষয়বস্তু নির্বাচনে—প্রতিকৃতি বা প্রকৃতি, বা আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে—পাহাড় বা শিশু : দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে বিষয়ের বিশেষ কিছু অনুষঙ্গের ওপর নিয়মিতভাবে জোর দেওয়া—প্রকৃতির আদিম ও রুক্ষ রূপ বা প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সুষমা ; তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে কম্পোজিশনের বিন্যাসে ও বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রয়োগে। শৈলী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসা চাই, তা যেন আরোপিত না হয়। কোন ফোটোগ্রাফারের ব্যক্তিগত শৈলী নির্ভর করে তাঁর শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈল্পিক পটভূমির ওপর। যেমন একক শিল্পীর ব্যক্তিগত শৈলী, তেমনি অনেক শিল্পীর মধ্যে যখন একটা বিশেষ শৈলীর প্রতি আনুগত্য তখন তা এক যৌথ ঘরানা, শৈলীর এই ঐক্য যখন আরো ব্যাপক হয়ে প্রায় সমস্ত দেশ জুড়ে ছড়িয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় দেশজ ঐতিহ্য, যা জাপানী ছবির কথা ভাবলে স্পষ্ট বোঝা যায়। সব মিলিয়ে শৈলী বিষয়বস্তুকে সংহত ও সংলগ্ন করে আনে, ফোটোগ্রাফিতে যার ভূমিকা অনস্বীকার্য ।

রঙীন ছবি

'If Black & White pictures look cold and abstract, coloured pictures have life-like and warm, emotional appeal.

—Focal Encyclopedia of Photography

এই বইয়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সাদা-কালো ফোটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রয়োজন মত রঙীন ফোটোগ্রাফি নিয়েও আলোচনা করেছি । ফোটোগ্রাফির ইতিহাস পরিচ্ছেদে বলেছি সাদা-কালো ছবি পাওয়ার সময় থেকেই রঙীন ছবির জন্য কীভাবে নানা গবেষণা শুরু হয়ে যায় এবং ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কৃত ত্রিবর্ণ তত্ত্ব রঙীন ছবির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হয়ে দেখা দেয়। প্রথম দিকে রঙীন ছবি তোলার পদ্ধতি ছিল তিনটে প্রাথমিক রঙের তিনটি পৃথক ছবি একই জায়গায় সমন্বিত করে। এই প্রক্রিয়ায় ছবি তোলা বা প্রদর্শন করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল এবং রঙও খুব আকর্ষণীয় হত না। ফলে রঙীন ছবি সে সময় প্রসার লাভ করেনি।

আলো পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি রঙের উৎস, কারণ ও সংজ্ঞা নিয়ে। দৃশ্য ইন্দ্রিয় অনুসারে বর্ণ ও বস্তুবর্ণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছি । চোখ ও মস্তিষ্কের যুগ্মক্রিয়ায় কীভাবে রঙের অনুভূতি হয় তাও বলেছি। এ সমস্তই রঙীন ফোটোগ্রাফির ভিত্তিভূমি। লেন্স ও ক্যামেরার আলোচনায় রঙের কথা আলাদা ভাবে তেমন আসে না। তবে রঙীন ছবিতে রঙের প্রকাশ কেমন হবে তা অবশ্যই লেন্স ব্যবহারের ওপর কিছুটা নির্ভর করে এবং আলোকচিত্রশিল্পীরা রঙীন ছবির জন্য বিষয়বস্তু অনুসারে বিশেষ বিশেষ ক্যামেরা ব্যবহার করা পছন্দ করেন।

রঙের কথা বিশেষ ভাবে এসেছে আবার ফিল্ম ও ফিল্টার পরিচ্ছেদে। বস্তুত রঙীন ছবির ব্যাপক প্রসারের সূচনাই হয় ১৯৩৫ সালে কোডাক-এর বিযুত পদ্ধতির ত্রিস্তর কোডাক্রোম ফিল্মের আবিষ্কারের পর। এই হিসাবে ফোটোগ্রাফিতে কালো-সাদা ছবির প্রায় একশো বছর পরে রঙীন ছবির প্রচলন। ১৯৫০-এর পর রঙীন ফোটোফিল্মের আরো অনেক উন্নতিও ঘটে। কালো-সাদা ফিল্মের ক্ষেত্রে যেমন ফিল্মের দ্রুতি ও তার কণাময়তাই বিবেচ্য, রঙীন ফিল্মের ক্ষেত্রে কিন্তু যে আলোকে

ছবি তোলা হবে তার তাপের বিষয়ও বিবেচনা করা দরকার, কারণ বর্ণের সঙ্গে তাপমাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে যে কথা ওই পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। সেজন্য রঙীন ফোটোফিল্‌ম কালো-সাদা ফিল্‌মের মত বিভিন্ন দ্রুতি ছাড়াও তৈরি হয় তিন রকম কেলভিন তাপমাত্রা অনুসারে। দিনের আলোয় ছবি তোলার জন্য ৬০০০-কে° ও কৃত্রিম আলোয় ছবি তোলার জন্য ৩২০০ কে° ও ৩৪০০ কে°। তবে ছবি তোলার সময় আলোর বর্ণতাপমাত্রা কখনোই এক থাকে না। নানা কারণে এই তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। এই তারতম্যটুকু অল্প হলে রঙীন নেগেটিভ ফিল্‌ম থেকে কাগজে প্রিন্ট করার সময় ফিল্‌টার ব্যবহার করে ঠিক করে নেওয় যায়, কিন্তু ট্রান্সপেরেন্সির ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হয় না বলে ও অধিক তারতম্যের ক্ষেত্রে ছবি তোলার সময়ই ফিল্‌টার ব্যবহার করে বর্ণতাপমাত্রার সামঞ্জস্য করে নিতে হয় যার বিস্তৃত উল্লেখ ওই পরিচ্ছেদে আছে।

দৃশ্যরস ও কম্পোজিশনে রঙের ভূমিকার কথা আমরা আলোচনা করেছি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। আর সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বলেছি বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে রঙ প্রয়োগের কথা ও কোন কোন বিষয় রঙীন ছবিতেই ভাল আসে সে কথাও। রঙীন ছবিতে আলোকপাত সঠিক হওয়া খুব দরকার কারণ রঙীন ফিল্‌মের ক্রমায়ণ অত্যন্ত কম এবং আলোকপাত কম বা বেশি হলে রঙেরও পরিবর্তন ঘটে যায়। রঙীন ছবির ক্ষেত্রে এক্সপোজার মিটার বাবহার করা তাই অবশ্য প্রয়োজনীয়। কালো-সাদা ছবিতে যা শুধুমাত্র কালো-সাদার বৈষম্যের মাধ্যমে পাওয়া যায়, রঙীন ছবির ক্ষেত্রে তা-ই পাওয়া যায় বর্ণস্বাতন্ত্র্য মারফত। রঙীন ছবিতে লাল ফুল সবুজ পাতার যে বর্ণস্বাতন্ত্র্যতা সাদা-কালো ছবিতে ধরা দেবে ধূসরের মাত্রাভেদ হয়ে। সাধারণভাবে উজ্জ্বল, সম্পৃক্ত বর্ণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু একটি ছবিতে পাশাপাশি কতকগুলি উজ্জ্বল রঙের সমাবেশ ঘটালে তা দৃষ্টিনন্দন নাও হতে পারে। তা ছাড়া আমাদের চোখে যে রঙ ধরা পড়ে তা খুবই আপেক্ষিক—তা নির্ভর করে চারপাশের অন্যান্য রঙ ও অবস্থার ওপর। রঙের ত্রিমাত্রিক জগতের বর্ণমাত্র, ঔজ্জ্বল্য ও সম্পৃক্তিকে সাদা-কালো ছবি পর্যবসিত করে ধূসর রঙের একমাত্রিকতায়, সেই মাত্রাটি হল ঔজ্জ্বল্যের । এর ফলে বস্তুবিশেষকে চিহ্নিত করা কঠিন হলেও দৃশ্যমানের সংখ্যা কম হওয়ার দরুন কম্পোজিশনে শৃঙ্খলা ও তীক্ষ্ণতা আনা অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারে। রঙীন ছবিতে এই সুযোগ খুব কম এবং সেখানে কম্পোজিশনকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করা খুব কঠিন। কিন্তু মাধ্যমের এই নিজস্ব জটিলতা বা সমস্যার সমাধান করতে পারলে তখন রঙীন ছবি শিল্পকর্ম হিসেবে উন্নত ও সমৃদ্ধই হয়। সাদা-কালো ছবি অনেকটা বিমূর্ত ধরনের, দর্শক সেখানে তার কল্পনাশক্তি খাটাবার অনেকটা সুযোগ পান। তুলনায় রঙীন ছবি অনেক স্বাভাবিক ও তার আবেগ সৃষ্টি করার ক্ষমতাও বেশি। ছবিতে দৃশ্যগত আবেদন বা দৃশ্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—আবেগগত প্রতিবেদন ও নতুনত্বের অভিঘাত সৃষ্টির এবং নিজেকে আঙ্গিকগত ভাবে চিহ্নিত করতে পারার ক্ষমতার ওপর। এর মধ্যে রঙীন ছবির প্রথম দুটি ক্ষমতা অধিক। রঙ ছবিতে শুধুমাত্র কম্পোজিশনে নয়, রঙ হিসেবেই, একটা

আলাদা তাৎপর্য আনতে পারে এবং দর্শকের মনস্তত্ত্বে তা একটা বিশেষ ভাব বা আবেদন সৃষ্টি করে। ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ রঙের প্রতি একটা ভাল লাগা থাকে, কোন বিশেষ রঙ খারাপও লাগতে পারে। সুতরাং ছবিতে রঙের ব্যবহার ও বিভিন্ন রঙের অবস্থান সম্বন্ধে একজন আলোকচিত্রী যথেষ্ট সচেতন থাকলেও রঙীন ছবির আস্বাদন শেষ পর্যন্ত অনেকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; সে তুলনায় সাদা-কালো ছবি অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক।

বর্তমানে রঙীন ফোটোগ্রাফি কলাকৌশলের দিক থেকে আগের তুলনায় অনেক সহজসাধ্য হয়েছে এবং সাধারণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আজ সারা পৃথিবীতে মোট যত স্থিরচিত্র তোলা হয়— বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়িক বা শৈল্পিক প্রয়োজনে —তার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ রঙীন। এমন অনেক আলোকচিত্রী আছেন যাঁরা কালো-সাদা ছবি একেবারেই তোলেন না। এমনকি অপেশাদার আলোকচিত্রীদের ক্ষেত্রেও রঙীন ছবি তোলা এখন সাদা-কালো ছবির মতই সহজ। অথচ একটা সময় পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পীরা রঙে ছবি তোলার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। রঙীন ছবির এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণ কি শুধুই নানা রঙে ছবি তুলতে পারার নিছক আনন্দ? যদিও রঙ একটা ছবির প্রকৃতি পালটে দিতে পারে তবু এই পরিবর্তনের ফলে ছবির মান যে উন্নত হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ছবির বিষয়বস্তুর তালিকা বোধ হয় সীমাবদ্ধ, কিন্তু কোন বিষয়ের বিভিন্ন দিক, প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের তালিকা সহজে ফুরোয় না। রঙ ছবির বিষয়ের ও আঙ্গিকের এই রকম একটা অতিরিক্ত অনুষঙ্গ, উপাদান, যা ছবির সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়, যে সম্ভাবনাকে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা যেতেও পারে, নাও পারে, রঙকে এইভাবেই রঙীন ছবিতে গ্রহণ করা সমীচীন।

রঙ ফোটোগ্রাফিতে একটি শক্তিশালী উপাদান। একজন আলোকচিত্রীর কাছে তা একই সঙ্গে যেমন একটা বিরাট সুযোগ, তেমনি একটা বড় সমস্যাও বটে। কালো-সাদা ছবির কম্পোজিশনের বিভিন্ন উপাদান—রেখা, বুনন, আকার, অবস্থানানুপাত ও আলোছায়ার বৈষম্যের সঙ্গে রঙীন ছবির রঙ যুক্ত হবার পর দেখা গেল কম্পোজিশনের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় তার আকর্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি। ফলে একদিকে রঙ যেমন ছবির চিত্রগত সম্ভাবনা, অলংকরণের বিস্তৃতি, রঙের টোনগত তারতম্য সমস্তই বহুদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে তেমনি রঙের বিবিধ অনুষঙ্গ রঙের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে কখনো কখনো বাধা সৃষ্টি করে ও রঙ প্রযুক্ত হওয়ার ফলে, আগেই বলেছি, কম্পোজিশনকে সুষম ও ঐক্যবদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। রঙ সব সময়ই কোন না কোন ভাব বা ভাবার্থের দ্যোতক। সেইজন্য রঙ ছবিতে একটা বিশেষ মাত্রা আরোপ করে ছবির ভাবগত দিককে সমৃদ্ধতরও করতে পারে। এর ফলে ছবির প্রকাশযোগ্যতা বাড়ে, রঙ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জ অনুষঙ্গ তুলে ধরে প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপের আবেগমূল্য তীব্রতর করে। রঙীন ছবির সাফল্য নির্ভর করে রঙের সঠিক প্রয়োগের ওপর। রঙের পরিবেশ ও অনুষঙ্গ যেন কম্পোজিশনের অন্যান্য উপাদানের বিরুদ্ধে গিয়ে ছবির উদ্দেশ্য ও ভাবগত ঐক্য কোনক্রমেই ব্যাহত না করে।

ছবিতে কয়েকটা রঙের একত্র সমাবেশ সব সময়ই পৃথক পৃথক ভাবের যোগফলের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু তুলে ধরে। আবার রঙের পরিপ্রেক্ষিতে রঙের সমাবেশে দর্শকের মনে নির্দিষ্ট আবেগ ও অনুভূতিরও জন্ম হয়। পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন রঙ ও রঙের বিভেদকে কাজে লাগিয়ে আলোকচিত্রশিল্পী রঙের যে কম্পোজিশন গড়ে তোলেন তা শিল্পের সংবিধানের ও শিল্পবোধের এক অঙ্গাঙ্গি অংশ । রঙ সম্পর্কে যে সমস্ত শৈল্পিক তর্ক বিতর্ক প্রচলিত আছে, যেমন—রঙের শক্তিশালী ও মোহময় আকর্ষণ অনেক সময়ই ছবির সঠিক রসগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বা রঙ সমস্ত কিছুই স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে দেয়, কোন কিছু আভাষে, ইঙ্গিতে রাখে না,ফলে দর্শকের কল্পনাশক্তি প্রয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে বা কোন বস্তু বা দৃশ্যের যাবতীয় রঙকে শুধুমাত্র সাদা-কালো টোনের মাত্রাভেদের মাধ্যমে প্রকাশ করলে ঐ বস্তু বা দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে একটা অন্যতর বিশেষত্ব নিয়ে ধরা দেয়—তার মধ্যে না গিয়েও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, আধুনিক কালে আলোকচিত্রে রঙ একটা অন্যতম হাতিয়ার ও প্রায় অপরিহার্য উপাদান।

রঙের সৌন্দর্য ও রঙের নান্দনিকতা রঙের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সাধারণভাবে প্রকৃতির কাছ থেকেই আমরা রঙের সৌন্দর্যের ধারণা পেয়েছি। এই ধারণা আবার আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অনুভবের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সমুদ্র বা আকাশের নীল রঙ, সূর্য বা আগুনের লাল বা হলুদ রঙ অথবা গাছের সবুজ রঙ আমাদের মনে ঐ সব বস্তুর বিশেষত্বের অনুভূতি আনে। লাল, হলুদ বা কমলা আমাদের কাছে উষ্ণ রঙ বলে মনে হয়, অপরদিকে সবুজ বা নীলকে আমরা শীতল বলে মনে করি। সূর্যাস্তের আগে আকাশের লাল, হলুদ রঙ ক্রমশঃ সন্ধ্যা ও রাত্রির আগমনে ধূসর থেকে গাঢ় নীলে পরিণত হয়ে কিভাবে আমাদের মনে রেখাপাত করে এবং কি অনুভূতি আনে তা ভাবলেই রঙের মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। কোন নিরপেক্ষ একক রঙের প্রতি ব্যক্তির অনুভবগত প্রতিক্রিয়া সাধারণত কম, তা মূলত নান্দনিক বিচার, যা অনেকটাই যুক্তি ও মনন নির্ভর, তাতে আবেগের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম। রঙের প্রতি আমাদের আবেগময়তা মূলত বর্ণবিন্যাস অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়।

যে কোন বর্ণবিন্যাসের বেলায় বর্ণ পরিকল্প হওয়া চাই বৈচিত্র্যময়, ভাব ও রূপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও শিল্পীর উদ্দেশ্যের সহায়ক। বর্ণবিন্যাসের প্রতি আমাদের সাধারণত এই ক্রমানুসারে পক্ষপাতিত্ব থাকে—১. বৈসাদৃশ্যময় বা পরিপূরক বিন্যাস ২. সুসঙ্গত বা সাদৃশ্যযুক্ত বিন্যাস ৩.একবর্ণীয় বিন্যাস—এতে একটি মাত্র বর্ণ ব্যবহৃত হলেও, তার সম্পৃক্তি ও ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যের মাধ্যমে বর্ণবিন্যাস সৃষ্টি করা হয়। ফলে বর্ণবৈষম্য ও বর্ণসঙ্গতি বর্ণবিন্যাসেরই দুটি বিশেষ অবস্থা। বৈষম্য বা বৈসাদৃশ্য বলতে আমরা বিরোধী বা প্রায় বিপরীত বর্ণ, আকার ও গুণ বা শক্তির সম্মেলনকে বুঝে থাকি। উপাদানের বৈসাদৃশ্য ব্যবহৃত উপাদানগুলিকেই আরো জোরালো করে। বর্ণসঙ্গতির বেলায় সাধারণত ব্যবহৃত বর্ণগুলি এককভাবে প্রত্যেকে যত মনোরম, তাদের সম্মেলন থেকে উদ্ভূত

বিন্যাস তত বেশি মনোহারী হওয়া সম্ভব। কারও কারও মতে দুই বা ততোধিক রঙের মিশ্রণের ফলে যদি নিরপেক্ষ ধূসর রঙের সৃষ্টি হয় তবে ওই রঙগুলোর মধ্যে বর্ণসঙ্গতি রয়েছে। বহু আধুনিক শিল্পী ও সমালোচক বর্ণসঙ্গতিকে প্রাচীন এবং অপ্রচলিত ধারণা বলে মনে করেন। আসলে বিশেষ কোন বর্ণবিন্যাসের প্রতি পক্ষপাত বা অপছন্দের ব্যাপারে যুগরুচির বিশেষ ছাপ পড়ে। একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ১৮৩৫ সনে লিখেছিলেন, লাল ও কমলার একত্র প্রয়োগ খুবই অসঙ্গত ব্যবহার। কিন্তু আজ তা আমাদের মোটেই মনে হয় না। তেমনি প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল রঙীন ছবির মধ্যে কোথাও না কোথাও লাল রঙের ব্যবহার ঘটাতেই হবে। কিন্তু আজ সেই নিয়মও বাধ্যতামূলকভাবে মানা হয় না।

শিল্পী তাঁর ছবির বর্ণবিন্যাসে যেমন জোরালো রঙ ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি প্রয়োজনে মৃদু রঙও ব্যবহার করতে পারেন, তবে যে কোন অবস্থাতেই মৃদুতা ও ঔজ্জ্বল্যের যথেচ্ছ বৈসাদৃশ্য পরিহার করাই ভাল, কেননা তা চোখে কর্কশ লাগে ও ফলে নান্দনিক মূল্য কমিয়ে দেয়। বিন্যাসে অনেকটা জায়গা জুড়ে একই রঙের ঘাতপ্রতিঘাতহীন চেটালো প্রয়োগও পরিহার করা উচিত, কেননা তা বিন্যাসকে নির্জীব, নীরস ও বিরক্তিকর করে তুলতে পারে, প্রকৃতিতে বা বাস্তবেও একক বর্ণের ব্যাপক সমতল এলাকা নিতান্ত বিরল । আরো জটিল বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে নকশা ও আকারের সম্মেলন ব্যবহৃত বর্ণের সমবায়ের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । নকশা ও রঙের সঠিক ব্যবহারই রঙীন ছবিতে একটা নির্দিষ্ট জোরালো মেজাজ তৈরি করে।

বিভিন্ন রঙের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হলে ষ্টুডিওতে কৃত্রিম আলোকের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকারী। অপরদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যে সঠিক আলোও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরা আলোকচিত্রীদের ছবি দেখলে বোঝা যাবে রঙের ব্যবহার অনেকটাই ব্যক্তিগত, পাওয়া যাবে রঙ প্রয়োগের বিভিন্ন ও বিচিত্র সব উদাহরণ। নিয়ম ও নিয়মভঙ্গের দৃষ্টান্ত। দেখা যাবে রঙ সম্পর্কে গভীর অনুশীলনের ফলে কয়েকটি উগ্র ও বিরোধী রঙের একত্র ব্যবহার কীভাবে ছবিতে ফলপ্রদ হয়ে ওঠে, বা কোন রঙের আভা বা ছায়াও সঠিক প্রয়োগে মূল রঙের মতই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, বা মূল বস্তুর রঙের বিপরীত কয়েকটি পরস্পরের-নিকটস্থ-রঙ পটভূমিতে কেন্দ্রীয় রঙ হিসাবে ব্যবহার করেও ছবিতে রঙের ভারসাম্য ঠিক রাখা যায়।

দেখা যাবে কোডাক্রোম ফিল্মের উচ্চ বৈষম্যময় ও অতি উজ্জ্বল বর্ণায়ণের পাশে পোলারয়েড কালার ফিল্মে তোলা ছবির সূক্ষ্ম ও মৃদু বর্ণরীতি। তবে অধিকাংশ পেশাদার আলোকচিত্রশিল্পী বর্তমানে ছবিতে রঙের ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত মিতব্যয়ী, অল্প কয়েকটি উজ্জ্বল রঙের সঙ্গে কয়েটি গাঢ় রঙ মিশিয়ে ব্যবহার করতে তাঁরা পছন্দ করেন। ক্যামেরাতে বা আলোকের উৎসে রঙীন ফিল্টার ব্যবহার করে, রঙের বিভিন্ন সূত্রকে ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে এবং সচেতন ভাবে বিভিন্ন কালার ট্রিক্‌সের আশ্রয় নিয়ে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণ ও বর্ণবিন্যাস সৃষ্টি করেও শিল্পী তাঁর

অনুভূতি প্রকাশ করে থাকেন। অবচেতন মনের ভাবপ্রকাশে, কাল্পনিক পরিবেশ-সৃষ্টিতে অথবা স্বপ্নময় দৃশ্যের উপস্থাপনায় শিল্পী রঙের বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতাকে ভেঙে নেন। এই উদ্দেশ্যে অনেক আলোকচিত্রশিল্পী এখন এমনকি ইনফ্রারেড ফিল্মও ব্যবহার করে থাকেন। এই ফিলম সাধারণ ফোটোগ্রাফির প্রয়োজনে তৈরি নয় বলে, আমাদের বর্ণানুভূতি অনুসারে নীল, সবুজ ও লালের প্রতি সংবেদনশীল না হয়ে, সবুজ, লাল ও অবলোহিতের প্রতি সংবেদনশীল। ফলে এই ফিলমে সাধারণ দৃশ্যের ছবি তুললে অনন্যসাধারণ ও মোহময় চিত্ররসের সৃষ্টি হয়।

ল্যাবরেটরি

"There are simply no methods that increase the speed of films a dozen times while at the same time reducing grain and improving contrast.'

-- H. Gotze

আলোকচিত্রকর্মকে তিনটি স্বতন্ত্র স্তর বা পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ক্যামেরা ও ফিল্মের স্তর, যখন ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়। দ্বিতীয়টি ফিলম পরিস্ফুটনের, তৃতীয়টি চিত্রমুদ্রণের স্তর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কাজ হয় ডার্করুম বা ল্যাবরেটরিতে তা ফোটোগ্রাফির এক অপরিহার্য অংশ। ফোটোগ্রাফি শুধু ক্যামেরায় ছবি তোলার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় না, চূড়ান্ত ছবি সৃষ্টি হয়ে থাকে ল্যাবরেটরিতেই । অনেকে ক্যামেরায় ছবি তুলে ফিল্ম পরিস্ফুটন ও তা থেকে প্রিন্ট তৈরির কাজ কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মারফৎ করিয়ে নেন। কিন্তু ল্যাবরেটরির কাজ নিজে না করলে কোন আলোকচিত্রীর পক্ষেই সম্পূর্ণ তাঁর মনোমত ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত কোন শিল্পসম্মত ছবির রূপ ও আবেদনের শতকরা অন্তত পঞ্চাশভাগ নির্ভর করে ল্যাবরেটরির কাজের ওপর। এটা ঠিক যে, যেমন ভাল আবহসঙ্গীত খারাপ চলচ্চিত্রকে ভাল করে দিতে পারে না কিন্তু খারাপ আবহসঙ্গীত ভাল চলচ্চিত্রে খারাপ করে দিতে পারে, তেমনি খারাপ ভাবে তোলা ছবিকে ল্যাবরেটরির কাজ দিয়ে সত্যিকারের ভাল করা না গেলেও, ল্যাবরেটরির কাজ খারাপ হলে কিন্তু ভাল ছবিও নষ্ট হয়ে যাবে। ফোটোগ্রাফিকে যাঁরা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন বা করতে চান ল্যাবরেটরি তাঁদের কাছে ক্যামেরা ও ফিল্মের মতই প্রয়োজনীয়। পোলারয়েড ল্যাণ্ড ক্যামেরায় তোলা ছবিতে ল্যাবরেটরির কাজ আলাদা ভাবে করার উপায় নেই বলে কোন সচেতন আলোক চিত্রশিল্পী মূল ছবি কখনোই এই ক্যামেরায় তোলেন না।

পেশাদার ফোটোগ্রাফারের ডার্করুম, তাঁর কাজের পরিমাণ অনুসারে ও দ্রুতগতিতে কাজ করার ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য নানা আকারের হতে পারে, কিন্তু যাঁরা ব্যক্তিগত শখ হিসাবে ফোটোগ্রাফির চর্চা করেন তাঁদের কাজের জন্য ছোট্ট একটি ডার্করুমই যথেষ্ট। সেই ডার্করুম ও তার নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দিচ্ছি।

ডার্করুম

সাধারণ উচ্চতার ৬ ফুট × ৮ ফুট মাপের হাওয়া বাতাসযুক্ত ও সম্পূর্ণ আলোকপ্রতিরোধী একটি ঘর বা ঘেরা জায়গা হলে ডার্করুমের কাজ চলে যায়। জুলিয়া মারগারেট ক্যামেরণ একটা কাঁচেঘেরা মুরগির ঘরকে তাঁর স্টুডিও ও একটা কয়লা রাখার খুপরিকে তাঁর ডার্করুম হিসেবে ব্যবহার করতেন। ডার্করুমের ঘরের দেয়াল ও ছাদ যে কোন হালকা রঙের হলে ভাল হয়, অন্যথায় সাদা হলেও কোন অসুবিধা নেই। তবে ডার্করুমে যদি রঙীন ছবির জন্যও ব্যবস্থা রাখতে হয়, তাহলে ঘরটি খসখসে, অনুজ্জ্বল ও গাঢ় রঙের করাই যুক্তিযুক্ত, যাতে কোন বিক্ষিপ্ত আলো কোনভাবেই প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। যে কোন রঙের সামান্যতম আলোও রঙীন ফিল্‌ম বা কাগজের ক্ষতি করতে পারে।

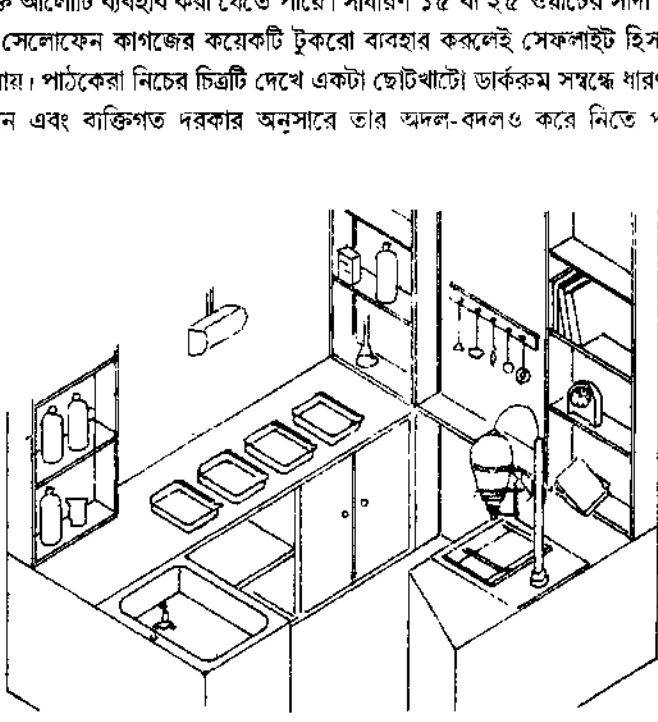
আসবাব

ডার্করুমের একদিকের দেয়াল বরাবর থাকে ৫ থেকে ৬ ফুট লম্বা ও ১½ থেকে ২ ফুট চওড়া একটা টেবল, যার ওপর তরল আলোক রাসায়নিকের ট্রে পর পর রেখে কাজ করা যায়। বলে রাখা ভাল, বর্তমানে ফিল্‌ম পরিস্ফুটনের কাজ ট্রের সহায্যে সাধারণত আর করা হয় না। এই কাজের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ড্রাম বা ট্যাঙ্ক পাওয়া যায় যা উচ্চ সংবেদনশীল আধুনিক ফিল্‌মের জন্য খুব উপযোগী। এছাড়া পরিস্ফুটনের সময় ট্রে ব্যবহার করলে ফগিং-এরও আশঙ্কা থাকে। পূর্বোক্ত টেবলটির উচ্চতা মোটামুটি ৩½ ফুট হলে কাজের সুবিধা হয়। তবে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে উচ্চতা কমবেশি করলেও কোন আপত্তি নেই। কাজ করার সময় তরল রাসায়নিক পড়ে টেবলটি যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য এটি সিমেন্ট বা কংক্রিটের হলে ভাল হয়, নয়তো টেবলের ওপর এমন একটা আচ্ছাদন ব্যবহার করা উচিত যাতে নিয়মিত রাসায়নিক পড়ে টেবলটি তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়ে যায়। ফোটোল্যাবরেটরির পরিভাষায় এই টেবলটিকে wet bench বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ওয়েট বেঞ্চ থেকে আড়াই ফুট মত উচ্চতায় দেয়ালের গায়ে এক বা একাধিক তাক করে নিয়ে আলোক-রাসায়নিকের শিশি, বোতল, মাপন গ্লাস, বিকার ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা করা যায়। ওয়েট বেঞ্চের শেষে একটি জলের সিংকেরও (sink) খুব প্রয়োজন; যদি তা কোন কারণে সম্ভব না হয় তাহলে একটি জলভরা পাত্র রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরটির অপর দিকের দেয়াল ঘেঁসে থাকবে ড্রয়ার সমেত একটা কাঠের টেবল যার ওপর ইজেল সহ এন্‌লার্জার, প্রিন্টিং ফ্রেম, ঘড়ি বা ষ্টপ ওয়াচ, ও অন্যান্য কতকগুলি টুকিটাকি জিনিষ রাখা যাবে। প্রিন্টিংয়ের কাগজ বা ফিল্‌ম এই টেবলের ড্রয়ারে রাখা যেতে পারে। এই বস্তুগুলি ওয়েট বেঞ্চ ও তৎসংক্রান্ত রাসায়নিক থেকে আলাদাভাবে রাখা দরকার।

আলো

ডার্করুমে এমন ধরনের সেফলাইটের ব্যবস্থা করতে হয় যাতে আলোক-সংবেদনশীল

বস্তুর ওপর তার কোন প্রতিক্রিয়া না হয়। বিভিন্ন ধরনের আলোক-সংবেদনশীল বস্তুর জন্য বিভিন্ন রঙের সেফলাইটের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন কন্ট্যাক্ট প্রিন্ট বা গ্যাসলাইট কাগজের ক্ষেত্রে হলুদ আলো, অর্থোক্রোমেটিক ফিল্মের ক্ষেত্রে লাল আলো, প্যানক্রোমেটিক ফিল্মের ক্ষেত্রে গাঢ় সবুজ আলো, বিবর্ধনের ব্রোমাইড কাগজের ক্ষেত্রে গাঢ় কমলা বা হলুদাভ সবুজ আলো, এবং রঙীন ফিল্ম বা প্রিন্টের কাগজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মৃদু জলপাই-সবুজ রঙের এক বিশেষ ধরনের আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ডার্করুমে এতগুলি সেফলাইটের ব্যবস্থা করার দরকার হয় না, একটিমাত্র সেফলাইটে, বিভিন্ন আলোক-সংবেদনশীল বস্তুতে কাজ করার সময়, প্রয়োজনমত বিভিন্ন রঙের লাইট ফিলটার ব্যবহার করে নিলেই চলে। বাস্তব ক্ষেত্রে এতগুলি ফিলটারেরও দরকার হয় না। ডার্করুমে মাত্র দুটি আলো হলেই মোটামুটি সব কাজ করা যায়। একটি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত ১০০ ওয়াটের সাদা আলো ও আর একটি হলুদাভ সবুজ অথবা গাঢ় কমলা রঙের সেফলাইট। প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম ও রঙীন ছবির কাজ সম্পূর্ণ অন্ধকারেই করা উচিত। খুব প্রয়োজনের সময় মাত্র দু-এক সেকেণ্ডের জন্য অত্যন্ত মৃদু পূর্বোক্ত আলোটি ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণ ১৫ বা ২৫ ওয়াটের সাদা আলোতে রঙীন সেলোফেন কাগজের কয়েকটি টুকরো ব্যবহার করলেই সেফলাইট হিসাবে কাজ চলে যায়। পাঠকেরা নিচের চিত্রটি দেখে একটা ছোটখাটো ডার্করুম সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন এবং ব্যক্তিগত দরকার অনুসারে তার অদল-বদলও করে নিতে পারবেন।



সাজসরঞ্জাম

ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের জন্য এত বিভিন্ন রকমের সরঞ্জাম পাওয়া যায় যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব এবং সাধারণ আলোকচিত্রীর পক্ষে তার কোন দরকারও নেই। এখানে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। কাজ করতে করতে কোন একটি নির্দিষ্ট সরঞ্জামের প্রয়োজন বোধ করলে, আলোকচিত্রী তা যথাসময়ে সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

ক. ফিল্ম পরিস্ফুটনের ট্যাঙ্ক বা ড্রাম (Developing Tank)

সম্পূর্ণ আলোকপ্রতিরোধী প্লাষ্টিক বা স্টেনলেস স্টিলের এই পাত্র দু ধরনের হয়ে থাকে। একটি ধরনে স্বাভাবিক আলোতেই ফিল্মের ক্যাসেট বা স্পুল থেকে ফিল্ম সরাসরি ট্যাঙ্কে ভরে নেওয়া যায়। আর এক ধরনে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ট্যাঙ্কের স্পাইরাল পদ্ধতির স্পুলে ফিল্ম লাগিয়ে নিয়ে ট্যাঙ্ক বন্ধ করে সাধারণ আলোয় পরিস্ফুটন করা হয়। স্পাইরালের মধ্যে ফিলম এমনভাবে লাগাতে হয় যাতে তরল ডেভেলাপার ফিলমের গোটা পৃষ্ঠভাগের ওপর সমানভাবে লাগতে পারে, এছাড়া স্পাইরালটি সম্পূর্ণ শুকনো ও পরিষ্কার থাকাও দরকার। বিভিন্ন প্রস্থ বিশিষ্ট রোল ফিল্ম অনুযায়ী স্পাইরাল স্পুলটির প্রস্থও কম বা বেশি করার ব্যবস্থা যে ট্যাঙ্কগুলিতে থাকে সেগুলি ইউনিভার্সাল ডেভেলাপিং ট্যাঙ্ক নামে পরিচিত। বড় আকারের ট্যাঙ্কগুলিতে দরকার মত একাধিক ফিলম একসঙ্গে পরিস্ফুটন করা যায়। তবে ফিল্ম ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী পরিস্ফুটন কালের যথেষ্ট তারতম্য হয় বলে মোটামুটি একই মাত্রা ও সময়ের পরিস্ফুটন দাবী করে এমন একাধিক ফিলমই একত্র পরিস্ফুটন করা ভাল। বর্তমানে এক ধরনের আধা-স্বয়ংক্রিয় ডেভেলাপিং ট্যাঙ্কের যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে যা হাত দিয়ে ঝাঁকাবার দরকার হয় না বলে পরিশ্রমও কম এবং এতে ফিল্মের পৃষ্ঠভাগের ওপর তরল ডেভেলাপারের বিচলনও আরো নিখুঁত হয়। ট্যাঙ্কটি শুধু বৃত্তাকার গতিতে নয়, সামনে পিছনেও আন্দোলিত হতে পারে। রঙীন ফিল্মের পরিস্ফুটনের জন্য এই ট্যাঙ্ক বিশেষ উপযোগী।

খ. রাসায়নিকের ট্রে বা ডিশ

ফোটোগ্রাফির কাজের জন্য এই কানা উঁচু ট্রে এনামেল, পলিথিন, পোরসিলেন বা স্টেনলেস স্টিলে তৈরি হয়ে থাকে। বিভিন্ন আকারের ট্রে পাওয়া যায়, তবে প্রিন্টের আকার অনুযায়ী ট্রের আকার বেছে নিতে হয়। পরিস্ফুটন, স্টপবাথ, স্থায়ীকরণ (fixing) ও ধৌতকর্ম (washing)—এই চারটি কাজের জন্য অন্তত পক্ষে চারখানি এবং রঙীন ছবির ক্ষেত্রে ব্লিচিং-এর জন্য আর একখানি, মোট পাঁচখানি ট্রে প্রয়োজন। ধৌতকর্মের ট্রেটি আকারে একটু বড় হলে, একসঙ্গে কয়েকখানি প্রিন্ট ভালভাবে ধোয়ার সুবিধা হয়। আধুনিক আধা-স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে ফিল্ম পরিস্ফুটন , স্থায়ীকরণ ও ওয়াশের ব্যবস্থা পরপর থাকে। ওয়াশিং-এর পর ফিল্মটিকে ডিষ্টিলড্ ওয়াটার বা অন্য কোন উপযুক্ত তরলে মিনিট খানেক সময় ধরে আরো একবার ধৌত করে শুকোবার জন্য টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

গ. ছোট ওজনের দাঁড়ি বা তুলাযন্ত্র

বিভিন্ন রাসায়নিক ওজন করার জন্য গ্রাম বাটখারা সহ একটি ছোট ওজনদাঁড়ি ডার্করুমে থাকা অতি আবশ্যক। যন্ত্রটির পরিমাপন খুব নিখুঁত হওয়াও দরকার।

ঘ. তরল রাসায়নিক প্রস্তুত করার জন্য কয়েকটি পাত্র

পলিথিন বা কাঁচের তৈরি, একটি ১০০ মি. লি. দাগবিশিষ্ট মাপন গ্লাস, একটি ৫০০ মি.লি. দাগবিশিষ্ট চোঙাকৃতি বিকার, একটি ফানেল, জলে রাসায়নিক মিশিয়ে নাড়বার জন্য একটি কাঁচের রড এবং পলিথিনের ঠোঁটযুক্ত মগ বা জগ একটি। বিভিন্ন নমুনা দ্রবণ (stock solution) রাখার জন্য ভাল ছিপিযুক্ত সাধারণ বাদামী কাঁচের কয়েকটি শিশি বা বোতলও প্রয়োজন। বোতলগুলির গায়ে কাগজ সেঁটে দ্রবণের নাম বা রাসায়নিকের বিবরণ লিখে রাখতে হয়। বোতলগুলি রঙীন না হলে আলো লেগে রাসায়নিক নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া রঙীন ছবির জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিকের তাপমাত্রা সুনির্দিষ্ট রাখার জন্য থার্মোস্ট্যাট যুক্ত একটি হিটারের ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

ঙ. থার্মোমিটার

রাসায়নিকের তাপাঙ্ক মাপার জন্য একটি ভাল পারদ বা অ্যালকোহল থার্মোমিটার অবশ্য প্রয়োজনীয়। এটি সেন্টিগ্রেড বা ফারেনহাইট যে কোন স্কেলের হতে পারে। এর তাপাঙ্ক মাপার ক্ষমতা নিখুঁত এবং ৬০° থেকে ১২০° ফারেনহাইট অথবা ১৫° থেকে ৫০° সেন্টিগ্রেডের মত বা আরও বেশি পরিধিযুক্ত হওয়া উচিত।

চ. সময়জ্ঞাপক ঘড়ি

ফিলম পরিস্ফুটনের সময় বা ছবি বিবর্ধনের কাজে আলোকপাতের সময় দেখার জন্য সেকেণ্ডের বড় কাঁটাযুক্ত ঘড়ি বা স্টপওয়াচ অপরিহার্য। পরিস্ফুটন কাল, স্থায়ীকরণ কাল ও কতক্ষণ ধরে ধৌত করতে হবে সেই সময় ভাল ছবির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই সমস্ত সময়সীমার সামান্য হেরফেরে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু বিবর্ধনের জন্য আলোকপাতের সময়ের দু-এক সেকেণ্ড হেরফেরেই ছবির প্রিন্ট খারাপ হয়ে যেতে পারে। ফলে এনলার্জারের সঙ্গে যুক্ত করে কাজ করার জন্য যে ঘড়ি পাওয়া যায় তা এ ব্যাপারে খুব উপযোগী। এতে সময় নির্দিষ্ট করে এনলার্জারের আলো জ্বেলে দিলে নির্দিষ্ট সময় পর এনলার্জারের আলো স্বয়ংক্রিয় ভাবে নিভে যাবে। রেডিয়ামের আভাযুক্ত সংখ্যাবিশিষ্ট, সেকেণ্ড ও মিনিট নির্দেশক ইলেকট্রনিক ঘড়ি রঙীন ছবির কাজের জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

ছ. প্রিন্টিং বক্স বা ফ্রেম

কনট্যাক্ট প্রিন্টের জন্য যে প্রিন্টিং বক্স পাওয়া যায় তার দাম তুলনামূলক ভাবে বেশি। প্রিন্টিং ফ্রেম দামে সস্তা। তবে ইজেল বা বেসবোর্ডে নেগেটিভ প্রিন্ট করার কাগজ রেখে তার ওপর ভারী ও পরিষ্কার কাঁচ চাপা দিয়ে আলোকপাত করেও কনট্যাক্ট প্রিন্ট করার কোন অসুবিধা হয় না। আধুনিক ল্যাবরেটরিতে শুধু কনট্যাক্ট প্রিন্ট নয়, প্রোজেকশন প্রিন্টের জন্যও যন্ত্র থাকে, প্রিন্ট করার যন্ত্রের সঙ্গে থাকে কপি করার যন্ত্রও। যেমন

রঙীন ছবির সঠিক মুদ্রণকর্মের জন্য থাকে বর্ণবিশ্লেষক যন্ত্র।

জ. প্রিন্ট ড্রায়ার ও গ্লেজার

ছবি তাড়াতাড়ি শুকোবার জন্য চকচকে কাগজের প্রিন্ট আরও চকচকে করার প্রয়োজনে এই ইলেকট্রিক হিটারযুক্ত ড্রায়ারের প্রয়োজন হয়।

ঝ. ট্রিমার

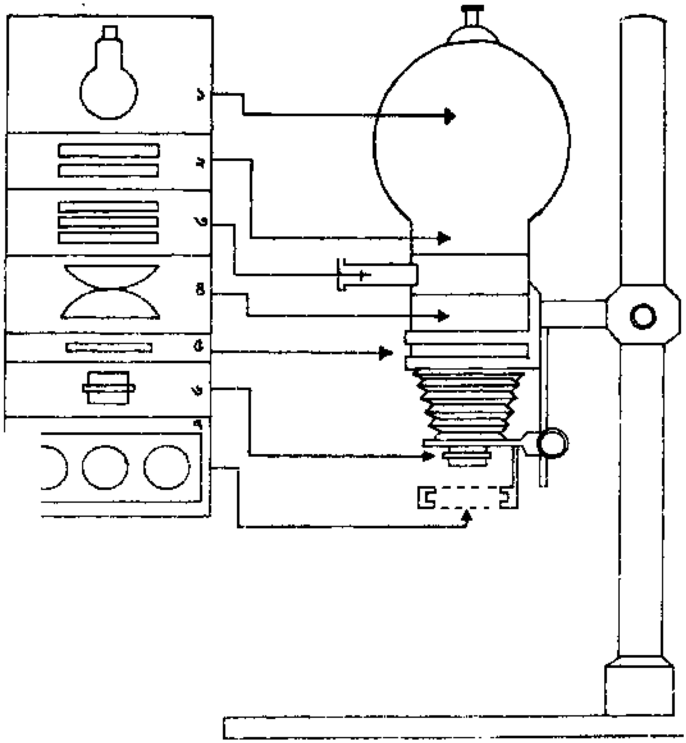
ছবির চারপাশ সমানভাবে বা ঢেউ খেলিয়ে কাটার জন্য ট্রিমার বা কাটার দরকার হতে পারে।

ঞ. বিবর্ধক যন্ত্র (Enlarger)

ল্যাবরেটরির সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যার সাহায্যে নেগেটিভ থেকে বড় আকারের ছবি গঠন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে একটি নেগেটিভের অতি সামান্য অংশকেও এনলার্জারের সাহায্যে বৃহদাকার করে একটি সম্পূর্ণ ছবি করে তোলা যায়। এনলার্জার একটি দৃকযন্ত্র। এর কাজের পদ্ধতি হচ্ছে নেগেটিভের পিছন বা উপর দিক থেকে আলো ফেলে এনলার্জিং লেনসের মধ্য দিয়ে বিবর্ধিত প্রতিচ্ছবি প্রিন্ট করার কাগজের অবদ্রবের ওপর ফেলা। অবদ্রবের স্তরে যে অদৃশ্য প্রতিবিম্ব গঠিত হবে তা পরিস্ফুটন ও স্থায়ীকরণের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান পজিটিভ প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং পজিটিভ প্রতিচ্ছবি তৈরির পদ্ধতির একটি মাত্র অংশ এনলার্জারের দ্বারা সাধিত হয়।

বিভিন্ন আকারের নেগেটিভ বিবর্ধিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের এনলার্জার পাওয়া যায়। তবে B_2 (৩১/২" × ২১/২") আকারের নেগিটিভের উপযুক্ত B_2 এনলার্জার হলে ৩৫ মি. মি. থেকে B_2 পর্যন্ত সমস্ত নেগেটিভ থেকেই ভালভাবে বিবর্ধন করা সম্ভব। বিবর্ধক যন্ত্রটি একটি শক্ত ও সমতল ইজেলের একধারে আটকানো একটি মজবুত উল্লম্ব স্তম্ভের ওপর দৃঢ়ভাবে বসানো থাকে। বিবর্ধক যন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশটি—যাকে বলা হয় এনলার্জার হেড বা হেড অ্যাসেম্ব্লি—প্রয়োজনমত স্তম্ভের গা বরাবর উপর নিচ করে ইজেল থেকে তার দূরত্ব কম বা বেশি অর্থাৎ ছবির আকার ইচ্ছামত বড় বা ছোট করা যায়। কোন কোন বিবর্ধক যন্ত্রে হেড অ্যাসেম্ব্লিকে উল্লম্ব অক্ষ বরাবর ১৮০° বা অনুভূমিক অক্ষ বরাবর ৯০° ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে। ইজেলটি সাধারণত হয় সাদা রঙের।

হেড অ্যাসেম্ব্লির সবচেয়ে উপরের অংশে থাকে একটি বালবের সাহায্যে আলোর ব্যবস্থা (lamp house)। এই বাল্‌বটি (light source) একটি দুধ-সাদা ফোটো ল্যাম্প (incandescent lamp with a frosted bulb) হওয়া প্রয়োজন যার ফিলামেন্ট আলোটি অনবরত জ্বালানো ও নেভানোর ধকল সইতে পারে। ল্যাম্পের পেছনে একটি চোঙাকৃতি প্রতিফলক বসানো থাকে যার ফলে বাল্‌বের আলোর প্রভা বৃদ্ধি পায়। ল্যাম্পের অবস্থানকে ঠিকঠাক করার ব্যবস্থাও (adjuster) থাকে। এই বাল্‌বের গায়ে সাধারণ বাল্‌বের মত কোন কিছু লেখা থাকে না, থাকলে ঐ লেখাগুলি ছবি প্রিন্ট করার সময় কাগজের ওপর তার ছায়া ফেলবে। রঙীন ছবি প্রিন্ট করতে হলে ফোটোল্যাম্পের বদলে



বিবর্ধন যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা : ১. টাংস্টেন আলো। ২. অবলোহিত ও অতিবেগনি রশ্মি শোষণকারী ফিল্টার। ৩. ফিল্টার পকেট বা ড্রয়ার। ৪. কন্ডেনসার। ৫. নেগেটিভ ক্যারিয়ার। ৬. লেন্স। ৭. যুক্ত পদ্ধতিতে কাজ করার প্রয়োজনে লাল, সবুজ ও নীল ফিল্টার রাখার ব্র্যাকেট।

১৫০ ওয়াটের একটি টাংস্টেন আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। আলোর ঠিক তলাতেই থাকে একটি ড্রয়ার বা পকেট যার ওপর প্রয়োজন মত হলুদ, ম্যাজেন্টা ও নীলাভ-সবুজ রঙের বিভিন্ন স্তরের লাইট ফিল্টার রেখে রঙীন ছবি প্রিন্ট করা যায়। সমগ্র নেগেটিভটির ওপর আলো যাতে সমানভাবে পড়ে তার জন্য এই ড্রয়ারের ঠিক নিচে ডিফিউজার অথবা কনডেনসার লেন্স ব্যবহার করা হয়। ডিফিউজার ব্যবহার করলে নেগেটিভের ওপর পতিত আলোর পরিমাণ কমে যায় ফলে কাগজের ওপর আলোকপাতের সময়ও বাড়াতে হয়। ছবির তীক্ষ্ণতা ও বৈষম্যও এর ফলে অনেক কম হয়, তবে নেগেটিভের

ছোটখাটো ত্রুটি ছবিতে ধরা পড়ে না। ডিফিউজারের পরিবর্তে কনডেনসার ব্যবহার করলে আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে জোরালো হয়, ফলে নেগেটিভ প্রতিচ্ছবির দীপ্তি বৃদ্ধি পায়, ছবির তীক্ষ্ণতা ও বৈষম্যও বাড়ে, তবে নেগেটিভের সামান্য ত্রুটিও ছবিতে বড় আকারে ধরা পড়ে। উভয় পদ্ধতির দোষগুণের সামঞ্জস্য করে এন্‌লার্জারে এখন যুগ্মভাবে ডিফিউজার-কন্‌ডেনসার ব্যবহার করা হচ্ছে।

কন্‌ডেনসারের নিচে নেগেটিভকে স্থির ও সমতলভাবে ধরে রাখার জন্য একটি নেগেটিভ ক্যারিয়ার থাকে। ক্যারিয়ারের মধ্যে দুখানি স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর নেগেটিভটিকে চেপে রাখা হয়। অথবা কাঁচের বদলে নির্দিষ্ট ফিলমের মাপে মাস্ক ব্যবহার করে নেগেটিভটিকে আটকানো হয়। নেগেটিভ ক্যারিয়ারের [illegible] থাকে ডায়াফ্রাম যুক্ত ও ফোকসিং ব্যবস্থাসহ এন্‌লার্জিং লেনস যার সাহায্যে নেগেটিভ প্রতিচ্ছবিকে সঠিকভাবে ফোকস করে ইজেলের ওপর ফেলা হয়। পজিটিভ প্রতিচ্ছবির আকার কী হবে তা এই লেন্‌সের ফোকস দৈর্ঘের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ফলে নেগেটিভের ফর্ম্যাট অনুযায়ী এন্‌লার্জিং লেন্‌সের ফোকস দৈর্ঘ স্থির করা প্রয়োজন। যে নেগেটিভ ফর্ম্যাটে যেটি নর্ম্যাল লেনস সেই ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌সকেই এন্‌লার্জিং লেন্‌স হিসাবে অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন ৩৫ মি. মি. নেগেটিভের জন্য ৫০ মি.মি., ৬ × ৬ সি. মি. নেগেটিভের জন্য ৭৫ মি.মি. ও B_2 নেগেটিভের জন্য ১০৫ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌স। কিন্তু এন্‌লার্জিং লেন্‌সের ফোকস দৈর্ঘ নর্মালের তুলনায় সামান্য বেশি হলেই ভাল। যেমন ৩৫ মি. মি. নেগেটিভের জন্য ৬৫ মি. মি. বা ৬ × ৬ সি. মি. নেগেটিভের জন্য ১০০ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘ ইত্যাদি। তবে এতগুলি লেন্‌স ক্রয় না করে একটি ৭৫ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌সে সব কাজ করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এন্‌লার্জিং লেন্‌সকে ফোকস করা যায় হাত দিয়ে ঘুরিয়ে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে। বিবর্ধক যন্ত্রে কখনো কখনো ফোকসিংয়ের সুবিধার জন্য রেঞ্জফাইণ্ডারের অনুরূপ ব্যবস্থা থাকে। এন্‌লার্জিং লেন্‌স বদল হলে সাধারণত কনডেনসারও বদল করার প্রয়োজন হয়। ১০৫ মি. মি. লেন্‌সের ক্ষেত্রে যেখানে ৪" কনডেনসার লাগে, ৫০ মি. মি. লেন্‌সের বেলায় সেখানে $১^১/_২$" কনডেনসার দরকার। তবে এক্ষেত্রেও মধ্য পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

এন্‌লার্জারের লেন্‌স যেন কোন ক্রমেই যে ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়েছে তার লেন্‌সের চেয়ে নিকৃষ্ট মানের না হয়, বরং উন্নততর মানের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একটি নেগেটিভে যতখানি অনুপুঙ্খ ও বৈষম্য থাকে বিবর্ধনের মাধ্যমে প্রিন্টে তা পুরোপুরি পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং যথেষ্ট উন্নত মানের এন্‌লার্জিং লেন্‌সের সাহায্যে একটি নেগেটিভ থেকে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল অর্জন করা সম্ভব। ক্যামেরা লেন্‌স ও এন্‌লার্জিং লেন্‌সের কর্মপ্রণালীর মধ্যে যে তফাৎ তা হল বস্তু দূরত্ব ও প্রতিচ্ছবি দূরত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য। ক্যামেরা লেন্‌স তৈরি করা হয় এমনভাবে যাতে লেন্‌স থেকে প্রতিচ্ছবি দূরত্ব লেন্‌স থেকে বস্তুর দূরত্ব অপেক্ষা কম হলেই ভাল ফল দেয়। এন্‌লার্জিং লেন্‌স ঠিক এর বিপরীত উদ্দেশ্যে তৈরি হয়ে থাকে। অর্থাৎ লেন্‌স থেকে

ইজেলের দূরত্ব লেন্‌স থেকে নেগেটিভের দূরত্ব অপেক্ষা বেশি হলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে তার কাজ ম্যাক্রো লেন্‌সের কাজের সঙ্গে তুলনীয়। এনলার্জিং লেন্‌সের মুখের কাছে ব্র্যাকেটের সাহায্যে একটি লাল ফিল্‌টার লাগানো থাকে যা দরকার মত সাদা-কালো ছবির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যুত পদ্ধতিতে রঙীন ছবি প্রিন্ট করতে হলে ব্র্যাকেটটিতে লাল, সবুজ ও নীল এই তিনটি ফিল্‌টার ব্যবহার করার ব্যবস্থাও সহজেই করে নেওয়া সম্ভব।

সর্বাধুনিক এন্‌লার্জারগুলিতে এক্সপোজার মিটার এবং যথাযথ রঙীন ফিল্‌টার নির্বাচনের জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে। এতে ডায়াল ঘুরিয়ে ফিল্‌টার পরিবর্তন করার সুবিধা থাকায় অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি কাজ সারা যায়। তবে এই এন্‌লার্জারের দাম অত্যন্ত বেশি, সেজন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের পক্ষেই এটা ব্যবহার করা সম্ভব। সাধারণ এন্‌লার্জারের ফিল্‌টার-পকেটে ব্যবহারের জন্য তিন রঙের বিভিন্ন স্তরের ২২ টি অ্যাসিটেট ফিল্‌টারের যে সেট পাওয়া যায় তা ব্যবহার করলে খরচ খুব বেশি হয় না অথচ ছবির গুণমান ঠিক থাকে।

ট. মাস্কিং ইজেল (Masking Easel)

প্রিন্টের কাগজকে সমতলভাবে ধরে চারপাশে সাদা বর্ডার রেখে ছবি করার জন্য এর প্রয়োজন হয়। ছবির আকার অনুযায়ী স্কেল কম বেশি করার ব্যবস্থাও এতে থাকে। সাধারণত এটি লোহার তৈরি, লোহার ওপরে দুধ-সাদা, ঝকঝকে, পুরু এনামেল পেন্ট। বিভিন্ন আকারের ইজেল পাওয়া গেলেও মোটামুটি ১২″ × ১০″ বা খুব বেশি হলে ১৫″ × ১২″ মাপের ছবি করার উপযুক্ত ইজেল হলেই ছোট আকার পর্যন্ত সব ছবির কাজ চলে যায়। খুব বড় আকারের ছবির ক্ষেত্রে ইজেল ব্যবহার করা হয় না।

ল্যাবরেটরিতে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছাড়াও আরো কয়েকটি ছোটখাটো জিনিষপত্রের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন দু-একটা ক্লিপ, চিমটা, কিছু বোর্ডপিন, ডজিং করার জন্য হাতে তৈরি কয়েকটি মাস্ক, চূড়ান্তভাবে ধৌত করে নেগেটিভের রোল শুকোতে দেবার পর তা যাতে কুঁচকে না যায় তার জন্য কয়েকটি ক্ল্যাম্প ইত্যাদি। ল্যাবরেটরির সমস্ত সরঞ্জাম নির্দিষ্ট জায়গা মত গুছিয়ে রাখা একান্ত আবশ্যক, নচেৎ কাজের সময় অত্যন্ত মৃদু আলোয় বা রঙীন ছবির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্ধকারে দরকারি জিনিষটি হাতের ক..ছ না পাওয়া গেলে ছবি নষ্ট হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কোনক্রমেই অগোছালো হওয়া চলবে না। ল্যাবরেটরিতে অগ্নি নির্বাপণের কিছু ব্যবস্থা থাকা, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা এবং ডার্করুম কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাও জরুরি।

পরিস্ফুটন (Developing)

ক্যামেরার সাহায্যে আলোকপাতের ফলে ফিলমের ওপর অথবা প্রিন্টের জন্য নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলোকপাতের সাহায্যে কাগজের অবদ্রবের ওপর যে প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয় তা অদৃশ্য ও অস্থায়ী। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ লীন প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে

তুলে স্থায়িত্ব দেওয়াকেই পরিস্ফুটন বা ডেভেলাপিং বলে। বস্তুত ফোটোগ্রাফিক পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্বের কাজের সূচনাই হয় নেগেটিভ পরিস্ফুটন করার মধ্য দিয়ে। আলোকপাতের ফলে অবদ্রবের সিলভার হ্যালাইডগুলি পরিবর্তিত হয়ে যে অদৃশ্য প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে তা যদি ঐ ভাবেই রেখে দেওয়া যায়, তবে সময় ও আলোকের প্রভাবে অপরিবর্তিত সিলভার হ্যালাইডগুলিও পরিবর্তিত সিলভার হ্যালাইডের মত ক্রমশঃ কালো হয়ে যাবে ও ফলে প্রতিচ্ছবি মিলিয়ে যাবে। পরিস্ফুটনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া : ১. অবদ্রবের মধ্যে যে লীন প্রতিচ্ছবি গড়ে উঠেছে তাকে ধাতব সিলভারের কণায় ফুটিয়ে তোলে। অবদ্রবের যে সমস্ত স্থানে আলো পড়েনি, সেখানে সিলভার হ্যালাইড তখনও থেকে যায়। ২. এই সিলভার হ্যালাইডগুলিকে আলাদা করে দিয়ে কিন্তু ধাতব সিলভারের কণাগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে পূর্বোক্ত প্রতিচ্ছবিকে স্থায়িত্ব দেয়। যদিও কার্যক্ষেত্রে স্থায়ীকরণ (fixing) পদ্ধতি সিলভার প্রতিচ্ছবিকে সামান্য ক্ষুণ্ণ করেই। ৩. সবশেষে ফিল্মের গায়ে লেগে থাকা বিভিন্ন লবণ ও রাসায়নিক দ্রবণগুলিকে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলে যাতে এগুলি প্রতিচ্ছবির ওপর আর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে। এই কাজ (washing) সাধারণ পরিষ্কার জলের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে।

প্রথম কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত রাসায়নিক মিশ্রণকে বলা হয় ডেভেলাপার ও দ্বিতীয় কাজের রাসায়নিক মিশ্রণকে ফিক্সার । ডেভেলাপার সাধারণত তৈরি করা নমুনা দ্রবণ (stock solution) হিসেবে বা মিশ্রিত পাউডারের রূপে পাওয়া যায় যা যথাক্রমে জলে মিশিয়ে নিলে বা জলে গুলে নিলেই ব্যবহারের যোগ্য হয়ে ওঠে। অনেক ফোটোগ্রাফার বিভিন্ন উপাদান ও পদার্থ সহযোগে ডেভেলাপার নিজেরাই তৈরি করার পক্ষপাতী। সাদা-কালো ফিল্মের ডেভেলাপারের বিভিন্ন উপাদান হল :

১. পরিস্ফুটনের এক বা একাধিক প্রধান উপাদান (developing agents) মেটল, হাইড্রোকুইনোন ইত্যাদি।

২. সংরক্ষক (preservative)—ডেভেলাপারের পরিস্ফুটনের ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য এর ব্যবহার। যেমন, সোডিয়ম সালফাইট।

৩. ত্বরান্বিতকারক (accelerator)—প্রধান পরিস্ফুটককে দ্রুত কার্যকারী করার জন্য একটি ক্ষারজাতীয় দ্রবণের প্রয়োজন। যেমন, সোডিয়ম কার্বোনেট, বোরাক্স ইত্যাদি।

৪. প্রতিহতকারক (restrainer)—অপরিবর্তিত সিলভার হ্যালাইডগুলি যাতে সামান্যও পরিস্ফুটিত হতে, ও তার ফলে ফগের সৃষ্টি করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করাই এর কাজ। যেমন, পটাসিয়ম ব্রোমাইড।

৫. পরিষ্কার সাধারণ পানীয় জল।

এছাড়া আরো দু একটি উপাদান বা পদার্থ কখনো কখনো ব্যবহৃত হয় যা ডেভেলাপারের কর্মক্ষমতাকে তেমন প্রভাবিত করে না, কিন্তু পরিষ্কার নেগেটিভ পেতে সাহায্য করে। এগুলি হল water softener, developer improver ও wetting agent. এর

মধ্যে ডেভেলাপার ইমপ্রুভারের ফগকে প্রতিহত করার উচ্চক্ষমতা আছে। তা খুব অল্প পরিমাণে ডেভেলাপারের মধ্যে মিশিয়ে নিলে পুরনো নেগেটিভ পরিস্ফুটনের কাজে খুব সুবিধা হয়।

আমরা এখন উপরোক্ত উপাদানগুলি নিয়ে সামান্য আলোচনা করে তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হবার চেষ্টা করব। নেগেটিভ পরিস্ফুটকদের মূলত এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : স্বাভাবিক বৈষম্য, উচ্চ বৈষম্য ও স্বল্প বৈষম্যের ডেভেলাপার এবং উচ্চ দ্রুতি বা সূক্ষ্ম দানার মত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য ডেভেলাপার। সবচেয়ে জনপ্রিয়, স্বাভাবিক নেগেটিভ ডেভেলাপার হল মেটল-হাইড্রোকুইনন ডেভেলাপার, যা M.Q.নামে পরিচিত এবং মেটল ও হাইড্রোকুইনন এই দুই উপাদানের এক মিশ্রণ। এই উপাদান দুটির কাজ হল আলো লাগা সিলভার হ্যালাইডগুলিকে ধাতব সিলভারে রূপান্তরিত করা।

M.Q. ডেভেলাপার মেটলের বৈশিষ্ট্যের (উচ্চ ফিল্ম-দ্রুতি ও উন্নত ক্রমায়ণ) সঙ্গে হাইড্রোকুইননের বৈশিষ্ট্যকে (উচ্চঘনত্ব ও বৈষম্য) সমন্বিত করে। স্বাভাবিক অবস্থায় মেটল ও হাইড্রোকুইননের মিশ্রণের অনুপাত হয় ১ : ৪।

মেটল হল Monomethyl-para aminophenol Sulphate. এর রাসায়নিক সূত্র $(CH_3NHC_6H_4OH)_2H_2SO_4$, আণবিক ওজন ৩৪৪। এটি ১৮৯১ সালে হাউফ কর্তৃক প্রথম পরিস্ফুটক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সহজে জলে দ্রবণীয় সাদা কেলাসাকার পাউডার। অনুগ্র অথচ অত্যন্ত সক্রিয় এই উপাদানটি ছায়াবৃত অংশের অনুপুঙ্খ খুব ভালভাবে প্রকাশ করে কিন্তু প্রতিচ্ছবির বৈষম্য বাড়তে দেয় না। তা ছাড়া মেটল ধাতব সিলভারকণাগুলিকে অত্যন্ত সুষম ও দৃঢ়বদ্ধ ভাবে ধরে রাখে বলে সিলভার দানাগুলিও সূক্ষ্ম থাকে। Elon, Genol, Planetol ইত্যাদি বিবিধ ব্যবসায়িক নামেও মেটল পরিচিতি। এই রাসায়নিকটি ব্যবহার করার সময়ে সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অনেকের গায়ের চামড়ায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

হাইড্রোকুইনন হল Para dihydroxybenzene. এর রাসায়নিক সূত্র $C_6H_4(OH)_2$ আণবিক ওজন ১১০। ১৮৮০ সালে অ্যাবনে প্রথম এই উপাদানটি পরিস্ফুটনের ক্ষমতার কথা প্রকাশ করেন। এটিও জলে দ্রবণীয়, সাদা ও সূক্ষ্ম কেলাসাকার দানার আকারে পাওয়া যায়। বৈষম্য বাড়াবার জন্যই এর ব্যবহার তবে এককভাবে এর কার্যক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষীণ, তীব্র অ্যালকালি সহযোগে এর কার্যক্ষমতা দ্রুত করে তোলা হয়। অ্যালকালির পরিমাণ যত বাড়ানো হয় এটি তত কার্যকারী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে প্রয়োজনীয় পরিস্ফুটন কালও কমতে থাকে। সাধারণত মেটলের সঙ্গে ব্যবহৃত হলেও, উচ্চ বৈষম্য ও ঘনত্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে এককভাবেও ব্যবহার করা হয়—যেমন Process work এর কাজে। ফিল্ম বা প্রিন্টের কাগজ পরিস্ফুটনের জন্য মেটল ও হাইড্রোকুইনোন ছাড়া আরও কয়েকটি উপাদান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, Paraminophenol, Adurol, Amidol, Phenylendiamine ইত্যাদি। Adurolও

Amidol উপাদান দুটির প্রথমটি ক্লোরোব্রোমাইড মুদ্রণের কাগজকে উষ্ণতর কালো ও দ্বিতীয়টি শীতলতর কালো করার জন্য প্রধানত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফিল্মের নেগেটিভ সূক্ষ্মতম কণাযুক্ত করার জন্য Phenylendiamine সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, যদিও এজন্য ফিল্মের ওপর আলোকপাতের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করার দরকার হয়। প্যারামিনোফেনল বৈশিষ্ট্যে মেটলের মতই, তবে উচ্চ তাপমাত্রায় অধিকতর কার্যকারী ও নমুনা দ্রবণ সহজে নষ্ট হয় না। Phenidoneও একটি অত্যন্ত স্বল্প বৈষম্যের পরিস্ফুটনের উপাদান যা প্রধানত হাইড্রোকুইননের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্রণটি P. Q.ডেভেলাপার নামে পরিচিত। এই প্রসেঙ্গে বলা দরকার, পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াটি তার প্রকৃতির দিক থেকে সর্বদা অ্যালকালাইন অর্থাৎ ক্ষারীয় কিন্তু স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়াটি সর্বদাই অ্যাসিডিক অর্থাৎ অম্লীয়। হাইড্রোকুইনন প্রতিচ্ছবির বৈষম্য বাড়াতে সাহায্য করে। এটি quinol নামেও পরিচিত। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, ডেভেলাপারগুলিকে নির্দেশ করার দুটি প্রাথমিক উপায় আছে, একটি কণাময়তার ওপর তাদের প্রভাবের ভিত্তিতে, অন্যটি বৈষম্যের।

সমস্ত ডেভেলাপারই বাতাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অম্লজানায়িত (oxidise) হতে শুরু করে, গাঢ় থেকে গাঢ়তর বাদামী রঙে পরিবর্তিত হয় এবং দ্রুত পরিস্ফুটনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং মিশ্রণে সংরক্ষক হিসাবে সোডিয়াম সালফাইট (Na_2So_3) ব্যবহার করার দরকার হয়। তা পরিস্ফুটনের উপাদানগুলিকে অম্লজানায়িত হওয়া থেকে রক্ষা করে তাদের কার্যক্ষমতা বজায় রাখে। শুষ্ক ও জলবিহীন সালফাইট পাউডার খুব সহজেই ১০০° ফারেনহাইট উত্তাপে জলে দ্রবীভূত হয়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে পরিস্ফুটনের ক্রিয়াকে কার্যকারী করার জন্য মিশ্রণে অ্যালকালি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ত্বরান্বিতকারক অ্যালকালি হল সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2Co_3)। কতকগুলি বিশেষ ধরনের মিশ্রণে অ্যালকালি হিসাবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaoH) ও বোরাক্স ($Na_2B_4O_7$)-ও ব্যবহৃত হয়। তীব্র অ্যালকালির প্রয়োজনে হাইড্রোক্সাইড ও মৃদু অ্যালকালির প্রয়োজনে বোরাক্স ব্যবহার প্রচলিত। অ্যালকালির তীব্রতা বৈষম্য বাড়ায় ও মৃদুতা বৈষম্য কমায়। মিশ্রণে এর সঙ্গে প্রতিহতকারক বা অ্যান্টিফগ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় পটাসিয়াম ব্রোমাইড (KBr)। এর কাজ হল অবদ্রবের অপরিবর্তিত সিলভার হ্যালাইডগুলিকে পরিস্ফুটিত হতে না দেওয়া। এছাড়া এটি ফিল্মের দ্রুতির-ওপরেও প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব নির্ভর করে পরিস্ফুটনের মিশ্রণে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের অনুপাতের তারতম্যের ওপর। মিশ্রণ প্রস্তুত করার জন্য সাধারণ কলের জলই যথেষ্ট। অনেকে পরিশোধিত জল ব্যবহারের পরামর্শ দেন, তবে দামের তুলনায় এর সুবিধা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণ কলের জলে যে খনিজ লবণ থাকে তা কোন ক্ষতি করে না। অধিকাংশ M. Q. ডেভেলাপারের রাসায়নিক সংগঠন এই রূপ :

মেটল	০.৫—২ গ্রাম
সোডিয়াম সালফাইট	১২—৬০ গ্রাম
হাইড্রোকুইনন	২—৮ গ্রাম
সোডিয়াম কার্বোনেট	১০—৩০ গ্রাম
পটাসিয়াম ব্রোমাইড	০.১—১ গ্রাম
সাধারণ কলের জল	১০০০ সি. সি.

অনেক সময় পরিস্ফুটনের মিশ্রণকে ঘনীভূত করার জন্য জলের পরিমাণ কিছু কমানো হয়। সাধারণ জলে ক্যালসিয়াম লবণের পরিমাণ বেশি হলে সালফাইট বা কার্বোনেটের দ্রবণে একটা সাদা দুধের মত তলানি পড়ে এবং তার ফলে পরিস্ফুটনের পর ফিল্মের গায়ে সাদা খড়িগুঁড়োর মত পাউডার লেগে থাকতে পারে। এই ক্যালসিয়াম গুঁড়ো শতকরা ২ ভাগ অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলে একবার ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

পরিস্ফুটনের আর যে কটি উপাদানের কথা আগে বলেছি তার মধ্যে ফেনিডোন-এর সঙ্গে হাইড্রোকুইননের মিশ্রণের ফলে প্রস্তুত P. Q. ডেভেলাপার এক বহুল প্রচলিত পরিস্ফুটক। এতে ফেনিডোন ও হাইড্রোকুইননের মিশ্রণের অনুপাত ১ : ২৫ থেকে ১ : ৪০-এর মধ্যে এবং এর বৈশিষ্টা M. Q. ডেভেলাপারের অনুরূপ। এর সাংগঠনিক সূত্র এই প্রকার—

সোডিয়াম সালফাইট	৭৫ গ্রাম
হাইড্রোকুইনন	৮ গ্রাম
সোডিয়াম কার্বোনেট	৩৭.৫ গ্রাম
ফেনিডোন	০.২৫ গ্রাম
পটাসিয়াম ব্রোমাইড	২ গ্রাম
জল	১০০০ সি. সি.

পরিস্ফুটনের কাজ যাঁরা নতুন করছেন বা করবেন, স্বাভাবিক বৈষম্যের M. Q. ডেভেলাপার দিয়ে তাঁদের কাজ শুরু করা উচিত। পরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভের পর, অন্যান্য ধরনের ডেভেলাপার ব্যবহার করে তাঁরা পছন্দ ও প্রয়োজনমত নেগেটিভ পাবার চেষ্টা করতে পারেন। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তৈরি বিভিন্ন ধরনের ডেভেলাপারের সঙ্গে প্রদত্ত ব্যবহারবিধিগুলি ঠিকমত অনুসরণ করে পরিস্ফুটনের কাজ করলে নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায়। তবে যে ধরনের ডেভেলাপারই ব্যবহার করা হোক না কেন, পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হল যথাযথ ও নির্ভুলভাবে কাজ করার অভ্যাস। পরিস্ফুটনের মিশ্রণ তৈরি, তা ট্যাঙ্কে ভরা, মিশ্রণের তাপমাত্রা, ট্যাঙ্কটি ঝাঁকানো, পরিস্ফুটন এবং স্থায়ীকরণ কাল প্রভৃতি যথাযথ হলে একটি নির্দিষ্ট ডেভেলাপার থেকে প্রত্যাশিত ফল পেতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু পরিস্ফুটনের কাজে ঘটনা এত কম ও রুটিন এত বেশি যে গাফিলতি হওয়া স্বাভাবিক। এবং সেক্ষেত্রে ফিল্মের ত্রুতি ও

ডেভেলাপারের শক্তি সঠিক থাকলেও নেগেটিভ প্রতিচ্ছবির বৈষম্য, ঘনত্ব ও অনুপুঙ্খ কিছুতেই আশানুরূপ হবে না। প্রতিচ্ছবির এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে এটুকু জেনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞানীরা একটি নেগেটিভের ঘনত্ব ও বৈষম্যের তুলনামূলক মান গাণিতিক নিয়মে গামা সংখ্যার দ্বারা সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ করে থাকেন। বিবর্ধনের হার অনুযায়ী একটি নেগেটিভের গামা সংখ্যা ০.৬ থেকে ০.৮-এর মধ্যে থাকা উচিত। কম গামা সংখ্যা-বিশিষ্ট নেগেটিভের ঘনত্ব ও বৈষম্য উচ্চ গামা সংখ্যা-বিশিষ্ট নেগেটিভের ঘনত্ব ও বৈষম্য অপেক্ষা কম হয়, ফলে কম গামা সংখ্যা-বিশিষ্ট নেগেটিভ থেকে বৃহদাকার বিবর্ধনের যথেষ্ট সুবিধা হয়। গাণিতিক সংজ্ঞা অনুসারে গামা $(\gamma)=D/\log E$, যেখানে D হল ঘনত্ব ও E আলোকপাত। বিবর্ধনের সুবিধার জন্য এই সম্পর্কের সামঞ্জস্য করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রস্তুত সমস্ত ডেভেলাপারেই ০.৭ গামা সংখ্যা পাবার উপযুক্ত করে পরিস্ফুটন -কাল ও মিশ্রণের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট করা থাকে। পরিস্ফুটন কাল কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যেমন ব্যবহৃত ফিল্‌ম, নেগেটিভের বৈষম্য, মিশ্রণের তাপমাত্রা, ঝাঁকুনির পরিমাণ ইত্যাদি। পরিস্ফুটনের মিশ্রণ সবচেয়ে কার্যকারী সাধারণত ৬০° থেকে ৭৫° ফারেনহাইট বা ১৫° থেকে ২৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে। এখন পরিস্ফুটন তাপমাত্রা প্রতি ১০° সেন্টিগ্রেড বা ১৮° ফারেনহাইট হ্রাস পেলে পরিস্ফুটন-কাল যতগুণ বৃদ্ধি করতে হবে সেই সংখ্যাকে বলা হয় ওই ডেভেলাপারের তাপমাত্রা গুণাঙ্ক; সাধারণ ক্ষেত্রে এই মান ১.৯-এর কাছাকাছি। এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় কেননা পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে একটা বহুল ত্রুটি হল ওভার ডেভেলাপমেন্ট, প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় ধরে পরিস্ফুটন।

পরিস্ফুটনের দ্বিতীয় স্তর স্থায়ীকরণ, যার সাহায্যে নেগেটিভকে কার্যোপযোগী করা হয়। সোডিয়াম থিওসালফেট ($Na_2S_2O_3$)—সাধারণত যা হাইপো নামে পরিচিত—অবদ্রবের অপরিবর্তিত সিলভার হ্যালাইডগুলিকে লবণে পরিবর্তিত করে দেয়, যা পরে সহজেই ধুয়ে ফেলে ফিল্‌ম থেকে বার করে দেওয়া হয়। এই অপরিবর্তিত হ্যালাইডগুলিই ছিল ফিলমের অনালোকিত অংশ যা স্থায়ীকরণের ফলে সরে গিয়ে ফিল্‌মের অবদ্রবের মধ্য দিয়ে প্রিন্ট তৈরির সময় আলোক প্রবেশের পথ করে দেয় এবং যা পরে ছবিতে ছায়া বা ছায়াবৃত অংশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। হাইপো দ্রবণে অধিকাংশ নেগেটিভ পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই স্থায়ী হয়ে যায়। এ হল স্বাভাবিক স্থায়ীকারকের ক্ষেত্রে। আর এক ধরনের স্থায়ীকারক আছে যা অতি দ্রুত ক্রিয়াশীল, তার ক্ষেত্রে স্থায়ীকরণ-কাল মাত্র এক মিনিটের মত। যে কোন স্থায়ীকরণ দ্রবণই যাতে ফিল্‌মের সমস্ত অংশে নির্দিষ্টভাবে কাজ করে সেজন্য তাকেও নিয়মানুযায়ী ঝাঁকানো দরকার। মনে রাখতে হবে হ্যালাইডগুলিকে পরিবর্তিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ীকারকের ক্ষমতা পরিস্ফুটকের মতই ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং শেষে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্য স্থায়ীকরণের সময় পূর্বে ব্যবহৃত স্থায়ীকারক দ্রবণের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

পরিস্ফুটনের ও স্থায়ীকরণের বিভিন্ন দ্রবণ একাধিকবার ব্যবহার করা যায়, কিন্তু প্রতিবার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের কর্মক্ষমতা কমে যায়, ফলে পরবর্তী ক্ষেত্রে পরিস্ফুটন-কাল বা স্থায়ীকরণ-কাল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় অথবা ব্যবহৃত রাসায়নিককে প্রতিস্থাপিত করার জন্য দ্রবণে কিছু পরিমাণ শক্তিবর্ধক (replenisher) মিশিয়ে দ্রবণের কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। আবার প্রয়োজনীয় স্থায়ীকরণ-কালের চাইতে বেশি সময় ধরে নেগেটিভ স্থায়ীকরণের দ্রবণের সংস্পর্শে থাকলে নেগেটিভ প্রতিচ্ছবি, বিশেষত তার সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খগুলি, ক্ষয় পেতে থাকে।

পরিস্ফুটনের দ্রবণ স্থায়ীকরণের দ্রবণের (সাধারণত হাইপো) সংস্পর্শে এলে যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার ফলে হাইপো দ্রবণে সূক্ষ্ম কালো সিলভার কণার একটা হালকা প্রলেপ পড়ে, যার দরুন ফিল্মে ফগিং-এর সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য পরিস্ফুটনের পর হাইপো দ্রবণ ব্যবহার করার আগে ফিল্মটির পরিস্ফুটন বন্ধ করা ও তাকে সম্পূর্ণ ডেভেলাপার মুক্ত করা প্রয়োজন। তাই হাইপো দ্রবণ ব্যবহারের আগে ফিল্মটিকে ২% অ্যাসিটিক অ্যাসিডের অথবা ৪% মেটাবাইসালফাইট বাথে অল্প ক্ষণের জন্য ধুয়ে নেওয়া উচিত। এই প্রক্রিয়াটিকে ষ্টপ বাথ (stop bath) বলে। পরিস্ফুটনের ফলে ফিল্মের জিলেটিন যথেষ্ট নরম হয়ে পড়ে, সেজন্য জিলেটিনকে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য ষ্টপ বাথের পর অনেক সময় হাইপোর দ্রবণে পটাশিয়াম অ্যালাম মিশিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ব্যবহারের সময় আঁচড় পড়ে নেগেটিভ সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

পরিস্ফুটনের তৃতীয় স্তর ধৌতকরণ বা ওয়াশিং। এর সাহায্যে ফিল্মের গায়ে লেগে থাকা যাবতীয় রাসায়নিক পরিষ্কার করে ও সম্পূর্ণ রূপে ধুয়ে ফেলা হয়। নয়তো, বিশেষ করে হাইপোর মত অম্লীয় রাসায়নিক ফিলমকে নষ্ট করে দেবে। ফিল্ম ঠিক কতক্ষণ ধরে ধোয়া দরকার তা ব্যবহৃত ফিল্ম, ব্যবহৃত স্থায়ীকরণ দ্রবণ এবং ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত জলের তাপমাত্রা এ সবের ওপর নির্ভর করে এবং এই সময় ১০ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণ ভাবে ফিল্ম মোটামুটি আধঘণ্টা প্রবহমান জলে ধোয়া দরকার। প্রবহমান জলের অভাবে জল বার বার বদল করেও এই কাজ করা যেতে পারে। ধোয়া শেষ হবার পর জলে কয়েক ফোঁটা ওয়েটিং এজেন্ট মিশিয়ে তাতে ফিল্মটি ডুবিয়ে নিয়ে শুকোতে দিলে ফিলম মসৃণ ভাবে ও জলের দাগ না ফেলে শুকিয়ে যাবে। ফিল্মের বিভিন্ন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিস্ফুটনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন কণাময়তা, এর সৃষ্টি হয় সাধারণত অতিরিক্ত আলোকপাত ও অতিরিক্ত সময় ধরে পরিস্ফুটনের জন্য। কোন ডেভেলাপার কণার আকার-বৃদ্ধিকে প্রতিহত করতে পারলেও, ব্যবহৃত ফিল্মের নির্দিষ্ট কণার আকারের চেয়ে ছোট আকারের কণা চূড়ান্ত নেগেটিভে সৃষ্টি করতে পারবে না। যেমন বৈষম্য, স্বল্প বৈষম্যের বিষয়কে অধিক সময় ধরে ও উচ্চ বৈষম্যের বিষয়কে অপেক্ষাকৃত কম সময় ধরে পরিস্ফুটন করা দরকার। বিশেষত কোডাক D.76, ইলফোর্ডের ID-II বা মাইক্রোফেনের মত সর্বার্থসাধক ডেভেলাপারের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এরা পরিস্ফুটন কালের তারতম্য করে নেগেটিভের ক্রমায়ণকে নিয়ন্ত্রিত করার

সুযোগ করে দেয়। যেমন দ্রুতি, নিম্ন-দ্রুতি ফিল্মের ক্রমায়ণ সাধারণত অপেক্ষাকৃত উগ্র হয়ে থাকে, পরিস্ফুটনের সাহায্যে তাকে মৃদু করা যায় কেননা পরিস্ফুটন-কাল যত বাড়বে নেগেটিভ ততই উগ্র হবে। অনেকে মনে করেন ফিল্মের আই. এস. এ. মান অর্ধেক হ্রাস পেলে পরিস্ফুটন কাল সিকি ভাগ কমানো উচিত। কারণ উচ্চ দ্রুতির ফিল্ম অপেক্ষা নিম্ন দ্রুতির ফিল্মে সিলভার হ্যালাইডের পরিমাণ কম থাকে এবং কণাগুলিও সূক্ষ্ম হয়।

ফিল্ম পরিস্ফুটন সম্বন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা করলাম। এবার সংক্ষেপে পর্যায়ক্রম হিসাবে সমগ্র পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াটির উল্লেখ করে এই বিষয় শেষ করছি : (১) সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফিল্মটি পরিস্ফুটন ট্যাঙ্কে ভরে নিতে হবে (২) সমস্ত রাসায়নিক মিশ্রণ নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত করে পর পর সাজিয়ে রাখতে হবে। সমস্ত মিশ্রণ ও ধোয়ার জল যাতে একই তাপমাত্রায় থাকে তার ব্যবস্থা করা দরকার। পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সক্রিয় ও কার্যকারী তাপমাত্রা হল ৬০° থেকে ৮০° ফারেনহাইট, সেজন্য সবকিছু এই সীমার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় থাকা চাই । গড় তাপমাত্রা ৬৮° বা ৭০° ফারেনহাইটকে তাই পরিস্ফুটনের কাজে স্বাভাবিক বলে ধরা হয় (৩) রাসায়নিকের নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সঠিক পরিস্ফুটন-কাল নির্ণয় করে ডেভেলাপার ট্যাঙ্কে একটানা ঢেলে দিতে হয়। ফিল্মের গায়ে যাতে বাতাসের বুদ্বুদ তৈরি না হয় সেজন্য ট্যাঙ্কটিকে সামান্য ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। একটি প্রমাণ সাইজ সাধারণ ট্যাঙ্কে একটি ফিল্ম পরিস্ফুটন করার জন্য ৪০০ সি. সি.-র মত ডেভেলাপারের দরকার হয়। ট্যাঙ্কটিকে নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পর পর ঝাঁকানো দরকার। নির্দেশ অপেক্ষা বেশি বা কম ঝাঁকুনি যেন না হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ট্যাঙ্ক থেকে ডেভেলাপার বের করে নিয়ে (৪) ষ্টপ বাথ ট্যাঙ্কে ঢেলে ফিল্মটির পরিস্ফুটন বন্ধ করতে হবে। এক মিনিট পরে ষ্টপ বাথ ফেলে দিয়ে (৫) পটাশিয়ম অ্যালাম মিশ্রিত হাইপো দ্রবণ বা ফিক্সার ট্যাঙ্কে দিয়ে ফিল্মটিকে পাঁচ থেকে দশ মিনিট রাখতে হবে। তবে দু মিনিট পরেই ট্যাঙ্কটি খুলে ফেলা যায়। (৬) ফিক্সিং হয়ে গেলে ওয়াশিং বা ধৌত করণ ফিলমটিকে ট্যাঙ্কে রেখেও ধৌত করা যায়। প্রবহমান জলে অন্তত আধঘণ্টার মত ফিল্মটিকে ধৌত করার পর অবশেষে (৭) কয়েক ফোঁটা ওয়েটিং এজেন্ট মেশানো জলে ফিলমটিকে ডুবিয়ে ধুলো বিহীন কোন স্থানে লম্বা টানটান করে শুকোতে দিতে হবে।

ভালভাবে শুকিয়ে যাবার পর যদি ফিল্মের প্রান্ত ভাগে যে ফ্রেম নম্বর দেওয়া আছে সেগুলো ধূসর ও স্পষ্ট না হয়ে কালো ও অস্পষ্ট দেখা যায় তবে বুঝতে হবে ফিল্মটি ওভার ডেভেলাপড হয়েছে ; সেক্ষেত্রে পরিস্ফুটন সময় বা পরিস্ফুটনের সময় ঝাঁকুনির পরিমাণ কমাতে হবে।

কয়েকটি বিশেষ ধরনের ডেভেলাপার

হাইকনট্রাস্ট ডেভেলাপার

উচ্চ বৈষম্যের ডেভেলাপারের ক্ষেত্রে পরিস্ফুটনের প্রধান উপাদান হল হাইড্রোকুইনন।

সাধারণ M. Q. ডেভেলাপারের তুলনায় হাইড্রোকুইননের পরিমাণকে ছয়গুণ থেকে দশগুণ বৃদ্ধি করে ও দ্রবণকে দুই থেকে চারগুণ বেশি ঘনীভূত করে নেগেটিভের বৈষম্য বাড়ানো সম্ভব। ক্ষারীয় গুণ বৃদ্ধি পেলেও বৈষম্য বাড়ে, ফলে পরিস্ফুটনের দ্রবণে সোডিয়াম কার্বোনেটের বদলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড-এর ব্যবহার হয়। কোডাকের এইচ. সি. ১১০ এই ধরনের ডেভেলাপার ।

ম্যাক্সিমাম এনার্জি ডেভেলাপার

ব্যবহৃত ফিল্মের সর্বাধিক দ্রুতি বের করে আনার জন্য, বিশেষ করে কম আলোকপাত হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে, এই ডেভেলাপারের প্রয়োজন। পাইরো-মেটল এই ধরনের একটি পরিস্ফুটক।

ফাইন গ্রেন ডেভেলাপার

এই ডেভেলাপার কণার আকার বৃদ্ধির প্রবণতাকে প্রতিহত করে এবং তা প্রধানত তিন ধরনের হয়ে থাকে—নর্মাল, লো-এনার্জি, সলভেন্ট। প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষারীয় গুণ হ্রাস করে পরিস্ফুটনের দ্রবণকে ধীরগতিতে ক্রিয়াশীল করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম শক্তিসম্পন্ন ক্ষারীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, এর ফলে ফিলমের কার্যকারী দ্রুতি হ্রাস পায় ও পরিস্ফুটন-কাল যথেষ্ট বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে সিলভার হ্যালাইডের একটি সলভেন্ট ব্যবহার করে কণার আকার বৃদ্ধিকে ভৌতভাবে প্রতিহত করা যায়। বর্তমানে অবশ্য কার্যকারী দ্রুতি ও সূক্ষ্ম কণার সমন্বয়ের জন্য স্বল্প দ্রুতির সূক্ষ্ম কণা ফিলম ব্যবহার করে তাকে দ্রুতগতিতে ক্রিয়াশীল, যথেষ্ট ঘনীভূত দ্রবণে পরিস্ফুট করা হয়। এই প্রকার পরিস্ফুটন দ্রবণ অপেক্ষাকৃত দামী বলে এখানে প্রতিস্থাপক বা রিপ্লেনিশারু-এর বিশেষ ব্যবহার ঘটে।

ডেভেলাপার মিশ্রণের পদ্ধতি

পরিস্ফুটনের বেশির ভাগ উপাদান তাড়াতাড়ি অম্লজানায়িত হয়ে যায় বলে পরিস্ফুটনের দ্রবণ প্রস্তুত করার সময় জলে সবচেয়ে প্রথম সোডিয়াম সালফাইট মেশানো উচিত। তবে সালফাইট দ্রবণে মেটল সহজে মেশানো যায় না বলে মেটল-মিশ্রিত যে কোনো ডেভেলাপার প্রস্তুত করার সময় মেটল আগে মেশাতে হয়। একটি পরিষ্কার কাঁচ বা প্লাষ্টিকের পাত্রে ঈষদুষ্ণ (১২০°—১২৫°ফা.), নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা সিকিভাগ কম জলে মেটল ভালভাবে মেশাবার পর যথাক্রমে সোডিয়াম সালফাইট, হাইড্রোকুইনন, সোডিয়াম কার্বোনেট ও পটাশিয়াম ব্রোমাইড মেশানো হয়। মেশাবার সময় একটি রড দিয়ে মিশ্রণটি নাড়তে হয় ও একটি রাসায়নিক সম্পূর্ণভাবে মিশে গেলে তবেই পরের রাসায়নিকটি মেশাতে হয়। সমস্ত রাসায়নিক মিশ্রিত হয়ে যাবার পর বাকি জল মিশিয়ে মিশ্রণটি নির্দিষ্ট পরিমাণ করা হয়।

ফিল্মের অদ্রব জিলেটিনে তৈরি, ল্যাবরেটরিতে ব্যাকটিরিয়া বিষয়ক গবেষণায় এর ব্যবহার ঘটে। সুতরাং পরিস্ফুটিত নেগেটিভ যথেষ্ট সাবধানে না রাখলে তাতে বীজাণু জন্মে যায়। নেগেটিভ সঞ্চিত করার সময় তিনটে থেকে সাতটা ফ্রেমের এক একটা

ফালি করে কেটে রাখা ভাল। কখনই একক ফ্রেমের নেগেটিভ হিসেবে কাটা উচিত নয়, কেননা তাহলে এনলার্জারে লাগিয়ে কাজ করা অসুবিধা হয়ে পড়ে।

রঙীন ফিল্ম পরিস্ফুটন

রঙীন ফিল্ম পরিস্ফুটন পদ্ধতি সাদা-কালো ফিল্মের তুলনায় এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। তবে ফিলম প্রস্তুতকারকদের প্রস্তাবিত রাসায়নিক ভিন্ন ফিল্ম সঠিকভাবে পরিস্ফুটন করা মুশকিল। রঙীন ফিল্ম পরিস্ফুটনের রাসায়নিক প্যাকে পরিস্ফুটনের যে নিয়মাবলী ও নির্দেশ থাকে তা ঠিকমত অনুসরণ করলে তবেই ভাল মানের নেগেটিভ পাওয়া সম্ভব। এই পরিস্ফুটন দ্রবণ প্রস্তুত করার পর অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়। সেজন্য পরিস্ফুটনের আগে দ্রবণ তৈরি করে নেওয়া ভাল। ব্যবহার করার পর দ্রবণ বাতাসহীন বোতলে ভালভাবে তুলে রাখলে আরও কয়েকদিন তার কার্যক্ষমতা বজায় থাকে। রাসায়নিক দ্রবণ রাখার সময় প্রতিটি দ্রবণ আলাদাভাবে পরিষ্কার বোতলে রাখা উচিত যাতে একটি দ্রবণ অন্য একটি দ্রবণের সংস্পর্শে না আসে। দ্রবণে কোন প্রকার অশুদ্ধি বা ময়লা থাকলে ফিল্ম নষ্ট হয়ে যাবে। রঙীন ফিল্ম পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাদা-কালো নেগেটিভ পরিস্ফুটনের দুটি প্রধান উপায় আছে—পরিদর্শনের সাহায্যে এবং সময় ও তাপমাত্রার মিশ্র পদ্ধতিতে। রঙীন নেগেটিভের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই একমাত্র পদ্ধতি, যা ডেভেলাপারের তাপমাত্রা এবং ফিল্ম কতক্ষণ ডেভেলাপারের সংস্পর্শে থাকবে সেই সময়ের ওপর নির্ভরশীল। ডেভেলাপারের তাপমাত্রা যেন কোন ক্রমেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অপেক্ষা ১/৪° ফা.-এর অধিক কম বা বেশি না হয়।

রঙীন ফিল্ম পরিস্ফুটন পদ্ধতিতে সাতটি পর্যায় । এর মধ্যে চারটি রাসায়নিক দ্রবণের প্রক্রিয়া, দুটি সাধারণ ওয়াশিং ও শেষেরটি ফিল্মকে শুকোনোর কাজ। রাসায়নিক ট্যাঙ্কে ঢালা শুরু হতেই সময়ের হিসাব আরম্ভ হয় এবং সময়ের হিসাবের মধ্যে দশ সেকেণ্ড রাসায়নিক ট্যাঙ্ক থেকে বের করার জন্য ধরা থাকে। যার অর্থ নির্দিষ্ট সময় শেষ হবার দশ সেকেণ্ড আগে থেকেই ট্যাঙ্ক থেকে দ্রবণ বের করার কাজ শুরু করতে হবে। কাজ করার পর প্রতিটি দ্রবণ ট্যাঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেওয়া চাই। পরিস্ফুটনের দ্রবণটির তাপমাত্রা কাজের সময় ১০০° ±১/৪° ফা. থাকা দরকার। অন্যান্য দ্রবণ ও জলের তাপমাত্রা ৭৫° থেকে ১০৫° ফা. বা ২৪° থেকে ৪০.৫° সে.) হলেও চলে। পরিস্ফুটন আরম্ভ করার দশ মিনিট আগে দ্রবণের পাত্রগুলি ও ফিল্ম ভরা ট্যাঙ্কটি যদি ১০০.৫° ফা. তাপমাত্রা বিশিষ্ট জলে বসিয়ে রাখা যায় তবে কাজের সময় ডেভেলাপারের তাপমাত্রা ১০০° ফা-এ পেতে অসুবিধা হয় না। তবে ঐ জলের উচ্চতা যেন দ্রবণের শীর্ষদেশ অবধি হয়। ট্যাঙ্কে ডেভেলাপার ঢালার পর, ট্যাঙ্কটি ৩০ সেকেণ্ড ঝাঁকানো দরকার। তারপর অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতি ১৩ সেকেণ্ড ব্যবধানে ২ সেকেণ্ড করে ঝাঁকুনি দেওয়া প্রয়োজন। ঝাঁকুনির সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় ট্যাঙ্কটি প্রয়োজনে পূর্বোক্ত গরম (১০০.৫° ফা.) জলের মধ্যে রাখা যেতে পারে। পরিস্ফুটনের সাতটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথম দুটি—পরিস্ফুটন ও ব্লিচিং—শেষ হয়ে যাবার পর ট্যাঙ্কের ঢাকনি

খুলে সাধারণ ঘরের আলোতেও বাকি কাজ করা যায়। রঙীন ফিল্‌ম পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে সিলভার হ্যালাইড অবদ্রবকে নিয়ে এক গুচ্ছ বিশেষ ক্রিয়া সংঘটিত হয়। চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি গঠিত হয় পরিস্ফুটিত সিলভারে নয়, তিনটি ডাইয়ের সমন্বয়ে। অবদ্রবের প্রতিটি স্তরে ডাইয়ের সংগঠন ও মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় পরিস্ফুটিত সিলভারের দ্বারাই কিন্তু পরে সিলভার নিজে প্রতিচ্ছবি থেকে অপসারিত হয়ে যায়।

সি-৪১ রাসায়নিকে কোডাকলার ১০০ এ. এস. এ. ও ৪০০ এ. এস.এ. ফিল্‌মের পরিস্ফুটনের ক্রমপর্যায় দেখানো হল :

পর্যায়	সময়	তাপমাত্রা	প্রাথমিক ঝাঁকানি	পরবর্তী ঝাঁকানি
(১) ডেভেলাপিং	৩মি. ১৫সে.	১০০° ± ১/৪° ফা. ৩৭.৮° ± ০.১৫° সে.	৩০ সেকেণ্ড	প্রতি ১৩ সে. অন্তর ২ সে. করে
(২) ব্লিচিং	৬মি. ৩০সে.	৭৫°–১০৫° ফা. ২৪°–৪০.৫° সে.	৩০ সেকেণ্ড	প্রতি ২৫ সে. অন্তর ৫ সে. করে
এর পর ট্যাঙ্কের ঢাকনি খোলা যেতে পারে				
(৩) ওয়াশিং	৩মি. ১৫সে.	৭৫°–১০৫° ফা. ২৪°–৪০.৫° সে.	—	—
(৪) ফিক্সিং	৬মি. ৩০সে.	ঐ	৩০ সেকেণ্ড	প্রতি ২৫ সে. অন্তর ৫ সে. করে
(৫) ওয়াশিং	৩মি. ১৫সে.	ঐ	—	—
(৬) স্টেবিলাইজিং	১মি. ৩০সে.	ঐ	৩০ সেকেণ্ড	—
(৭) শুকোনো	১০ থেকে ২০ মিনিট	ঐ	—	—

মুদ্রণ

ক্যামেরার সাহায্যে ফিল্‌মে ছবি তোলা এবং সেই ফিল্‌ম পরিস্ফুটনের পর মুদ্রণ বা প্রিন্টিং হল ফোটোগ্রাফির তৃতীয় ও শেষ পর্যায়। পরিস্ফুটিত ফিল্‌মে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তা মূল বস্তুর বিপরীত অর্থাৎ এতে উজ্জ্বল আলোকিত অংশ কালো ও অনালোকিত অন্ধকার অংশ স্বচ্ছ দেখায়। এই বৈপরীত্যের জন্য এই প্রতিচ্ছবিকে বলা হয় নেগেটিভ। বস্তুর সঠিক ছবির জন্য নেগেটিভ থেকে মুদ্রণ করে পজিটিভ প্রতিচ্ছবি পেতে হয়।

ফোটোপ্রিন্ট যে কোন আলোক সংবেদনশীল বস্তুর ওপর করা গেলেও সাধারণত তা করা হয়ে থাকে আলোক-সংবেদনশীল কাগজ (চকচকে বা খসখসে বা অন্য কোন প্রকারের) অথবা ফিল্‌ম (সেলুলোজ ট্রাইঅ্যাসিটেট বা সিন্‌থেটিক পলিমার) অথবা প্লেটের (সিলিকা বা জৈব কাঁচ) ওপর। নেগেটিভের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলো কাগজ বা ফিল্‌ম বা প্লেটের অবদ্রবের ওপর যে লীন প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে তা পরিস্ফুটন করে প্রিন্ট পাওয়া যায়। নেগেটিভের মধ্য দিয়ে দুভাবে আলোকপাত করে দুরকম প্রিন্ট পাওয়া যায়—কন্‌ট্যাক্ট প্রিন্ট ও প্রোজেকশন্‌ প্রিন্ট।

কন্‌ট্যাক্ট প্রিন্ট

এর জন্য ব্যবহার করা হয় আলোক-সংবেদনশীল কাগজ। এই কাগজের ভূমি হিসেবে থাকে ব্লিচ্‌ করা বা না-করা সালফাইট বা সালফেট সেলুলোজ থেকে প্রস্তুত বিশেষ এক ধরনের কাগজ যার বিভিন্ন দৃক্‌গত ও বলবিদ্যক বৈশিষ্ট্য থাকে। এই আলোক-সংবেদনশীল কাগজের ওপর নেগেটিভকে এমন প্রত্যক্ষভাবে রাখা হয় যাতে কাগজের ও নেগেটিভের অবদ্রবের মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে। এর পর নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলোক সঞ্চারণ করে কাগজের ওপর প্রাপ্ত লীন প্রতিচ্ছবি ফিল্‌মের মত পরিস্ফুটন করে নিলেই কন্‌ট্যাক্ট প্রিন্ট পাওয়া যায়। নেগেটিভের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সৃষ্ট এই প্রিন্ট একমাত্র নেগেটিভের মাপেই পাওয়া সম্ভব। প্রিন্টের রঙ সাধারণত হয় কালো, কিন্তু বিশেষ টোনের কাগজ ও টোনার ব্যবহার করে প্রিন্টকে অন্যান্য রঙেও রঞ্জিত করা সম্ভব। কন্‌ট্যাক্ট মুদ্রণের কাজে বিশেষ কোন কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় না। এই কাজের জন্য বাজারে যে প্রিন্টিং ফ্রেম ও প্রিন্টিং বক্স (প্রচুর মুদ্রণের জন্য প্রিন্টিং মেশিনও) পাওয়া যায় তার মধ্যে নেগেটিভ ও কাগজ পরপর রেখে সমানভাবে চাপ দিয়ে ধরার ব্যবস্থা করা থাকে। ফ্রেমে মুদ্রণের সময় ঘরের সাধারণ আলোর সাহায্যেই আলোকপাত করতে হয়। অপরদিকে আলোকপাতের জন্য প্রিন্টিং বক্সের মধ্যেই আলোর ব্যবস্থা থাকে। আলোকপাতের সময় নির্ভর করে কাগজের দ্রুতি, নেগেটিভের ঘনত্ব এবং নেগেটিভ থেকে আলোর উৎসের দূরত্বের ও আলোর শক্তির ওপর। একাধিকবার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এইসময় নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। কন্‌ট্যাক্ট মুদ্রণের জন্য যে কাগজ ব্যবহার করা হয় তার দ্রুতি অত্যন্ত কম। আলোক-সংবেদনশীল উপাদান হিসাবে এই কাগজে সিলভার ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়। এই কাগজের ক্ষেত্রে ডার্করুমে উজ্জ্বল হলুদ আলো নিরাপদ আলো রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। আগেকার দিনে এই কাগজ গ্যাসলাইট কাগজ নামে পরিচিত ছিল। বড় আকারের নেগেটিভ থেকে কন্‌ট্যাক্ট মুদ্রণ তখন খুবই প্রচলিত ছিল। আজকাল কন্‌ট্যাক্ট মুদ্রণের জন্য এক ধরনের কাগজ বেরিয়েছে যার অবদ্রবের মধ্যে পরিস্ফুটনের উপাদান দেওয়া থাকে। এই কাগজ রোলার-প্রোসেসরে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে যায়।

কন্‌ট্যাক্ট প্রিন্টে ছবির সামগ্রিক টোনের মাত্রা কিছুটা হেরফের করা গেলেও আর কোনভাবে ছবিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এই প্রিন্ট সাধারণত ছবি ভালভাবে পরীক্ষা

করার জন্য ও পরবর্তী রেফারেন্সের প্রয়োজনে ফাইলে রাখার জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে একটি বড় আকারের কাগজের ওপর কয়েকটি ফিল্‌মস্ট্রিপ একসঙ্গে রেখে মুদ্রণের কাজ করা হয়। কোন নেগেটিভ বিবর্ধন করার আগে তার কন্‌ট্যাক্ট প্রিন্টটি একটি আতস কাঁচের সাহায্যে ভালভাবে পরীক্ষা করে নিলে বিবর্ধনের কাজে সুবিধা হয়।

প্রোজেক্‌শন্ প্রিন্ট

নেগেটিভ প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলো বিবর্ধক যন্ত্রের লেন্‌সের সহায্যে আলোক সংবেদনশীল কাগজের অবদ্রবের ওপর ফেলে প্রোজেক্‌শন্ প্রিন্টিং করা হয়। নেগেটিভ থেকে মুদ্রণের কাগজের দূরত্বের দরুন এই প্রিন্ট কনট্যাক্ট প্রিন্টের মত শুধুমাত্র নেগেটিভের নির্দিষ্ট মাপেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজন মত সমগ্র নেগেটিভ থেকে অথবা নেগেটিভের যে কোন অংশ থেকে যে কোন মাপে মুদ্রণ করা যেতে পারে। বৃহদাকারের জন্য মুদ্রণের এই পদ্ধতি বিবর্ধন বা এন্‌লার্জিং নামে অধিকতর পরিচিত। চূড়ান্ত ছবির ক্ষেত্রে বিবর্ধন বা বিবর্ধক যন্ত্রটির গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। মনোমত ছবি পাবার জন্য একজন আলোকচিত্রী লেন্‌স, শাটার ইত্যাদির সাহায্যে যেমন তাঁর ক্যামেরাকে এবং ডেভেলাপারের সাহায্যে নেগেটিভকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনি বিবর্ধক যন্ত্রটির সাহায্যে তাঁর ছবির মুদ্রণকেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। যদিও বিবর্ধকের প্রধান কাজ হল বৃহৎ আকারের ছবি তৈরি করা, তবু নেগেটিভের সমান আকারের বা তার চেয়েও ছোট মাপের ছবি এর সাহায্যে তৈরি করা সম্ভব। আলোকপাতের সঠিক সময় পরীক্ষা বা গণনার দ্বারা নির্ণয় করার জন্য মূল বিবর্ধনের আগে এক্সপোজার টেস্ট করে নেওয়া দরকার। বিবর্ধক যন্ত্রে বিবর্ধনের সময় যাতে কোন কাঁপুনি না হয় সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখারও দরকার। খুব বড় আকারের প্রিন্ট তৈরির সময় আলোকপাতের সময় অনেক বাড়াতে হয় বলে (কেননা লেন্‌স ও মুদ্রণের কাগজের মধ্যে দূরত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে আলোকপাত চারগুণ বৃদ্ধির দরকার হয়) আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেশি থাকে। সুতরাং আলোকপাতের সময় কম রেখে অন্য কোন উপায়ে আলোকপাত বাড়ানো যায় — যেমন এন্‌লার্জিং লেন্‌সের অ্যাপারচার বাড়িয়ে বা উৎসের আলোকের শক্তি বৃদ্ধি করে।

ছবি তোলার সময় নানা কারণে ছবির অনেক কিছু আলোকচিত্রীর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। যেমন বস্তুর বিভিন্ন অংশের আলোকমাত্রার অনুপাত ঠিক হয় না বা কোন কোন অনুপুঙ্খ অবাঞ্ছনীয় ভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে মুদ্রণের সময় টোনের মাত্রা বা অনুপুঙ্খের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন করে আলোকচিত্রী তাঁর পছন্দ অনুসারে ছবি মুদ্রণ করে নিতে পারেন। ছবির মুদ্রণকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন আলোকচিত্রী যেসব কলাকৌশলের আশ্রয় নেন তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল—

বিবর্ধন (Enlarging)

এর সাহায্যে ছবিকে যে কোন আকারে মুদ্রণ বা যেমন ভাবে ইচ্ছা কম্পোজ করা যায়।

বর্গাকার বা আয়তাকার নেগেটিভ থেকে সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে অনুভূমিক বা উল্লম্ব, চৌকো বা গোল, অথবা অন্য যে কোন ভাবে ছবিকে কম্পোজ করা যেতে পারে। এছাড়া নেগেটিভের যে কোন অংশকে বিবর্ধিত করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবিও অনায়াসেই করে নেওয়া যায়। দৃষ্টিকটু কণাময়তা ব্যতিরেকে নেগেটিভকে ২০ থেকে ৩০ গুণ পর্যন্ত বিবর্ধিত করা সম্ভব।

ডজিং (Dodging)

শেডিং ও স্পট প্রিন্টিং-এর সাহায্যে মুদ্রণকে স্থান বিশেষে নিয়ন্ত্রিত করা ডজিং নামে পরিচিত। বিবর্ধক যন্ত্রের অভিক্ষিপ্ত আলো নেগেটিভের মধ্য দিয়ে মুদ্রণের কাগজের ওপর পড়ার সময় সেই আলোকে স্থানবিশেষে প্রতিরোধ করে ছবির কোন কোন অংশে আলোকপাত কমানো হয়। এই কাজের জন্য কয়েকটি খুব সরু অথচ শক্ত যে কোন ধরনের দণ্ডের প্রত্যেকটির আগায় কয়েকটি ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের কার্ডবোর্ড কেটে লাগিয়ে নেওয়া হয় যাতে আলোকপাতের সময় এর যে কোন একটি বা প্রয়োজনে একাধিক, লেন্স ও কাগজের মধ্যে অভিক্ষিপ্ত আলোর পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, প্রয়োজনীয় আকৃতির ছায়া সৃষ্টি করতে পারে। সামান্য অভ্যাসের পর আলোকপথে দুহাতের আঙ্গুলের নানা ভঙ্গিমার মাধ্যমে বিভিন্ন আকৃতির ছায়া সৃষ্টি করেও এই কাজ ভালভাবে করা সম্ভব। ডজিংয়ের সাহায্যে নেগেটিভের টোনের মাত্রা পরিবর্তন করে ছবিতে টোনের সমতা আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। ডজিংয়ের সময় প্লাষ্টিক জাতীয় অর্ধস্বচ্ছ বস্তু বা কোঁচকানো দোমড়ানো সেলোফেন কাগজ ব্যবহার করে স্থান বিশেষের তীক্ষ্ণতাও অনেক কমিয়ে দেওয়া যায়।

বার্নিং-ইন (Burning-in)

প্রিন্টের স্থানবিশেষে আলোকপাতের পরিমাণ বাড়িয়ে ছবির সেইসব অংশকে অধিকতর কালো করে দেওয়া বার্নিং-ইন নামে পরিচিত। আসলে এটিও এক ধরনের ডজিং, একটিতে অংশ বিশেষে ছায়াপাত করা হয়, অপরটিতে আলোকপাত বাড়ানো হয়। নির্দিষ্ট অংশে আলোকপাত বাড়াবার জন্য একটি বড় কার্ডবোর্ডের মধ্যে অসমান গোলাকার ছিদ্র করে নিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। হাতের সাহায্যেও মোটামুটি গোলাকার ভাবে নির্দিষ্ট স্থানে আলোকপাত করা যায়। ধোঁয়াটে আলো ব্যবহার করেও বার্নিং-ইনের কাজ করা সম্ভব। সাধারণত ছায়াবৃত অংশের জন্য ডজিং ও আলোকিত অংশের জন্য বার্নিং-ইনের প্রয়োজন। খেয়াল রাখতে হবে ডজিং বা বার্নিং-এর বস্তু যেন কোন সময়েই সম্পূর্ণ স্থির না থাকে, বস্তুটি সব সময় সচল রাখা দরকার যাতে ছবিতে অংশ বিশেষের সীমারেখা তীক্ষ্ণ হয়ে ধরা না পড়ে।

ভিনিয়েটিং (Vignetting) :

ছবির অন্তর্গত মূল বস্তুর চারপাশ ক্রমশঃ সমানভাবে কম বা বেশি আবছা করে দেওয়ার কৌশলকে ভিনিয়েটিং বলে। অনেক সময় মূল ছবির চারপাশের অনাবশ্যক অনুপুঙ্খকে বা অবাঞ্ছিত পটভূমিকে বাদ দেওয়ার জন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার ঘটে। বার্নিং-ইনের

জন্য যে ছিদ্রযুক্ত কার্ডবোর্ড ব্যবহার করা হয় তা ধীরে ধীরে ওপর নিচ করে অথবা দুই হাতের আঙুলের সাহায্যে ফাঁক ধারাবাহিক ভাবে বড় বা ছোট করে ভিনিয়েটিং ভালভাবেই করা সম্ভব। ভিনিয়েটিং দু রকমের হতে পারে—ছবির চারধার গাঢ় কালো থেকে মধ্যের মূল বস্তুর দিকে ক্রমশঃ হালকা হয়ে যাবে অথবা মধ্যের মূল বস্তু থেকে ক্রমশঃ হালকা হতে হতে ছবির চারধার সাদা হয়ে যাবে।

মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণের আরও বহুবিধ কৌশলের মধ্যে ফ্ল্যাশিং (flashing) বহুল প্রচলিত। ছবির একটি ছোট অংশ ওভার-এক্সপোজ করে সম্পূর্ণ কালো করার প্রয়োজনে এর ব্যবহার। এজন্য বিবর্ধক যন্ত্র থেকে নেগেটিভ খুলে ফেলে মুদ্রণের কাগজের নির্দিষ্ট স্থানে সরাসরি আলো ফেলে কিংবা সরু টর্চের মুখে চোঙাকৃতি কালো কাগজ লাগিয়ে পেনসিলের মত সরু আলোর শিস মুদ্রণের কাগজের ওপর দিয়ে বুলিয়ে এই কাজ করা হয়ে থাকে। স্পট প্রিন্টিং-এর সময় প্রতিচ্ছবির বিভিন্ন অংশের টোন তাদের ঘনত্ব অনুপাতে কমবেশি কালো হয় কিন্তু ফ্ল্যাশিং-এর সময় ছবির নির্দিষ্ট অংশের পুরোটাই সমানভাবে কালো হয়ে পড়ে। মূল নেগেটিভের সঙ্গে অন্য একটি স্ক্রীন নেগেটিভ ব্যবহার করা অথবা দুটি বা ততোধিক নেগেটিভের প্রতিচ্ছবি একই কাগজের ওপর মুদ্রণ করা প্রভৃতিও অভিক্ষেপ মুদ্রণের নানাবিধ কৌশল। স্থিরচিত্র মুদ্রণ মূলত এই প্রোজেকশন প্রিন্টিং, কিন্তু চলচ্চিত্রের মুদ্রণকর্ম সাধারণত কনট্যাক্ট প্রিন্টিং (ব্লো আপ বা রিডাকশন প্রিন্টের ক্ষেত্র ছাড়া)।

মুদ্রণের কাগজ

মুদ্রণের কাগজের গঠন মোটের ওপর ফিল্মের মতই, কেবল সংবেদনশীলতা অনেক কম ও হ্যালাইড দানাগুলি আকারে অধিকতর ছোট ও সূক্ষ্ম। মুদ্রণের কাগজে যে আলোক-সংবেদনশীল অবদ্রব লাগানো হয় তা ক্লোরাইড অবদ্রব (মূলত কনট্যাক্ট প্রিন্টের জন্য) অথবা ব্রোমাইড অবদ্রব (প্রধানত বিবর্ধনের জন্য)। ক্লোরাইড অবদ্রবের তুলনায় ব্রোমাইড অবদ্রবের দ্রুতি বা সংবেদনশীলতা বহুগুণ বেশি। এই দুই উপাদানের মিশ্রণে প্রস্তুত ব্রোমো-ক্লোরাইড বা বিশেষত ক্লোরো-ব্রোমাইড অবদ্রবও মুদ্রণের কাগজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আলোক-সংবেদনশীল অবদ্রব মুদ্রণের কাগজে হয় সরাসরি লাগানো হয় অথবা কাগজকে অধিকতর সাদা করার জন্য ব্যারাইট-এর একটি রাসায়নিক প্রলেপ মাখিয়ে নিয়ে অবদ্রব লাগানো হয় ও তার উপরে একটি সুপারকোট লাগিয়ে কাগজকে চকচকে করা হয়। বর্তমানে প্লাষ্টিক কাগজ নামে প্রচলিত রেজিন কোটেড মুদ্রণের যে কাগজ পাওয়া যায় তাতে ব্যারাইট ব্যবহার করা হয় না, পরিবর্তে কাগজের উভয় দিকে পলিথিন ল্যামিনেশন করে অবদ্রব লাগানো ও তার উপরে সুপারকোট ব্যবহার করা হয়। কাগজ অনুসারে অবদ্রবের স্তরের বেধ হয় ১০ থেকে ১৫ মাইক্রন। মুদ্রণের কাগজকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে—সাধারণ ব্যবহারের জন্য এবং বিশেষ প্রাযুক্তিক কর্মের জন্য। সাধারণ ব্যবহারের কাগজ বর্ণালির নীল ছাড়া আর কোন রঙের প্রতি সংবেদনশীল নয়, সেজন্য ডার্করুমে হলুদাভ সবুজ বা কমলা রঙের আলো নিরাপদ আলো হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

সাধারণ ব্যবহারের জন্য মুদ্রণের কাগজ চেহারা অনুসারে তিন ধরনের হয়ে থাকে —চকচকে (glossy), খসখসে (mat) , আধা খসখসে, (semi-mat) এবং তা বৈষম্য অনুসারে ছয়টি গ্রেডে প্রস্তুত করা হয়—extra soft (০ নং), soft(১ নং), special (২ নং), normal(৩ নং) hard(৪ ও ৫ নং), ultra hard(৬ ও ৭ নং)। সাধারণভাবে কোন্ বৈষম্যের নেগেটিভ কোন্ গ্রেডের কাগজে মুদ্রণ করা ভাল তার তালিকা দিলাম:

নেগেটিভের বৈষম্য	কাগজের গ্রেড
খুব কম	আলট্রা হার্ড
কম	হার্ড
মাঝারি	নর্মাল
অধিক	সফ্ট
অত্যধিক	এক্সট্রা সফট

কম বৈষম্যের নেগেটিভ বিবর্ধনের সময় আলোকপাতও কম হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য আলোকচিত্রী তাঁর পছন্দ মত যে কোন বৈষম্যের নেগেটিভ যে কোন গ্রেডের কাগজে মুদ্রণ করে ছবিতে ভিন্ন রূপ আনতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার কাগজের নিজস্ব ক্রমায়ণ প্রিন্টের চূড়ান্ত ক্রমায়ণকে যেমন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি ব্যবহৃত ফিলমের নেগেটিভ-অবদ্রবের অন্তর্নিহিত ক্রমায়ণ-ক্ষমতাও (ফিল্মে দ্রুতি যত বেশি হবে গ্রেড তত সফ্ট হবে) মুদ্রণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, ফলে আলোকচিত্রী একেবারে নিজের ইচ্ছেমত কিছু করতে পারেন না। মুদ্রণের কাগজের এই কয়টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষত্ব থাকতে পারে, যেমন কাগজ হালকা (single weight) বা ভারী (double weight) এবং তার উপরিভাগ সমতল বা টেক্সচার-সমন্বিত। সাদার পরিবর্তে হালকা রঙের কাগজও প্রস্তুত হয়। মুদ্রণের কাগজ পাওয়া যায় রোল হিসাবে অথবা বিভিন্ন মাপে (৬ × ৯ সি. মি. থেকে ৫০ × ৬০ সি. মি.) ১০, ২০, ৫০ বা ১০০টা শিটের প্যাকেটে। কোন একক বর্ণে রঞ্জিত প্রিন্ট পেতে হলে কাগজের অবদ্রবের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ অজৈব অ্যাসিড ও তার লবণ মিশ্রিত থাকা দরকার। যেমন সাদা-কালো প্রতিচ্ছবির টোনিং-এর জন্য ব্লিচিং উপাদানের প্রয়োজন।

নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলোকপাত করে কাগজের ওপর প্রাপ্ত লীন প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য মুদ্রণের কাগজকে ডেভেলাপারে পরিস্ফুটন করে নিতে হয়। পরিস্ফুটনের পদ্ধতি ঠিক ফিল্ম পরিস্ফুটনের মতই এবং রাসায়নিকও প্রায় একই। কেবল উপাদানের অনুপাতে তারতম্য হয়ে থাকে। ডেভেলাপার নির্বাচন ও তার অন্তর্গত বিভিন্ন রাসায়নিকের অনুপাত নির্ধারণ কিছুটা মুদ্রণের কাগজের ধরনের ওপরও নির্ভর করে। প্রিন্টের পরিস্ফুটন সর্বদাই পরিদর্শনের মাধ্যমে করা হয় এবং তার ক্রমপর্যায়টি এইরূপ —পরিস্ফুটন, ষ্টপ বাথ, স্থায়ীকরণ, ধৌতকরণ ও শুকোনো।

কোন বড় আকারের ছবি বিবর্ধন করার সময়, যে মাপে ছবি হবে সেই মাপে ইজেল প্রস্তুত করে লেন্স ফোকস করে নিতে হবে। কাগজের ওপর আলোকপাতের

সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য নমুনা হিসাবে খানিকটা টুকরো কাগজ ইজেলের ওপর রেখে মধ্যবর্তী লেন্স-অ্যাপারচারে অনুমানমত আলোকপাত ও তার পরিস্ফুটন করে দেখে নিতে হবে। নমুনা কাগজটিকে অন্তত দেড় মিনিট পরিস্ফুটন করে যদি দেখা যায় ছবি খুব হালকা দেখাচ্ছে তবে আলোকপাতের সময় আরও বাড়াতে হবে অথবা লেন্স-অ্যাপারচার বড় করতে হবে। অপর দিকে ছবি যদি বেশি কালো দেখায় তবে আলোকপাতের সময় কমানো অথবা অ্যাপারচার ছোট করা দরকার। ছবিতে টোনের মাত্রা ঠিক থাকলে আলোকপাত সঠিক হয়েছে বলে ধরা যায়।

নমুনা প্রিন্ট বিচার করার ভাল উপায় হল ছবির সর্বাপেক্ষা আলোকিত ও ছায়াবৃত অংশের অনুপুঙ্খ তুলনা করা। ছবিতে আলোকিত অংশের অনুপুঙ্খ যদি স্পষ্ট থাকে তবে আলোকপাত ঠিক হয়েছে, যদি না থাকে তবে বুঝতে হবে আলোকপাত আরও বাড়ানো দরকার। আবার ছায়াবৃত অংশের অনুপুঙ্খ যদি ভালভাবে দেখতে না পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে আলোকপাত বেশি হয়ে গেছে, তা কমানো দরকার। যদি দেখা যায় আলোকিত ও ছায়াবৃত অংশের অনুপুঙ্খ ঠিক থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ছবিতে ঔজ্জ্বল্যের অভাব বা ধোঁয়াটে ভাব, তাহলে বোঝা যাবে কাগজের ক্রমায়ণ কম হয়েছে, সেক্ষেত্রে আরও অধিক ক্রমায়ণের কাগজ ব্যবহার করা দরকার। আবার নেগেটিভের বৈষম্যের তুলনায় কাগজের ক্রমায়ণ অধিক হলে আলোকিত বা ছায়াবৃত কোন অংশের অনুপুঙ্খই স্পষ্ট হবে না। মুদ্রণের কাগজ সর্বাধিক যে বৈষম্যকে ছবিতে ধরতে পারে তার অনুপাত মোটামুটি ৫০:১।

কয়েকদিন অভ্যাসের পর মুদ্রণের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে আসে। প্রিন্ট পরিস্ফুটনের জন্য বাজারে প্রচলিত বহু ডেভেলাপার ও ফিক্সার নির্দেশ অনুসারে তৈরি করে নিয়ে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। একটি ইউনিভার্সাল ডেভেলাপারের সংগঠন সূত্র—রাসায়নিক সংগঠন (Chemical Formulae)-এ দেওয়া হয়েছে। এই দ্রবণটি তৈরি করে রঙীন শিশিতে সাবধানে রেখে দিলে বহুদিন থাকে, নষ্ট হয় না। বাতাসের সংস্পর্শে যত কম আসবে, তত বেশি দিন থাকবে। সেজন্য যতদূর সম্ভব শিশি ভর্তি করে দ্রবণটি রাখা উচিত। ব্যবহার করার ফলে পরিমাণে কমে গেলে অপেক্ষাকৃত ছোট শিশিতে রেখে বাতাসের অংশ কমিয়ে দেওয়া যায়। প্রতিবার কাজ করার আগে এই দ্রবণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় অনুপাতে জল মিশিয়ে কার্যকারী দ্রবণ প্রস্তুত করে পরিস্ফুটন করতে হয়। কাজ করার পর কার্যকারী দ্রবণ ফেলে দেওয়া দরকার।

খুব বড় আকারের প্রিন্ট পরিস্ফুটনের বেলায় উপযুক্ত মাপের পরিস্ফুটন ডিশ পাওয়া মুশকিল বলে বিশেষ কায়দায় পরিস্ফুটন করতে হয়। যার ফলে প্রিন্টের উপরিভাগ অধিকাংশ সময়েই বাতাসের সংস্পর্শে থাকে। সুতরাং সহজেই অম্লজানান্বিত হয়ে যায় এমন ডেভেলাপার—যেমন যার মধ্যে হাইড্রোকুইনন এবং অ্যালকালির পরিমাণ বেশি—এক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। গ্লিসিনের (glycin) মত ডেভেলাপার এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত।

পরিস্ফুটনের পর স্থায়ীকরণের আগে প্রিন্টটি ষ্টপ বাথে ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তাহলে স্থায়ীকরণের দ্রবণ অধিক সংখ্যক প্রিন্টকে স্থায়ী করতে পারবে। কাগজের সঙ্গে লেগে থাকা তরল ডেভেলাপার যাতে স্থায়ীকরণের দ্রবণে না চলে যায় সেই জন্যই ষ্টপ বাথের প্রয়োজন। সাধারণ পরিষ্কার জল দিয়েও এই কাজ করা যায়, তবে অ্যাসিড মিশ্রিত জল ব্যবহার করাই ভাল। ৩ ভাগ গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে ৮ ভাগ জল মিশিয়ে ২৮% অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। তা ১ লিটার জলে ৪৮ সি. সি. মিশিয়ে নিলেই ষ্টপ বাথ তৈরি হয়ে যায়। প্রিন্টটি এই বাথে ৫ থেকে ১০ সেকেণ্ড ধোয়া দরকার।

স্থায়ীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কাজটি ভালভাবে না করলে ছবি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। মুদ্রণের কাগজ ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে স্থায়ী করা দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রিন্টগুলি পরস্পারের গায়ে লেগে না থাকে। স্থায়ীকরণের পর প্রিন্টগুলি খুব ভালভাবে ধুয়ে নিতে হয়। কাগজের গায়ে হাইপো দ্রবণ লেগে থাকলে ছবি পরে নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ ব্রোমাইড কাগজের প্রিন্ট প্রবহমান জলে অন্তত একঘন্টা ধোয়া উচিত। প্রবহমান জলের অভাবে বারবার জল পালটে ধুলেও চলে। রেজিন কোটেড কাগজ বস্তুত জল প্রতিরোধী, সেজন্য স্থায়ীকরণের পর সামান্য ধুয়ে নিলেই সম্পূর্ণ রাসায়নিক মুক্ত হয়ে যায়। প্রিন্ট ভালভাবে ধোয়ার পর খসখসে কাগজ হলে পরিষ্কার সাদা কাপড়ের ওপর উপুড় করে রেখে হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হয়। চকচকে কাগজ হলে বৈদ্যুতিক গ্লেজিংযন্ত্রে মিনিট দশেকের মধ্যে শুকিয়ে চকচকে হয়ে যায়। রেজিন কোটেড কাগজ গরম হাওয়ায় শুকিয়ে নিলে আপনিই চকচকে হয়ে পড়ে।

যে সমস্ত ত্রুটির ফলে প্রিন্টের গুণমান প্রায়শ ব্যাহত হয় তা হল কালোর অনুজ্জ্বলতা, বেঠিক টোন, ফগিং ও অস্পষ্টতা। কালোর বিবর্ণতা একাধিক কারণে হতে পারে—বেঠিক আলোকপাত, পুরনো মুদ্রণের কাগজ, পরিস্ফুটনে ত্রুটি বা ভুল ডেভেলাপার ব্যবহারের দরুন। নেগেটিভের তুলনায় বেশি সফট বা বেশি হার্ড মুদ্রণের কাগজ ব্যবহার বেঠিক টোনের কারণ হতে পারে। ফগিং সাধারণত হয় নিখুঁত পরিস্ফুটনের অভাবে ও প্রিন্টের ওপর বিক্ষিপ্ত আলো এসে পড়ার ফলে। আর বিবর্ধনের সময় এনলার্জারের কম্পন বা এনলার্জিং লেনসের ত্রুটিপূর্ণ ফোকসিং এবং লেনসেজমে থাকা ময়লা বা জলীয় বাষ্প অস্পষ্টতার জন্য দায়ী। ত্রুটির এইসব সম্ভাবনার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে উন্নতমানের প্রিন্ট পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। বস্তুত একজন উৎসাহী আলোকচিত্রী তাঁর দক্ষতা কল্পনা ও নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে শুধু তাঁর মনের মত মুদ্রণের কাজ করতে পারেন তাই নয়, তিনি তাঁর ছবিতে প্রয়োজনমত বিভিন্নভাবে বাস্তবের বহু পরিবর্তনও ঘটাতে পারবেন।

রঙীন ছবির মুদ্রণ

রঙীন ছবি মুদ্রণের মূল পদ্ধতি সাদা-কালো ছবির মুদ্রণের মতই। তবে রঙীন ফিল্মে ছবি যত নিখুঁত আলোতেই তোলা হোক না কেন, নেগেটিভ থেকে সরাসরি মুদ্রণ করলে

সঠিক রঙ কিছুতেই পাওয়া যায় না। সেজন্য মুদ্রণের সময় রঙীন ফিল্টার ব্যবহার করে প্রিন্টের বর্ণবিন্যাসে সমতা আনার প্রয়োজন হয়। রঙীন ছবি মুদ্রণের জন্য বিবর্ধক যন্ত্রে ফিল্টার ছাড়া আর যা দরকার তা হল সাধারণ ফ্লুয়োরেসেন্ট আলোর বদলে টাংস্টেন ল্যাম্প, উত্তাপশোষণকারী কাঁচ, ইউ. ভি. ফিল্টার, আলোকপাতের সময় নির্দেশের জন্য একটি টাইমার, মুদ্রণের কাগজ ধরার জন্য একটি হোল্ডার ও একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। আলোর উৎসের ভোল্টেজ ক্রমাগত পরিবর্তিত হলে আলোর বর্ণ ও তীব্রতায় যে প্রভাব পড়ে তার ফলে ছবির রঙে পরিবর্তন ঘটে যায়, সেই কারণে ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এই স্টেবিলাইজারের দরকার। রঙীন ছবির মুদ্রণ উন্নত করার জন্য এনলার্জারের অ্যানাস্টিগম্যাট লেনসগুলি কোটেড হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এই মুদ্রণকর্ম সমাধা করতে হয় সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

রঙীন ছবি দুটি পদ্ধতিতে মুদ্রণ করা যেতে পারে—যুত পদ্ধতি ও বিযুত পদ্ধতি। যুত পদ্ধতিতে মুদ্রণ করতে হলে প্রাথমিক রঙের তিনটি ফিলটার অর্থাৎ নীল, সবুজ ও লাল প্রয়োজন। মুদ্রণের সময় তিন রঙের ফিলটারের মধ্য দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তিনবার আলোকপাত করতে হয় বলে পদ্ধতিটি সময়সাপেক্ষ। সাধারণ বিবর্ধক যন্ত্রের লেনসের নিচে রেখে এই ফিলটার ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন ফিল্টারের মধ্য দিয়ে কতক্ষণ আলোকপাত করতে হবে তা আগে পরীক্ষা করে ঠিক করে নিতে হয়। মুদ্রণের যে কাগজ পাওয়া যায় তাতে একটি সাধারণ নেগেটিভের ক্ষেত্রে কোন ফিল্টারের মধ্য দিয়ে কতক্ষণ আলোকপাত করতে হবে তার একটা আনুমানিক হিসেব দেওয়া থাকে। সেই অনুসারে নমুনা কাগজ মুদ্রণ করে দেখে নিয়ে চূড়ান্ত মুদ্রণের সময় আলোকপাত প্রয়োজনমত সংশোধন করে নিতে হয়। বারবার আলো নিভিয়ে ফিলটার পালটানোর জন্য বিবর্ধক যন্ত্রটি নড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে খুবই সাবধানে কাজ করতে হয়।

পক্ষান্তরে বিযুত পদ্ধতিতে একাধিক রঙীন ফিলটার একসঙ্গে ব্যবহার করে একবার মাত্র আলোকপাতেই ছবি মুদ্রণ করা যায়। ফলে ঝামেলাও কম, সময়ও কম লাগে। যুত পদ্ধতিতে যে সময়ের মধ্যে দুটি প্রিন্টের কাজ সারা যায়, বিযুত পদ্ধতিতে সেই একই সময়ে বারোটি প্রিন্টের কাজ করে ওঠা যায়। এক্ষেত্রে পরিপূরক রঙের অর্থাৎ নীলাভ-সবুজ, ম্যাজেন্টা ও হলুদ ফিলটার ব্যবহার করা হয়। যুত পদ্ধতিতে তিনটি প্রথমিক রঙের ফিল্টারের সাহায্যে যেমন ছবিতে তিনটি প্রাথমিক রঙ যোগ করা হয়, বিযুত পদ্ধতিতে তেমনি কোন একটি নির্দিষ্ট রঙের ফিলটার ছবি থেকে সেই বিশেষ রঙের কিছুটা অপসারিত করে। বিযুত পদ্ধতিতে নীলাভ-সবুজ ফিলটার মুদ্রণের কাগজে লাল আলো প্রবেশের পরিমাণকে কমিয়ে দেয়, ম্যাজেন্টা ফিল্টার সবুজ আলো প্রবেশের পরিমাণকে কমায়, হলুদ ফিল্টার কমায় নীল আলোকে। পরের পৃষ্ঠায় বর্ণ সংশোধনী ফিল্টার ব্যবহারের একটি নির্দেশিকা দেওয়া হল—

ছবিতে কোন্ রঙের বাহুল্য	ছবিতে কোন রঙের অভাব	যে রঙের ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে	বা যে রঙের ফিল্টার প্রত্যাহার করতে হবে
লাল	নীলাভ-সবুজ	হলুদ ও ম্যাজেন্টা	নীলাভ-সবুজ
সবুজ	ম্যাজেন্টা	হলুদ ও নীলাভ-সবুজ	ম্যাজেন্টা
নীল	হলুদ	ম্যাজেন্টা ও নীলাভ-সবুজ	হলুদ
নীলাভ-সবুজ	লাল	নীলাভ-সবুজ	হলুদ ও ম্যাজেন্টা
ম্যাজেন্টা	সবুজ	ম্যাজেন্টা	হলুদ ও নীলাভ ·
হলুদ	নীল	হলুদ	ম্যাজেন্টা ও নীলাভ-সবুজ

তবে লাল আলো, সবুজ আলো বা নীল আলোর পরিমাণকে কতটা কমিয়ে ছবিতে রঙের সমতা আনতে হবে তা অনেকখানিই অনুমানের ওপর নির্ভর করে। সেইজন্য এই ফিল্টারগুলি গাঢ় থেকে মৃদু বিভিন্ন ঘনত্বের হয়ে থাকে। চূড়ান্ত মুদ্রণের আগে কয়েকবার নমুনা মুদ্রণ করে দেখে নিতে হয় কোন্ কোন্ ঘনত্বের কোন্ কোন্ ফিল্টার ব্যবহার করা দরকার। এক্ষেত্রেও কাগজ প্রস্তুতকারকদের নির্দেশ সাহায্য করবে। এই সমস্ত ফিল্টার অ্যাসিটেট শিট বা জিলেটিনে তৈরি করা হয়। নেগেটিভের ওপরে জিলেটিন ফিল্টার ব্যবহার করা যায়-না, কারণ তা উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায় । জিলেটিন ফিল্টার লেন্সের নিচে ব্যবহার করতে হয়। অ্যাসিটেট ফিল্টারগুলি কলার প্রিন্টিং ফিল্টার বা সি. পি. ফিল্টার নামে এবং জিলেটিন ফিল্টারগুলি কলার কারেকশন ফিল্টার বা সি. সি. ফিল্টার নামে পরিচিত। সংখ্যা ও অক্ষর উল্লেখ করে ফিল্টারের ঘনত্ব ও রঙ বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন CP-10Y বলতে বোঝাবে অ্যাসিটেট কলার প্রিন্টিং ০.১০ ঘনত্বের হলুদ ফিল্টার যা নীল আলোর পরিমাণকে ০.১০ ভাগ কমাবে। তেমনি CC- 40M বলতে বোঝাবে জিলেটিন কলার কারেকশন, ০.৪০ ঘনত্বের ম্যাজেন্টা ফিল্টার যা সবুজ আলোর পরিমাণকে ০.৪০ ভাগ কমিয়ে দেবে। এই লিপি অনুসারে কোন একটি নির্দিষ্ট ছবি মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ফিল্টার সম্মেলন হতে পারে CC-10M+CC-20Y। বিযুত পদ্ধতির আর একটা সুবিধা হল এর সাহায্যে মুদ্রণের সময় শেডিং বা ডজিং-এর কাজ করা সম্ভব।

মুদ্রণের কাগজ

রঙীন ছবি মুদ্রণের কাগজ কনট্যাক্ট প্রিন্ট ও প্রোজেকশন প্রিন্ট দুয়ের জন্যই পাওয়া যায়। এর কোন গ্রেড হয় না। রঙীন ফিল্মের মতই এতে তিনটি প্রাথমিক রঙের প্রতি সংবেদনশীল অবদ্রবের তিনটি স্তর থাকে। রঙীন মুদ্রণের কাগজের প্রতিটি ব্যাচের সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানের তৈরি অন্য ব্যাচের তফাৎ হয়। সেজন্য যে ব্যাচের কাগজে চূড়ান্ত মুদ্রণ হবে, সেই ব্যাচের কাগজ নিয়েই নমুনা মুদ্রণ করা দরকার। একাধিক ফিল্টার

ব্যবহার করলে আলোকপাত কিছুটা বাড়ানো বাঞ্ছনীয় কেননা প্রতিটি ফিল্টার রঙের ওপর নির্বাচিত ভাবে প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও বিক্ষেপ ও প্রতিফলনের মাধ্যমে কিছুটা আলোক হরণও করে। প্রতিটি অতিরিক্ত ফিল্টার ব্যবহারের জন্য সাধারণভাবে আলোকপাত ১০% হারে বাড়ানো উচিত।

পরিস্ফুটন

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট ডেভেলাপারে, নির্দেশ অনুযায়ী মুদ্রণের কাগজ পরিস্ফুটন করলে উন্নত মানের প্রিন্ট পাওয়া যায়। ফিল্ম পরিস্ফুটনের মতই কাগজ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রেও পরিস্ফুটন-কাল ও রাসায়নিকের তাপমাত্রা একই ভাবে জরুরি। পরিস্ফুটনের সম্পূর্ণ ক্রমপর্যায়টি এইরূপ : পরিস্ফুটন, ষ্টপ বাথ, ব্লিচিং, স্থায়ীকরণ ও ধৌতকরণ। পরিস্ফুটিত সিলভার এবং মুদ্রণের কাগজে যদি হলুদ ফিলটারের কোন অন্তর্স্তর থাকে ব্লিচিং তা অপসারিত করে।

এই কাগজ প্লাষ্টিক বা রেজিন-কোটি কাগজের মতই বেশি ধোয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই কাগজ চকচকে করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। রঙীন ছবির ডেভেলাপার প্রকৃতিতে অত্যন্ত ক্ষারীয় এবং এই কাগজে জিলেটিনের তিনটে স্তর থাকে বলে এই সমস্যা। গ্লেজিং যন্ত্র খুব উচ্চ তাপমাত্রায় চালালে পরিস্ফুটনের পর নরম জিলেটিন স্থানচ্যুত হয়ে ছবিকে নষ্ট করে দিতে পারে। সুতরাং রঙীন প্রিন্ট স্বল্প তাপমাত্রায় গ্লেজ করা হয় অথবা প্রিন্ট প্রথমে শুকিয়ে নিয়ে, তারপর তাকে ওয়েটিং এজেন্টে ফের সিক্ত করে গ্লেজ করা হয়ে থাকে।

এক্সপোজার

'...and God said, Let there be light and there was light.'

—Old Testament.

আলোকচিত্রের অপরিহার্য উপাদান আলো, লেন্স, ক্যামেরা, ফিল্ম ইত্যাদি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং চেষ্টা করেছি তাদের গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করতে। প্রত্যেক ফোটোগ্রাফারের লক্ষ্য থাকে উচ্চমানের প্রাণবন্ত ছবি তোলার, যার প্রাথমিক শর্ত ফিলমের ওপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত। উচ্চমানের নেগেটিভের জন্য নির্ভুল আলোকপাত বা correct exposure সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

আজকাল সমস্ত ক্যামেরার সঙ্গে এক্সপোজার মিটার যুক্ত থাকার ফলে নির্দিষ্ট মানের ছবি পাওয়া গেলেও, পেশাদারী দক্ষতাযুক্ত প্রাণবন্ত ছবি আমরা পাইনা। কারণ এক্সপোজার মিটার বস্তু থেকে প্রতিফলিত বিভিন্ন আলোর গড় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাদা ও ঘন কালোর মধ্যবর্তী ধূসরতার উপযুক্ত আলোকপাত নির্দেশ করে। শুভ্র তুষার ও কালো কষ্টিপাথর উভয়ই তার চোখে ধূসর, সামান্য কম বা বেশি। সেজন্য সুনির্দিষ্ট আলোছায়ার মাত্রার প্রয়োজনে আলোকচিত্রীকে আলোকপাতের পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে হয়।

আলোছায়ার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বহু আলোকচিত্রীই নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আমরা জানি Edward Steichen কালো ভেলভেটের পটভূমিতে একজোড়া সাদা কাপ-ডিশ রেখে হাজার খানেকেরও বেশি ছবি তুলে আলোকপাতের সঙ্গে আলোছায়ার মাত্রার সম্পর্ক নিয়ে বহু সময় ব্যয় করেছেন।

ফোটোগ্রাফির জগতে Ansel Adams একটি সুপরিচিত নাম। তিনিও বিষয়টি নিয়ে বহুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ১৯৪০ সালে মূলত সাদা-কালো ছবির জন্য আলোকপাতের যে পদ্ধতিটি প্রচলন করেন তা 'The Zonal System' নামে পরিচিত। তাঁর তোলা ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় সাদা-কালো টোনের ওপর তাঁর কি অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ। উৎসাহী আলোকচিত্রীদের সাহায্য করবে মনে করে আমরা তাঁর আলোকপাত পদ্ধতি 'The Zonal System' নিয়ে এখানে আলোচনা করলাম —

বস্তুর প্রতিরূপ সাদা-কালোর যতগুলি মাত্রায় একটি মুদ্রণে পাওয়া সম্ভব সেগুলিকে তিনি দশটি zone বা বলয়ে (band) ভাগ করে নির্দিষ্ট সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করে নিয়েছেন। প্রতিটি zone বা বলয় ঔজ্জ্বল্যে পূর্ববর্তী বলয়ের দ্বিগুণ। আলোকচিত্রে যে ছায়াযুক্ত (Shadows), ধূসর (Greys) ও উজ্জ্বল অংশ (Highlights) থাকে সেগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়ে দশটি বলয় প্রস্তুত করা হয়। অনুষ্ঠান প্রচারের আগে সাদা-কালো টিভি-র ঔজ্জ্বল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন সাদা থেকে কালো পর্যন্ত আটটি বলয় প্রদর্শন করা হয়, ঠিক সেরকম। সর্বাপেক্ষা ঘন কালোকে শূন্য বা এক ধরে নয় পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রাগুলিকে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এভাবে বর্ণনা করতে পারি।

ছায়াযুক্ত অংশসমূহ (Shadows)

বলয় এক—নেগেটিভের অনালোকিত অংশ, যা মুদ্রণের কাগজে দৃষ্টিগ্রাহ্য গভীরতম কালো।

বলয় দুই—এক সংখ্যার কালো থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা গেলেও এই কালো অংশে কোন অনুপুঙ্খ দৃষ্টিগোচর হয় না।

বলয় তিন—অনুপুঙ্খ দৃষ্টিগোচর হতে পারে এমন কালো।

ধূসর অংশসমূহ (Greys)

বলয় চার—কালচে ধূসর। রৌদ্রালোকে ঘন সবুজ পাতা অথবা মুখাবয়বের ছায়াযুক্ত অংশের অনুরূপ ধূসরতা।

বলয় পাঁচ—কালো ও সাদার মধ্যবর্তী ধূসরতা। রৌদ্রোজ্জ্বল নীল উত্তর আকাশের প্রতিরূপ। প্রতিফলিত আলোক মিটার অথবা ১৮% প্রতিফলন বিশিষ্ট ধূসর কার্ড যে ধূসরতার মানদণ্ডে প্রস্তুত করা হয়।

বলয় ছয়—হালকা ধূসর। রৌদ্রালোকে ফর্সা মানুষের গাত্রচর্ম অথবা তুষারের ছায়াযুক্ত অংশের ধূসরতা।

উজ্জ্বল অংশসমূহ (Highlights)

বলয় সাত—অনুপুঙ্খ দৃষ্টিগোচর হয় এমন সাদা বা উজ্জ্বল অংশ।

বলয় আট—প্রায় সাদা। অনুপুঙ্খ স্পষ্ট নয়। তৈলাক্ত মুখাবয়ব থেকে প্রতিফলিত আলোর ঔজ্জ্বল্য।

বলয় নয়—মুদ্রণের কাগজের রঙ। প্রখর রৌদ্রে ধাতু অথবা তুষার থেকে প্রতিফলিত আলোর ঔজ্জ্বল্য।

প্রথমে দশটি বলয়ের কথা বলা হলেও শূন্য ও এক সংখ্যাকে একটি ধরে মোট নয়টি বলয়ের বিবরণ দেওয়া হলো। কারণ সাধারণ ফিল্মের ব্যাপ্তি বা latitude আট বা নয়টির বেশি বলয় ধারনের উপযুক্ত নয়।

অ্যানসেল অ্যাডামসের এই পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হলে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আলোকচিত্রীকে উল্লিখিত নয় মাত্রার নয়টি বলয় প্রস্তুত করে নিতে হবে, যাতে চূড়ান্ত ছবি তোলার সময় ঐ নয়টি বলয়ের ঠিক যে মাত্রায় বস্তুর প্রতিরূপ পেতে চাই,

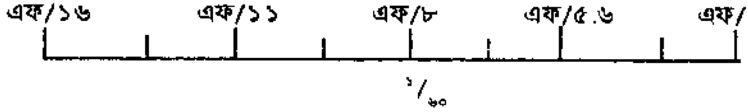
সেইমত সঠিক আলোকপাত করা সম্ভব হয়। তবে ফিল্‌মে সাদা কালোর মাত্রা কেবলমাত্র আলোকপাতের ওপরই নির্ভর করে না। বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের ফিল্‌ম, বিভিন্ন ধরনের পরিস্ফুটনের দ্রবণ বা মুদ্রণের কাগজের বিভিন্ন গ্রেডের জন্যও এই মাত্রার তারতম্য হতে পারে। সুতরাং সুনির্দিষ্ট ফল পেতে হলে, আলোকচিত্রের যাবতীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার একটি সুনির্দিষ্ট মান অনুসরণ করা অবশ্যই জরুরি। নমুনা বলয় প্রস্তুত করার সময় আলোকচিত্রী যে ফিল্‌ম, দ্রবণ বা কাগজের গ্রেড ব্যবহার করবেন চূড়ান্ত ছবির জন্য তাঁকে তাই ব্যবহার করতে হবে।

প্রথমে পরিস্ফুটন করা অনালোকিত (unexposed)একটি ফিল্‌ম ফ্রেম বিবর্ধক যন্ত্রে (Enlarger) রেখে নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থাপন ও ফোকস করে কয়েকটি নমুনা আলোকপাত (Test strip) করতে হবে। যন্ত্রটিকে ১৫´´x ১২´´, ৮´´x ১১´´, ৯´´x ৭´´ বা অন্য যে কোন স্বাভাবিক মাপেব উপযুক্ত উচ্চতায় স্থাপন করা যেতে পারে। তবে যে উচ্চতায় তা রাখা হোক না কেন, দণ্ডটিতে একটি চিহ্ন দিয়ে রাখা প্রয়োজন, যাতে পরে ঐ একই উচ্চতায় তা আবার স্থাপন করা যায়। এবার অ্যাপারচার নির্দিষ্ট করে, ধরা যাক এফ/৮ দিয়ে, নরমাল গ্রেডের কাগজে (অন্য অ্যাপারচার বা অন্য গ্রেডের কাগজও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ভবিষ্যতেও ঐ একই অ্যাপারচার ও গ্রেডের কাগজ ব্যবহার করতে হবে) দু সেকেণ্ড করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কয়েক বার আলোকপাত করে পুরো সময় ধরে পরিস্ফুটন করে নিলে আমরা পাব ধূসর থেকে ঘন কালোর কয়েকটি মাত্রা। আলোকপাতের যে ধাপে আমরা সর্বাপেক্ষা ঘন কালো পেলাম, সেটাই হবে আমাদের চূড়ান্ত নেগেটিভ থেকে মুদ্রণের সঠিক আলোকপাতের সময়। এবং এই ঘন কালোই হবে বলয় সংখ্যা এক। বিবর্ধনের অনুপাত ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া অনুসারে, ধরা যাক দশ সেকেণ্ড আলোকপাতে যে ঘন কালোর মাত্রা আমরা পেলাম তা বারো বা চোদ্দ সেকেণ্ড আলোকপাতের ঘন কালোর থেকে দৃশ্যত তফাৎ করা যাচ্ছে না। সুতরাং এক্ষেত্রে দশ সেকেণ্ড আলোকপাতই আমাদের নেগেটিভের সঠিক আলোকপাত। এরপর প্রতিটি মুদ্রণের সময়ই সমস্ত নেগেটিভে ঐ একই আলোকপাত করতে হবে।

এইভাবে বিবর্ধক যন্ত্রের উচ্চতা, অ্যাপারচার, নেগেটিভের সঠিক আলোকপাত, কাগজের গ্রেড, রাসায়নিক দ্রবণ প্রভৃতি স্থির করে নেওয়ার পর পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার আমরা যে ফিল্‌ম ব্যবহার করছি তা থেকে সঠিকভাবে ১৮% ধূসর কার্ডের অনুরূপ ধূসরতা (বলয় সংখ্যা ৫) পাওয়া যাবে কি না। কারণ পরিস্ফুটন দ্রবণের উপকরণ সমূহের বিভিন্নতার জন্য ফলাফলে কিছু তারতম্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেটুকু অসুবিধা ফিল্‌মের ঘোষিত দ্রুতির সামান্য হেরফের করে সহজেই ঠিক করে নেওয়া যায়।

খোলা আকাশের নিচে সমানভাবে আলোকিত (মেঘাচ্ছন্ন দিনের আলোই উপযুক্ত) কোন স্থানে একটি সাদা অথবা ধূসর (১৮%) কার্ডবোর্ড রেখে বিভিন্ন আলোকপাত করে কয়েকটি ছবি তুলতে হবে। মিটারের নির্দেশ অপেক্ষা দু ষ্টপ কম থেকে শুরু করে দু ষ্টপ বেশি পর্যন্ত অর্ধ ষ্টপ করে বাড়াতে বাড়াতে মোট নয়টি ছবি। ধরা যাক মিটারের

নির্দেশমত তা হলো ১/৬০ সে. আলোকপাত এফ/৮ অ্যাপারচার। সুতরাং আলোকপাতের সময়টা একই রেখে, অর্থাৎ ১/৬০ সে. রেখে এফ/১৬ থেকে অর্ধ ষ্টপ করে বাড়িয়ে এফ/৪ পর্যন্ত তুললেই আমরা নয়টি ছবি পাব।



এইভাবে ছবি তুলে আগেকার মত ঠিক একই ভাবে পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ করে, অর্থাৎ বিবর্ধক যন্ত্রের উচ্চতা, অ্যাপারচার ও আলোকপাত (এফ/৮ এ ১০ সে.) সব কয়টি ফ্রেমের একই রেখে যে নয়টি মুদ্রণ আমরা পাব তা থেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন মুদ্রণটি ১৮% ধূসর কার্ডের মাত্রার সঙ্গে সমান হয়। যদি মিটারের নির্দেশমত এফ/৮এ তোলা ছবির অনুরূপ হয় তা হলে ফিল্মের দ্রুতি পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হবে না। তা না হয়ে যদি এফ/৫.৬ অথবা এফ/১১ এ তোলা ছবির মুদ্রণের অনুরূপ হয় তবে ফিল্মের দ্রুতি যথাক্রমে অর্ধেক বা দ্বিগুণ ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ ১২৫ এ. এস. এ ফিল্মের ক্ষেত্রে তা হবে যথাক্রমে ৬৪ এ. এস. এ এবং ২৫০ এ এস. এ

ফিল্মের দ্রুতি স্থির করে নেবার পর জোন পদ্ধতির নয় মাত্রার নয়টি চূড়ান্ত বলয় প্রস্তুত করা যাবে। পুনরায় ১৮% ধূসর বা সাদা কার্ডের ছবি একই রকম ভাবে তুলতে হবে তবে এক্ষেত্রে মিটারের নির্দেশ অপেক্ষা চার ষ্টপ কম থেকে শুরু করে এক ষ্টপ করে বাড়াতে বাড়াতে চার ষ্টপ বেশি পর্যন্ত মোট নয়টি ছবি তুলে ঠিক একই পদ্ধতিতে পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ করলেই নয় মাত্রার নয়টি বলয় (সংখ্যা এক থেকে নয় পর্যন্ত) বা রুলার তৈরি হয়ে যাবে।

সমস্ত কিছু সঠিকভাবে করা সত্ত্বেও এমন হতে পারে যে এক সংখ্যক বলয় ঘন কালো ও পাঁচ সংখ্যক বলয় ঠিকমত ধূসর (১৮%) হলেও নয় সংখ্যক বলয় কাগজ-সাদা হলো না। সে ক্ষেত্রে ফিল্ম পরিস্ফুটনের সময় সামান্য বাড়িয়ে দিলে নেগেটিভের ঘনত্ব বেড়ে নয় সংখ্যক বলয়টি কাগজ-সাদা হবে। এই পরিবর্তনে পাঁচ সংখ্যক বলয়ের ধূসরতা সামান্য পরিবর্তিত হলেও ঘন কালোর কোন পরিবর্তন হবে না। এই ভাবে সাদা থেকে কালো পর্যন্ত নয়টি বা তার মধ্যবর্তী যে কোন টোনের উপযুক্ত আলোকপাত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এক্সপোজার মিটারের সাহায্য নিয়েই ইচ্ছামত আলোকপাত কমিয়ে বা বাড়িয়ে এখন তা করা যেতে পারে। তবে নয়টি বলয় ধরতে হলে উচ্চ দ্রুতির ফিল্মই (৪০০ এ. এস. এ) উপযুক্ত।

Gene Nocon, যিনি উচ্চমানের মুদ্রণের জন্য অধিক পরিচিত, তিনিও আলোকপাত ও পরিস্ফুটনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন, ষ্টেজের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিতে আলোকজ্জ্বল কুশীলবের বা 'রক কন্‌সার্টের' ছবি মিটারের নির্দেশ অপেক্ষা দু ষ্টপ কম আলোকপাত করা নেগেটিভেই সঠিকভাবে ধরা

পড়ে। একই হিসাবে সূর্যাস্তের দৃশ্য এক ষ্টপ কম, উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে সমুদ্রতটের দৃশ্য এক ষ্টপ বেশি এবং তুষার দৃশ্যের ছবি দু ষ্টপ বেশি আলোকপাতেই অধিকতর বিশ্বস্ত নেগেটিভ পাওয়া সম্ভব।

আলোকপাতের সঙ্গে পরিস্ফুটনের সম্পর্কও নিবিড়। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি ফিল্ম পরিস্ফুটন করতে স্বাভাবিক যে সময় লাগে তার অর্ধেক সময়ের মধ্যে ফিল্মের উজ্জ্বল অংশগুলি অর্থাৎ আলো লাগা সিলভার হ্যালাইডগুলি পরিস্ফুট হয়ে যায়। বাকি অর্ধেক সময়টা আলো লাগা অংশগুলির ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে মাত্র, অনালোকিত অংশে কোন কাজই করে না। ফোটোগ্রাফারের বিষয় যদি হয় একই সঙ্গে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও অত্যধিক ছায়াযুক্ত অর্থাৎ বৈষম্যের মাত্রা যদি এত বেশি হয়, যা ফিলমের ধারণ ক্ষমতার বাহিরে [illegible] সেসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ছায়াযুক্ত অংশের মিটার রিডিং নিয়ে আলোকপাত করে পরিস্ফুটন কাল অর্ধেক করলে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নেগেটিভ পাওয়া সম্ভব। নৈশকালীন ক্যাম্প ফায়ার দৃশ্যের বৈষম্য প্রসঙ্গে আমরা 'দৃশ্যরস ও কম্পোজিশন' পরিচ্ছেদে এ কথার উল্লেখ করেছি।

আমাদের মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে ফিল্মের ব্যাপ্তি বা latitude মাত্র পাঁচ ষ্টপ পর্যন্ত (অনুপাত ১:৩২) অথচ রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের বহির্দৃশ্যে আকাশের আলো থেকে গভীর ছায়া পর্যন্ত যে আলোর অনুপাত থাকে (১:৪০৯৬) তা দাবী করে অন্তত বারো ষ্টপ ব্যাপ্তির। বারো ষ্টপের কাজ পাঁচ ষ্টপের মধ্যে সংকুচিত করে আনার প্রয়োজন হয়। অধিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে যদি মিটারের নির্দেশমত আলোকপাত করা যায় তা হলে ছায়াযুক্ত অংশের অনুপুঙ্খ আমরা পাব না এবং স্বাভাবিক পরিস্ফুটনে উজ্জ্বল অংশের অনুপুঙ্খও হারিয়ে যাবে। দৃশ্যে আলো-ছায়ার অনুপাত যদি পাঁচ ষ্টপের মধ্যে থাকে অর্থাৎ ছায়াযুক্ত অংশের মিটার রিডিং যদি ১/৬০ আলোকপাতে এফ/৪ এবং উজ্জ্বল অংশে এফ/১৬ হয় তবেই মিটার যথাযথভাবে ১/৬০ সে. এ এফ/৮ অ্যাপারচার নির্দেশ করবে এবং তা স্বাভাবিক পরিস্ফুটনেই সবচেয়ে ভাল নেগেটিভ পাওয়া যাবে। মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্যের ক্ষেত্রে G. Nocon-এর উপদেশ 'Expose for shadows, develop for highlights.'

আধুনিককালে ফোটোগ্রাফির নানারকম যান্ত্রিক আবিষ্কার ফোটো তোলা অনেক সহজ করে দিয়েছে; কিন্তু যন্ত্রের ওপর নির্বিচারে নির্ভরশীল হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ও ভুল ধারণারও সৃষ্টি করেছে। আমাদের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে মিটারের নির্দেশমত নয়, মিটারের সাহায্য নিয়ে আলো-ছায়ার মাত্রার প্রয়োজনে যে আলোকপাত তাই যেমন নির্ভুল, ফিল্মের ব্যাপ্তির প্রয়োজনে পরিস্ফুটন সময়ের পরিবর্তনও তেমনি কোন ত্রুটি নয়।

অনেকের ধারণা, নেগেটিভ পাতলা হলেই তা আণ্ডার-এক্সপোজ্ড বা ঘন হলেই ওভার-এক্সপোজ্ড। কিন্তু এখন আমরা জেনেছি যে কালো বা অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তুর নেগেটিভ পাতলাই হবে এবং আলোকোজ্জ্বল বস্তুর নেগেটিভ ঘন। এর বিপরীত হলে তবে নেগেটিভ আণ্ডার বা ওভার-এক্সপোজ্ড হয়, এবং আলোছায়ার মাত্রা অনুসারে সেটাই হওয়া উচিত।

উপস্থাপনা ও রসাস্বাদন

'A photograph is not taken, it is made. A photograph is not seen, it is felt'.

—Ansel Adams.

আমাদের উৎসাহ ও বোধ-বুদ্ধি-কল্পনা ও কারিগরি দক্ষতা প্রয়োগ করে আমরা আলোকচিত্র পাই। ১৯৭৮ সনের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রতি বছর ২২০ কোটী ছবি তোলা হয, গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৯০ টি করে। রবার্ট ফ্রাঙ্কের ভাষায় বর্তমান যুগ হল 'an age whose air is polluted with the stench of photography.' উৎসাহের এই প্রাবল্যের আবার রকমভেদ আছে। ফোটোগ্রাফিতে আমাদের কারও কারও উৎসাহ হঠাৎ চাগিয়ে ওঠে, আবার হঠাৎ চলেও যায়। আর কারও কারও উৎসাহ অত সহজে জাগে না, কিন্তু একবার জাগলে তা কিছু দিনের মধ্যেই কেটে যায় না, বহুকালের সঙ্গী হয়ে থাকে। এটা প্রবণতার প্রসঙ্গ। আমি মনে করি আলোকচিত্রকে কেউ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন কিনা শুধু তাই দিয়ে পেশাদার/অপেশাদার ফোটোগ্রাফার ভাগ করা যায় না, ফোটোগ্রাফির প্রতি নির্দিষ্ট প্রবণতার কথাও এ প্রসঙ্গে জরুরি।

ছবি তোলার পর তা দর্শকের দরবারে হাজির করার পালা। সে দর্শক নিজেদের পরিচিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পত্রপত্রিকা অথবা কোন প্রদর্শনীর বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠী যেই হোক না কেন। দর্শকই ছবির চূড়ান্ত বিচারক। বলা হয়, ছবি তোলার সময় আলোকচিত্রী সমস্ত উৎসাহ ও আবেগ নিয়ে ছবি তুলবেন, কিন্তু ছবি দর্শকের সামনে হাজির করাব আগে ছবির গুণাগুণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত ভাবে বিচার করে দেখবেন। অর্থৎ আলোকচিত্রী একই সঙ্গে স্রষ্টা ও বিচারক। দর্শক যেমন একই সঙ্গে ভোক্তা ও বিচারক। শুধু ছবির গুণাগুণই নয়, কোন্ ছবিকে কীভাবে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করলে দর্শকের পক্ষে তার যথার্থ রসাস্বাদন করার সুবিধা হবে তাও বিবেচনা করা দরকার।

মাধ্যম হিসাবে আলোকচিত্র সম্পূর্ণ যন্ত্রনির্ভর এবং তার মূল গঠন-কাঠামো যান্ত্রিক কলাকৌশলকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। কিন্তু শুধু যান্ত্রিক দিকটিই তো যথেষ্ট নয়, এর

সঙ্গে ছবির শিল্পগত দিকও রয়েছে। বলা হয়, আলোকচিত্র হল যন্ত্রবিজ্ঞান যুগের উপযুক্ত চিত্রকলা। ফলে যান্ত্রিক দিক থেকে ছবি যাতে নিখুঁত হয় সে দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তা না হলে ছবিটির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আলোকচিত্রের এই যান্ত্রিক দিকটি বস্তুগত এবং তার ত্রুটি সঠিকভাবে নির্দেশ করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ছবির শিল্পগত দিক কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। সংখ্যা ও গণিত যেমন এক নয়, ফোটো ও ফোটোগ্রাফিও তেমনি এক নয়। ফোটোগ্রাফি বাস্তবতার নিতান্ত দৃক্‌যান্ত্রিক স্থায়ীকরণ নয়, তা বাস্তবতার আবেগগত ও মননশীল বিশোষণের একটা উপায়। অর্থাৎ ফোটোগ্রাফি যতটা না বাস্তব, তার চেয়ে বেশি বাস্তবের ধারক ও বাহক। ফলে ছবি তোলার মত ছবি দেখাও নির্ভর করে দর্শকের মনন, মনস্তত্ত্ব, আবেগ ও অভিজ্ঞতার ওপর এবং আলোকচিত্রীর লক্ষ্য হল তাঁর ছবির অন্তর্নিহিত বক্তব্য বা তাৎপর্যকে দর্শকের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরে দর্শককে নিজের আবেগ বা অভিজ্ঞতার শরিক করে তোলা। যে কোন ছবি আসলে হল বাইরের জগৎ ও ভেতরের জগতের মধ্যে, ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে ও ছবি থেকে যা অনুভব করা যাচ্ছে এই দুয়ের ভেতর এক যোগসূত্র। সুতরাং সমস্ত প্রকাশ করে দিয়ে দর্শকের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায় না। চূড়ান্ত জ্ঞান মানুষকে প্রাজ্ঞ করে, কিন্তু মানুষকে সুখী করে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া। তাই কিছুটা প্রকাশ করে, কিছুটা গোপন রেখে দর্শকের আবেগ ও বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে হয়। রহস্যের এই ওড়না-ই দর্শকের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। 'তারে বলে আর্ট না বলা যাহার কথা, ঢাকা খুলে বলা সে কেবল বাচালতা।' বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ। প্রচলিত বিষয়ও কলাকৌশলের নতুনত্বে রহস্যময় হয়ে ওঠে।

ছবির যথার্থ রসাস্বাদনে ছবির সঠিক উপস্থাপনা নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। ছবি উপস্থাপনা সামগ্রিক ছবিরই একটা অঙ্গ। আপাতভাবে মনে হতে পারে ছবির বক্তব্য বা তাৎপর্যের সঙ্গে উপস্থাপনার কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু ছবির সুষ্ঠু উপস্থাপনা যে দর্শকের মনে পরিবেশগত প্রভাব ফেলে সেকথা অনস্বীকার্য। ছবির উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথম যা বিবেচনা করা দরকার তা হল ছবির আয়তন (size) যার ওপর নির্ভর করে প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণতা ও দানার আকার। বৃহদাকার যে ছবির তীক্ষ্ণতা কয়েক ফুট দূর থেকে দেখলে সঠিক বলে মনে হয়, সে ছবিই খুব কাছ থেকে দেখলে ঝাপসা ও অত্যন্ত কণাময় মনে হবে। কিন্তু অত্যন্ত বিবর্ধিত ছবি কাছ থেকে দেখার জন্য নয় যেহেতু ছবির আয়তনের সঙ্গে ছবি দেখার প্রয়োজনীয় দূরত্বের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ ৪৫°-র কাছাকাছি। সুতরাং দেখার দূরত্ব অনুযায়ী ছবির আয়তন সেই দৃষ্টিকোণ ভরাট করার মত হওয়া চাই, যাতে দর্শকের স্বাভাবিক দৃষ্টক্ষেত্রের সমগ্র স্থান জুড়ে ছবিটি থাকে । ছবিটি যে পুরোপুরি ঐ মাপেরই হওয়া দরকার তা নয়। দরকারমত ছবির চারপাশে ফাঁকা জায়গা ছেড়েও দর্শকের দৃষ্টিকোণ ভরাট করা যেতে পারে। মোট কথা দর্শক যাতে সঠিক অনুপাত ও অবস্থান থেকে ছবিটি অবলোকন করতে পারেন সেই অনুযায়ী ছবির আয়তন স্থির করা উচিত। দর্শক যদি ছবির আয়তনের তুলনায় বেশি কাছ থেকে ছবিটি দেখেন, তাহলে

আলোকচিত্রী তাঁর ছবিতে সামগ্রিকভাবে যা দেখাতে চেয়েছেন তা না দেখে দর্শক ছবিটির নির্বাচিত অংশমাত্রই অধিক ভাবে দেখতে পাবেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ছবির অন্তর্নিহিত ভাবার্থ বা রসের সঙ্গে ছবির উপযুক্ত আয়তন ও দেখার দূরত্বের একটা সম্পর্ক রয়েছে। যেমন ছবিতে যদি শূন্যতা বা একাকিত্বের প্রতিরূপ থাকে তবে ছবির আকার বড় হলে সেই একাকিত্ব আরও প্রগাঢ় হয়ে ধরা পড়ে, শূন্যতা যেন খাঁ খাঁ করতে থাকে। আবার ছবিতে যদি থাকে বস্তুর আধিক্য বা জনাকীর্ণতা তবে ছবির আঁটোসাঁটো আয়তনে সেই ঘিঞ্জিভাব, সেই দমবন্ধকর পরিবেশ আরও তীক্ষ্ণ হয়। তেমনি যে সমস্ত ছবিতে কেন্দ্রীয় বস্তু বা প্রতিরূপ কোন প্রতীকতা বা ইঙ্গিতধর্মী চরিত্র পায় সেখানে ছবির সঠিক রস উপলব্ধিতে দেখার দূরত্বের একটা বড় ভূমিকা আছে, নির্দিষ্ট দূরত্বের চেয়ে কিছু বেশি বা কম হলে মনে হবে যেন ছবির সঙ্গে দর্শকের যথার্থ সম্পর্ক স্থাপিত হল না।

অনেকে মনে করেন ছবি তোলার সময় ক্যামেরা থেকে বস্তুর দূরত্ব অনুসারে ছবি দেখার দূরত্ব স্থির হওয়া উচিত। তাঁদের মতে ক্যামেরা লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ্য ও ছবি বিবর্ধনের হারের গুণফল হল ছবি দেখার সঠিক দূরত্ব। অর্থাৎ ৫ সি. মি. ফোকস দৈর্ঘ্যের লেন্সে তোলা ছবিকে দশগুণ বিবর্ধন করলে ছবিটি দেখার সঠিক দূরত্ব হবে ৫ × ১০ = ৫০ সি. মি.।

ছবির উপস্থাপনে আয়তনের পর আসে আকৃতির কথা। সাধারণভাবে আমরা ছবি আয়তাকারে বা বর্গাকারে দর্শকের সামনে উপস্থিত করি। কিন্তু প্রয়োজনে ছবিকে অনুভূমিক বা উল্লম্ব অথবা অন্য যে কোন আকৃতিতে উপস্থাপিত করতে পারি। ছবির আকৃতি ছবির আঙ্গিকেরই একটা অংশ। তা দর্শকের মনে একটা বিশেষ অনুভূতি বা মেজাজ সৃষ্টি করতে পারে। কম্পোজিশনের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে অনুভূমি যেমন বিস্তারের দ্যোতনা আনে, লম্ব তেমনি উচ্চতা বা গভীরতার বোধ জাগায়।

ছবির উপস্থাপনায় মাউন্টিংও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছবি যদি অ্যালবামে রাখা হয় তাহলে কাগজের রঙ অথবা দেয়ালে রাখা হলে বাঁধাই-বোর্ডের রঙ সুনির্বাচিত হওয়া উচিত। ছবির মাউন্টে কী রঙ থাকবে অথবা তাতে ছবির চারপাশে কোন্ দিকে কতটা ফাঁকা জায়গা রাখা হবে তা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। কারণ মাউন্টিং দর্শককে শুধু দৃশ্যগত ভাবে নয় মানসিকভাবেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ভুল মাউন্টিং অনেক সময় ছবির সঠিক রসোপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। ছবির বর্ডার সাদা হবে না কালো হবে অথবা আদৌ কোন বর্ডার থাকবে না এ সব সিদ্ধান্তই মাউন্টিং-এর অন্তর্গত। বর্ডারবিহীন রঙীন ছবি সাদা কাগজের তুলনায় ধূসর কাগজের ওপর বেশি আলোকময় এবং ধূসর কাগজের তুলনায় কালো কাগজের ওপর বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। রঙীন পটভূমির ওপর রঙীন ছবি সাজাবার ফলে চিত্ররস অনেকটা বাড়তে পারে, আবার যথেষ্ট ব্যাহত হতেও পারে। দৃশ্যগত ও নান্দনিক প্রভাব সৃষ্টির জন্য দুটো প্রাথমিক নিয়ম মেনে চলা উচিত—পটভূমি এমন এক রঙে হওয়া বাঞ্ছনীয় যে রঙটি ছবির মধ্যেও

রয়েছে (হয় ছবিতে অনেকটা জায়গা জুড়ে বা অল্প স্থানে হলেও চিত্রগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনুপুঙ্খে) অথবা পটভূমির রঙ ছবির প্রধান রঙগুলির সঙ্গে বৈষম্যযুক্ত হতে পারে কিন্তু সম্পৃক্তি ও ঔজ্জ্বল্যের একটা মোটামুটি সাদৃশ্য থাকা চাই। রঙীন পটভূমির ওপর বিভিন্ন রঙের কয়েকটি ছবি পাশাপাশি ও উপর-নিচ করে একত্র রেখে রঙের বৈপরীত্যও সৃষ্টি করা যেতে পারে। ছবি ঠিকভাবে নির্বাচন করতে পারলে সাদা-কালো ছবির ক্ষেত্রে এরূপ বিন্যাস মনতাজ-এর মত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। ছবিগুলি (সংখ্যায় সাধারণত চারটি) অপ্রশস্ত কালো বর্ডার বিশিষ্ট বা বর্ডার বিহীন হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা আসি সিকোয়েন্স ফোটোগ্রাফের কথায়। কোন প্রক্রিয়া বা বিকাশ বা পারম্পর্য অনেক সময়ই একটা মাত্র ছবিতে উদ্‌ঘাটিত হয় না। সেক্ষেত্রে একাধিক ছবির একত্র উপস্থাপনা আঙ্গিকগত ভাবেই অপরিহার্য।

ছবির উপস্থাপনায় আলোকচিত্রী আরও বহু ভাবনাচিন্তা ও কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করতে পারেন (যেমন ছবির ওপর রঙীন প্রিন্টিং স্ক্রীন লাগিয়ে ছবিকে বুনন সমন্বিত করা, ছবির ট্রিমিং, ফোটোকোলাজ ইত্যাদি) কিন্তু একটা কথা সব সময়ে মনে রাখা দরকার উপস্থাপনার অভিনবত্বের মোহে যেন ছবির মূল ভাব নষ্ট না হয়।

সবশেষে অ্যালবাম সাজানোর কথা। অ্যালবাম সাজানো যায় বিষয়বস্তু অনুসারে, বিশেষ কোন ঘটনা অনুসারে বা আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। সাজাবার সময় গল্পরসের ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করা যায় বা দৃশ্যরসের ওপর জোর দেওয়া যায়। ছবির সঙ্গে ব্যবহার করা যায় টেক্সট বা ক্যাপশন্। ফোটোগ্রাফ হল স্মৃতির সংরক্ষণ ও সুন্দরের উদাহরণ। অ্যালবাম সাজানোয় যেন তার প্রমাণ মেলে।

রাসায়নিক সংগঠন

'One of the occupational hazards of photography is that the entire results of a hard day's work can be spoilt by using the wrong solution, time or temperature, or just by switching on a light.'

—J. Hedgecoe

ডেভেলাপার

ডি-৭৬/আই. ডি-১১

জল (৫২° সে বা ১২৫° ফা)	৭০০ গ্রাম
মেটল	২ গ্রাম
সোডিয়ম সালফাইট (শুষ্ক)	১০০ গ্রাম
হাইড্রোকুইনন	৫ গ্রাম
বোরাক্স	২ গ্রাম
ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে মোট	১০০০ মি. লি.

২০° সে. (৬৮° ফা) তাপমাত্রায় পরিস্ফুটন কাল ৯ থেকে ১০ মিনিট

ডি-২৩

জল (৫২° সে)	৭০০ মি. লি.
মেটল	৭.৫ গ্রাম
সোডিয়ম সালফাইট (শুষ্ক)	১০০ গ্রাম
ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে মোট	১০০০ মি. লি.

২০° সে (৬৮° ফা) তাপমাত্রায় পরিস্ফুটন-কাল ১৮ মিনিট

ইউনিভার্সাল ডেভেলাপার (Universal Developer)

জল (৫২° সে বা ১২৫° ফা)	৮৫০ মি. লি.
সোডিয়ম সালফাইট (শুষ্ক)	৭ গ্রাম
মেটল	৫ গ্রাম
হাইড্রোকুইনন	২০ গ্রাম
সোডিয়ম সালফাইট (শুষ্ক)	৬৮ গ্রাম

সোডিয়ম কার্বোনেট	১২০ গ্রাম
পটাশিয়ম ব্রোমাইড	২ গ্রাম
ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে মোট	১০০০ মি. লি.

মিশ্রটি সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর ১২৫ মি. লি. উড বা মিথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে নিয়ে দ্রবণটি সম্পূর্ণ করতে হবে। যতদূর সম্ভব হাওয়ার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে রাখলে দ্রবণটি বহুদিন থাকে। লক্ষ্য করার যে সোডিয়ম সালফাইট দুবার মেশানোর কথা বলা হয়েছে। কারণ ফোটো রাসায়নিক দ্রুত অম্লজানায়িত হয়ে যায়। সেজন্য সংরক্ষক হিসাবে সোডিয়ম সালফাইট সব সময় প্রথমেই মেশানো উচিত, অথচ সোডিয়ম সালফাইট দ্রবণে মেটল সহজে মিশতে চায় না। এই কারণে মেটল মেশানোর আগে সামান্য সোডিয়ম সালফাইট দিয়ে নিলে সমস্যার সমাধান হয়।

১ ভাগ এই দ্রবণের সঙ্গে ৬ ভাগ জল মিশিয়ে ব্রোমাইড কাগজ, লণ্ঠন স্লাইড, পজিটিভ ফিল্ম ইত্যাদি ৪ বা ৫ ভাগ জল মিশিয়ে ভেলক্স কাগজ ও ক্লোরো-ব্রোমাইড কাগজ এবং ৩ ভাগ জল মিশিয়ে কনট্যাক্ট প্রিন্ট পরিস্ফুটন করতে হয়। ৬৫°—৬৮° ফা বা ১৮°—২০° সে তাপমাত্রায় ২ থেকে ৩ মিনিট এবং কনট্যাক্ট প্রিন্টের জন্য ৪৫—৬০ সেকেণ্ড পরিস্ফুটন-কাল।

ষ্টপ বাথ

১.	গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড	২০ মি. লি.
	জল	১০০০ মি. লি.
২.	২৮% অ্যাসিটিক অ্যাসিড	৪৮ মি. লি.
	জল	১০০০ মি. লি.

যে কোনটি ফিল্ম বা মুদ্রণের কাগজ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। ২০ থেকে ৩০ সেকেণ্ড রাখা দরকার। বেশিক্ষণ থাকলে দাগ হয়ে যেতে পারে।

হার্ডনার

১.	জল	১০০০ মি. লি.
	ক্রোম অ্যালাম	৩০ গ্রাম
	সময় ৩ থেকে ৫ মিনিট	

পরিস্ফুটনের সময় নরম হয়ে যাওয়া জিলেটিনকে দৃঢ় করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োগের সময় ফিল্মটিকে সামান্য নাড়াচাড়া করা দরকার।

ষ্টপ বাথ ও হার্ডনার

একই সাথে ব্যবহার করার জন্য

জল	১০০০ মি. লি.
ক্রোম অ্যালাম	২০ গ্রাম
সোডিয়ম বাইসালফাইট	২০ গ্রাম
সময় ৫ মিনিট	

ফিক্সার

১.	জল	১০০০ মি. লি.
	হাইপো (সোডিয়ম থিওসালফাইট)	৪০০ গ্রাম
	পটাশিয়ম মেটাবাইসালফাইট	২৫ গ্রাম
	সময় ৩ থেকে ৫ মিনিট	
২.	কোডাক-এর এফ-৫ (অ্যাসিড হার্ডনিং ফিক্সিং বাথ)	
	জল (৫২° সে)	৬০০ মি. লি.
	হাইপো	২৪০ গ্রাম
	সোডিয়ম সালফাইট (শুষ্ক)	১৫ গ্রাম
	অ্যাসিটিক অ্যাসিড (২৮%)	৪৮ মি.লি.
	*বোরিক অ্যাসিড (ক্রিস্টাল)	৭.৫ গ্রাম
	পটাশিয়ম অ্যালাম	১৫ গ্রাম
	ঠাণ্ডা জল দিয়ে মোট	১০০০ মি. লি.
	সময় ১০ মিনিট	
৩.	জল	১০০০ মি.লি.
	হাইপো	২৪০ গ্রাম

হাইপো জলে ভালভাবে মিশে যাবার পর আলাদাভাবে প্রস্তুত করা নিচের দ্রবণটি হাইপো মিশ্রণে ঢেলে দিতে হয়।

জল (৫২° সে)	৮০ মি.লি.
সোডিয়ম সালফাইট (শুষ্ক)	১৫ গ্রাম
অ্যাসিটিক অ্যাসিড (২৮%)	৪৮ মি.লি.
পটাশিয়ম অ্যালাম	১৫ গ্রাম
সময় ১০ থেকে ১৫ মিনিট	

ইন্‌টেন্‌সিফায়ার ও রিডিউসার

পরিস্ফুটনের পর ফিল্‌মের ঘনত্ব কম বা বেশি হয়ে গেলে, ফিল্‌মকে ঠিক মাত্রায় আনার জন্য এই ইনটেনসিফায়ার বা রিডিউসারের প্রয়োগ করা হয়। এই কাজ সাধারণ ঘরের আলোতেই করা যায়। ডার্করুমের প্রয়োজন হয় না। তবে ফিল্‌মকে ভালভাবে ওয়াশ করার পরই প্রয়োগ করতে হয়।

ইন্‌টেন্‌সিফায়ার (Intensifier) পাতলা ফিলমকে ঘন করার জন্য।

১.	জল	৫০০ মি. লি

বোরিক অ্যাসিড পাউডার সহজে জলে মিশে যায় না, সেজন্য বোরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল ব্যবহার করা প্রয়োজন।

পটাশিয়ম ডাইক্রোমেট (ক্রিস্টাল)	৪.৫ গ্রাম
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	৩ মি. লি.

এই দ্রবণে ফিল্মটি দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকলে প্রতিচ্ছবি ক্রমশ হালকা খয়েরি রঙ ধারণ করবে। খুব হালকা হবার পর পরিষ্কার জলে ভালভাবে ধুয়ে যে কোন সাধারণ ডেভেলাপারে পরিস্ফুটন করে নিলেই নেগেটিভ অপেক্ষাকৃত ঘন হয়ে যাবে। প্রথমবার করার পর যদি যথেষ্ট ঘন না হয় ঐ পদ্ধতি পুনরায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২. আর একটি ইনটেন্সিফায়ারের সংগঠন এই রকম। প্রয়োগ পদ্ধতিও একই।

পটাশিয়ম বাইক্রোমেট (১০%)	২৫ মি. লি.
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	০.৬ মি. লি.
জল	২০০ মি. লি.

রিডিউসার

ঘন নেগেটিভকে পাতলা করার জন্য।

"ফার্মার্স রিডিউসার" নামে পরিচিত সরল এই রিডিউসারটির সংগঠন :

ক.	জল	৫০০ মি. লি.
	হাইপো	১০০ গ্রাম
খ.	জল	৫০০ মি.লি.
	পটাশিয়ম ফেরিসায়ানাইড	৪ গ্রাম

ব্যবহার করার ঠিক আগে সমান পরিমাণ 'ক' দ্রবণ ও 'খ' দ্রবণ মিশিয়ে নিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। যখন দেখা যাবে প্রয়োজনমত নেগেটিভ পাতলা হয়েছে তখন তুলে নিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফিক্স করতে হবে।

টোনিং

টোনিং সবই সাধারণ ঘরের আলোয় করা যায়। ডার্করুমের প্রয়োজন হয় না। টোনিং করার আগে সাদা-কালো মুদ্রণকে ভালভাবে ফিক্স ও ওয়াশ করে নেওয়া প্রয়োজন।

সিপিয়া টোনিং

দুটি দ্রবণ প্রয়োজন। প্রথমটি ফেরিসায়ানাইড দ্রবণ যাতে সাদা-কালো মুদ্রণটি bleach করে নিতে হয়। দ্রবণটির সংগঠন :

জল	১০০০ মি.লি.
পটাশিয়ম ফেরিসায়ানাইড	১৪ গ্রাম
পটাশিয়ম ব্রোমাইড	১৪ গ্রাম
তরল অ্যামোনিয়া	২০ ফোঁটা

এই দ্রবণে ছবিটি ধীরে ধীরে হালকা হয়ে যাবার পর মুদ্রণটিকে তুলে নিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিচের সালফাইড দ্রবণে দিতে হবে।

জল	৫০০ মি. লি.
সোডিয়ম সালফাইড	৭ গ্রাম

এক মিনিটের মধ্যেই সুন্দর সিপিয়া রঙ ধরে গেলে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। ফেরিসায়ানাইড দ্রবণটি বোতলে ভরে রাখলে বহুদিন থাকে ও অনেক বার ব্যবহার করা যায়। সালফাইড দ্রবণ প্রয়োজনমত পরিমাণে তৈরি করে ব্যবহার করার পরই ফেলে দিতে হয়। ডার্ক-ব্রাউন রঙ করার প্রয়োজনে ছবিটিকে সম্পূর্ণ bleach না করলেই হবে। সিপিয়া টোনিং-এর জন্য সাদা-কালো মুদ্রণটি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ডার্ক প্রিন্ট করলে ফল ভাল হয়। এই টোনিংকে 'সালফাইড টোনিং'-নামেও উল্লেখ করা হয়।

ব্লু টোনিং

ব্লু টোনিং এর জন্য সাদা-কালো মুদ্রণটি একটু হালকা করলে ভাল হয়।

ফেরিক অ্যামোনিয়ম সাইট্রেট (১০%)	১ ভাগ
পটাশিয়ম ফেরিসায়ানাইড (১০%)	১ ভাগ
অ্যাসিটিক অ্যাসিড (১০%)	১০ ভাগ

এই দ্রবণে ছবিটি রঙ করার পর পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়ার জলে সামান্য অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে নিলে ভাল হয়। কারণ জলে ক্ষারের (Alkaline) জন্য নীল রঙ সামান্য নষ্ট হতে পারে।

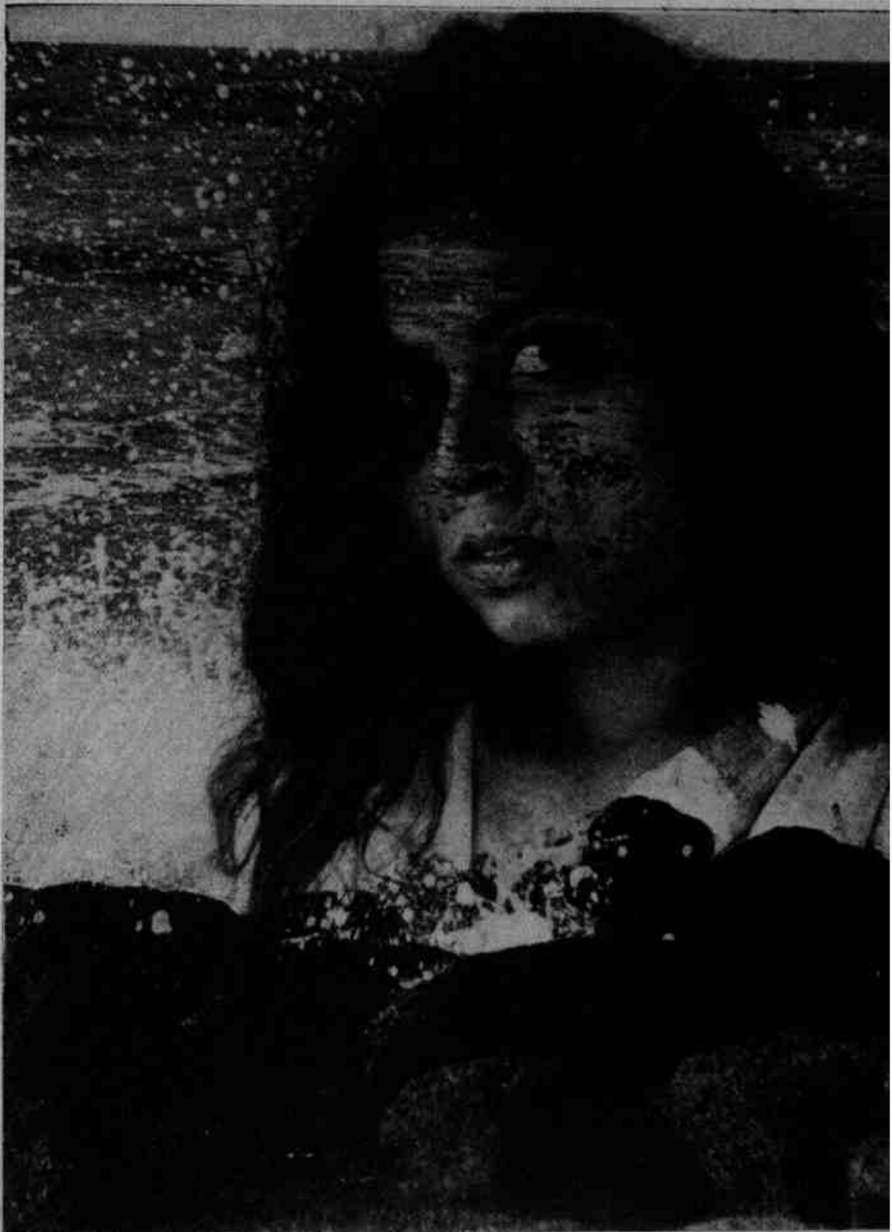
প্রয়োজনীয় তথ্য

১. সমস্ত রাসায়নিক যে পর্যায়ক্রমে দেওয়া আছে ঠিক সেইভাবে পর পর মেশাতে হবে। একটি রাসায়নিক সম্পূর্ণ মিশে যাবার পরই পরবর্তী রাসায়নিক মেশাতে হয়।

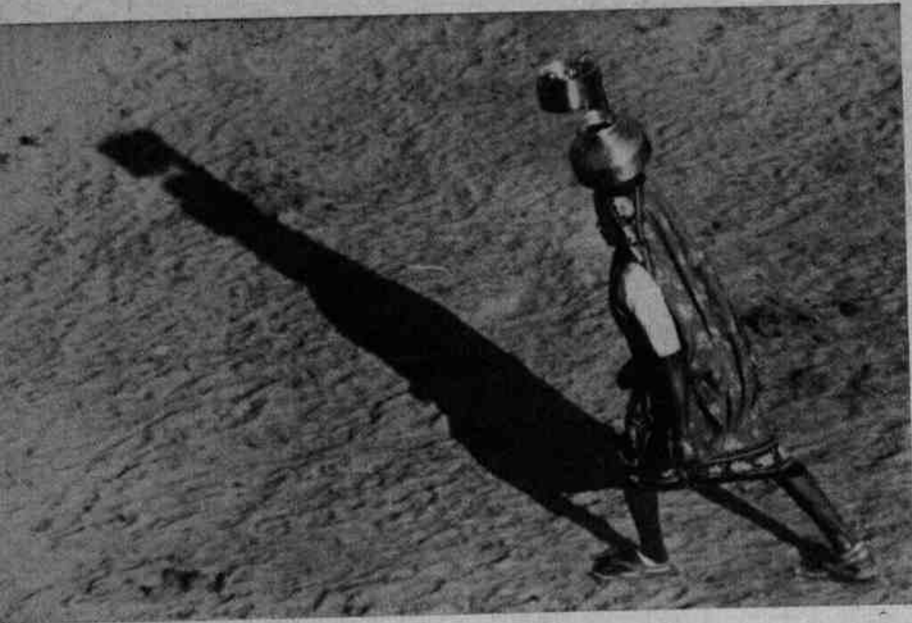
২. ২৮% অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করতে হলে ৩ ভাগ গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে ৮ ভাগ জল মেশাতে হবে।

৩. পরিস্ফুটনের জন্য সঠিক যে সময় প্রয়োজন তা নির্ভর করে তাপমাত্রা ছাড়াও ফিল্মের দ্রুতি ও বিভিন্ন ফিল্মের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর। সেজন্য সবই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই ফোটোগ্রাফারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিতে পরিস্ফুটন-কাল বাড়ে বা কমে। সাধারণভাবে প্রতি ২°ফা. তারতম্যে ৫% হারে পরিস্ফুটন-কাল বাড়ে বা কমে। সেন্টিগ্রেড থেকে ফারেনহাইটে পরিবর্তন — সে° × ১.৮+৩২=ফা°

৪. সমস্ত ফোটো রাসায়নিক যতদূর সম্ভব বাতাসের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে রাখা উচিত। বাতাসের সংস্পর্শে যত কম আসবে তত বেশি দিন ভাল থাকবে। রঙীন শিশিতে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে রাখলে রাসায়নিকের কার্যকারী ক্ষমতা অনেক দিন বজায় থাকে।



R. Dutta



R. Dutta

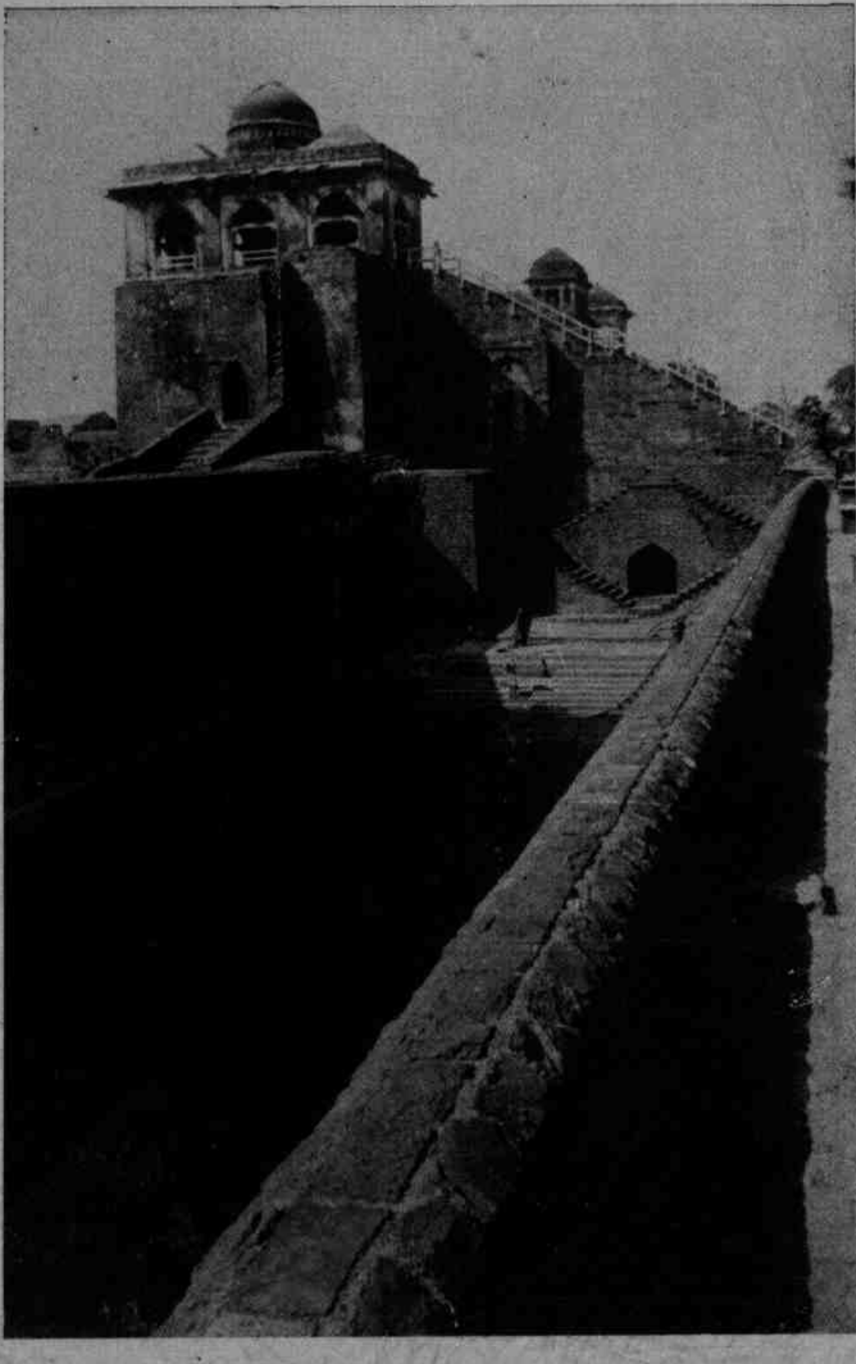




R. Dutta



R. Dutta



R. Dutta

ফোটোগ্রাফির অভিধান

অভিধান

অটো আই

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশলাইটে ব্যবহৃত সেনসর যা বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর পরিমাণ পরিমাপ করে ফ্ল্যাশের আলোকসম্পাতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাতের ফলে ফ্ল্যাশগানের শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয় না এবং ক্যাপাসিটরে সবসময়ই কিছু শক্তি সঞ্চিত থাকে। ফলে ব্যাটারির শক্তি ক্ষয় হয় কম। ইলেকট্রনিক আই বা কম্প্যুটার আই নামেও এটি পরিচিত।

অটো ওয়াইণ্ডার

একটি ছবি তোলার পর পরবর্তী ফিল্ম ফ্রেম স্বয়ংক্রিয় ভাবে দ্রুত এগিয়ে আনার জন্য মোটর চালিত যন্ত্র যা আধুনিক বহু এস. এল আর. ক্যামেরার নিচে লাগিয়ে ব্যবহার করা যায়। দ্রুত ক্রমান্বয়ে ছবি তোলার অত্যন্ত উপযোগী এই যন্ত্রটি পাওয়ার ওয়াইণ্ডার নামেও পরিচিত।

অটো কনভার্টার

একটি সাধারণ লেন্স যা ক্যামেরার লেন্সের সঙ্গে লাগিয়ে ক্যামেরা লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ দুই বা তিনগুণ বাড়ানো যায়। বিবর্ধনের অনুপাত অনুযায়ী কনভার্টারে লেখা থাকে ২ গুণিতক (×) বা ৩ গুণিতক। এটির ব্যবহারে আলোক-প্রবেশের পরিমাণ কমে যায় বলে আলোকপাতের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াতে হয় এবং প্রতিচ্ছবির বিকৃতিও বৃদ্ধি পায়। টেলিকনভার্টার, টেলিএক্সটেনডার ইত্যাদি নামেও এটি পরিচিত।

অটোমেটিক ডায়াফ্রাম

এই ব্যবস্থায় লেন্সের ডায়াফ্রাম কমানো হলেও ক্যামেরার শাটার না টেপা অবধি লেন্স সম্পূর্ণ খোলা থাকে, ফলে এস. এল. আর. ক্যামেরার ভিউইং স্ক্রীন উজ্জ্বল থাকে ও ফোকস করার খুব সুবিধা হয়। শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে আলোকপাতের পূর্ব মুহূর্তে ডায়াফ্রাম স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্দিষ্ট ষ্টপে চলে আসে।

আটোমেটিক মিটার

ক্যামেরার মধ্যে বসানো এক্সপোজার মিটার যা বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর পরিমাণ পরিমাপ করে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ক্যামেরা লেন্সের অ্যাপারচার ও/ বা শাটার দ্রুতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে গড় আলোকপাতের ক্ষেত্রে সমস্যা না থাকলেও, আলোকপাতের পরিমাণ ইচ্ছেমত কমানো বা বাড়ানো যায় না।

অটোস্ক্রীন

অর্থোক্রোমেটিক শিট ফিল্ম যার সাহায্যে ছাপাখানায় হাফটোন ছবির যে প্রিন্ট তৈরি হয় তার মত ছোট ছোট বিন্দু সমন্বিত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সাধারণত বিজ্ঞাপনের

জন্য কমার্শিয়াল ফোটোগ্রাফিতে ও চিত্ররসের প্রয়োজনে পিকটোরিয়াল ফোটোগ্রাফিতে এই স্ক্রীনের ব্যবহার ঘটে।

অপটিক্স/অপটিকাল এলিমেন্ট

সাধারণ অর্থে দৃষ্টি ও আলোক সংক্রান্ত বিজ্ঞান। ফোটোগ্রাফিতে আলোর সাহায্যে লেন্স যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে তা ত্রুটিমুক্ত করার কাজে এই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়। প্রতিচ্ছবিকে এইভাবে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য কয়েকটি লেন্সের সহযোগে যে সম্পূর্ণ, যৌগিক লেনস গঠন করা হয় তার প্রতিটি একক লেন্সকে অপটিকাল এলিমেন্ট বলে।

অর্থোক্রোমেটিক ইমালশন

আক্ষরিক অর্থে যে আলোক-সংবেদনশীল অবদ্রব বর্ণমাত্র, ঔজ্জ্বল্য ও সম্পৃক্তির তারতম্য অনুসারে সমস্ত রঙের প্রতি সঠিকভাবে সংবেদনশীল—গ্রীক শব্দ 'অর্থো' হল সঠিক ও 'ক্রোমা' হল রঙ। কিন্তু বাস্তবে ফিলম বা কাগজে ব্যবহৃত এই অবদ্রব লাল রঙের প্রতি সংবেদনশীল নয়। প্রথম প্রচলনের সময় এই অবদ্রবকে ভুলভাবে এই নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

অ্যাকুটেন্স

ফিলমের ওপর প্রাপ্ত প্রতিচ্ছবির প্রান্তভাগের তীক্ষ্ণতা। আলোকরশ্মি ফিলমের অবদ্রবে সামান্য বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণতা ব্যাহত করে। ফিলমের নিজস্ব কণাময়তার সঙ্গে এই তীক্ষ্ণতার কোন সম্পর্ক নেই। স্থূল কণাযুক্ত ফিলমে প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণতা সূক্ষ্মতর কণাযুক্ত ফিলমে প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষা বেশি হতে পারে। কনট্যুর শার্পনেস নামেও এটি পরিচিত।

অ্যাডাপটিং রিং

ক্যামেরাতে অন্য মাপের লেনস বা ফিলটার ব্যবহার করার প্রয়োজনে এই রিং ব্যবহার করা হয়। রিংয়ের একদিক ক্যামেরা মাউন্টের সঙ্গে ও অপরদিক লেন্স বা ফিলটার মাউন্টের সঙ্গে ঠিকভাবে লাগাবার মত করে এই রিং তৈরি। এই রিং প্রয়োজন মত একদিকে বেয়নেট ও অপর দিকে স্ক্রু, অথবা দুদিকেই স্ক্রু, অথবা দুদিকেই বেয়নেট যে কোন ধরনেরই পাওয়া যায়।

অ্যাডিটিভ প্রোসেস

যে দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে রঙীন ছবি সৃষ্টি করা হয় অ্যাডিটিভ প্রোসেস বা যুত পদ্ধতি তার একটি। তিনটি প্রাথমিক রঙের (নীল, সবুজ ও লাল) আলোকরশ্মির আনুপাতিক মিশ্রণই সাদা সমেত সমস্ত রঙের আলোর উৎস। তিনটি প্রাথমিক রঙ আনুপাতিক হারে যোগ করে বিভিন্ন রঙ সৃষ্টি করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে যুত পদ্ধতি বলে।

অ্যানাসটিগম্যাট

অ্যাসটিগম্যাটিজম দ্রষ্টব্য।

অ্যাপারচার

লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোক-প্রবেশের স্থান। আইরিস ডায়াফ্রামের সাহায্যে এই স্থান বা অ্যাপারচারকে ছোট বা বড় করে ফিল্মের ওপর আলোকপাতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ অনুসারে এফ সংখ্যার দ্বারা লেন্সের অ্যাপারচার বোঝানো হয়ে থাকে।

অ্যাফোকল অ্যাডাপ্টার

টেলিস্কোপের আইপিসের সঙ্গে ক্যামেরাকে সংযুক্ত করার জন্য যে রিং (কাপ্লিং রিং) ব্যবহার করা হয়।

অ্যাফোকল মেথড

সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে ছবি তোলার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ক্যামেরা লেনসকে অসীম দূরত্বে ফোকস করে, অ্যাফোকল অ্যাডাপটারের মাধ্যমে টেলিস্কোপের আইপিসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এবং ক্যামেরা ও টেলিস্কোপ উভয় লেন্সের সাহায্যে দূরের জগতের ছবি তোলা হয়ে থাকে।

অ্যাবেরেশন

লেন্সের বিভিন্ন ত্রুটি। আলোব সাহায্যে লেন্স যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে তা কখনই বস্তুর সঠিক প্রতিরূপ নয়। প্রতিচ্ছবির প্রধান অস্বাভাবিকতা সাত রকমের হতে পারে যা লেন্সের ত্রুটি হিসাবেই বিবেচ্য। এই সাতটি ত্রুটি হল—১. গোলীয় ২. কোমা ৩. অ্যাসটিগম্যাটিক বা বিষমদৃক ৪. ক্ষেত্র বক্রতা ৫. বিকৃতি ৬. রঙের অনুদৈঘ ত্রুটি ৭. রঙের পার্শ্বিক ত্রুটি। প্রতিচ্ছবিকে এই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যই বিভিন্ন ধরনের কয়েকখানি লেনসের সহযোগে যৌগিক লেনস গঠন করা হয়।

অ্যাভারেজিং মিটার

ক্যামেরায় ব্যবহৃত আলোক পরিমাপের তিন ধরনের CdS মিটারের একটি। অ্যাভারেজিং মিটার লেন্সের কৌণিক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত আলোকিত ও অনালোকিত অংশের আলোকের পরিমাপ করে গড় আলোকপাতের পরিমাণ নির্দেশ করে। দ্বিতীয় ধরনের মিটার হল স্পট মিটার যা শুধুমাত্র ফ্রেমের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট অংশের আলোকের পরিমাপ করে। তৃতীয় ধরনের মিটার সেণ্টার ওয়েটেড মিটার ফ্রেমের সমগ্র অংশের আলোকের পরিমাপ করলেও কেন্দ্রাংশের আলোকের পরিমাণের ওপর অধিকতর গুরুত্ব (৬০%) দেয়। তবে সমস্ত ক্ষেত্রেই মধ্য ধূসরতার (১৮% গ্রে কার্ড) উপযুক্ত আলোকপাত নির্দেশ করে।

অ্যাসটিগম্যাটিজ্ম

লেন্সের একটি ত্রুটি। এই ত্রুটির ফলে লেন্সের কেন্দ্রবিন্দুর মধ্য দিয়ে যাওয়া অনুভূমিক

রেখা ও উল্লম্ব রেখা একই সঙ্গে ফোকস করা যায় না। আপতিত আলোকরশ্মির অসমান প্রতিসরণের দরুন এই দুই রেখার ফোকস তল পৃথক হয়ে যায়। পজিটিভ ও নেগেটিভ লেন্‌স (অপটিকাল এলিমেন্ট)-এর সংযোগে এই ত্রুটি দূর করা যায়। এই ত্রুটিমুক্ত লেন্‌সকে অ্যানাসটিগ্‌ম্যাট লেন্‌স বলে।

অ্যাস্‌ফেরিকাল লেন্‌স

গোলীয় ত্রুটিমুক্ত অগোলাকার লেন্‌স। লেন্‌সের অ্যাপারচার যত বাড়ানো (এফ সংখ্যা যত কমানো) হয়, প্রতিচ্ছবির সমগ্র অংশে গোলীয় ত্রুটি সংশোধন করা তত কঠিন হয়ে পড়ে ফলে উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন লেন্‌স যার সাহায্যে বড় অ্যাপারচারে গ্রহণযোগ্য ও ছোট অ্যাপারচারে উত্তম মানের প্রতিচ্ছবি পাওয়া সম্ভব তার গঠন প্রণালী অত্যন্ত জটিল। শক্তিশালী লেন্‌সের গোলীয় ত্রুটি হ্রাস করার সহজ উপায় লেন্‌সের উপরিভাগকে অগোলাকার করা। কিন্তু লেন্‌সের অগোলাকার উপরিভাগকে ফোটোগ্রাফির পক্ষে উপযুক্ত করে পালিশ করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সেজন্য এই লেন্‌সের ব্যবহার যথেষ্ট সীমিত। অধিকতর ত্রুটিশূন্যতা, তীক্ষ্ণ অনুপুঙ্খ ধরার ক্ষমতা ও উচ্চ দ্রুতি এই লেন্‌সের প্রধান বিশেষত্ব। ছাঁচে ঢালা অগোলাকার উপরিভাগ অনেক সময় কনডেনসার ও ভিউফাইণ্ডার হিসাবে ব্যবহার করা হয় যার উপরিভাগের পালিশ ফোটোগ্রাফির লেন্‌সের মত যথেষ্ট না হলেও চলে।

আই. এস. ও

এ. এস. এ দ্রষ্টব্য

আগ্‌ফাকালার

১৮৯৭ সনে du Hauron একই ফিল্‌মের ওপর তিনটি প্রাথমিক রঙের প্রতি সংবেদনশীল তিনটি অবদ্রবের স্তর পরপর ব্যবহার করে বহুরঙা নেগেটিভ ফিল্‌ম তৈরির পেটেন্ট নেন। কিন্তু ১৯৩৫ সনের আগে পর্যন্ত এই ফিল্‌ম ব্যবসায়িক ভাবে প্রস্তুত করা ও নেগেটিভ সিলভার প্রতিচ্ছবিকে রঙীন পজিটিভে পরিবর্তিত করার সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৫-এ প্রথম দুটি রঙীন ফিল্‌ম বাজারে এল—একটি জার্মানির 'আগ্‌ফাকলার', অপরটি আমেরিকার 'কোডাক্রোম'। কোডাক্রোম ফিল্‌মে রঞ্জকের উপাদান ব্যবহার করা হত পরিস্ফুটনের সময় এবং একমাত্র ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানিই এই ফিল্‌ম পরিস্ফুটন করত। কিন্তু আগ্‌ফাকলার ফিল্‌মে রঞ্জকের উপাদান অবদ্রবের মধ্যেই ব্যবহার করা হত, ফলে ফিল্‌ম ব্যবহারকারীরাও এই ফিল্‌ম পরিস্ফুটন করতে পারতেন। এই দুটি ফিল্‌মই ছিল রিভার্সাল বা রঙীন ট্রান্সপেরেন্সি ফিল্‌ম। ১৯৩৯ সনে আগফা কোম্পানি 'আগ্‌ফাকালার নেগেটিভ' নামে সিনেমার জন্য ৩৫ মি. মি. ও ১৯৪২ সনে কাগজে রঙীন ছবি মুদ্রণের উদ্দেশ্যে স্থিরচিত্রের জন্য নেগেটিভ ফিল্‌ম বার করে। ১৯৪২-এ ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানিও 'কোডাকলার' নাম দিয়ে রঙীন নেগেটিভ ফিল্‌ম বাজারে ছাড়ে।

আণ্ডারওয়াটার ফোটোগ্রাফি

বাতাসে ও জলে আলোর সঞ্চরণ ও প্রতিসরণের বিবিধ তারতম্য জলের নিচে ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। এই তারতম্যগুলির ফলে প্রথমত, জলের নিচে কোন বস্তুকে আমরা বাস্তব দূরত্ব অপেক্ষা প্রায় সিকিভাগ কাছে দেখি এবং বস্তু আমাদের চোখে বা লেন্‌সে সামান্য বিবর্ধিত আকারে ধরা পড়ে। দ্বিতীয়ত, লেন্‌সের কৌণিক ক্ষেত্র কমে যায় বা ফোকস দৈর্ঘ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, প্রতিফলিত ও শোষিত হওয়ার ফলে আলোকের পরিমাণ অনেক কমে যায় এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ জলেরও অতি সূক্ষ্ম কণা আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত ও সীমিত করে। চতুর্থত, আলোক-বর্ণালির লাল, কমলা ও হলুদ আলো জলের গভীরে ক্রমশঃ শোষিত হয়ে যায়। জলের নিচে ফোটোগ্রাফির জন্য জল-প্রতিরোধী আবরণের মধ্যে রেখে যে কোন উচ্চদ্রুতি লেন্‌সযুক্ত ক্যামেরা ব্যবহার করা গেলেও এই কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ক্যামেরাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌স লাল ফিল্‌টার, উচ্চ দ্রুতির ফিল্‌ম (৪০০ এ. এস. এ.) এবং ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশও এর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

আলট্রাভায়োলেট ফিল্‌টার

তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালির নীল অতিক্রান্ত হ্রস্বতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (৩৮০ মি. মা-র নিচে ও সাধারণভাবে ২০০ মি. মা. পর্যন্ত) রশ্মি অতিবেগনি রশ্মি নামে পরিচিত, যা আমাদের দৃষ্টিগোচর না হলেও ফোটোসংবেদনশীল অবদ্রবের ওপর ক্রিয়া করে। দূর পটভূমিতে ও মেঘলা আবহাওয়ায় এই রশ্মি অধিকতর মাত্রায় বিকিরীত হয়। পরিষ্কার সূর্যালোকে ও দূর বহির্দৃশ্যে যে অস্পষ্টতা (haze) ও নীল আভা লক্ষ্য করা যায় তা এই অতিবেগনি রশ্মির ফল। বায়ুমণ্ডলে ও দূর দিগন্তে অতিবেগনি রশ্মিজনিত নীল আভা ও অস্পষ্টতা দূর করে ছবিতে অধিকতর বৈষম্য আনার প্রয়োজনে বহির্দৃশ্যে, অধিক উচ্চ পাহাড়ের ওপর বা এরিয়েল ফোটোগ্রাফিতে আলট্রাভায়োলেট বা ইউ. ভি. ফিল্‌টার ব্যবহার করা প্রয়োজন। অস্পষ্টতা দূর করে বলে এই ফিল্‌টার হেজ ফিল্‌টার নামেও পরিচিত। এর ফিল্‌টার ফ্যাক্টর শূন্য। টাংস্টেন আলোযুক্ত বিবর্ধক যন্ত্রেও এই ফিল্‌টার ব্যবহার করা হয়।

ইউনিভার্সাল ক্যারিয়ার

বিবর্ধক যন্ত্রের যে নেগেটিভ ক্যারিয়ারে বিভিন্ন আকারের নেগেটিভ ব্যবহার করা যায়।

ইউনিভার্সাল ডেভেলাপার

বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে প্রস্তুত পরিস্ফুটনের দ্রবণ যার সাহায্যে সব রকম ফিল্‌ম, স্লাইড বা মুদ্রণের কাগজ পরিস্ফুটন করা সম্ভব।

ইজেল

ছবি বিবর্ধনের জন্য মুদ্রণের কাগজ সমানভাবে ধরে রাখার সমতল সাদা বোর্ড। এই বোর্ডের ধারে বিভিন্ন মাপের দাগ দেওয়া, কব্জাযুক্ত দুটি ফ্রেমের সঙ্গে দুটি চ্যাপ্টা ধাতুর

পাত লাগানো থাকে। এই ধাতুর পাতদুটিকে দাগ দেওয়া মাপ অনুযায়ী প্রয়োজনমত কম বেশি করে নির্দিষ্ট মাপের ছবি মুদ্রণ করার সুবিধা হয়। ইলেকট্রনিক ইজেল নির্দিষ্ট মাপের ছবি পেতে সাহায্য করা ছাড়াও আলোকের পরিমাপ করে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সঠিক আলোকপাতের ব্যবস্থা করে। ইজেলকে বাঁকিয়ে নেগেটিভের সঙ্গে মুদ্রণের কাগজের তলের তারতম্য বা বৈষম্য ঘটিয়ে প্রতিচ্ছবিতে যে বিকৃতি আনা হয় তাকে ইজেল ডিস্টর্শন বলে। প্রায়শই ইচ্ছাকৃতভাবে ছবিতে এই বিকৃতি এনে নেগেটিভের রৈখিক ত্রুটি সংশোধন করা, ছবিতে গতিময়তা আনা বা বস্তুবিকৃতির মাধ্যমে বক্তব্যের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা হয়।

ইনটারনাল রিফ্লেকশন

ফ্লেয়ার দ্রষ্টব্য।

ইনটেনসিফিকেশন

প্রতিচ্ছবির ঘনত্ব ও বৈষম্য বাড়াবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে নীল ও অতিবেগনি রশ্মি শোষিত করে অথবা কিছু ধাতব কণা সৃষ্টি করে প্রতিচ্ছবির ঘনত্ব বৃদ্ধি করা হয়। অনেক সময় দুটি পদ্ধতি একসাথেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত কম পরিস্ফুটনজনিত নেগেটিভের হালকা প্রতিচ্ছবিকে স্পষ্টতর করার প্রয়োজনে এই পদ্ধতির ব্যবহার ঘটে। নেগেটিভে ধাতব কণা যোগ করা হয় নানা রকমের রাসায়নিক মিশ্রণের সাহায্যে । তবে বেশিরভাগ সময়েই নেগেটিভকে একটি দ্রবণে প্রথমে ব্লিচ করে অদ্রবণীয় সিলভার কম্পাউণ্ডকেও লবণে পরিণত করে পুনরায় পরিস্ফুটন করে নেওয়া হয়। একই দ্রবণে ইনটেনসিফিকেশন সম্পূর্ণ করার জন্য সাধারণত মারকিউরিক ক্লোরাইড ও পটাশিয়ম আয়োডাইডের সঙ্গে সোডিয়াম সালফাইট বা হাইপো মিশ্রিত দ্রবণের আথবা মারকিউরিক ক্লোরাইডের সঙ্গে থিওসায়ানেট দ্রবণের ব্যবহার প্রচলিত।

ইনফ্রারেড ফিল্ম

তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির লাল অতিক্রান্ত দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (৭৬০ মি. মা.-র ওপরে ও সাধারণভাবে ১৫০০ মি. মা. পর্যন্ত) রশ্মি অবলোহিত রশ্মি যা আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। এই আলোকরশ্মি প্রায় সমস্ত বস্তু থেকেই বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মির ছবি বিশেষভাবে প্রস্তুত কালো-সাদা অথবা রঙীন ইনফ্রারেড ফিল্মের সাহায্যে তোলা সম্ভব। সাধারণত অন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মিকে বাদ দিয়ে অবলোহিত রশ্মিতে ছবি তোলার জন্য কালো-সাদা ইনফ্রারেড ফিল্মের সঙ্গে লাল ফিলটার ব্যবহার করা হয়। তেমনি সাধারণভাবে রঙীন ইনফ্রারেড ফিল্মের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় হলুদ ফিলটার। অবলোহিত রশ্মি বস্তুর বর্ণমাত্র ও টোনের মাত্রায় যে পরিবর্তন ঘটায় তা স্বাভাবিকভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু ইনফ্রারেড ফিল্মে যখন তা ধরা পড়ে তখন বস্তুর ছবি আমাদের কাছে অবাস্তব ও অতিনাটকীয় মনে হয়। কালো-সাদা অবলোহিত ছবিতে নীল আকাশকে কালো ও

সবুজ গাছপালাকে বরফের মত সাদা দেখায়। রঙীন অবলোহিত ছবিতে সবুজ হয়ে যায় ম্যাজেন্টা, লাল হয়ে যায় হলুদ এবং বিভিন্ন রঙের ফিল্টার ব্যবহার করলে এই সব রঙেরও অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। অবলোহিত আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ বেশি হওয়ার দরুন তার প্রতিসরণের ক্ষমতা অনেক কম, ফলে এই ফিল্ম ব্যবহার করার সময় ফোকাসের তারতম্য করা প্রয়োজন। ক্যামেরা লেনসের ফোকস মাউন্টে লাল চিহ্ন বা আই. আর. অক্ষর দুটি দিয়ে এক্ষেত্রে ফোকসের সঠিক অবস্থান কোন্‌টি তা নির্দেশ করা থাকে। রাত্রে জীবজন্তুকে সচকিত না করে সম্পূর্ণ অন্ধকারেও এই ফিল্মে ছবি তোলা যায়। কৃষি-গবেষণায় ও চিকিৎসার কাজেও ইনফ্রারেড ফোটোগ্রাফির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইনভার্টেড টেলিফোটো লেনস

স্বল্প ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌স এলিমেণ্টগুলি টেলিফোটো লেন্‌সের বিপরীত ক্রমে সাজিয়ে যে আলট্রাওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্‌স তৈরি করা হয়। এই ধরনের লেন্‌সের ব্যাক-ফোকস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হওয়ার ফলে ছোট ফর্ম্যাট ক্যামেরায়—যাতে শাটার, মিরর ইত্যাদি খুব কাছাকাছি অবস্থানে রাখতে হয়— এই লেন্‌স ব্যবহার করায় বিশেষ সুবিধা হয়। ৩৫ মি. মি. ক্যামেরায় ব্যবহারোপযোগী 'ফিশ আই' লেন্‌স এই ধরনের লেন্‌স।

ইনসিডেন্ট লাইট মিটার

রিফ্লেকটেড লাইট মিটার দ্রষ্টব্য

ইনহিবিশন প্রোসেস

ডাই ট্রান্সফার প্রোসেস দ্রষ্টব্য।

ইমালশন

জিলেটিনের সঙ্গে সিলভার হ্যালাইড স্ফটিকের অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম পলিমারের সঙ্গে সিলভার হ্যালাইড স্ফটিকের মিশ্রণকে ফোটোগ্রাফির ভাষায় ইমালশন বা অবদ্রব বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে এটি ঠিক মিশ্রণ নয়, কারণ হ্যালাইড দানাগুলি জিলেটিনে ছড়ানো থাকে। আলোক-সংবেদনশীল হ্যালাইড দানাগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহারোপযোগী করার ও সেগুলিকে ঠিকভাবে ধারণ করে রাখার প্রয়োজনেই জিলেটিনের ব্যবহার। নেগেটিভ অবদ্রবে সিলভার ব্রোমাইডের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে সিলভার আয়োডাইড এবং মুদ্রণের কাগজে সিলভার ক্লোরাইড বা সিলভার ব্রোমাইড অথবা উভয়ের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। নেগেটিভ অবদ্রবে স্ফটিকগুলির আকার ও পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ইমেজ

বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো নিয়ন্ত্রণ করে ত্রিমাত্রিক বস্তুর যে দ্বিমাত্রিক প্রতিরূপ পাওয়া যায় তাকেই ফোটোগ্রাফিতে ইমেজ বা প্রতিচ্ছবি বলে। প্রতিচ্ছবি দৃশ্যগোচর বা লীন দুইই হতে পারে।

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ

গ্যাসভর্তি টিউবের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে গ্যাস প্রজ্বলিত করে ছবি তোলার জন্য যে উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করা হয়। প্রোফেসর হ্যারল্ড এড্‌গারটন ১৯৩১ সালে পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। ১৯৪০ সাল নাগাদ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রথম প্রচলনের পর থেকে ক্রমশঃ এর দ্রুত উন্নতি হয় এবং বর্তমানে এটি প্রায় একমাত্র প্রচলিত ফ্ল্যাশলাইট।

ইলেকট্রোফোটোগ্রাফি

পদার্থের বৈদ্যুতিক ধর্মের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির প্রক্রিয়া। ইলেকট্রোফোটোগ্রাফি অন্তত দুভাবে হয়ে থাকে—জেরোগ্রাফি ও ইলেকট্রোফাক্স। জেরোগ্রাফি একটি অরাসায়নিক ফোটোপদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি সুষমভাবে আহিত আলোক-পরিবাহী অন্তরক অবদ্রব আলোকপাতের ফলে প্রতিচ্ছবি অনুযায়ী তড়িৎ ক্ষরণ করে যে তড়িদ্‌স্থিতীয় লীন প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে তার ওপর এক ধরনের সূক্ষ্ম পাউডার অবক্ষেপ করে এই প্রতিচ্ছবিকে পরিস্ফুটনের মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর করা হয়। আর ইলেকট্রোফাক্স পদ্ধতিতে আলোক-সংবেদনশীল উপাদানটি হল জিঙ্ক অক্সাইডের মত কোন আলোক-পরিবাহী বস্তু ও কৃত্রিম রেজিনের মত কোন অন্তরক আসঞ্জকের মিশ্রণ। আলোকপাতের সাহায্যে যে লীন প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয় কোন নির্দিষ্ট পরিস্ফুটকের ভৌত অবক্ষেপণের মাধ্যমে তা দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। বর্তমানে আরও একটি পদ্ধতিতে—পারসিস্‌টেন্ট ইন্‌টারনাল পোলারাইজেশন-এর সাহায্যে—ইলেকট্রোফোটোগ্রাফির কাজ করা হয়ে থাকে।

এ. এস. এ.

পূর্বতন আমেরিকান স্ট্যাণ্ডার্ডস অ্যাসোসিয়েশন-এর সংক্ষিপ্ত রূপ যা বর্তমানে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত। ফিল্‌মের দ্রুতি বা আলোক-সংবেদনশীলতা পরিমাপ করার একক। গাণিতিক নিয়মে উচ্চতর সংখ্যা অধিকতর দ্রুতির নির্দেশক। অধুনা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ডস অর্গানাইজেশন-এর নামানুসারে ফিল্‌ম দ্রুতি আই. এস.ও সংখ্যায় চিহ্নিত করা হয়, যাতে এ. এস.এ ও ডি. আই. এন উভয় সংখ্যারই উল্লেখ করা থাকে।

এক্সটেনশন টিউব

সাধারণত ছোটি আকারের ক্যামেরায় ব্যবহার করার জন্য ধাতুর তৈরি ছোটি নল যার সাহায্যে লেন্‌স থেকে ফিল্‌মের দূরত্ব বাড়িয়ে প্রতিচ্ছবিকে বিবর্ধিত করা হয়। প্রতিচ্ছবির বিবর্ধনের গুণিতকে নলের আকার বড় হয়ে ২ গুণ, ৩ গুণ ইত্যাদি হয়। গুণিতক যত বেশি হয় আলোকপাতের পরিমাণও তত বাড়াতে হয়।

এক্সপোজার

আলোক-সংবেদনশীল বস্তুর ওপর আলোকপাতের সময় ও পরিমাণের প্রতিক্রিয়াকে ফোটোগ্রাফির ভাষায় এক্সপোজার বলা হয়। ক্যামেরার নির্দিষ্ট শাটারদ্রুতি অনুসারে

আলোকপাতের সময় সমগ্র প্রতিচ্ছবিতে একই থাকে, কিন্তু বস্তুর বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির শক্তির তারতম্যই প্রতিচ্ছবির বিভিন্ন অংশের ঔজ্জ্বল্যের প্রভেদ ঘটায়। আলোকপাত পরিমাপ করার জন্য একক হিসাবে ধরা হয় মিটার ক্যাণ্ডল সেকেণ্ড বা ফুট ক্যাণ্ডল সেকেণ্ডকে অর্থাৎ একটি সাধারণ মোমবাতি ১ মিটার/১ ফুট দূরত্ব থেকে এক সেকেণ্ড সময়ে যে পরিমাণ আলোকপাত করে।

এক্সপোজার ইনডেক্স

ফিল্মের দ্রুতি বা আলোক-সংবেদনশীলতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ফিল্ম স্পীড, স্পীড ইনডেক্স বা এ. এস. এ. উল্লেখ করেও বোঝানো হয়ে থাকে।

এক্সপোজার মিটার

এক্সপোজার মিটার আপতিত আলোর অথবা প্রতিফলিত আলোর পরিমাপ করে, ব্যবহৃত ফিল্মের দ্রুতি অনুযায়ী, মধ্য ধূসরতার (১৮% গ্রে কার্ড) উপযুক্ত লেন্সের অ্যাপারচার ও শাটার দ্রুতি নির্দেশ করে। বর্তমানে যে ফোটো ইলেকট্রিক মিটার ব্যবহার করা হয় তার প্রথম প্রচলন হয়েছিল আমেরিকায় ১৯৩২ সনে। এই মিটার তিনভাবে ব্যবহার করা যায়—ক্যামেরার অভ্যন্তরে, হাতে ধরে ও ক্যামেরার গায়ে আটকে। এই মিটারগুলির শক্তি যোগানো হয় ক্যাডমিয়ম সালফাইড (CdS) সেল, সেলেনিয়ম সেল বা ব্যাটারিচালিত বিভিন্ন ডায়োডের সাহায্যে। প্রতিটি সেল আলোককে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করে একটি সরু নিড্‌লকে চালনা করে আলোকের পরিমাপ করে। এই মিটার 'লাইট-মিটার' নামেও পরিচিত। (অ্যাভারেজিং মিটার দ্রষ্টব্য)

এনলার্জার

পরিস্ফুটিত নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলোক প্রক্ষেপণ করে লেন্সের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি গঠনের যন্ত্র। সাধারণত নেগেটিভ অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের প্রতিচ্ছবি আলোক-সংবেদনশীল কাগজ বা ফিল্মের ওপর ফেলে প্রিন্ট করা হয় বলে যন্ত্রটি এনলার্জার বা বিবর্ধক যন্ত্র নামে পরিচিত।

এনলার্জিং পেপার

নেগেটিভ থেকে এনলার্জারের সাহায্যে ছবি মুদ্রণের জন্য যে আলোক-সংবেদনশীল কাগজ ব্যবহার করা হয় তা পেপার, প্রিন্টিং পেপার বা এনলার্জিং পেপার নামে পরিচিত। সংবেদনশীলতা, বৈষম্য, বুনন, রঙ, ঘনত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই কাগজ নানা ধরনের ও মাপের হয়ে থাকে।

এফ স্টপ/নাম্বার

লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ্য অনুসারে ব্যবহৃত অ্যাপারচারের ব্যাস নির্দেশ করে। এই ব্যাসের সাহায্যেই আলোকপাতের পরিমাণ বোঝা যায়। লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ্যকে ব্যবহৃত অ্যাপারচারের ব্যাস দিয়ে ভাগ করে এফ নাম্বার হিসাব করা হয়। যেমন ৫৫ মি. মি.

ফোকস দৈর্ঘের লেন্সকে এফ/১১ করা হলে অ্যাপারচারের ব্যাসের মাপ হবে ৫৫÷ ১১=৫ মি. মি.। ব্যবহৃত এফ নাম্বারের অ্যাপারচারকে রিলেটিভ অ্যাপারচারও বলা হয়। একই এফ নাম্বারের বিভিন্ন লেন্সের অ্যাপারচারের ব্যাস বিভিন্ন হলেও আলোকপাতের মাত্রা একই।

এরিয়েল পারস্পেকটিভ

বস্তুর মূলত উঁচু থেকে দেখা অবস্থানানুপাত। ত্রিমাত্রিক বস্তুর আকৃতি ও গঠনের আনুপাতিক সম্বন্ধকে দ্বিমাত্রিক ছবিতে প্রকাশ করার জন্যই ফোটোগ্রাফিতে পারস্পেকটিভ বা অবস্থানানুপাত শব্দের ব্যবহার। দৃষ্টিকোণ, বস্তুর আকারের তারতম্য ও অভিসারী রেখা বা ক্ষেত্রের সাহায্যে দ্বিমাত্রিক ছবিতে রৈখিক ও তলীয় অবস্থানানুপাত সৃষ্টি করা হয়। অতি দূরের বস্তু বায়ুমণ্ডলের অস্পষ্টতার জন্য যখন গঠন হারিয়ে শুধুমাত্র আকৃতি, রঙ ও টোনের মাত্রার তারতম্যে ছবিতে গভীরতা ও দূরত্ব নির্দেশ করে তখন সেটাই এরিয়েল পারস্পেকটিভ। বস্তুর অনুপুঙ্খহীনতাও দূরত্বের বোধ আনে।

এস. এল. আর.

সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরার সংক্ষিপ্ত নাম। এই ক্যামেরায় যে লেনসের সাহায্যে ছবি তোলা হয় সেই লেন্সের সাহায্যেই বস্তুকে দেখা হয় বলে প্যারালাক্স ত্রুটি হয় না এবং ফোকস গভীরতাও সঠিক দেখা যায়। বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে, একটি আয়নায় এসে পড়ে পেন্টাপ্রিজমের কয়েকটি তলে প্রতিফলিত হয়ে বস্তুর প্রতিচ্ছবি স্বাভাবিক সোজা ভাবে ভিউফাইণ্ডারে তুলে ধরে। একই ক্যামেরায় বিভিন্ন ফোকস দৈর্ঘের লেনস ব্যবহার করাও সেজন্য খুব সুবিধাজনক।

ওপেসিটি

আলোক-সংবেদনশীল মাধ্যমের আলোক প্রতিহত করার ক্ষমতা ফোটোগ্রাফির ভাষায় ওপেসিটি নামে পরিচিত। আপতিত আলো ও সঞ্চারিত আলোর আনুপাতিক হারের সাহায্যে উল্লেখ করা হয়।

ওয়র্ম টোন

ছবিতে যে রঙ বা টোনের মাত্রা দর্শকের বোধে উষ্ণতার অনুভূতি আনে। যেমন হলুদ, কমলা, লাল প্রভৃতি। শীতলতার বোধ জাগানো নীল বা সবুজের বিপরীত রঙ বা রঙের টোন।

ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স

যে লেন্সের সাহায্যে মানুষের স্বাভাবিক কৌণিক দৃষ্টিক্ষেত্র অপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রের দৃশ্য ধরা যায় সংজ্ঞাগত ভাবে তাকে ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স বলা গেলেও ব্যবহারিক দিক থেকে নির্দিষ্ট কোন্ ফোকস দৈর্ঘ থেকে ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স ধরা হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে ফিল্ম ফর্ম্যাটের প্রস্থের সমান বা তার চেয়ে কম ফোকস

দৈর্ঘ্যের লেন্সকে সর্বজনস্বীকৃত ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ৩৫ মি. মি. (২৪ × ৩৬ মি. মি. ফর্ম্যাট) ক্যামেরায় ২৪ মি. মি. এবং তার চেয়ে কম ফোকস দৈর্ঘ্যের লেনসকে অবশ্যই ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনস বলা যায়। এই লেনস শর্ট ফোকস লেনস নামেও পরিচিত।

ওয়াইণ্ডার

অটো ওয়াইণ্ডার দ্রষ্টব্য।

ওয়াশিং

পরিস্ফুটন ও স্থায়ীকরণের পর ফিলম বা প্রিন্ট পরিষ্কার জলের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময় ধরে ধৌত করাকে ওয়াশিং বলে। ধৌতকরণের প্রধান উদ্দেশ্য ফিলম বা প্রিন্টকে জলে দ্রবণীয় যৌগ সিলভার থিওসালফেট, হাইপো ও অন্যান্য রাসায়নিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। তা না করা হলে হাইপোর সঙ্গে সিলভার মিশে হলুদাভ বাদামী সিলভার সালফাইড সৃষ্টি করে ফিলম বা প্রতিচ্ছবি নষ্ট করে দেবে।

ওয়েভ লেংথ

ম্যাক্সওয়েলের সুবিখ্যাত বিকিরণের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব অনুযায়ী আলো এবং একই রকমের সমস্ত বিকিরণই তরঙ্গাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গের একটি শীর্ষ থেকে ঠিক পরের শীর্ষ অবধি যে দূরত্ব তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ বলা হয়। তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, দৃশ্য বা অদৃশ্য যাই হোক না কেন, তাদের প্রতিটির তরঙ্গ দৈর্ঘ ভিন্ন এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এই বিভিন্নতাই রশ্মিগুলিকে পরস্পর থেকে আলাদা করে। বিকিরীত শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাপ এত সূক্ষ্ম যে তা মিলিমাইক্রন বা আঙ্গস্ট্রম এককে হিসাব করা হয়। ১ মিলি মাইক্রন (M μ) =১/১০,০০০,০০০ সি. মি, ১ আঙ্গস্ট্রম (A)=১/১০০,০০০,০০০ সি. মি.। ৩৮০ থেকে ৭৬০ মিলি মাইক্রন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি আমাদের দৃষ্টিগোচর।

ওয়েস্ট লেভেল ভিউফাইণ্ডার

যে সমস্ত ক্যামেরায় ভিউফাইণ্ডারের গ্রাউণ্ডগ্লাস ওপর দিকে মুখ করা থাকে এবং কোমর উচ্চতায় ক্যামেরা রেখে বস্তু ফোকস করা হয়। এই ক্যামেরা ওজনে একটু ভারী হলেও নিচু দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তোলার পক্ষে ও শিশুদের ছবি তোলার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

কনটিনিউয়াস টোন ডেভেলাপমেন্ট

অর্থোক্রোমেটিক ও প্যানক্রোমেটিক ফিল্মের রাসায়নিক পরিস্ফুটন। এই পরিস্ফুটনে নেগেটিভে সাদা ও কালোর মধ্যে ধূসরতার ক্রমায়ণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ধরা সম্ভব হয়।

কন্‌ট্যাক্ট প্রিন্ট/প্রিন্টিং ফ্রেম

নেগেটিভকে মুদ্রণের কাগজের সরাসরি সংস্পর্শে রেখে আলোকপাতের মাধ্যমে যে ছবি

পাওয়া যায় তাই হল কনট্যাক্ট প্রিন্ট। নেগেটিভের সরাসরি সংস্পর্শে আলোকপাত করা হয় বলে ছবির আকার নেগেটিভ অপেক্ষা বড় বা ছোট হয় না। নেগেটিভকে ঠিকভাবে কাগজের সংস্পর্শে রাখার জন্য কাঁচ লাগানো ও কব্জা দেওয়া যে ফ্রেম পাওয়া যায় তাকে বলে প্রিন্টিং ফ্রেম।

কনট্যুর শার্পনেস

অ্যাকুটেন্স দ্রষ্টব্য।

কনট্রাস্ট

ফোটোগ্রাফে আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ সাদা এবং কালোর মধ্যে টোনের মাত্রার বিন্যাসকে বৈষম্য বলে উল্লেখ করা হয়। উচ্চ বৈষ্যম্যের ছবিতে মধ্যবর্তী টোনের মাত্রা খুব কম থাকে। বস্তুর নিজস্ব বৈষম্য, ফিল্মের অবদ্রব, ফিল্টার, আলোকপাত, পরিস্ফুটন,মুদ্রণ প্রভৃতির সাহায্যে বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়।বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ ছবিতে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কনট্রাস্ট ফিল্টার

যে ফিল্টারের সাহায্যে সাদাকালো ছবিতে টোনের মাত্রা কমানো অথবা বাড়ানো যায়।

কনডেনসর

এনলার্জারে আলোকের উৎস ও লেন্সের মাঝে ব্যবহৃত বড় আকারের উত্তল লেন্স যার সাহায্যে আলো-কে কেন্দ্রীভূত করে উজ্জ্বলভাবে প্রক্ষেপ করা হয়। ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের ক্যাপাসিটরও কনডেনসর নামে পরিচিত।

কপি নেগেটিভ

কোন ফোটোগ্রাফ বা আর্টওয়র্ক থেকে পুনরায় প্রিন্ট করার জন্য যে নেগটিভ তৈরি করা হয়।

কম্পাউণ্ড লেন্স

যে লেন্স দুই বা ততোধিক লেন্স এলিমেন্ট সহযোগে তৈরি তাকে কম্পাউণ্ড বা যৌগিক লেন্স বলে। এই লেন্স তৈরির নক্সা অত্যন্ত জটিল। লেন্সকে উচ্চতর দ্রুতি-সম্পন্ন, সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ ধরার উপযোগী ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্যই এই জটিল নকশার প্রয়োজন।

কম্পোজিট নেগেটিভ

পোস্টারাইজেশন ছবির জন্য কয়েকখানি বিভিন্ন টোনাল মাত্রার উচ্চ বৈষম্যযুক্ত পজিটিভ প্রিন্ট থেকে যে মাস্টার নেগেটিভ তৈরি করা হয়।

কম্পোজিশন

ছবিতে বস্তুর আকার, রঙ, রেখা, বুনন, টোন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের সুসমঞ্জস ও ফলপ্রদ ব্যবহার।

কলার অ্যানালিসিস/সিনথেসিস

প্রিজমের সাহায্যে আলোর বিচ্ছুরণ আলোক-বর্ণালির সৃষ্টি করে যা থেকে প্রমাণিত হয় সাদা আলো হল বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ বিশিষ্ট রঙের আলোকরশ্মির এক নির্দিষ্ট আনুপাতিক মিশ্রণ। যদি আলোতে কোন বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘের প্রাধান্য ঘটে তবে আলো সেই তরঙ্গ দৈর্ঘের রশ্মির রঙ পায়।

বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্টির একটা উপায় হল বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মিকে সংযুক্ত করা। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অ্যাডিটিভ সিনথেসিস। সংশ্লেষণের আরও একটি পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিতে বিবেচ্য হল ব্যবহৃত ফিল্টার কোন্ বর্ণের আলোকরশ্মিকে শোষণ করে নিচ্ছে তা, কোন্ বর্ণের আলোকরশ্মিকে সঞ্চারিত হতে দিচ্ছে সেটা নয়। সাদা আলো থেকে এক বা একাধিক উপাদান বাদ দিয়ে সাদা আলোর ভারসাম্যকে ব্যাহত করে বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্টির এই পদ্ধতিকে বলা হয় সাবট্র্যাক্টিভ সিনথেসিস। এই পদ্ধতিতে রঙের বিশ্লেষণ হয় লাল, সবুজ ও নীল-শোষণকারী ফিল্টারের সাহায্যে। উভয় পদ্ধতিতে কলার অ্যানালিসিসের জন্য বিভিন্ন উপায় আছে যাদের সেপারেবল ও ইন্‌সেপারেবল এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কলার অ্যানালিসিসের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম কলার অ্যানালাইজার।

কলার কনট্রাস্ট

ছবিতে বিভিন্ন রঙের দৃশ্যগত প্রভেদ ও বৈষম্য। সাদা-কালো ছবিতে বস্তুর বিভিন্ন রঙের তারতম্য ফুটে ওঠে ধূসরতার বিভিন্ন মাত্রার সাহায্যে। আলোক-বর্ণালির ক্রম অনুসারে যদি একটি রঙীন চক্র তৈরি করা হয় তবে দেখা যাবে বস্তুবর্ণের প্রাথমিক রঙ লাল, হলুদ ও নীলের বিপরীতে আছে সবুজ, বেগনি ও কমলা, যেগুলিকে ঐ প্রাথমিক রঙের পরিপূরক রঙ বলা হয়। প্রাথমিক ও পরিপূরক রঙের কাছাকাছি অবস্থানই সর্বাপেক্ষা কনট্রাস্ট বা বৈষম্য সৃষ্টি করে। কোন রঙ তার পারিপার্শ্বিক বা পটভূমির রঙের দ্বারাও প্রভাবিত হতে পারে। যেমন হালকা রঙ তার পরিপূরক রঙের পটভূমিতে আমাদের চোখে অধিকতর সম্পৃক্ত লাগে অথবা একই ধূসর বর্ণ লাল পটভূমিতে সামান্য নীলচে-সবুজ ও সবুজ পটভূমিতে ঈষৎ নীলচে-লাল বলে মনে হয়।

কলার কমপেনসেটিং ফিল্টার

এক ধরনের নির্দিষ্ট আলোর জন্য তৈরি ফিল্ম অন্য ধরনের আলোয় ব্যবহার করার প্রয়োজনে (যেমন ডেলাইট ফিল্ম কৃত্রিম আলোয় অথবা কৃত্রিম আলোর ফিল্ম সূর্যালোকে) যে ফিল্টার প্রয়োগ করে ছবিতে রঙের সমতা ও স্বাভাবিকতা আনা হয়। কলার কারেকশন ফিল্টার বা সংক্ষেপে সি. সি. ফিল্টার নামেও পরিচিত।

কলার টেম্পারেচার

যা উল্লেখ করে আলোকের শুভ্রতার পরিমাপ করা হয়। উত্তরোত্তর তাপ বৃদ্ধির ফলে

কালো বস্তুর রঙের যে ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে— কমলা, হলুদ, সাদা ইত্যাদি—সেই তাপমাত্রা ও রঙ অনুযায়ী কেলভিন ডিগ্রি বা মিরেড (মাইক্রো রেসিপ্রোকাল ডিগ্রি) সংখ্যার সাহায্যে বর্ণতাপমাত্রা উল্লেখ করে আলোকের গুণ নির্দেশ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আলোক-উৎসের তাপমাত্রা এক হওয়া সত্ত্বেও আলোকের রঙে তারতম্য ঘটে, যেমন দিনের আলোর সমান তাপমাত্রার ফ্লুওরেসেন্ট আলোর ছবি ডেলাইট ফিল্মে স্পষ্টতই সবুজাভ দেখায়। কেলভিন ডিগ্রি বা মিরেড সংখ্যা মাপার যন্ত্রকে কলার টেম্পারেচার মিটার বলে।

কলার ট্রান্সপেরেন্সি

সরাসরি রঙীন পজিটিভ প্রতিচ্ছবি পাওয়ার ফিলম যাকে স্লাইড বা রিভার্সাল নামেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সঞ্চারিত আলোর সাহায্যে দেখা হয় বলে ট্রান্সপেরেন্সির রঙ প্রতিফলিত আলোয় দেখা ছবির প্রিন্ট অপেক্ষা অনেক বেশি উজ্জ্বল লাগে।

কলার প্রিন্টিং ফিল্টার

নেগেটিভ থেকে রঙীন ছবি মুদ্রণের সময় বিবর্ধক যন্ত্রে ব্যবহৃত রঙীন অ্যাসিটেট ফিলটার। অতিবেগনি রশ্মি শোষণকারী, ম্যাজেন্টা ও হলুদ—বিভিন্ন ঘনত্বের এই তিন রকম ফিলটার ব্যবহার করে প্রিন্টের রঙে প্রয়োজনীয় টোন আনা হয়। প্রয়োজনমত বিভিন্ন ঘনত্বের যে ফিল্টারগুলি একসঙ্গে বিবর্ধক যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে 'ফিল্টার প্যাক' বলে। সংক্ষেপে সি. পি. ফিল্টার নামেও পরিচিত।

কলার ফিল্টার

রঙীন পাতলা কাচ, জিলেটিন বা অ্যাসিটেট শিট যা রঙ বিশেষে আলোকরশ্মির বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ প্রতিহত করে। ফিল্টার নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ শোষণ করে আলোকের পরিমাণ কমিয়ে দেয় এবং সাদা-কালো ছবিতে টোনের মাত্রা ও রঙীন ছবিতে বর্ণমাত্রের পরিবর্তন ঘটায়।

কলার ফিল্ম

রঙীন ছবির ফিল্ম প্রধানত দু ধরনের হয়ে থাকে—নেগেটিভ, যা থেকে রঙীন পজিটিভ প্রিন্ট পাওয়া যায় এবং রিভার্সাল বা ট্রান্সপেরেন্সি যা সঞ্চারিত আলোয় অর্থাৎ প্রোজেক্টরের সাহায্যে প্রতিফলিত করে দেখা হয়। উভয় প্রকার ফিলমই আলোর বর্ণতাপমাত্রা অনুযায়ী ডেলাইট (৬০০০° কেলভিন) বা কৃত্রিম (৩৪০০ কে° বা ৩২০০ কে°) প্রভৃতি বিভিন্ন তাপমাত্রার হয়ে থাকে।

কলার ব্যালেন্স

ফিল্মে রঙের ভারসাম্য বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। রঙীন ফিল্ম যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার আলোয় ছবি তোলার জন্য তৈরি হয়ে থাকে সেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রার তারতম্য

হলে ছবিতে বস্তুর রঙের স্বাভাবিকতা ও ভারসাম্য থাকে না। রঙীন ফিল্টারের সাহায্যে আলোক উৎসের বর্ণতাপমাত্রাকে ব্যবহৃত ফিল্মের উপযুক্ত তাপমাত্রায় পরিবর্তিত করে ছবিতে রঙের সমতা আনা হয়।

কলার রিভার্সাল ফিল্ম

কলার ট্রান্সপেরেন্সি দ্রষ্টব্য।

কাট্ ফিল্ম

শিট ফিল্ম নামে অধিকতর পরিচিত। ২″ × ৩″, ৪″ × ৫″ ও ৮″ × ১০″ মাপে পাওয়া যায়। ভিউ ক্যামেরায় ব্যবহারের উপযোগী।

কাপল্ড্ রেঞ্জফাইণ্ডার

রেঞ্জফাইণ্ডার দ্রষ্টব্য।

কার্ভিলিনিয়র ডিস্টর্শন

লেন্সের অক্ষ থেকে বস্তুর দূরত্ব অনুসারে প্রতিচ্ছবির আকৃতিতে যে বিকৃতি ঘটে এবং সরলরেখাকে বক্র দেখায়। সরলরেখার এই বক্রতাকে কার্ভিলিনিয়র বিকৃতি বলে। বস্তুর আকারগত বিকৃতি দু ধরনের হতে পারে, যা লেন্সের ত্রুটি হিসাবেই গণ্য হয়—নেগেটিভ বা ব্যারেল বিকৃতি এবং পজিটিভ বা পিনকুশন বিকৃতি। কয়েকটি লেন্স এলিমেন্টের সংযোগে সাধারণ ফোকস দৈর্ঘ্যের লেন্সে এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব।

কার্ভেচার অব্ ফিল্ড

লেন্সের একটি ত্রুটি যার ফলে সমতল বস্তুর প্রতিচ্ছবি অসমতল ভাবে ফোকস হয়ে থাকে এবং ছবিতে প্রতিচ্ছবির অংশবিশেষের তীক্ষ্ণতা হ্রাস পায়। ফোকস গভীরতার সাহায্যে এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

কারেকশন ফিলটার

কলার কমপেনসেটিং ফিলটার দ্রষ্টব্য।

কেব্‌ল রিলিজ

ক্যামেরার শাটার টেপার সময়ে, বিশেষত বেশি সময় আলোকপাতের প্রয়োজনে, যাতে ক্যামেরা একটুও না নড়ে সেজন্য যে নমনীয় সরু লম্বা তার ব্যবহার করা হয়। এই তারটি সাধারণত দশ ইঞ্চি বা তার চেয়ে সামান্য বেশি লম্বা হয় যেটির একদিক ক্যামেরা শাটারের প্যাঁচের সঙ্গে ঘুরিয়ে আটকে দিয়ে অপর দিকের বোতাম টিপে শাটার খোলা যায়। ক্যামেরার গায়ে হাত না লাগার ফলে ক্যামেরা নড়ার সম্ভাবনা থাকে না। বহুক্ষণ ধরে শাটার খোলা রাখার প্রয়োজন হলে এই কেব্‌ল রিলিজের বোতাম লক করে শাটার খুলে দেওয়া যায়।

কেমিক্যাল ইন্‌টেন্সিফিকেশন

ইন্‌টেন্সিফিকেশন দ্রষ্টব্য। সাধারণত অল্প পরিস্ফুটিত নেগেটিভকে মুদ্রণোপযোগী করার

প্রয়োজনে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রবণ বাড়তি ধাতবকণা যুক্ত করে নেগেটিভ প্রতিচ্ছবিকে অধিকতর কালো করে ও নেগেটিভের কালো অংশে দ্রুত কাজ করে বলে নেগেটিভের সামগ্রিক বৈষম্যও বৃদ্ধি পায়।

কোটেড লেন্স

সুপারকোটেড বা মাল্টিকোটেড লেন্স নামেও পরিচিত। লেন্স এলিমেন্টের আভ্যন্তরীণ আলোক প্রতিফলন (যাকে ফ্লেয়ার নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে) কমাবার জন্য লেন্সের উপরিভাগে যে রাসায়নিক প্রলেপ (ম্যাগনেসিয়াম ফ্লুওরাইড) লাগানো থাকে তাকে লেন্স কোটিং বলে। এই প্রলেপের দরুন প্রতিফলন কমার ফলে আলোকের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও প্রতিচ্ছবিও স্পষ্টতর হয়।

কোডাক্রোম

ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানির তৈরি রঙীন ট্রান্সপেরেন্সি বা রিভার্সাল ফিলমের ব্যবসায়িক নাম।

কোমা

লেন্সের ত্রুটিবিশেষ, যার ফলে প্রতিচ্ছবির কিয়দংশ ফ্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হয়ে ধূমকেতুর পুচ্ছের মত ঝাপসা ও বিকৃত দেখায়। লেন্সের মধ্য দিয়ে তির্যকভাবে আলোক সঞ্চারণের ফলে সমস্ত আলোকরশ্মি একই বিন্দুতে ফোকস না হওয়ায় এই ত্রুটি। ফলে প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল অংশের পেছনেই অস্পষ্ট ও বিকৃত অংশ দেখা যায়। আলোকরশ্মি যত বেশি তির্যকভাবে সঞ্চারিত হয় এই বিকৃতির আকারও তত বড় হয়। সাধারণভাবে উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্স যুক্ত করে এবং অ্যাপারচার কমিয়ে প্রতিচ্ছবির এই বিকৃতি বা ত্রুটি সংশোধন করা হয়। লেন্সের অ্যাপারচার বেশি বড় হলে এই ত্রুটির সঙ্গে অ্যাসটিগম্যাটিজম যুক্ত হয়ে আরও জটিল ত্রুটির সৃষ্টি করতে পারে।

কোল্ড টোন্ড পেপার

সাদা-কালো ছবি মুদ্রণের কাগজ যাতে কালো ও ধূসরতার মাত্রা সামান্য নীলাভ দেখায় এবং সাদা অংশ অধিকতর সাদা হয়।

ক্যাটাডাইঅপট্রিক লেন্স

মিরর লেন্স দ্রষ্টব্য

ক্যাপাসিটর

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ ইউনিটের বিদ্যুৎশক্তি সংগৃহীত রাখার যন্ত্রাংশ যার সাহায্যে ফ্ল্যাশের আলোকের পরিমাণ ও সময় স্থির করা হয়। বর্তমানে এর দুটি ধরন প্রচলিত—অয়েল ফিল্ড ক্যাপাসিটর যা বড় স্টুডিওতে ব্যবহারোপযোগী ইউনিটের জন্য বৃহদাকার, ভারী ও বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি সংগৃহীত রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কম ভোল্টেজে কাজ

করার উপযোগী ছোট বহনযোগ্য ইউনিটের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য। ইলেকট্রোলাইট ক্যাপাসিটরগুলিকে ভালভাবে কার্যোপযোগী রাখার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে অব্যবহৃত অবস্থায় কিছুদিন (একমাস বা তার বেশি) পড়ে থাকলে ক্যাপাসিটরকে পুনরায় কার্যোপযোগী করার জন্য ব্যাটারি থেকে অত্যধিক বিদ্যুৎশক্তি খরচ করার প্রয়োজন হয়। তাই ফ্ল্যাশ-ইউনিটের ক্যাপাসিটরকে কার্যক্ষম রাখার জন্য সপ্তাহে অন্তত তিন/চার বার ফ্ল্যাশ করা দরকার এবং পুনরায় তুলে রাখার আগে ক্যাপাসিটরকে পূর্ণশক্তি সম্পন্ন করে তা থেকে ব্যাটারি বার করে রেখে দেওয়া উচিত। অনেক সময় এটিকে কনডেনসর নামেও উল্লেখ করা হয়।

ক্যামেরা অবস্কুরা

বর্তমান ক্যামেরার প্রাচীনতম রূপ। সরলভাবে বললে সম্পূর্ণ অন্ধকার একটি ঘরের একদিকের দেয়ালের একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে অপরদিকের দেয়ালে উল্টোভাবে বাইরের বস্তুর প্রতিচ্ছবি প্রক্ষেপ করার ব্যবস্থা। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আরিস্ততল এর উল্লেখ করেছিলেন। পরের কয়েকশো বছরে এর সামান্য উন্নতি ঘটে ও আকার ছোট হয় এবং এটি রেখাচিত্রের কাজে শিল্পীদের সাহায্য করে। ষোড়শ শতকে চশমার উপযোগী (শর্টসাইট) উভোত্তল লেন্স ব্যবহার করায় প্রতিচ্ছবির স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায়। ১৮০০ সাল নাগাদ টমাস ওয়েজউড সর্বপ্রথম ক্যামেরা অবস্কুরার সঙ্গে আলোক-সংবেদনশীল রাসায়নিক বস্তুর সংযোগ ঘটাবার চেষ্টা করেন যে কাজে আরও ছ'বছর পরে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেন নীপ্সে।

ক্যালোটাইপ

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হেনরী ফক্স ট্যাল্বট নেগেটিভ থেকে কন্ট্যাক্ট পদ্ধতিতে মুদ্রণের সাহায্যে পজিটিভ ছবি তৈরির যে পেটেন্ট নেন তার নাম দিয়েছিলেন ক্যালোটাইপ। 'সুন্দর ছবি'-র গ্রীক প্রতিশব্দ এটি।

ক্যাসেট

আলোক-প্রতিরোধী যে কৌটোর মধ্যে রোল ফিল্ম ক্যামেরায় ভরে ব্যবহার করা হয়।

ক্রপিং

বিবর্ধনের সময়ে ছবি থেকে নেগেটিভের অংশবিশেষকে বর্জন করা। এনলার্জার ইজেলে মাস্কিং করে এই ক্রপিং-এর কাজ করা হয়ে থাকে।

ক্রিটিকাল অ্যাপারচার

লেন্সের অন্যান্য ত্রুটি দ্রষ্টব্য

ক্রোমেটিক অ্যাবেরেশন

অ্যাবেরেশন দ্রষ্টব্য

ক্রোমোজেনিক ফিল্ম

'ক্রোমোজেনিক' কথাটি রঙ বোঝালেও ফিল্মটি সাদা-কালো। তবে রঙীন ফিল্মের মত প্রতিচ্ছবি গঠিত হয় ডাইয়ের সাহায্যে, প্রচলিত সাদা-কালো ফিল্মের মত ধাতব সিলভার কণার সাহায্যে নয়। অতি সংবেদনশীলতার প্রয়োজনে বা সর্বোচ্চ ল্যাটিচুড অর্জনের জন্য এই ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। ISOরেটিং অনুসারে এই ফিল্ম ১৬০০ ISO থেকে, ব্র্যাণ্ড অনুযায়ী, ৪০০ বা এমনকি ১২৫ ISO পর্যন্ত যে কোন দ্রুতিতে ব্যবহারযোগ্য এবং যে কোন রেটিংয়েই তুলনামূলক পার্থক্য খুব কম ও সামগ্রিক ফলাফল প্রায় সমান সন্তোষজনক। একই ফিলমের একাংশ একটি দ্রুতিতে ব্যবহার করে, অন্য অংশ তার চেয়ে বেশি বা কম দ্রুতিতে ব্যবহার করাও সম্ভব এবং সমস্ত দ্রুতিতেই কণাময়তা ও বৈষম্যের অবস্থা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য থাকে। স্বল্প আলোয় কণামুক্ত সাদা-কালো ছবি তোলার জন্য এই ফিল্ম বিশেষ উপযুক্ত। দ্রুতি বাড়ালেও এর কণাময়তা সেই অনুপাতে বাড়ে না। XP1 হল এর ব্যবসায়িক নাম।

ক্লোজ-আপ

সাধারণভাবে মানুষের কাঁধ ও মাথার ছবি থেকে যে কোন বস্তুর ১:১ অনুপাত অবধি প্রতিচ্ছবি এই নামে অভিহিত। ১:১ অনুপাত অপেক্ষা দশগুণ পর্যন্ত বড় প্রতিচ্ছবি ম্যাক্রো ছবি নামে পরিচিত, দশগুণ অপেক্ষাও বৃহত্তর প্রতিচ্ছবি যা মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গ্রহণ করা হয় তা ফোটোমাইক্রোগ্রাফির অর্ন্তগত।

গাইড নাম্বার

ফ্ল্যাশ ইউনিটের শক্তির সূচক সংখ্যা, যার সাহায্যে ফ্ল্যাশ ব্যবহারের সময়ে বস্তুর দূরত্ব অনুসারে এফ ষ্টপ স্থির করা হয়। ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বলতা ও আলোক নিক্ষেপের ক্ষমতা নির্দেশক এই সংখ্যাকে বস্তুর দূরত্ব দিয়ে ভাগ করে এফ ষ্টপ পাওয়া যায়।

গামা ভ্যালু

পরিস্ফুটন কালে নেগেটিভের ঘনত্ব ও বৈষম্য সঠিকভাবে পরিমাপ করার গাণিতিক সূত্র। ফিল্ম পরিস্ফুটনের সঠিক গামা ভ্যালু ০.৭ ধরা হয়। এই মান নির্ভর করে পরিস্ফুটনের রাসায়নিক মিশ্রণ, তাপমাত্রা, স্থিতিকাল ও ঝাঁকুনির উপর। পরিস্ফুটকের গ্রাফচার্টে রৈখিক বক্রতার সাহায্যে এই মান দেখানো থাকে। প্রয়োজনমত প্রদত্ত মানের সামান্য তারতম্য করে নেগেটিভের বৈষম্য ও ঘনত্বের পরিবর্তন করা সম্ভব।

গোল্ড সেনজিটাইজিং

গোল্ড লবণ যুক্ত করে ফিলমের অবদ্রবের আলোক-সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

গ্রাউণ্ড গ্লাস

ক্যামেরায় বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফোকস করা ও দেখার জন্য ব্যবহৃত ঈষদচ্ছ, ঘষা কাঁচ। সমস্ত বড় ফর্ম্যাট ক্যামেরায় এবং কিছু ছোট আকারের রিফ্লেক্স ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়।

গ্রাফিক আর্টস ডেভেলাপার

লিথ্ ফিল্ম পরিস্ফুটনের উপযুক্ত, বিশেষভাবে প্রস্তুত পরিস্ফুটক যা কালো-সাদার মধ্যবর্তী কোন টোন পরিস্ফুটন করে না। লিথ্ ডেভেলাপার নামে অধিকতর পরিচিত। কোডাকের এইচ. সি. ১১০ এই ধরনের ডেভেলাপার।

গ্রেন

আলোক সংস্পর্শের পর সিলভার হ্যালাইড যে কালো ধাতব সিলভার কণায় পরিণত হয়ে পরিস্ফুটনের মাধ্যমে প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিগোচর করে।

গ্র্যানুলারিটি/গ্রেনিনেস

ফিল্ম বা মুদ্রণের কাগজের অবদ্রবে সিলভার হ্যালাইড কণাগুলির পারস্পরিক আবদ্ধতার পরিমাণ বোঝানোর জন্য গ্র্যানুলারিটি শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং সিলভার হ্যালাইড কণাগুলি দানার মাধ্যমে প্রতিচ্ছবিতে দৃশ্যগোচর হলে তাকে গ্রেনিনেস বা কণাময়তা বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিচ্ছবির সুষম ধূসর টোনের মধ্যে এই কণাময়তা অধিক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

গ্লসি

ছবি মুদ্রণের জন্য চকচকে, উজ্জ্বল তলযুক্ত কাগজ। এই কাগজে কোন বুনন থাকে না। উত্তাপের সাহায্যে এই কাগজকে উজ্জ্বল ও ঝকঝকে করা হয়। ম্যাট-প্রিন্টের তুলনায় গ্লসি প্রিন্টের ঔজ্জ্বল্য ও গভীরতা বেশি।

গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড

তরল রাসায়নিক অম্ল। পরিস্ফুটনের পর ষ্টপ বাথ এবং অ্যাসিড ফিক্সিং বাথ-এ ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিডের সংস্পর্শে হাইপো যাতে বিশ্লিষ্ট না হয়, সেজন্য প্রতিষেধক (buffer) হিসাবে অ্যাসিড ফিক্সিং বাথে সোডিয়ম মেটাবাইসালফাইট মেশানো হয়ে থাকে।

গ্লোলাইট

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ-এর ক্যাপাসিটর বা কনডেনসরে বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়ে ফ্ল্যাশ করার উপযুক্ত হলে ইউনিটের পিছনে অথবা পাশে ছোট, চৌকো অংশে যে লাল অথবা সোনালি-হলুদ আলো জ্বলে ওঠে। এই আলো ফ্ল্যাশ করার প্রস্তুতি নির্দেশ করে বলে একে রেডিলাইটও বলা হয়।

ঘোষ্ট ইমেজেস

ফিল্ম ব্যাকিং থেকে অত্যধিক আলো প্রতিফলনের ফলে ছবিতে যে অবাঞ্ছিত রেখা দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতে যার কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না।

জি. এ. পি.

ক্যামেরা লেন্সের (টি. টি.এল.) মধ্য দিয়ে বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকের পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত আলোক-সংবেদনশীল ডায়োড। জি. এ. পি. হল 'গ্যালিয়ম

আরসেনিক ফসফোরস ফোটো ডায়োড'—এর নামসংক্ষেপ। সিডি.এস (CdS) লাইট মিটার অপেক্ষা জি.এ. পি. লাইট মিটার অধিকতর দ্রুত কাজ করে এবং সিলিকন ব্লু সেলের মত অবলোহিত রশ্মি ফিলট্রেশন করার কোন প্রয়োজন হয় না।

জুম লেন্স

যে লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তনক্ষম। এই লেন্সের অন্তর্গত এলিমেণ্টগুলিকে খুব সহজেই সামনে-পিছনে-করে সর্বাপেক্ষা কম থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি পর্যন্ত অসংখ্য ফোকস দৈর্ঘের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তবে লেন্স এলিমেণ্টগুলির স্থান পরিবর্তনের ফলে এলিমেণ্টগুলির সমস্ত অবস্থানে লেন্সের ত্রুটি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এই লেন্স 'ভ্যারিয়েবল ফোকস লেন্স' এবং 'কনটিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল ফোকল লেংথ লেন্স' নামেও পরিচিত।

জোন সিস্টেম

কয়েকটি ধূসর টোনমাত্রার নিরিখে ছবির সঠিক এক্সপোজার নির্ধারণের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ছবিকে দশটি টোনমাত্রায় ভাগ করে নিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি টোনমাত্রা অনুযায়ী, অর্থাৎ বস্তুর সামগ্রিক আলোক প্রতিফলনের ওপর নির্ভর না করে, ছবিতে যে মাত্রার প্রধান্য চাই ধূসরতার সেই মাত্রার নিরিখে, ফিল্মে আলোকপাত করা হয়। এই পদ্ধতিতে তোলা ছবিতে চরম সাদা বা কালো অথবা অন্তবর্তী কয়েকটি টোন ধরা নাও পড়তে পারে। আনসেল অ্যাডামস এই পদ্ধতির উদ্ভাবক, যার অত্যন্ত সার্থক ব্যবহার তিনি করেছেন। দ্র. এক্সপোজার।

টপ লাইট

উল্লম্ব অবস্থান থেকে সোজাসুজি আলোকসম্পাত। যেমন ভরদুপুরের সূর্যালোক। প্রতিকৃতি তোলার সময় মাথার চুলে আউটলাইন আনার জন্য এই ধরনের যে আলো ব্যবহার করা হয় যা হেয়ার লাইট নামেও পরিচিত।

টাইম এক্সপোজার

ক্যামেরাতে বিভিন্ন শাটার-দ্রুতির জন্য যে কয়েকটি যন্ত্রগত সময়সীমা নির্দিষ্ট করা থাকে তা ব্যবহার না করে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাটার খুলে রেখে আলোকপাত করা। টাইম এক্সপোজারের সাহায্যে স্বল্পালোকিত স্থিতিশীল বস্তুর ছবি ছাড়াও হেডলাইট সমেত গতিশীল গাড়ির অথবা রাতের তারাভরা আকাশের ছবিও তোলা যায় যাতে আলোকের গতিপথ ছবিতে সুন্দরভাবে ধরা পড়ে।

টাইম-ল্যাপ্স ফোটোগ্রাফি

যে পদ্ধতির সাহায্যে ক্যামেরায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট সময় পর পর একই বস্তুর ছবি তোলা হয়। সাধারণত চোখের পক্ষে অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন বস্তুর গতির পরিমাপ করা বা অবস্থার পরিবর্তন রেকর্ড করা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কাজে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

টাইমার

বিবর্ধক যন্ত্রে ব্যবহারোপযোগী এক বিশেষ ধরনের ঘড়ি যা পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় আলোকপাত হবার পর স্বয়ংক্রিয় ভাবে বিবর্ধক যন্ত্রের আলো নিভিয়ে দেয। এটি ফিল্ম বা মুদ্রণের কাগজ পরিস্ফুটন করার কাজেও সময়জ্ঞাপক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্যামেরাতেও এক ধরনের টাইমার থাকে যাকে বলে 'সেলফ টাইমার' যার কাজ হল শাটার টেপার পর আট/নয় সেকেণ্ড বাদে আলোকপাত করা। সাধারণত নিজের ছবি তুলতে বা শাটার টেপার সময় ক্যামেরা-ঝাঁকুনি এড়াতে সেল্ফ টাইমারের সাহায্যে আলোকপাত করা হয়।

টাংস্টেন লাইট

আর্গন ও নাইট্রোজেন পূর্ণ, টাংস্টেন ধাতুর ফিলামেন্ট যুক্ত বাল্বের আলো। শুভ্র আলোক প্রদানকারী এই বাল্বকে 'ইনক্যানডেসেন্ট টাংস্টেন ল্যাম্প' বলা হয়। এই ল্যাম্পের ফিলামেন্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় (প্রায় ৫৫০০° ফা.) অত্যন্ত শুভ্র আলোক বিকিরণ করে। অত্যধিক তাপমাত্রা সত্ত্বেও, এই ল্যাম্পের নিষ্ক্রিয় গ্যাস বাষ্পীভূত হওয়া রোধ করে ফিলামেন্টকে দ্রুত ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। আলোকের বিকিরণের অধিকাংশ অবলোহিত অঞ্চলে হওয়ার ফলে সাদা-কালো ছবিতে এর কোন প্রভাব না থাকলেও ইনফ্রারেড ফোটোগ্রাফিতে তার গুরুত্ব কম নয়। এই আলোকের তীব্রতা ও বর্ণতাপমাত্রা ব্যবহৃত বিদ্যুতের ভোল্টেজ ও ল্যাম্পের বয়সের ওপর নির্ভর করে থাকে। এই ল্যাম্পের উন্নত সংস্করণ 'টাংস্টেন হ্যালোজেন ল্যাম্প'-য়ে বর্ণতাপমাত্রার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম হয়।

টি

টাইম শব্দের নামসংক্ষেপ। অনেক ক্যামেরার শাটার স্পীড ডায়ালে টি অর্থাৎ টাইম সেটিং দেওয়া থাকে যেখানে ডায়াল করে শাটার টিপলে পুনরায় না টেপা পর্যন্ত শাটার খোলা থাকে। এর ফলে টাইম এক্সপোজারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

টিল্ট

বস্তুর অবস্থানানুপাতকে সঠিকভাবে ধরার জন্য ভিউ ক্যামেরার সামনের অথবা পিছনের অংশকে বিন্যস্ত করা। ক্যামেরার অংশবিশেষ এমনভাবে হেলানো হয় যাতে ফিল্ম তলের কৌণিক অবস্থান বস্তুর কৌণিক অবস্থানের সঙ্গে এক হয়ে বস্তুকে স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতে ধরতে পারে।

টুইন লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা

দুটি লেন্সযুক্ত বিশেষ ক্যামেরা। একটি লেন্সের মধ্য দিয়ে, ৪৫° কৌণিক অবস্থানে রাখা একটা আয়নায় প্রতিচ্ছবিকে প্রতিফলিত করে ওপরের গ্রাউণ্ডগ্লাসে দেখে ফোকস করা যায়। অপর লেন্সটির সাহায্যে ছবি ওঠে।

টু-কোয়ার্টার ক্যামেরা/ফিল্ম

যে ক্যামেরায় ৬ সি. মি. × ৬ সি. মি. অর্থাৎ ২১/৪″ × ২১/৪″ ফর্ম্যাটে ছবি ওঠে। বেশির ভাগ টু-কোয়ার্টার ক্যামেরা টি.এল. আর. (টুইন লেন্স রিফ্লেক্স)। কিছু এস. এল. আর.-ও হয়ে থাকে। '120' ফিল্ম নামে পরিচিত বড় আকারের রোল ফিল্ম যাতে ২১/৪″ × ২১/৪″ মাপে ছবি ওঠে তাকে টু-কোয়ার্টার ফিল্ম নামেও উল্লেখ করা হয়।

টু-বাথ ফর্মুলা

নেগেটিভের আলোকিত অংশের ঘনত্ব বেশি বাড়তে না দিয়ে ছায়াবৃত অংশের অনুপুঙ্খ ভালভাবে ফুটিয়ে তোলার পরিস্ফুটন পদ্ধতি। এই পদ্ধতির পরিস্ফুটনে দুটি দ্রবণ ব্যবহার করা হয় বলে তা 'টু-বাথ' নামে পরিচিত। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ছায়াবৃত অংশের সঙ্গে অতিরিক্ত আলোকিত অংশ থাকলে এই পদ্ধতিতে পরিস্ফুটনে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া যায়। ফিল্মটিকে প্রথমে সাধারণ ফাইন গ্রেন ডেভেলাপারে (ডি-৭৬ বা অন্য কোন) নির্দিষ্ট সময়ের দুই-তৃতীয়াংশ সময় পরিস্ফুটন করার পর, না ধুয়ে সরাসরি শতকরা একভাগ বোরাক্স দ্রবণে দেওয়া হয় এবং এই দ্বিতীয় দ্রবণে ফিল্মটিকে একেবারে নাড়া হয় না, ফলে আলোকিত অংশে তখনও যে ডেভেলাপার লেগে থাকে তার কার্যকারী ক্ষমতা দ্রুত শেষ হয়ে সেই অংশে পরিস্ফুটন বন্ধ হয়ে যায় অথচ ছায়াবৃত অংশে ডেভেলাপার আরও কিছুক্ষণ কাজ করে অনুপুঙ্খকে ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

টেলি-কনভার্টার

ছোট আকারের সরল লেন্স, যা সাধারণ ক্যামেরা লেন্সের সম্মুখে ব্যবহার করে ফোকস দৈর্ঘ বাড়ানো হয়। টেলিফোটো লেন্সের তুলনায় দামে অনেক সস্তা, তবে আলোক প্রবেশের পরিমাণ অনেক কমে যায় এবং লেন্সের বিকৃতিও বৃদ্ধি পায়। 'অটো কনভার্টার' দ্রষ্টব্য।

টেলিফোটো লেন্স

দীর্ঘ ফোকস দৈর্ঘের লেন্স, যার সাহায্যে বস্তুর প্রকৃত দূরত্বের তুলনায় বস্তুর প্রতিচ্ছবি অনেক বড় আকারে পাওয়া সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সাধারণ লেন্সের পিছনে কয়েকটি নেগেটিভ লেন্স ব্যবহার করে এই ধরনের প্রতিচ্ছবি সর্বপ্রথম তোলা হয়েছিল। এর কয়েক বছর পর Emil Busch নির্দিষ্ট বিবর্ধনের 'Bis-Taler' নামের এক একক টেলিফোটো লেন্সের নকশা তৈরি করেন যা বাজারে আসে ১৯০৬ সনে। Zeiss, Dallmeyer, Ross প্রভৃতি কোম্পানিও একই ধরনের টেলিফোটো লেন্স বাজারে বের করে। আজকের তুলনায় এইসব লেন্সের ত্রুটি অনেক বেশি ও শক্তি অনেক কম ছিল। এরপর নানা গবেষণার ফলে এই লেন্স প্রভূত উন্নত হয়ে আজকের অতি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী টেলিফোটো লেন্সে রূপান্তরিত হয়েছে।

টেস্ট স্ট্রিপস

মুদ্রণের কাগজে আলোকপাতের সঠিক সময় স্থির করার জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে যে কাগজের টুকরোয় বিভিন্ন পরিমাণে আলোকপাত করে পরিস্ফুটন করে দেখা হয়। এই টুকরো কাগজে আলোকপাতের তারতম্য অনুসারে মুদ্রণের যে তারতম্য হয় তা ভালভাবে পরীক্ষা করে আলোকপাতের সঠিক সময় স্থির করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

টোনাল রেঞ্জ

প্রিন্টে সাদা থেকে কালোর মধ্যবর্তী ধূসরতার মাত্রাভেদ। ধূসরতার মাত্রা যত বেশি টোনাল রেঞ্জ-ও তত বেশি। বস্তুর ঔজ্জ্বল্য এবং আলোকতা বা আলোকহীনতার সঙ্গে টোনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নেগেটিভে বিভিন্ন মাত্রার ঘনত্বই প্রিন্টে বিভিন্ন মাত্রার ধূসরতা সৃষ্টি করে।

টোনাল স্কেল

জোন পদ্ধতিতে আলোকপাত স্থির করার জন্য ধূসরতার মাত্রাভেদের যে স্কেল বা ব্যাণ্ড ব্যবহার করা হয়। বিবর্ধনের সময়ও এই গ্রে স্কেল বা টোনাল স্কেল কাজে লাগিয়ে প্রিন্টের জন্য আলোকপাতের সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব (দ্র. জোন সিস্টেম)।

টোনিং

ফোটোগ্রাফির সাদা-কালো প্রিন্টকে রাসায়নিক দ্রবণের সাহায্যে অন্য রঙে পরিবর্তিত করা। ব্লীচ এবং ডাই করে প্রতিচ্ছবির কালো ধাতব সিলভারকে রঙে রূপান্তরিত করা হয়। বিভিন্ন রাসায়নিকের সাহায্যে প্রিন্টকে বিভিন্ন রঙে এবং রাসায়নিকের অনুপাতের তারতম্য অনুসারে রঙের বিভিন্ন শেডেও আনা যায়। সিপিয়া টোনিং বা সালফাইড টোনিং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। দ্র. 'রাসায়নিক সংগঠন'।

ট্রাই-এক্স ফিলম

কোডাক কোম্পানির ৪০০ এ. এস. এ. দ্রুতির সাদা-কালো ফিলমের ব্যবসায়িক নাম।

ট্রাই-কলার ফিলটার

একই ফিলটারের তিনটি অংশে তিনটি বিভিন্ন রঙ বিশিষ্ট যে ফিলটার রঙীন ছবিতে বিশেষ এফেক্ট আনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ট্রাইপড

ত্রিপদ বিশিষ্ট ক্যামেরা স্ট্যাণ্ড। সাধারণত ক্যামেরা হাতে ধরে আলোকপাত করা সম্ভব না হলে এই ত্রিপদ ব্যবহার করা হয়। ক্লোজ-আপ ফোটোগ্রাফি, কপি করার কাজ বা লং ফোকস লেন্স ব্যবহার করার সময় বিশেষ প্রয়োজনীয়। ছোট বড় নানা আকারের হয়ে থাকে।

ট্রাই-প্যাক

ত্রিস্তর রঙীন ফিলম। আবিষ্কার ও প্রচলনের পর প্রথম দিকে এই নামে পরিচিত ছিল।

ট্রান্সপেরেন্সি

সাদা-কালো বা রঙীন পজিটিভ ফিল্ম। মাউন্ট করে, প্রোজেক্টরের সাহায্যে সঞ্চারিত আলোকের মাধ্যমে দেখা হয়।

ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম

ক্যামেরার মধ্যে ফিল্মকে ফিল্মতলের উপর দিয়ে সমান ও সহজভাবে একদিকের স্পুল থেকে অপরদিকের স্পুলে নিয়ে যাবার জন্য যে খাঁজকাটা ব্যবস্থা থাকে। ফিল্মের ধারের ছিদ্র এই খাঁজের মধ্যে আটকে ফিল্মকে সহজভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ট্রিপ্‌ল কনডেনসর

এনলার্জারে সাধারণত দুটি কনডেনসর ব্যবহৃত হয়। তবে ফিল্ম ফর্ম্যাটের প্রয়োজনে লেন্সের ফোকস দৈর্ঘের পরিবর্তন করলে নেগেটিভের সমস্ত অংশ সমান ভাবে আলোকিত করার জন্য একটা বাড়তি কনডেনসর ব্যবহার করার দরকার হতে পারে।

ডজিং

বিবর্ধক যন্ত্রে মুদ্রণের সময় ছবির স্থান বিশেষে ছায়া সৃষ্টি করে আলোকপাত নিয়ন্ত্রণ করা।

ডাই

তরল রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এইচ. ডবলিউ. ভোগেল আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করেন যে ফোটোগ্রাফির সাধারণ সিলভার হ্যালাইড অবদ্রবে রঞ্জক মিশ্রিত করে অবদ্রবকে বর্ণালির প্রায় সমস্ত বর্ণের প্রতিই সংবেদনশীল করা যায়। হলুদ রঞ্জক নীল বর্ণের, সবুজ রঞ্জক লাল বর্ণের ও লাল রঞ্জক সবুজ বর্ণের প্রতি সংবেদনশীল। বর্তমানে উন্নত মানের যে অর্থোক্রোমেটিক ও প্যানক্রোমেটিক অবদ্রব আমরা ব্যবহার করে থাকি তা ভোগেলের এই আকস্মিক আবিষ্কারের ফল।

ডাই ট্রান্সফার প্রোসেস

ফিল্ম থেকে কাগজে রঙীন ছবি মুদ্রণের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একই বস্তুর তিন রঙের তিনটি পজিটিভ ফিল্ম থেকে একটি রঙীন প্রিন্ট করা হয়। তিন রঙের তিনটি প্রতিচ্ছবি থেকে মুদ্রণ করা হয় বলে, এই পদ্ধতিতে রঙের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করার কাজে বেশি সুবিধা পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি ইনহিবিশন পদ্ধতি নামেও পরিচিত।

ডাব্‌ল এক্সপোজার

ট্রিক শট বা ফেক শটের প্রয়োজনে ফিল্মের একই ফ্রেমে দুবার আলোকপাত করা।

ডাব্‌ল ওয়েট

মোটা ও ভারী মুদ্রণের কাগজ। সাধারণত বড় আকারের প্রিন্টের জন্য এর প্রয়োজন হয়। এই কাগজ 'ডি ডব্লিউ' নামেও পরিচিত।

ডাব্‌ল কন্‌ডেনসর

নেগেটিভের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলো সমান ও সংহতভাবে লেন্‌সের ওপর ফেলার জন্য বিবর্ধক যন্ত্রে কন্‌ডেনসর ব্যবহার করা হয়। দুখানি উত্তল লেন্‌স সহযোগে যে কন্‌ডেনসর তৈরি তাকে ডাব্‌ল কন্‌ডেনসর বলা হয়।

ডায়অপটার

ক্লোজ-আপ লেন্‌সের কর্মক্ষমতা বা বিবর্ধনের পরিমাপ বোঝাতে ডায়অপটার সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে ডায়অপটার সংখ্যাটি মিটার মাপের হিসাবে ফোকস দৈর্ঘ্যের (focal length) সূচক। ৫ ডায়অপটার ক্লোজ-আপ লেন্‌সের ফোকস দৈর্ঘ ১ মিটার=১০০০ মি. মি. ÷ ৫=২০০ মি. মি. অথবা ১০০ মি. মি. ফোকস দৈর্ঘ্যের ডায়অপটার ১০০০ মি. মি. ÷ ১০০=১০ ডায়অপটার। বিবর্ধনেব মাপ সঠিকভাবে জানার জন্য ফোকস দৈর্ঘ (focal length) জানা অত্যন্ত জরুরি। ক্যামেরা লেন্‌সের ফোকস দৈর্ঘকে ক্লোজ-আপ লেন্‌সের ফোকস দৈর্ঘ দিয়ে ভাগ করলে বিবর্ধনের মাপ পাওয়া যাবে। যেমন ৫০ মি. মি. ক্যামেরা লেন্‌সে ২ ডায়অপটার ক্লোজ-আপ লেন্‌স ব্যবহার করলে বিবর্ধনের মাপ হবে ৫০÷৫০০ (১০০০÷২)=০.১০ অথবা ২০০ মি. মি. ক্যামেরা লেন্‌সে যদি ৪ ডায়অপটার ক্লোজ-আপ লেন্‌স ব্যবহার করা হয় তবে বিবর্ধনের মাপ হবে ২০০÷২৫০=০.৮।

ডায়াফ্রাম

লেন্‌সের অ্যাপারচার বা আলোর প্রবেশের পথ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ধাতুর পাতলা আবরণ। অতি সাধারণ শাটারযুক্ত ক্যামেরায় একটি ধাতুর পাতে বিভিন্ন ব্যাসের দুটি অথবা তিনটি ছিদ্র করে আলোক প্রবেশের পথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্যামেরায় পাঁচ থেকে বারো খানি বিশেষ আকারে কাটা পাতলা ধাতুর পাত একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে লেন্‌সের মধ্যে বসানো থাকে যার সাহায্যে লেন্‌সের অ্যাপারচার ছোট বা বড় করে আলোক প্রবেশের পথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ছিদ্রপথ অনেকটা আমাদের চোখের কণীনিকার মত মধ্যাংশ থেকে আকারে বড় হয় বলে এই ডায়াফ্রামকে 'আইরিস ডায়াফ্রাম' বলে। এতে ধাতুর পাতের সংখ্যা যত বেশি হয় ছিদ্রপথ তত বেশি গোলাকার হয়। অবশ্য সঠিক আলোকপাতের জন্য ডায়াফ্রাম সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। ডায়াফ্রামের ব্যাস এফ স্টপ তথা ফোকস দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত।

ডার্করুম

আলোক-প্রতিরোধী ঘর, যেখানে ছবি তোলার পর পরিস্ফুটন, মুদ্রণ, বিবর্ধন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ করা হয়। ঘরে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত নিরাপদ আলো (সেফলাইট) ব্যবহার করার ব্যবস্থা থাকে।

ডি. আই. এন.

স্পীড দ্রষ্টব্য

ডিউপ

বিকল্প নেগেটিভ বা স্লাইডের পেশাদারী পরিভাষা।

ডি. এক্স. কোডেড ক্যামেরা/ফিল্ম

আজকাল অনেক স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার ফিল্ম ক্যাসেট বা কার্টরিজ রাখার জায়গায় বৈদ্যুতিক সঙ্কেতলিপির ব্যবস্থা রাখা হয় এগুলিকেই DX-Coded ক্যামেরা বলে। DX-Code যুক্ত ফিল্ম ক্যাসেট ব্যবহার করলে এই ক্যামেরায় আর আলাদা করে ফিল্ম স্পিড সেট করার দরকার হয় না। স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ঐ ফিল্মের দ্রুতি অনুসারে ক্যামেরা কাজ করে। DX-Coded film ক্যাসেটের গায়ে কতকগুলি হাল্কা ও গাঢ় রঙের ছক আঁকা থাকে। হালকা ছকগুলি বিদ্যুৎ পরিবাহী (conductive) ও গাঢ় ছকগুলি অপরিবাহী (insulated) রাখা হয়। ফিল্মের দ্রুতি অনুযায়ী এই ছকগুলি আঁকা হয়।

ডিফিউসার/ ডিফিউসার ফিল্টার

অর্ধস্বচ্ছ বস্তু যার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ঝাপসা হয়ে যায়। তীব্রতা হ্রাস করে আলোকে সমানভাবে নরম করার জন্য লেন্সের সামনে বা আলোকের উৎসমুখে ব্যবহার করা হয়। উৎস থেকে ডিফিউসার যত দূরে থাকে আলো তত বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। বর্ণহীন, স্বচ্ছ কাঁচ বা জিলেটিনে সরু সরু লাইন বা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিন্দু এচিং করে তৈরি যে ডিফিউসার ফিল্টারের মত লেন্সের সামনে ব্যবহার করার জন্য তা সঠিক অর্থে ফিল্টার না হলেও ডিফিউসার ফিল্টার নামেই পরিচিত।

ডিফ্র্যাকশন

অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র বা পথের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলোকরশ্মির অবক্ষিপ্ত হয়ে দিক পরিবর্তন করা । লেন্সের অ্যাপারচার খুব ছোট করা হলে, যেমন এফ ৩২ বা এফ ৪৫, তখন আলোকের এই অবক্ষেপ স্পষ্ট হয় এবং তার ফলে প্রতিচ্ছবির বিকৃতি ঘটে। সেজন্য যে কোন লেন্সের মোটামুটি মধ্যবর্তী অ্যাপারচারে সর্বাপেক্ষা ভাল ছবি পাওয়া সম্ভব, এই অ্যাপারচারে লেন্সের ত্রুটিও সবচেয়ে কম ও ডিফ্র্যাকশনের সৃষ্টি হয়ে প্রতিচ্ছবির বিকৃতিও ঘটে না। লেন্সের এই নির্দিষ্ট অ্যাপারচারকে 'ক্রিটিকাল অ্যাপারচার' নামেও উল্লেখ করা হয়। এই জন্যই ৩৫ মি. মি. ক্যামেরার অধিকাংশ লেন্সে এফ ১৬ অপেক্ষা ছোট অ্যাপারচার রাখা হয় না।

ডিস্টর্শন

কার্ভিলিনিয়র ডিস্টর্শন দ্রষ্টব্য।

ডিস্টেন্স স্কেল

লেন্স ব্যারেলে ফোকসের দূরত্ব নির্দেশক সংখ্যার দাগ দেওয়া স্কেল। বস্তু-দূরত্ব অনুসারে দূরত্ব নির্দেশক দাগে লেন্সকে এনে বস্তুকে ফোকস করা হয় অথবা লেন্সের ফোকস দূরত্বের নির্দেশ পাওয়া যায়। ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশগানেও এই দূরত্ব নির্দেশক মাপন থাকে যা বস্তু দূরত্ব অনুসারে এফ ষ্টপ নির্দেশ করে।

ডিস্‌পারসন

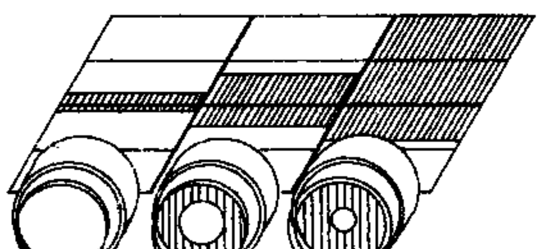
বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মিকে কোন মাধ্যমের (যেমন কাঁচ) বিভিন্ন কৌণিক মাত্রায় বাঁকিয়ে দেওয়ার ক্রিয়া। এই ডিস্‌পারসন বা বিচ্ছুরণের মাত্রা নির্ভর করে আপতিত আলোকের কৌণিক অবস্থান, কাঁচের ধরন ও তার প্রতিসরণ গুণাঙ্ক (রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স)-এর ওপর।

ডেন্‌সিটি

নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলোকসঞ্চারণের পরিমাণ বোঝানোর জন্য ডেন্‌সিটি বা ঘনত্ব শব্দের ব্যবহার। নেগেটিভের ঘনত্ব নির্ভর করে ফিল্‌মে আলোকপাত ও পরিস্ফুটনের ফলে সৃষ্ট ধাতব সিলভারের জমাট বাঁধার ওপর। বৈষম্য ও অনুপুঙ্খসহ চূড়ান্ত প্রিন্টের মান নেগেটিভের ঘনত্বের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

ডেপ্‌থ অব ফিল্ড

কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে ফোকস করার পর বস্তুর সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ পর্যন্ত যতটুকু ক্ষেত্র গ্রহণযোগ্যভাবে ফোকসের মধ্যে থাকে তাকে ডেপ্‌থ অব ফিল্ড বা ক্ষেত্র গভীরতা বলে। সাধারণত ফোকস করা বস্তুর সামনে ১/৩ অংশ ও পিছনে ২/৩ অংশ পর্যন্ত স্থান ক্ষেত্র গভীরতার অন্তর্গত। ফোকস ক্ষেত্রের গভীরতা নির্ভর করে লেন্‌সের অ্যাপারচার ও ফোকস দৈর্ঘ্যের ওপর। লেন্‌সের অ্যাপারচার যত বড় ও ফোকস দৈর্ঘ্য যত বেশি হতে থাকে ক্ষেত্র গভীরতাও তত কমে।



ডেপ্‌থ অব ফোকস

ক্ষেত্র গভীরতার একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বস্তুগুলি যেমন ফোকসে থাকে লেন্‌সের প্রতিচ্ছবির ক্ষেত্রেও তেমন একটি নির্দিষ্ট এলাকা থাকে যার মধ্যে প্রতিচ্ছবির অস্পষ্টতা

আপাত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। লেন্সের নির্দিষ্ট ফোকসতলের যতটুকু এলাকার প্রতিচ্ছবি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রটুকুকে ডেপ্থ অব ফোকস বা ফোকস গভীরতা বলে। নির্দিষ্ট ফোকসতলের উভয়দিকে সামান্য ব্যবধানের দরুন প্রতিচ্ছবির যে অস্পষ্টতা তা অবশ্য চোখে ধরা যায় না। এই ফোকস গভীরতা নির্ভর করে লেন্সের ব্যবহৃত অ্যাপারচার ও বস্তুর প্রতিটি বিন্দুর প্রতিচ্ছবির আকারের ওপর।

ডেফিনিশন

নেগেটিভে বা প্রিন্টে প্রতিচ্ছবির সামগ্রিক তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা বোঝাবার জন্য এই শব্দটি সাবজেকটিভভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিচ্ছবির স্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতা লেন্সের গুণমানের ওপরও নির্ভরশীল যা বোঝাতে 'রেজলিউশন' শব্দটির প্রয়োগ।

ডেভেল্যাপমেন্ট বাই ইন্সপেকশন

জরুরি কারণে পরিস্ফুনের সময় অত্যন্ত অল্পক্ষণের জন্য নিরাপদ আলোকে ফিল্মের অবস্থা দেখে নিয়ে পরিস্ফুটন করা। এক্ষেত্রে পরিস্ফুটকের তাপমাত্রা ও সময়ের হিসাব অনুসরণ করা হয় না। শুধু নেগেটিভের ঘনত্ব পরীক্ষা করেই পরিস্ফুটন বন্ধ করা হয়।

ডেভেলাপার

ফিল্মের লীন প্রতিচ্ছবিকে দৃশ্যমান করে তোলার জন্য যে দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, প্রচলিত অর্থে তাকেই ডেভেলাপার বা পরিস্ফুটক বলে। লীন প্রতিচ্ছবির বৈশিষ্ট্যের ওপর পরিস্ফুটন-কর্ম ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল। সংজ্ঞাগতভাবে পরিস্ফুটন বলতে বোঝায় আলোকিত সিলভার হ্যালাইডকে ধাতব সিলভারে পর্যবসিত করা। পরিস্ফুটন অংশে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছ। সাধারণ পরিস্ফুটনে শুধু লীন প্রতিচ্ছবি সৃষ্টিকারী আলোকিত হ্যালাইডকণাগুলিকেই রূপান্তরিত করা হলেও, বাস্তবিকপক্ষে যদি যথেষ্ট বেশি সময় ধরে পরিস্ফুটন করা হয়, তবে সমস্ত কণাই পরিস্ফুটিত হয়ে যাবে। সুতরাং শুধু আলোকিত কণাগুলিকে পরিস্ফুট করা সঠিক সময়ের ব্যাপার। আলোকিত কণাগুলি অনালোকিত কণাগুলির তুলনায় কম সময়ে পরিস্ফুটিত হয়ে যায়। পরিস্ফুটনের দ্রবণে হ্যালাইড কণা রূপান্তরের উপাদান নির্দিষ্ট শক্তিসম্পন্ন হওয়াও প্রয়োজন। উপাদান যদি কম শক্তিশালী হয় তবে কণা একেবারেই রূপান্তরিত হবে না, আর বেশি শক্তিশালী হলে আলোকিত, অনালোকিত সমস্ত কণাকেই রূপান্তরিত করে দেবে।

ডেভেলাপার স্ট্রীক্স

ফিল্মের সমগ্র অংশে সমানভাবে পরিস্ফুটন না হওয়ার ফলে নেগেটিভে যে রেখাকৃতি দাগ পড়ে। পরিস্ফুটনের সময় যথাযথ অ্যাজিটেশন বা ঝাঁকুনি দেওয়া না হলে এই রাসায়নিক বিকৃতি দেখা যায়।

ডেভেলাপিং এজেন্ট

পরিস্ফুটনের দ্রবণে হ্যালাইড কণা রূপান্তরের উপাদান যা অবদ্রবের অনালোকিত

হ্যালাইড কণাগুলিকে যথাযথ রেখে শুধু আলোকিত কণাগুলিকেই ধাতব সিলভারে রূপান্তরিত করে। যথাযথ পরিস্ফুটনের জন্য এই উপাদানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন—১. আলোকিত ও অনালোকিত সিলভার হ্যালাইড স্ফটিকগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারার ক্ষমতা যাতে উভয় প্রকার স্ফটিক পরিস্ফুটিত হয়ে নেগেটিভে ফগ না সৃষ্টি করে ২. একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দ্রবণের কার্যক্ষমতা বজায় রাখা ৩. জলে সহজে দ্রবণীয় হওয়ার ক্ষমতা ৪. জিলেটিনের স্তরকে ক্ষতিকরভাবে নরম না করা ৫. রাসায়নিকভাবে পারতপক্ষে বিষাক্ত না হওয়া। এই উপাদান জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার রাসায়নিক থেকেই পাওয়া সম্ভব, তবে বর্তমানে অজৈব রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। এক সময় ওয়েট কলোডিয়ন পদ্ধতিতে অজৈব উপাদান ফেরাস অক্সালেট বহুল প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাজারে প্রচলিত যে সমস্ত পরিস্ফুটক পাওয়া যায় তা প্রধানত জৈব রাসায়নিক গ্রুপের উপাদান থেকে প্রস্তুত। বইয়ের পরিস্ফুটন অংশে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

থিন্ নেগেটিভ

যে নেগেটিভের প্রতিচ্ছবিতে ধাতব সিলভারের সবন্ধতার পরিমাণ কম। এই ধরনের নেগেটিভ থেকে প্রিণ্ট করলে বৈষম্য থাকে না এবং নেগেটিভ বেশি পাতলা হলে সুন্দরভাবে মুদ্রণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দাগ্যেরোটাইপ

Louis Jacques Mande Daguerre ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট নীপ্সের সহযোগিতায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সর্বপ্রথম প্যারিসে যে পদ্ধতিতে ফোটো তোলার প্রচলন করেন। এই পদ্ধতিতে আলোক-সংবেদনশীল সিল্ভার নাইট্রেট মাখানো তামার পাতে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে পারদবাষ্পে পরিস্ফুটিত করে সরাসারি পজিটিভ ছবি পাওয়া যেত। প্রতিচ্ছবিকে স্থায়ী করার জন্য পাতটিকে সোডিয়ম ক্লোরাইড অথবা মৃদু সোডিয়ম থিওসালফেট দ্রবণে ডুবিয়ে নেওয়া হত।

নর্ম্যাল লেন্স

ক্যামেরায় ব্যবহৃত যে লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ্য মোটামুটি সেই ক্যামেরার ফিল্ম ফর্ম্যাটের কোনাকুনি মাপের সমান। ক্যামেরার সঙ্গে সাধারণত যে লেন্স দেওয়া থাকে তা সেই ক্যামেরার ক্ষেত্রে নর্ম্যাল লেন্স। যেমন ৩৫ মি. মি. ক্যামেরায় ৫০ মি. মি. লেন্স বা ৬ × ৬ সি. মি. ক্যামরায় ৭৫ মি. মি. লেন্স নর্ম্যাল। নর্ম্যাল লেন্সের কৌণিকক্ষেত্র আমাদের স্বাভবিক দৃষ্টিক্ষেত্রের খুব কাছাকাছি। এই লেন্স ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা প্রাইম লেন্স নামেও প্রচলিত।

নিউট্রাল ডেনসিটি ফিল্টার

ধূসর বর্ণের ফিল্টার যা বর্ণালির সমস্ত রশ্মির প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে অনচ্ছ । ফলে এই ফিল্টার ব্যবহারে প্রতিচ্ছবির রঙ কোনভাবেই প্রভাবিত হয় না। অ্যাপারচার ও

শাটার-দ্রুতি অপরিবর্তিত রেখে শুধু মাত্র আলোকের পরিমাণ কমাবার জন্যই এর ব্যবহার। বিভিন্ন ঘনত্বের হয়ে থাকে যা সমগ্র আলোকের শতকরা ৯০ থেকে ১ ভাগ পর্যন্ত সঞ্চারিত হতে দেয়। নামসংক্ষেপ অনুসারে এন. ডি. ফিলটার নামেই অধিক পরিচিত।

নেগেটিভ ক্যারিয়ার

বিবর্ধক যন্ত্রে বিবর্ধনের সময় নেগেটিভ রাখার জন্য চ্যাপ্টা ধাতুর ফ্রেম। এই ফ্রেমে নেগেটিভ লাগিয়ে কনডেনসর ও লেন্সের মাঝে রেখে বিবর্ধন করা হয়।

নোডাল পয়েন্ট

যৌগিক লেন্সের সামনের ও পিছনের দুটি কাল্পনিক বিন্দু। আলোকরশ্মিগুলি যে কাল্পনিক বিন্দু থেকে একই লক্ষ্যে লেনসে প্রবেশ করছে বলে মনে হয় তা লেন্সের সম্মুখ-নোডাল পয়েন্ট এবং আলোকরশ্মিগুলি যে কাল্পনিক বিন্দু থেকে নির্গত হয়ে লেন্স থেকে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হয় তা লেন্সের পশ্চাদ-নোডাল পয়েন্ট। দৃক-বিজ্ঞানে নানা পরিসংখ্যান ও মাপের জন্য এবং লেন্সের ফোকস দৈর্ঘের ক্ষেত্রে এই নোডাল পয়েন্টের হিসাব অত্যন্ত জরুরি।

পজিটিভ

যে প্রতিচ্ছবিতে বস্তুর সাদা, কালো ও ধূসরতা আমরা বাস্তবে যে ভাবে দেখতে অভ্যস্থ ঠিক সেইভাবেই পাওয়া যায়। নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট করে বস্তুর এই সদৃশ প্রতিরূপ পাওয়া যায়। আবার পজিটিভ ফিল্মের আলোকিত হ্যালাইড কণাগুলিকে ব্লীচ করে অবদ্রব থেকে অপসারিত করে ও অনালোকিত হ্যালাইড কণাগুলিকে পরিস্ফুটিত করেও পজিটিভ ছবি পাওয়া সম্ভব।

পজিটিভ ডিস্টর্শন

লেন্সের ক্ষেত্র বক্রতা জনিত ত্রুটির জন্য প্রতিচ্ছবিতে বস্তুর আকৃতির যে বিকৃতি ঘটে তার একটি পজিটিভ ডিস্টর্শন, যাকে চলতি কথায় বলা হয় পিনকুশন বিকৃতি। এই বিকৃতির ফলে প্রতিচ্ছবির প্রান্তভূমির সমান্তরাল সরল রেখাগুলি লেন্সের অক্ষের দিকে সরে আসে। বিপরীত ভাবে রেখাগুলি যদি অক্ষ থেকে দূরে সরে যায় তবে তাকে নেগেটিভ বা ব্যারেল ডিস্টর্শন বলা হয়।

পটাশিয়ম/ক্রোম অ্যালাম

অবদ্রবকে শক্ত করার উপাদান হিসাবে অ্যাসিড হার্ডনিং ফিক্সিং বাথে (এর স্থায়িত্ব অ্যাসিড ফিক্সিং বাথ অপেক্ষা কম) ব্যবহার করার রাসায়নিক। ক্রোম অ্যালামে সামান্য সবুজাভ ছাপ পড়তে পারে বলে মুদ্রণের সময় দ্রবণে পটাশিয়ম অ্যালামই সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

পলিকনট্রাস্ট পেপার/ফিল্টার

কোডাক কোম্পানির তৈরি যে কোন বৈষম্যের রঙীন ছবি মুদ্রণের কাগজের এবং প্রিণ্টে প্রয়োজনীয় বৈষম্য সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহারোপযোগী হলুদ ও ম্যাজেন্টা রঙের বিভিন্ন ঘনত্বের ফিল্টারের ব্যবসায়িক নাম।

পারস্পেকটিভ

দ্বিমাত্রিক ছবিতে ত্রিমাত্রিক বস্তুর আকার, আয়তন ও অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকাশ। দৃষ্টিকোণের সাহায্যে আয়তনের তারতম্য ও অভিসারী রেখা সৃষ্টি করে ছবিতে পারস্পেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অস্পষ্টতা ও অনুপুঙ্খের অভাবও ছবিতে দূরত্ব বা গভীরতা প্রকাশে সাহায্য করে।

পিগমেণ্ট প্রোসেস

ফোটোগ্রাফিতে যে পদ্ধতিতে রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা হয়। যেমন গাম/অয়েল/ব্রম অয়েল/ কার্বন প্রিন্টিং ইত্যাদি।

পিনকুশন ডিস্টর্শন

পজিটিভ ডিস্টর্শন দ্রষ্টব্য।

পিনহোল

নেগেটিভের অস্বচ্ছ অংশের ওপর অতি সূক্ষ্ম বিন্দুর মত দাগ। ধুলো বা ময়লার দরুন এই দাগ হয়ে থাকে। অধিক বৈষম্যের ফিল্মে এই দাগ বেশি দেখা যায়। অবদ্রবের সূক্ষ্ম আস্তরণ ছিঁড়ে গিয়ে এই পিনহোলের সৃষ্টি হয়, অস্বচ্ছ তরল রঙের সাহায্যে এই ছিদ্র ভরাট করে নেওয়া যায়।

পিনহোল ক্যামেরা

লেন্সবিহীন ক্যামেরা যাতে লেন্সের পরিবর্তে একটি অত্যন্ত ছোট ছিদ্রের সাহায্যে বিপরীত প্রান্তের আলোক-সংবেদনশীল বস্তুর ওপর প্রতিচ্ছবি পড়ে। ছিদ্রের মাপ স্থির করা হয় আলোকের পরিমাণ ও বিচ্ছুরণ অনুযায়ী। প্রতিচ্ছবি খুব ভাল মানের হয় না। এই ক্যামেরা "ক্যামরা অবস্কুরা"র পরবর্তী উন্নত সংস্করণ।

পুশ ডেভেলাপমেণ্ট

ফিল্মে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা আলোকের অভাবে আলোকপাত কম হলে, প্রতিচ্ছবি অধিক সময় ধরে বিশেষভাবে পরিস্ফুটন করা। অবশ্য কম আলোকপাত নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে করা প্রয়োজন যাতে কতটা অতিরিক্ত সময় ধরে পরিস্ফুট করতে হবে তা সঠিকভাবে স্থির করা যায়। এই পরিস্ফুটনে সাদা-কালো নেগেটিভে বৈষম্য ও কণাময়তা বৃদ্ধি পায় এবং রঙীন ফিল্মের ক্ষেত্রে কণাময়তা বাড়িয়ে রঙেরও ভারসাম্য নষ্ট করে।

পেজ্‌ভাল সাম/লেন্‌স

লেন্‌সের অ্যাস্‌টিগ্‌ম্যাটিজম (দৃকবৈষম্য) জনিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য লেন্‌স প্রস্তুতকারী কাঁচের শক্তি নির্ধারণ করার পদ্ধতি পেজ্‌ভাল সাম নামে পরিচিত। আর পেজ্‌ভাল লেন্‌স হল Voigtlander কোম্পানির জন্য ইয়োসেফ পেজ্‌ভাল তিন এলিমেন্ট যুক্ত যে লেন্‌স তৈরি করেছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী ধরে প্রতিকৃতি তোলার জন্য এই লেন্‌স অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই প্রকার ব্যবহারের জন্য একে পোর্ট্রেট লেন্‌সও বলা হত। বর্তমান কালের বহু লেন্‌স এই তিন এলিমেন্ট যুক্ত পুরনো লেন্‌সেরই উন্নত সংস্করণ।

পেন্টাপ্রিজম

সাধারণত ৩৫ মি. মি. ক্যামেরায় ব্যবহৃত পাঁচটি তলবিশিষ্ট ভারী লেন্‌স যার সাহায্যে ফোকস করার সময় বস্তুকে ভিউফাইণ্ডারে স্পষ্টাকারে দেখা যায়। সাধারণত একটি আয়নার সাহায্যে প্রতিচ্ছবিকে প্রতিফলিত করে বস্তুর প্রতিচ্ছবি সোজাভাবে দেখার সুবিধাও এতে পাওয়া যায়।

পেপার/পেপার গ্রেড

ছবি মুদ্রণের কাগজ। অবদ্রবের বৈষম্য অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডের কাগজ বিভিন্ন সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বৃহত্তর সংখ্যা অধিকতর বৈষম্য নির্দেশ করে।

পেপার নেগেটিভ

পজিটিভ প্রিন্ট থেকে কনট্যাক্ট মুদ্রণের সাহায্যে ফোটোগ্রাফির কাগজে যে নেগেটিভ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সাধারণত অত্যন্ত হালকা ও নরম ছবির ক্ষেত্রে পেপার নেগেটিভ তৈরি করে তা থেকে পজিটিভ প্রিন্ট করা হয়।

পোর্ট্রেট লেন্‌স

এক সময় পোর্ট্রেট লেন্‌স বলতে সফ্‌ট ফোকস লেন্‌সকে বোঝানো হত। পেজ্‌ভাল লেন্‌সে প্রতিচ্ছবির মধ্যাংশ তীক্ষ্ণ এবং চারপাশ সামান্য আবছা হত বলে সেই লেন্‌সও এই নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে সামান্য লং ফোকস লেন্‌স প্রতিকৃতি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয় যাতে প্রতিচ্ছবির পরিপ্রেক্ষিত ঠিক থাকে ও ব্যক্তির খুব কাছ থেকে ছবি তুলতে না হয়।

পোলারয়েড ল্যাণ্ড-ক্যামেরা/ফিল্‌ম

ড. এডউইন ল্যাণ্ড আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে ছবি তোলার ক্যামেরা যাতে ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্ট পাওয়া যায়। এই ক্যামেরায় এবং এতে ব্যবহারোপযোগী পোলারয়েড ফিল্‌মে এমন কিছু ব্যবস্থা থাকে যাতে আলোক-সংবেদনশীল অবদ্রব ক্যামেরা ও ফিল্‌ম প্যাকের অভ্যন্তরেই পরিস্ফুটিত হয়ে যায়।

পোলারাইজেশন/পোলাস্ক্রীন

স্বাভাবিকভাবে আলো তরঙ্গাকারে সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কাঁচ, জল, পাথর, কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন অধাতব বস্তু থেকে প্রতিফলিত অধিকাংশ আলোকতরঙ্গ পোলারাইজড বা সমাবর্তিত হয়ে একটি মাত্র তলে স্পন্দিত হয়। যে জন্য কাঁচ, জল প্রভৃতি চকচকে বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো গ্লেয়ার সৃষ্টি করে বস্তুকে ঝাপসা করে তোলে এবং বাতাসের ধূলিকণা থেকে প্রতিফলিত আলো দিগন্তের অস্পষ্টতা ও আকাশের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। সমাবর্তনের মাত্রা নির্ভর করে সেই পৃষ্ঠভাগের ওপর পতিত আলোকরশ্মির আপতন কোণের ওপর। যে ফিল্টারের সাহায্যে এই সমাবর্তিত আলোকতরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করা ও কমানো হয় তা পোলারাইজিং ফিল্টার বা পোলাস্ক্রীন নামে পরিচিত। এটিকে সঠিক অর্থে ফিল্টার বলা চলে না কারণ এটি নির্বাচিত ভাবে কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে শোষণ করে না। এটি সমান্তরাল ভাবে সাজানো অতি সূক্ষ্ম স্ফটিকের একটি স্বচ্ছ পর্দা যা হোল্ডার রিংয়ে লাগিয়ে ঘোরানো হয়। হোল্ডার রিং ঘুরিয়ে স্ক্রীনের সমান্তরাল রেখাগুলি সমাবর্তিত আলোকতরঙ্গের সমকোণে এনে আলোকের একদিকের গতি বন্ধ করে বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর ঝলকানি রোধ করা হয়। পোলাস্ক্রীন সাদা-কালো বা রঙীন উভয় ফিল্মের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি যে কেবল বস্তু থেকে আলোকের অবাঞ্ছিত প্রতিফলন রোধ করে তাই নয়, দৃশ্যের অস্পষ্টতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়, আকাশকে গাঢ়তর ও ছবির রঙকে সমৃদ্ধতর করে। হালকা ধূসর বর্ণের এই স্ক্রীন লেন্সের সম্মুখে ব্যবহার করা হয় এবং এর ব্যবহার অর্ধেকেরও বেশি আলো প্রতিরোধ করে বলে ১$^{১}/_{৩}$ স্টপ বেশি আলোকপাতের প্রয়োজন হয়। যদি দুটি পোলারাইজিং ফিল্টার পরস্পরের সহযোগে ব্যবহার করা হয় তাহলে তারা একত্রে একটি নিউট্রাল ডেন্সিটি ফিল্টার হিসাবে কাজ করতে পারে। ফিল্টার দুটির দৃকগত অক্ষের কৌণিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে কী পরিমাণ আলো শোষিত হবে তা।

পোস্টারাইজেশন

ফোটোগ্রাফির একটি কৌশল, যাতে একই ছবির বিভিন্ন টোনের জন্য আলাদা আলাদা কয়েকটি নেগেটিভ প্রস্তুত করা হয়। এই প্রকার ছবিতে একটি টোন থেকে আর একটি টোনের মধ্যে কোন ক্রমায়ণ থাকে না, সম্পূর্ণ টোনহীন সাদা ও ঘন কালো ছাড়া একটি অথবা দুটি মধ্যবর্তী ধূসর ফ্ল্যাট টোনই এই ছবির বৈশিষ্ট্য। একটি সাধারণ নেগেটিভ থেকে উচ্চ বৈষম্যের লিথ্ ফিল্মে কম আলোকপাত (ধরা যাক ৫ সেকেণ্ড), সঠিক আলোকপাত (১০ সেকেণ্ড) ও বেশি আলোকপাত (১৫ সেকেণ্ড) করে তিনটি আলাদা পজিটিভ প্রতিচ্ছবি লিথ্ ডেভেলাপারে পরিস্ফুটন করা হয়। এই তিনটি প্রতিচ্ছবিই পুনরায় একটি সাধারণ বৈষম্যের ফিল্মের ওপর সঠিক অবস্থানে পর পর মুদ্রণ করে যে মাস্টার নেগেটিভ পাওয়া যাবে তা থেকে স্বাভাবিক মুদ্রণ করে পোস্টারাইজেশন পিক্চার পাওয়া যায়। নেগেটিভের আকার অপেক্ষাকৃত বড় হলে কাজ করার সুবিধা।

প্যানক্রোমেটিক ফিল্‌ম

কালো-সাদা যে ফিল্‌মের অবদ্রব বর্ণালির সমস্ত আলোকরশ্মির প্রতি এবং কিছুটা অতিবেগনি রশ্মির প্রতি সংবেদনশীল। অবশ্য এই সংবেদনশীলতা বর্ণালির সমগ্র অংশে সমান নয়। প্যান ফিল্‌ম নামেও পরিচিত।

প্যানিং

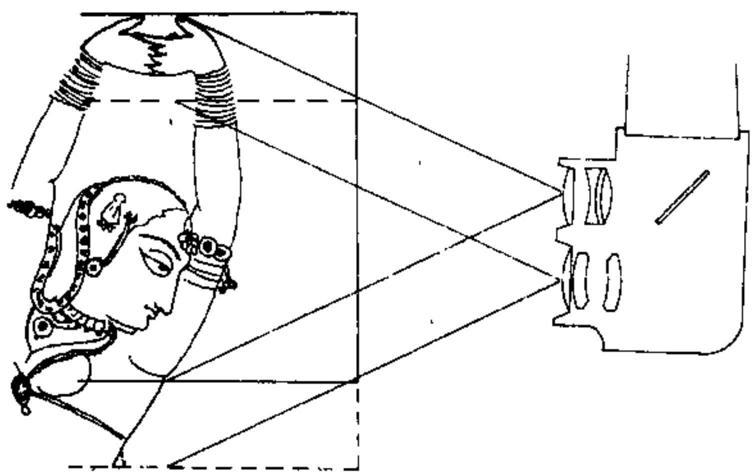
বস্তুর গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্যামেরা ধীরে ধীরে একদিক থেকে আর একদিকে সরাতে সরাতে শাটার টেপা। যার ফলে বস্তুর প্রতিচ্ছবি তীক্ষ্ণ ও পটভূমি ঝাপসা হয়ে স্থির ছবিতে গতির বিভ্রম সৃষ্টি হয়।

প্যানোরামিক ক্যামেরা

বিশেষ ধরনের স্ক্যানিং লেনসযুক্ত ক্যামেরা যার লেনসটি পিছনের নোডাল পয়েন্টে একদিক থেকে আর একদিকে সরিয়ে ছবি তোলা যায়। অতিরিক্ত বৃহৎ ক্ষেত্রের ছবি এই ক্যামেরার সাহায্যে ধরা হয় বলে ছবিতে উল্লম্ব রেখা বেলনাকার দেখায়।

প্যারালাক্স এরর

ভিউফাইণ্ডারের মধ্য দিয়ে দেখা দৃশ্যবস্তু ও ফিল্‌মে তার প্রতিচ্ছবির মধ্যে পরিবর্তনের



দরুন যে দোষ। ভিউফাইণ্ডার ও লেন্সের অবস্থানের তফাতের ফলে এই ত্রুটি ঘটে। বস্তুর যত নিকটে যাওয়া যায় এই পরিবর্তন তত বাড়ে। একমাত্র এস. এল. আর ক্যামেরায় এই পার্থক্য হয় না, কারণ ক্যামেরার যে লেন্সে ছবি তোলা হয়, সেই লেন্সেই দৃশ্যবস্তু দেখা যায়।

প্রি-এক্সপোজার

ছায়াবৃত অংশের অনুপুঙ্খ সুস্পষ্ট রেখে আলোকিত অংশকেও যথাযথ রাখার জন্য ফিল্মে দুবার আলোকপাত করার পদ্ধতি। প্রথম বারের আলোকপাতকে প্রি-এক্সপোজার বলে।

প্রিজারভেটিভ

পরিস্ফুটকে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান যা দ্রবণে রূপান্তরণের উপাদানকে অম্লজানায়িত হওয়া থেকে রক্ষা করে। সাধারণত সোডিয়ম সালফাইট প্রিজারভেটিভ বা সংরক্ষক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রিন্টিং/প্রিন্টিং পেপার

মুদ্রণ দু ভাবে করা হয়—কনট্যাক্ট পদ্ধতিতে মুদ্রণ ও নেগেটিভ অপেক্ষা বড় আকারে মুদ্রণ যা বিবর্ধন নামে পরিচিত। এই মুদ্রণ করা হয় বিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে। ফোটোগ্রাফির আবিষ্কারের পর থেকে বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে মুদ্রণের কাজ করা হয়েছে—সিলভার প্রিন্টিং আউট পদ্ধতি, আয়রন প্রিন্টিং পদ্ধতি (ব্লু প্রিন্ট), ক্রোমেটিক পদ্ধতি, গামবাইক্রোমেট বা কার্বন পদ্ধতি, ডিয়াজো পদ্ধতি ইত্যাদি। সাধারণ লবণাক্ত, অ্যালবুমেন, কলোডিয়ন থেকে শুরু করে আজকের উন্নত মানের কাগজ পর্যন্ত বিভিন্ন কাগজও ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসায়িক ভাবে প্রস্তুত মুদ্রণের কাগজ দ্রুতি, বৈষম্য, রঙ, ঔজ্জ্বল্য, বুনন প্রভৃতি বিভিন্ন তারতম্যে বহু রকমের হয়ে থাকে। কনট্যাক্ট প্রিন্টের জন্য অত্যন্ত ধীর দ্রুতির সিলভার ক্লোরাইড অবদ্রবের কাগজ থেকে বিবর্ধনের জন্য উচ্চ দ্রুতির ক্লোরো-ব্রোমাইড কাগজ পর্যন্ত নানা ধরনের কাগজ পাওয়া যায়। কাগজের নিজস্ব বৈষম্যও বহু রকমের হতে পারে।

প্রিন্টিং বক্স

মুদ্রণের বাক্স যার মধ্যে নেগেটিভের সঙ্গে মুদ্রণের কাগজকে শক্ত ও সমানভাবে ধরে রেখে আলোকপাত করার ব্যবস্থা থাকে। সাধারণত ৪″ × ৫″ বা তার চেয়েও বড় আকারের কনট্যাক্ট প্রিন্টের জন্য এই বাক্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রি-ভিউ বাটন/লিভার

ক্যামেরার গায়ে লাগানো বোতাম বা লিভার যার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় লেন্সের বিভিন্ন অ্যাপারচারের ক্ষেত্র গভীরতা দেখা যায়।

প্রেস ক্যামেরা

বহনযোগ্য ভিউ ক্যামেরা, এক সময় সংবাদপত্রের আলোকচিত্রের জন্য যা বহুল প্রচলিত

ছিল। বর্তমানে এই কাজের জন্য স্পীডগ্রাফিক, লিন্‌হফ প্রভৃতি এস.এল. আর. ক্যামেরাই বোঝায়।

প্রোজেক্টর

প্রক্ষেপণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের দ্বারা শক্তিশালী আলো, কনডেনসর ও ম্যাগনিফাইং লেন্‌সের সাহায্যে পজিটিভ ফিল্‌মের প্রতিচ্ছবি সমতল স্থানের ওপর বৃহদাকারে প্রক্ষেপ করে ছবি দেখা হয়। বর্তমানে প্রোজেক্টরে জুম লেন্‌সের ব্যবহার, স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্লাইড বদলানো, দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা সুবিধা করা হয়েছে।

প্রোসেস ইমালশন

উচ্চ বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির অবদ্রব যা গ্রাফিক আর্টের কাজে ব্যবহার করা হয়। লিথ্‌ ফিলম-এর অবদ্রবও এই উচ্চ বৈষম্যের প্রোসেস ইমালশন।

প্রোসেসর

মুদ্রণের কাগজ স্বয়ংক্রিয় ভাবে পরিস্ফুটন ও স্থায়ীকরণের যন্ত্র। আলোকপাত করার পর কাগজ এই যন্ত্রে ঢোকানো হলে কয়েকটি রোলারের সাহায্যে তা প্রথমে পরিস্ফুটনের দ্রবণে পরিস্ফুট ও পরে স্থায়ীকরণের দ্রবণে স্থায়ী হয়ে যন্ত্র থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে বের হয়ে আসে। এইভাবে মুদ্রণের জন্য যে কাগজ ব্যবহার করা হয় তা বিশেষ ধরনের কাগজ (স্টেবিলাইজেশন পেপার)। বড় ফোটো ল্যাবরেটরিতে প্রচুর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্লেন অব ফোকস

ফোকল প্লেন দ্রষ্টব্য।

ফগ্‌

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দরুন অথবা আকস্মিক আলোকপাতের ফলে ফিল্‌মে বা প্রিন্টে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির বদলে যে ঘনত্ব বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

ফাইন-গ্রেন-ডেভেলাপার

নেগেটিভের ধাতব সিলভার কণাগুলির আকার যে পরিস্ফুটকের সহায্যে সূক্ষ্ম রাখা যায় তাকে ফাইন-গ্রেন-ডেভেলাপার বলে। এই ডেভেলাপার সিলভার কণাগুলিকে জট পাকাতে ও নেগেটিভের বৈষম্য বাড়তে দেয় না। ছোট বা মাঝারি ফর্ম্যাট-এর ফিল্‌ম পরিস্ফুটনের জন্য সাধারণত্‌ ডি-৭৬ বা আই. ডি-১১ ফাইন-গ্রেন-ডেভেলাপার হিসাবে প্রচলিত। এতে পরিস্ফুটনের উপাদান হিসেবে স্বল্প ক্ষারযুক্ত দ্রবণে মেটল ও হাইড্রোকুইনন ব্যবহার করা হয়। এই সব ডেভেলাপার তুলনামূলক ভাবে ধীর গতিতে ক্রিয়াশীল। মনে রাখা দরকার ফাইন-গ্রেন কথাটি আপেক্ষিক এবং মোটা দানার ফিল্‌মকে পরিস্ফুটনের সাহায্যে কখনোই সূক্ষ্ম-দানা করা যায় না। পরিস্ফুটনের উপাদান হিসেবে

para বা ortho-phenylendiamine সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম-দানা সৃষ্টিকারী, তবে তার শক্তি অত্যন্ত কম এবং আলোকপাতের পরিমাণ সেক্ষেত্রে বেশ বাড়ানো দরকার। এই রাসায়নিক অত্যন্ত বিষাক্তও বটে।

ফিক্সড্ ফোকস

যে সমস্ত ক্যামেরায় লেন্স ফোকস করার কোন ব্যবস্থা থাকে না। সাধারণত স্বল্প মূল্যের ক্যামেরায় লেন্সটি একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে—মূলত হাইপার ফোকল দূরত্বে—ফোকস করা থাকে। এই সমস্ত ক্যামেরায় ছোট অ্যাপারচার অথবা ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স ব্যবহার করে পাঁচ ফুট দূরত্ব থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বস্তুর প্রতিচ্ছবিকে ফোকসের মধ্যে রাখা যায়।

ফিক্সার

সাধারণভাবে প্রতিচ্ছবি ফিক্স বা স্থায়ী করার রাসায়নিক উপাদান রূপে উল্লিখিত হলেও বাস্তবিকপক্ষে এই উপাদানটি সিলভার হ্যালাইডের দ্রাবক বা সলভেন্ট হিসাবে কাজ করে। পরিস্ফুটনের পর উপাদানটি অবদ্রবের ধাতব সিলভার কণাগুলি যথাযথ রেখে শুধু সিলভার হ্যালাইড কণাগুলিকে জলে দ্রবণীয় যৌগিক পদার্থে পরিবর্তিত করে, যা ধৌতকরণের সময় অপসারিত হয়ে ধাতব সিলভারে গঠিত প্রতিচ্ছবিকে স্পষ্ট করে। সিলভার হ্যালাইডকে জলে দ্রবণীয় করার বেশ কয়েকটি রাসায়নিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও ফোটোগ্রাফিতে এই কাজের জন্য অ্যামোনিয়ম থিওসালফেট বা বিশেষত সোডিয়ম থিওসালফেট (হাইপো)-র ব্যবহারই সর্বাধিক প্রচলিত।

ফিজিক্যাল ডেভেলাপমেন্ট

সিলভার লবণ ও পরিস্ফুটনের উপাদান মিশ্রিত দ্রবণ থেকে সিলভারের সাহায্যে লীন প্রতিচ্ছবিকে দৃশ্যমান করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ইনটেনসিফিকেশনের মত কিন্তু এতে পরিস্ফুটনের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলে খুব একটা কার্যকর নয়।

ফিল-ইন লাইট

বস্তুর অনালোকিত অংশে আলোকসম্পাত করার জন্য দ্বিতীয় অপ্রধান আলো যার ব্যবহার বস্তুর অনুপুঙ্খ ফুটিয়ে তোলে বা হাইলাইট সৃষ্টি করে—বিশেষ করে প্রতিকৃতির ছবিতে। বহির্দৃশ্যে আলোকের বিপরীতে ছবি তোলার সময় ফ্ল্যাশের সাহায্যে ফিল-ইন লাইট খুবই কার্যকারী।

ফিল্টার

আলোকের উৎস ও বর্ণালির প্রতি সংবেদনশীলতা এই দুটি বিষয়ের ওপর ফোটোগ্রাফিক বস্তুর প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। এর যে কোনটির পরিবর্তন প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটায়। ফিল্টারের সাহায্যে কয়েকটি তরঙ্গ দৈর্ঘের আলোকরশ্মিকে শোষিত করে প্রতিচ্ছবিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা যায়। ফিল্টার আলোকের উৎসমুখে অথবা ক্যামেরায় লেন্সের সঙ্গে লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়।

ফিল্টার ড্রয়ার

বিবর্ধক যন্ত্রে আলোর নিচে ফিল্টার ব্যবহার করার আধার। সাধারণত রঙীন ছবি মুদ্রণের সময় বিভিন্ন ঘনত্বের কলার কমপেনসেটিং ফিল্টার এই আধারে রাখা হয়।

ফিল্টার ফ্যাক্টর

ফিল্টারের বিভিন্ন ঘনত্ব ও বর্ণ অনুসারে, আলোকরশ্মি শোষণের পরিমাণও কম বা বেশি হয়। সেজন্য ফিল্টারের ঘনত্ব অনুযায়ী ফিল্মে আলোকপাতের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই আলোকপাত নিয়ন্ত্রণের পরিমাণকে অথবা ফিল্টারের আলোকরশ্মি শোষণের ক্ষমতাকে ফিল্টার ফ্যাক্টর বলা হয়। তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ অধিক শোষিত হয় যার ফলে লাল ফিল্টারের ফ্যাক্টর সর্বাপেক্ষা বেশি। তবে ইনফ্রারেড ফোটোগ্রাফিতে যে ফিলটার ব্যবহার করা হয় তার ফিলটার ফ্যাক্টর হিসাব করা যায় না কেননা এই ফিল্টার সমস্ত দৃশ্যরশ্মিকে শোষণ করে শুধুমাত্র অদৃশ্য অবলোহিত রশ্মিকে সঞ্চারিত করে থাকে।

ফিল্টার হোল্ডার

যে সমস্ত বিবর্ধক যন্ত্রে ফিলটার ড্রয়ার থাকে না, সেক্ষেত্রে লেন্সের নিচে একটি গোল রিঙের মত থাকে যার মধ্যে কলার কমপেনসেটিং অথবা অন্য কোন জিলেটিন বা অ্যাসিটেট ফিল্টার রেখে মুদ্রণের কাজ করা যায়। ক্যামেরার লেন্স মাউন্টে লাগাবার জন্যও একটি ফ্রেমের মত হোল্ডার থাকে যার মধ্যে প্রয়োজনীয় চৌকাকৃতি ফিলটার পরিয়ে ছবি তোলা যায়।

ফিল্ড

লেন্সের সাহায্যে যতটুকু এলাকার ছবি ফিল্মে ধরা পড়ে।

ফিল্ম ট্রান্সপোর্ট

ফোকস তল থেকে ফিল্ম ফ্রেম সরাবার ব্যবস্থা। সাধারণত ক্যামেরায় ফিল্ম লাগাবার পর নব্ ঘুরিয়ে বা ক্র্যাঙ্ক ঠেলে ফিল্ম সরানো হয়।

ফিল্ম দ্রুতি

স্পীড দ্রষ্টব্য।

ফিল্ম প্যাক

আলোক প্রতিরোধী আবরণের মধ্যে একসঙ্গে রাখা কয়েকটি ফিল্ম শিট যা পোলারয়েড ল্যাণ্ড ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণত একটি প্যাকে বারোখানি ফিল্ম শিট থাকে এবং প্রতিটির সংখ্যা নির্দেশক একটা করে কাগজের ট্যাগ টেনে ফিল্মকে আলোকপাতের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

ফিল্ম প্রোসেসিং

ফিল্মের লীন প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তোলার রাসায়নিক প্রক্রিয়া। ডেভেলাপার দ্রষ্টব্য।

ফিল্‌ম প্লেন

ক্যামেরার মধ্যে লেনসের পিছনে অবস্থিত ফোকস তল যেখানে ফিলম রাখা হয় এবং আলোকপাতের ফলে লীন প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়।

ফিল্‌ম বেস/সাপোর্ট

যে ভূমি ফিলমের অবদ্রবকে সঠিকভাবে ধারণ করে রাখে। উপযুক্ত ফিল্‌ম বেস দৃকগত ভাবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, বর্ণহীন ও ত্রুটিশূন্য। রসায়নগত ভাবে স্থিতিশীল, সংবেদনশীল অবদ্রবে ও ফোটো রাসায়নিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এবং অবদ্রবকে সমান ভাবে ধরে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন ও আর্দ্রতা প্রতিরোধী। এছাড়াও তা হওয়া চাই শক্ত, মজবুত, পাতলা নমনীয় ও সহজে কুঁচকে যায় না এমন। বহুদিন ধরে ফিল্‌ম সাপোর্ট হিসাবে সেলুলোজ ঈষ্টার-এর ব্যবহার প্রচলিত। বর্তমানে কয়েক ধরনের কৃত্রিম হাইপলিমার রেজিনও ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফিশ-আই লেন্‌স

চরম ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনস যার কৌণিক ক্ষেত্র ১০০° বা তার চেয়ে (১৮০° পর্যন্ত) বেশি। এই লেন্‌সের ক্ষেত্র-গভীরতা এত বেশি হয় যে ফোকস করার কোন প্রয়োজন হয় না। তবে গৃহীত প্রতিচ্ছবি বিকৃত হয়ে থাকে।

ফোকল্ প্লেন

লেনসের ফোকস বিন্দুর মধ্য দিয়ে অক্ষরেখা বরাবর খাড়াভাবে (৯০°) লম্বমান কাল্পনিক তল। অসীম দূরত্বে ফোকস করা অবস্থায় এই কাল্পনিক তলে প্রতিচ্ছবি তীক্ষ্ণ ফোকসের মধ্যে থাকে।

ফোকল-প্লেন শাটার

লেনসের ফোকস তলের ঠিক সম্মুখে যে শাটার ব্যবহার করা হয়। এই শাটারের পর্দা যখন একদিক থেকে আর একদিকে চলে যায় তখন ফোকস তলে অবস্থিত আলোক-সংবেদনশীল বস্তুর ওপর ক্যামেরা ক্রমশঃ আলোকপাত করে।

ফোকল লেংথ

অসীম দূরত্বে ফোকস্ করা লেনসের পিছনের নোডাল পয়েন্ট থেকে ফোকস তল পর্যন্ত যে দূরত্ব তাকে ওই লেন্‌সের ফোকল লেংথ বা ফোকস দৈর্ঘ বলে।

ফোকস

লেনসের মাধ্যমে প্রতিসরিত আলোকরশ্মিগুলি যে নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়ে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে।

ফোকসিং ম্যাগনিফায়ার

ভিউফাইণ্ডারে প্রতিচ্ছবির অংশবিশেষ বড় আকারে দেখার ব্যবস্থা যার ফলে বস্তুর প্রতিচ্ছবিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফোকস করায় সুবিধা হয়।

ফোটোগ্রাফিক লেভেল

বস্তুর উল্লম্ব রেখা ও ফিল্ম তল পরস্পরের সমান্তরাল রাখার জন্য যে লেভেলের সাহায্য নেওয়া হয়। রাজমিস্ত্রীরা যে স্পিরিট লেভেল ব্যবহার করে অনেকটা সেই ধরনের লেভেল।

ফোটোগ্রাম

আলোক-সংবেদনশীল ফিল্ম, কাগজ বা প্লেটের ওপর স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ কোন বস্তু রেখে আলোকপাত ও পরিস্ফুটনের মাধ্যমে যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই ধরনের ছবিতে কোন অনুপুঙ্খ থাকে না, তবে জোরালো বৈষম্যযুক্ত ছবিতে আকৃতি ও নক্সা খুব ভালভাবে ধরা পড়ে।

ফোটোন

বিকীর্ণ শক্তি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বা ঝলকে ঝলকে সূক্ষ্ম কণার আকারে বিচ্ছুরিত হয়। বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক এই সূক্ষ্ম কণার নাম দিয়েছিলেন কোয়ান্টা। এই শক্তির উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যে কোনটা হতে পারে। আলো, তাপ, রঞ্জন রশ্মি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বিকীর্ণ শক্তি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টায় স্থানের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে ও আলোর ক্ষেত্রে তা ফোটোন নামক বিচ্ছিন্ন শক্তিকণার দ্বারা গঠিত, সিদ্ধান্তটি আইনস্টাইনের।

ফোটোফ্লাড

ফোটোগ্রাফির কাজে ব্যবহারোপযোগী উজ্জ্বল সাদা আলো যা ষ্ট্যাণ্ডে রিফ্লেকটর সহযোগে ব্যবহার করা হয়। এই আলোর বর্ণতাপমাত্রা ৩৩০০° কেলভিন।

ফোটোফ্ল্যাশ

ছবি তোলার জন্য ক্যামেরার সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী কৃত্রিম আলোকের উৎস যা অত্যন্ত কম সময়ের জন্য অতি উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করে। এতে কয়েক ধরনের গ্যাসের সাহায্যে স্বচ্ছ টিউবে আলোক প্রজ্বলিত করা হয়। দু ধরনের হয়ে থাকে—বাল্‌ব যা একবার মাত্র প্রজ্বলনের জন্য (সাধারণ ফ্ল্যাশ বালব-এর বর্ণতাপমাত্রা ৩৮০০° কেলভিন, ব্লু ফ্ল্যাশ বাল্‌ব-এর ৬০০০°কে) এবং ইলেকট্রনিক যা বারবার প্রজ্বলিত করা যায় (এই ফ্ল্যাশের বর্ণতাপমাত্রা ৬০০০° থেকে ৬৫০০° কে)।

ফোটোমনতাজ

বিভিন্ন বস্তু বা ছবির অংশবিশেষ ইচ্ছামত সাজিয়ে বাস্তবাতীত বা বিমূর্ত চিত্ররূপ সৃষ্টি করা। মান রে, ম্যাক্স আর্নষ্ট, জন হার্টফীল্ড প্রমুখ সুররিয়ালিস্ট শিল্পীদের ফোটোমনতাজ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

ফোটোমাইক্রোগ্রাফি

ক্যামেরাকে মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে লাগিয়ে বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের ছবি তোলার পদ্ধতি। আকার বা আয়তনে ১০ গুণ বা তার চেয়ে বড় প্রতিচ্ছবি ফোটোমাইক্রোগ্রাফির

অন্তর্গত। ১:১ থেকে ১০ গুণ পর্যন্ত বড় আকারের প্রতিচ্ছবি ম্যাক্রোফোটোগ্রাফির বিষয়।

ফোটোসেনজিটিভ

যে কোন বস্তু যা আলোকপাতের ফলে পরিবর্তিত হয়। যে বস্তুর আলোকপাতের ফলে গঠনের ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে তা ফোটোগ্রাফিতে আলোক-সংবেদনশীল নামে উল্লিখিত হয়ে থাকে।

ফ্রিজ

উচ্চ শাটার দ্রুতি ব্যবহার করে ছবিতে গতির বিভ্রম না আনা। তরল গতিশীল বস্তুকে উচ্চ শাটার দ্রুতি ও কমপিউটারাইজড ফ্ল্যাশগানের সাহায্যে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করা যায়।

ফ্রেম

ফিল্মের যে অংশটুকুতে একবার আলোকপাত করা হয়। অর্থাৎ ক্যামেরাতে লেনসের ফোকস তলে যতটুকু অংশ ফোকসের মধ্যে থাকে। ভিউফাইণ্ডারে দেখা অংশ অথবা প্রিন্টের পরিপ্রেক্ষিতেও ফ্রেম বা ফর্ম্যাট শব্দ দুটি ব্যবহার হয়।

ফ্লাড লাইট

ছবি তোলার জন্য স্টুডিওতে ব্যবহারোপযোগী উজ্জ্বল আলো। এই আলোর পিছনে রিফ্লেকটর ব্যবহার করে বস্তুর ওপর আলোকসম্পাত করা হয়। ফ্লাড লাইটের দূরত্ব ও রিফ্লেকটরের ওপর ফ্লাড লাইটের আলোকবৃত্ত নির্ভর করে।

ফ্লেয়ার

লেন্‌স বা ক্যামেরার অভ্যন্তর ভাগের কোন অংশ থেকে আলোক প্রতিফলনের ফলে প্রতিচ্ছবি গঠনে যে বাধার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিফলিত আলো প্রতিচ্ছবির ওপর ছড়িয়ে পড়ে প্রতিচ্ছবিকে ঝাপসা বা অস্পষ্ট করে দেয়। তীব্র আলোক উৎসের মুখোমুখি ছবি তোলার সময় ফ্লেয়ারের সম্ভাবনা বাড়ে এবং প্রতিচ্ছবিতে লেন্‌স ডায়াফ্রামের আকারে ছোট ছোট আলোকবৃত্তের ছাপ পড়ে। এই অবাঞ্ছিত আভ্যন্তরীণ আলোক প্রতিফলন কমানোর জন্যই লেন্‌সে ধাতব ফ্লুয়োরাইডের কোটিং দেওয়া হয় ও ক্যামেরার অভ্যন্তর ভাগ ম্যাট ও কালো করা হয়। চিত্ররস সৃষ্টির জন্য ছবিতে অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ফ্লেয়ারকে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

ফ্ল্যাশ গান/বাল্‌ব/ কিউব/রিং

ফোটোগ্রাফিতে ব্যবহার করার উপযোগী কৃত্রিম আলোর উৎস যা স্বল্প সময়ের জন্য জ্বলে উঠে অত্যুজ্জ্বল আলোকসম্পাত করে/সাধারণ ফ্ল্যাশগানে একবার মাত্র ব্যবহারোপযোগী যে বাল্‌ব ব্যবহার করা হয়/ একটি ইউনিটের চারপাশে চারবার জ্বলার উপযোগী যে বাল্‌ব পাওয়া যায়/ক্লোজ-আপ ছবি তোলার জন্য চক্রাকার ফ্ল্যাশলাইট যা লেন্‌সের ফিল্টার মাউন্টে লাগিয়ে খুব ছোট বস্তুর ছবি তোলা হয়। এই আলোর বিস্তৃতি অনেক কম।

ফ্ল্যাশ সিনক্রোনাইজেশন

ফ্ল্যাশ লাইটের আলোকসম্পাতের স্বল্প সময়ের সঙ্গে ক্যামেরার শাটার সম্পূর্ণ খোলার সময়ের সামঞ্জস্যকরণ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ শাটার টেপার পর ঠিক যে সময়ে শাটারটি সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় থাকবে, সেই সময় ফ্ল্যাশের আলোকসম্পাতও পূর্ণ মাত্রায় হবে। ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ বিদ্যুৎ সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় প্রজ্বলিত হয় কিন্তু সাধারণ ফ্ল্যাশ বাল্‌বের আলো বিদ্যুৎ সংযোগের ১৭ মিলি সেকেণ্ড পরে পূর্ণশক্তির আলোকসম্পাত করে। তাই দু রকম ফ্ল্যাশ ব্যবহার করার জন্য ক্যামেরাতে 'এক্স' (ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের ক্ষেত্রে) ও 'এম' (সাধারণ ফ্ল্যাশগানের ক্ষেত্রে) দু রকম সিনক্রোনাইজেশন ব্যবস্থা (সেটিং) থাকে।

বক্স ক্যামেরা

ক্যামেরা অবস্কুরার উন্নত সংস্করণ—একটি ছোট বাক্সের আকারে অত্যন্ত সরল পদ্ধতিতে প্রস্তুত ক্যামেরা। এর প্রবর্তন করেন জর্জ ইষ্টম্যান ১৮৮৮ সালে যার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ফোটোগ্রাফি সহজলভ্য হয়ে ওঠে। এফ/১১ অ্যাপারচারযুক্ত, এক এলিমেন্টের একটি সরল লেন্‌স হাইপার ফোকল দূরত্বে ও ১/২৫ সেকেণ্ড শাটার দ্রুতিতে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট দূরত্বের পর থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য তীক্ষ্ম ছবি পাওয়া যেত।

বাউন্স ফ্ল্যাশ

ছবি তোলার সময় ফ্ল্যাশলাইটের আলো সোজাসুজি বস্তুর ওপর না ফেলে ঘরের দেয়াল, ছাদ বা অন্য কোন কিছু থেকে প্রতিফলিত করে ফেলা। ফ্ল্যাশের আলোর কর্কশ তীক্ষ্ণতা কমিয়ে নরম মোলায়েম আলোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। বাউন্স করার সুবিধার জন্য আজকাল ফ্ল্যাশগানের মাথাটি ওপর নিচ বা এপাশ ওপাশ ঘোরাবার ব্যবস্থা করা থাকে।

বাটারফ্লাই লাইটিং

প্রতিকৃতি তোলার সময় আলোকসম্পাতের বিশেষ পদ্ধতি। আলোকের প্রধান উৎসটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে নাকের নিচে হালকা ছায়াপাত ঘটে। সাধারণত গ্ল্যামার ফোটোগ্রাফিতে এই ধরনের আলোকসম্পাতের সাহায্য নেওয়া হয়।

বার্নিং-ইন

বিবর্ধক যন্ত্রে মুদ্রণের সময় প্রতিচ্ছবির অংশবিশেষে বেশি আলোকপাত করে টোনের তারতম্য করা। ছবির সমগ্র অংশে আলোকপাত করার পর হাইলাইটের অনুপুঙ্খ ভালভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য বার্নিং-ইন-এর প্রয়োজন।

বাস রিলিফ

ছবি মুদ্রণের একটি পদ্ধতি। নেগেটিভ থেকে একটি ফিল্‌মে কনট্যাক্ট মুদ্রণ করার পর, নেগেটিভ ও পজিটিভ ফিল্‌ম দুটি একটার ওপর আর একটা ঈষৎ সরিয়ে বসিয়ে

একসঙ্গে মুদ্রণ করা হয়। প্রিন্টে প্রতিচ্ছবির টোনের ক্রমায়ণ কমে যায় কিন্তু প্রতিচ্ছবির প্রতিটি রেখার পাশে ছায়া সৃষ্টি করে ত্রিমাত্রিক অনুভূতি আনে।

বি (বাল্ব)

শাটার ডায়ালের একটি সেটিং। এই সেটিংয়ে শাটার যতক্ষণ টিপে রাখা হয় শাটার ততক্ষণ খোলা থেকে আলোকপাত করে।

বিটউইন দ্য লেন্স শাটার

যে শাটার লেন্স এলিমেন্টের মাঝখানে ব্যবহার করা হয়। এই শাটারের সর্বোচ্চ দ্রুতি ১/৫০০ সেকেণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। লিফ বা ব্লেড-টাইপ এই শাটার মাঝখান থেকে খুলতে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ খোলে এবং বন্ধ হয়। এর সমস্ত দ্রুতিতেই ফ্ল্যাশগান ব্যবহার করার সুবিধা পাওয়া যায়।

বিল্ট-ইন মিটার

ক্যামেরার অভ্যন্তরে ব্যবহৃত আলোর মিটার, যা বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো অনুসারে আলোকপাতের পরিমাণ ও সময় নির্দেশ করে। ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডারেও এই নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়।

বিহাইণ্ড দ্য লেনস মিটার

রিফ্লেক্স ক্যামেরায় লেন্সের ঠিক পিছনে যে আলোর মিটার ব্যবহার করা হয়। বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে এসে মিটারে রিডিং দেয়। ফলে সাধারণ মিটার অপেক্ষা অধিকতর সঠিক নির্দেশ পাওয়া যায়।

বেলো

ক্যামেরা ও লেন্সের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য চামড়া বা কাপড়ে তৈরি আলোক প্রতিরোধী প্রসারণযোগ্য চোঙা। ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফিতে এই বেলোর সাহায্যে লেনস থেকে ফোকসতলের দূরত্ব বাড়ানো যায়। দূরত্ব ইচ্ছেমত কমানো বা বাড়ানো যায় বলে এক্সটেনশন রিং অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধাজনক।

বেস

ফিল্ম বেস দ্রষ্টব্য

ব্যাটারি

বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চিত বা সংগৃহীত রাখার আধার বা সেল ।

ব্যারেল ডিস্টর্শন

কার্ভিলিনিয়র ডিস্টর্শন দ্রষ্টব্য।

ব্রডলাইটিং

প্রতিকৃতি তোলার জন্য আলোকসম্পাতের একটি পদ্ধতি। প্রধান আলোক উৎসটি

এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যাতে ক্যামেরার সামনে মুখাবয়বের সমগ্র অংশটুকু উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হয়। সাধারণত লম্বা মুখাবয়বকে অপেক্ষাকৃত চওড়া দেখাবার জন্য এই প্রকার আলো ব্যবহার করা হয়।

ব্লাইণ্ড

ভিউফাইণ্ডারের চারপাশ থেকে অপ্রয়োজনীয় আলো যাতে ভিউফাইণ্ডারে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা। সাধারণত আইপীসে ব্যবহার করা হয়। বিক্ষিপ্ত আলো প্রবেশ করে ভিউফাইণ্ডারের দৃশ্য যাতে অস্পষ্ট অথবা আলোর মিটারে যাতে ভুল রিডিং না দেয় তার জন্য এই ব্লাইণ্ড-এর ব্যবহার ।

ব্লো-আপ

বিবর্ধিত করে মুদ্রণ। এনলার্জমেন্ট নামেও পরিচিত।

ভিউইং স্ক্রীন

ক্যামেরায় লেন্সের কৌণিকক্ষেত্র অনুযায়ী প্রতিচ্ছবি দেখার বা ফোকস করার জন্য ঘষা কাঁচ। ফোকসিং স্ক্রীন বা গ্রাউণ্ডগ্লাস নামেও পরিচিত।

ভিউ ক্যামেরা

ষ্ট্যাণ্ডে বসিয়ে ব্যবহার করার উপযোগী বড় ফর্ম্যাটের ক্যামেরা। ফোকসতলে গ্রাউণ্ডগ্লাসের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি দেখে ফোকস করা হয়।

ভিনিয়েটিং

মুদ্রণের একটি বিশেষ পদ্ধতি। প্রতিচ্ছবির মাঝের অংশ ঠিক রেখে চারপাশ ক্রমশঃ হালকা ও অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়।

ভোল্টেজ রেগুলেটর/ষ্টেবিলাইজার

বিবর্ধক যন্ত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঠিক রাখার জন্য ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। রঙীন ছবি মুদ্রণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। আলোকের বর্ণতাপমাত্রার তারতম্যের ফলে ছবিতে রঙের ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য এই নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়।

ভ্যারিয়েবল ফোকস লেন্স

জুম লেন্স দ্রষ্টব্য।

ভ্যালু

কালো-সাদা ছবিতে ধূসরতার মাত্রা বোঝাবার জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ছবিতে সাদা ও কালোর মধ্যবর্তী ধূসরতার কয়েকটি মাত্রা বা ভ্যালুর ওপর নির্ভর করেই জোন পদ্ধতিতে ছবি তোলা হয়ে থাকে।

মডেলিং

আলোক-উৎসের কৌণিক অবস্থান এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে প্রতিচ্ছবিতে বস্তুর

গভীরতা বা বেধের বিভ্রম সৃষ্টি করা যায়। আলোকসম্পাতের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক ছবিতে ত্রিমাত্রিক বোধ আনাই মডেলিংয়ের উদ্দেশ্য।

মনোবাথ

সাদা-কালো ফিল্ম পরিস্ফুটন ও স্থায়ীকরণের একটি একক দ্রবণ, যাতে পরিস্ফুটন ও স্থায়ীকরণের উপাদান একই সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। পদ্ধতিটি সরল তবে এই মিশ্রণ অত্যন্ত সাবধানে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পরিস্ফুটনের কাজ সম্পন্ন হবার পরই স্থায়ীকরণ শুরু হয়। সময় একটু কম লাগলেও পরিস্ফুটন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

মাইক্রোফিল্ম/মাইক্রোফিচ্

অত্যন্ত উচ্চ বৈষম্যের এই ফিল্মের দানা অতি সূক্ষ্ম এবং অবদ্রবের প্রলেপ অত্যন্ত পাতলা করা হয় যার ফলে এই ফিল্মের অনুপুঙ্খ ধরার ক্ষমতা খুব বেশি। সাধারণত দলিল দস্তাবেজ বা বইয়ের লেখা অল্প স্থানে সংরক্ষণের জন্য এই ফিল্মের ব্যবহার। মাইক্রোফিল্ম সাধারণত ১৬ ও ৩৫ মি. মি. আকারে পাওয়া যায়। বইয়ের পৃষ্ঠাগুলির পাশাপাশি সারিবদ্ধ ছবি তোলা যায় মাইক্রোফিচ্ শিট ফিল্মে। একটি ৪″ × ৫″ মাপের ফিল্মে সাধারণ বইয়ের দুশোরও বেশি পৃষ্ঠার ছবি তুলে রাখা সম্ভব।

মাইক্রোফোটোগ্রাফি

অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারে ছবি তোলা। সাধারণত দলিল-দস্তাবেজ বা বইয়ের লেখা ফোটোগ্রাফে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই ছবি দেখতে হয় মাইক্রোফিল্ম রিডারের সাহায্যে। ফোটোমাইক্রোগ্রাফি দ্রষ্টব্য।

মাল্টিকন্ট্রাস্ট পেপার

বিশেষ ধরনের মুদ্রণের কাগজ যাতে বিভিন্ন ঘনত্বের ম্যাজেন্টা ও হলুদ ফিলটারের সাহায্যে ছবির বৈষম্যের তারতম্য করা যায়। ভ্যারিয়েবল কনট্রাস্ট পেপার নামেও পরিচিত।

মালটিকোটেড লেন্স

কোটেড লেন্স দ্রষ্টব্য।

মাল্টিপল্ ইমেজ

একই ফিল্মে একাধিক বার আলোকপাতের মাধ্যমে অথবা মাল্টিপল্ ইমেজ লেন্সের সাহায্যে একই বস্তুর একাধিক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি।

মাস্কিং

নেগেটিভের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি। সাধারণত অর্ধস্বচ্ছ বা অনচ্ছ কোন বস্তু ব্যবহার করে প্রতিচ্ছবির অংশ বিশেষে—কালো-সাদা ছবির টোন ও রঙীন ছবির সম্পৃক্তির—পরিবর্তন করা হয়। মাল্টিপল্ এক্সপোজার বিশিষ্ট ছবির ক্ষেত্রে অংশবিশেষ

মাস্কিং করেও ছবি তোলা যেতে পারে। রুবিলিথ্ নামে লাল রঙের স্বচ্ছ ফিল্ম বিবর্ধনের সময় ব্যবহার করেও প্রিন্টের অংশবিশেষ চাপা দেওয়া হয়ে থাকে।

মিড্‌ল টোন

সাধারণ সাদা-কালো ছবির মধ্যবর্তী ধূসরতার মাত্রা অথবা পোস্টারাইজেশন ছবির অন্তর্বর্তী ধূসরতা।

মিরর লেন্‌স

যে লেন্‌সের আভ্যন্তরীণ গঠনে আয়না ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের বেশির ভাগ লেনসে প্রতিফলন ও প্রতিসরণ উভয় পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয় এবং এই লেন্‌স 'ক্যাটাডাইঅপট্রিক' বা 'মিরর টেলিফোটো' লেনস নামেও পরিচিত। সাধারণত ছোট আকারের মধ্যে অত্যধিক ফোকস দৈর্ঘের লেন্‌স তৈরির জন্যই আয়নার ব্যবহার, তবে এই লেন্‌স দৈর্ঘে কম করা গেলেও এর প্রস্থ বেশি হয়। লেন্‌স ব্যারেলের মধ্যে ওপরে নিচে প্রতিচ্ছবিকে কয়েকবার প্রতিফলিত করে ফিলমের ওপর ফেলা হয়, তবে আয়না ব্যবহারের জন্য ফোকস গভীরতা খুব কমে যায়।

মিরেড

মাইক্রো রেসিপ্রোকাল ডিগ্রির নামসংক্ষেপ যার সাহায্যে আলোর বর্ণতাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। উৎসের তাপমাত্রা অনুসারে আলোর গুণমান স্থির করার জন্য যে কেলভিন ডিগ্রি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, সেই সংখ্যা দিয়ে দশলক্ষকে ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় তাই হল আলোর মিরেড সংখ্যা।

মেটালিক সিলভার

আলোকিত যে সিলভার হ্যালাইড কণাগুলি পরিস্ফুটনের ফলে কালো ধাতব সিলভারে পরিণত হয়ে প্রতিচ্ছবিকে দৃষ্টিগোচর করে তোলে।

মোটর ড্রাইভ

ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ফিলম দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাটারিচালিত যান্ত্রিক পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ফিলম এগিয়ে গিয়ে পর পর ছবি উঠতে থাকে। মোটর ড্রাইভ-যুক্ত ক্যামেরায় অধিক পরিমাণ ফিল্‌ম ব্যবহার করার ব্যবস্থাও রাখা হয়।

ম্যাক্রোফোটোগ্রাফি

মাইক্রোস্কোপের সাহায্য ছাড়া বস্তুর চেয়ে বড় আকারের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় যে ফোটোগ্রাফিতে তাকে ম্যাক্রোফোটোগ্রাফি বলা হয়। সাধারণত বস্তু অপেক্ষা দশগুণ পর্যন্ত বড় আকারের প্রতিচ্ছবি এই ফোটোগ্রাফির অন্তর্গত।

ম্যাক্রো লেন্‌স

ম্যাক্রোফোটোগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত লেন্‌স। এই লেন্‌সের সাহায্যে অত্যন্ত কাছের বস্তুর

ছবি—ক্লোজ-আপ থেকে দশগুণ বড় প্রতিচ্ছবি পর্যন্ত—খুব ভালভাবে পাওয়া যায়। যদিও এই লেন্সের সাহায্যে সাধারণ ছবিও তোলা যায় তবে তার মান তেমন ভাল হয় না। এই লেন্স এমনভাবে তৈরি যাতে লেন্স থেকে বস্তু দূরত্ব অপেক্ষা লেন্স থেকে প্রতিচ্ছবি দূরত্ব বেশি হলে তবেই অনুপুঙ্খ ভালভাবে ধরা পড়ে।

ম্যাগ্নিফায়ার

প্রতিচ্ছবিকে ভালভাবে দেখে ফোকস করার জন্য রিফ্লেক্স ক্যামেরায় ব্যবহৃত আতস কাঁচ। বড় আকারের ভিউ ক্যামেরাতে ছবি তোলার কাজেও এই যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়।

ম্যাগ্নিফিকেশন

বস্তু ও তার প্রতিচ্ছবির আয়তনের সম্পর্ক। লেন্স থেকে বস্তু দূরত্ব এবং লেন্স থেকে প্রতিচ্ছবি দূরত্ব এই দুইয়ের অনুপাত বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার। বস্তু দূরত্ব ও প্রতিচ্ছবি দূরত্ব সমান হলে ম্যাগ্নিফিকেশন বলা হয় ১:১ বা লাইফ সাইজ। প্রতিচ্ছবি দূরত্বকে বস্তু দূরত্ব দিয়ে ভাগ করলে বিবর্ধনের অনুপাত পাওয়া যাবে। অপরদিকে প্রতিচ্ছবির মাপকে বস্তুর মাপ দিয়ে ভাগ করলেও একই অনুপাত হবে। ১০ মি. মি. বস্তুর প্রতিচ্ছবি ২০ মি. মি. হলে বিবর্ধনের অনুপাত হবে ২০÷১০=২ বা ২:১। উভয় ক্ষেত্রেই ফর্মুলা M=I/S যখন M= ম্যাগ্নিফিকেশন, I=ইমেজ দূরত্ব এবং S=সাবজেক্ট দূরত্ব বা মাপ। নেগেটিভ ও তার প্রিন্টের মাপের অনুপাত বোঝাতেও শব্দটির প্রয়োগ হয়।

ম্যাগাজিন

ক্যামেরাতে অধিক পরিমাণ ফিল্ম ব্যবহার করার জন্য ব্যবহৃত কার্ট্রিজ। সাধারণত মোটর ড্রাইভ-যুক্ত ক্যামেরাতে ফিল্ম ম্যাগাজিন ব্যবহার করা হয়।

ম্যাজেন্টা

রঙীন প্রিন্ট বা স্লাইড প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত তিনটি প্রাথমিক ডাইয়ের একটি। অপর দুটি সবুজাভ-নীল ও হল্দে।

ম্যাট

মুদ্রণের কাগজের উপরিভাগ সাধারণত গ্লসি অথবা ম্যাট হয়ে থাকে। ম্যাট কাগজের প্রিন্ট গ্লসি কাগজের প্রিন্টের মত উজ্জ্বল ও গভীরতাসম্পন্ন হয় না। অনুজ্জ্বল ও হালকা ছবি মুদ্রণের জন্য ম্যাট কাগজ বিশেষ উপযোগী।

রিজল্ভিং পাওয়ার

লেন্স বা আলোক-সংবেদনশীল বস্তুর (অবদ্রবের) অনুপুঙ্খ ধরার ক্ষমতা। ফোটোগ্রাফিতে প্রতিচ্ছবির মান নির্ভর করে এই ক্ষমতার ওপর । এক বর্গ মিলিমিটার স্থানে যত সংখ্যক সূক্ষ্ম রেখাকে পরিষ্কার ও স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায় তার সাহায্যেই লেন্স বা অবদ্রবের রেজলিউশান বোঝানো হয়ে থাকে। রেজলিউশান-এর পরিমাপকেই রিজল্ভিং পাওয়ার বলা হয়।

রিডিউসিং এজেন্ট

পরিস্ফুটনের দ্রবণে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান, যা আলোকিত সিলভার হ্যালাইড কণাগুলিকে কালো ধাতব সিলভারে পর্যবসিত করে। মেটল, হাইড্রোকুইনন, ফেনিডোন ইত্যাদি রিডিউসিং এজেন্ট।

রিপ্লেনিশমেন্ট

ব্যবহৃত আলোকরাসায়নিক দ্রবণের কর্মক্ষমতার মান বজায় রাখার জন্য নতুন দ্রবণ যোগ করা। পরিস্ফুটনের ফলে দ্রবণের কর্মক্ষমতা হ্রাস পেলে, ব্যবহৃত দ্রবণের কিয়দংশ ফেলে দিয়ে পরিমাণ মত নতুন, বিশুদ্ধ দ্রবণ যোগ করে এই মান ঠিক রাখা হয়। বিশেষভাবে প্রস্তুত রিপ্লেনিশারের সাহায্যে দ্রবণের কর্মক্ষমতা অনেক বাড়ে।

রিফ্লেকটেড লাইট মিটার

বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোক পরিমাপ করার মিটার। ক্যামেরার মধ্যে যে মিটার ব্যবহার করা হয় তা এ-ধরনের মিটার। বস্তুর বিভিন্ন অংশ অনুসারে আলোকের প্রতিফলন বিভিন্ন হয়ে থাকে, সুতরাং বস্তুর যে অংশ থেকে এই পরিমাপ করা হয়, তা ঠিক সেই নির্দিষ্ট অংশের আলোক প্রতিফলনের নির্দেশক। আপতিত আলোকের পরিমাপ করার জন্য যে মিটার ব্যবহার করা হয় তা ইনসিডেন্ট লাইট মিটার নামে পরিচিত। লাইট মিটার দ্রষ্টব্য।

রিফ্লেকশন

সমতল ও চকচকে বস্তুর ক্ষেত্রে আলোকরশ্মির আপতন ও প্রতিফলন কোণ একই থাকে। অসমতল ও অনুজ্জ্বল বস্তুর দ্বারা আলো বিক্ষিপ্ত ও ঝাপসা ভাবে প্রতিফলিত হয়।

রিফ্লেক্স ক্যামেরা

প্রতিচ্ছবিকে আয়নার সাহায্যে ভিউফাইণ্ডারে প্রতিফলিত করে দেখার ও ফোকস করার ব্যবস্থাযুক্ত ক্যামেরা। ৪৫° কৌণিক অবস্থানে রাখা আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে প্রতিচ্ছবি উপরের ভিউফাইণ্ডারে বিপ্রতীপভাবে পড়ে। পেন্টাপ্রিজম যুক্ত এস. এল. আর. ক্যামেরায় প্রতিচ্ছবিকে পুনরায় প্রতিফলিত করে এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

রিভার্সাল

বিশেষভাবে প্রস্তুত সাদা-কালো বা রঙীন ফিল্ম অথবা কাগজ যা পরিস্ফুটনের পর পজিটিভ প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। ট্রান্সপেরেন্সি দ্রষ্টব্য।

রিলেটিভ অ্যাপারচার

এফ নাম্বার দ্রষ্টব্য।

রিসাইক্লিং টাইম

একবার ফ্ল্যাশ করার পর, ব্যাটারি থেকে পুনরায় পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশলাইটের যে সময় লাগে। পুনরায় শক্তি সংগৃহীত হলেই ইউনিটে একটি আলো

(রেডিলাইট) জ্বলে উঠে ফের ফ্ল্যাশ করার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। ব্যাটারির শক্তি কমে গেলে রিসাইক্লিংয়ের সময় কুড়ি বা পঁচিশ সেকেণ্ডেরও বেশি লাগে।

রেকর্ডিং ফিল্ম

অতি উচ্চ দ্রুতির ফিলম যা অত্যন্ত কম আলোয় ব্যবহার করার জন্য।

রেঞ্জফাইণ্ডার

ফোকসিং পদ্ধতি,যার সাহায্যে ক্যামেরা থেকে বস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করা যায়। লেন্স থেকে বস্তু দূরত্বের তারতম্য অনুযায়ী লেন্সে পতিত আলোকরশ্মির অভিসারী কোণেরও তারতম্য হয়। এই কোণের মাপ অনুসারে বস্তু দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়। কাপ্‌লড্‌ রেঞ্জফাইণ্ডারও একই পদ্ধতিতে কাজ করে, শুধু ক্যামেরা-লেনসটিকে রেঞ্জফাইণ্ডারের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত করা থাকে যাতে ফোকসিংয়ের সময় লেন্‌সটিও একই সঙ্গে কাজ করে।

রেটিকুলেশন

পরিস্ফুটনের সময় তাপমাত্রার অতিরিক্ত তারতম্য ঘটলে অথবা দ্রবণে ক্ষার-বা অম্ল-রাসায়নিকের মাত্রা বেশি বৃদ্ধি পেলে ফোটো-অবদ্রবে যে নিয়মিত কুঞ্চন দেখা দেয় তা রেটিকুলেশন নামে পরিচিত। এটি যদিও পরিস্ফুটনের একটি ত্রুটি, তবু অনেকে ডুপ্লিকেট নেগেটিভ পরিস্ফুটনের সময় খুব ঠাণ্ডা ও মাঝারি গরম জলে পরপর ডুবিয়ে নেগেটিভ রেটিকুলেট করে নেন। তখন এই নেগেটিভ থেকে মুদ্রণ করলে মোজেইক ধাঁচের ছবি পাওয়া যায়।

রেডিল্যাইট

গ্লো লাইট দ্রষ্টব্য।

রেফারেন্স স্ট্রিপ

নেগেটিভের অংশ বিশেষের রঙীন প্রিন্ট যা দেখে চূড়ান্ত মুদ্রণের সময় সঠিক রঙের জন্য ফিল্‌টারের ঘনত্ব স্থির কবা হয়।

রেসিপ্রোসিটি ফেলিওর

আলোকপাতের একটি সুনির্দিষ্ট দ্রুতির মধ্যে সঠিক ভাবে কাজ করার উপযোগী করেই ফোটো-অবদ্রব প্রস্তুত করা হয়। আলোকপাত এই নির্দিষ্ট দ্রুতির বাইরে হলে অবদ্রবের রেসিপ্রোসিটি ফেল করে অর্থাৎ ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। রঙীন ফিল্মের ক্ষেত্রে রঙের ভারসাম্য একেবারেই থাকে না। আমরা যে সাধারণ রঙীন ডেলাইট ফিল্ম ব্যবহার করি তা ১/১০ সেকেণ্ড বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য আলোকপাতের উপযোগী করে তৈরি। এই ফিল্মের দ্রুতি অনুযায়ী আলোকপাতের সময় যদি ২ সেকেণ্ড বা ৪ সেকেণ্ড করতে হয় তবে রেসিপ্রোসিটি ফেলিওর হবে। তাই পেশাদারী কাজের প্রয়োজনে দু-ধরনের রঙীন নেগেটিভ ফিলম প্রস্তুত করা হয়—টাইপ-এস যা ১/১০ সেকেণ্ড বা

তার চেয়ে বেশি সময় আলোকপাত করার উপযুক্ত ও টাইপ-এস যা ১/১০ সেকেণ্ড বা তার চেয়ে কম সময় আলোকপাত করার জন্য।

রেস্ট্রেনার

পরিস্ফুটন-দ্রবণের একটি রাসায়নিক উপাদান, যা অনালোকিত সিলভার_হ্যালাইড দানাগুলিকে অপরিবর্তিত রাখতে সাহায্য করে ও রাসায়নিক ফগও প্রতিরোধ করে। পরিস্ফুটকে এজন্য পটাশিয়ম ব্রোমাইড ব্যবহার করা হয়।

রোটেটিং প্রিজম

রেঞ্জফাইণ্ডার পদ্ধতিতে ফোকস করার জন্য যে প্রিজমাকৃতি লেন্স ব্যবহৃত হয়।

র‍্যাডিয়েন্ট লাইট

সোজাসুজি উৎস থেকে যে আলো ব্যবহার করা হয়। অপ্রতিফলিত সূর্যালোক বা ফোটোফ্লাড, ফ্ল্যাশলাইট প্রভৃতির আলোকে র‍্যাডিয়েন্ট লাইট বলা যেতে পারে।

র‍্যাপিড ডেভেলাপার

স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত ফিল্ম-পরিস্ফুটনের জন্য যে পরিস্ফুটক ব্যবহার করা হয়। ফলস্বরূপ ফিল্মের কণাময়তা ও বৈষম্য উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

লং ফোকস লেন্স

যে লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ ব্যবহৃত ক্যামেরা/ফিল্ম ফর্ম্যাটের কোনাকুনি মাপ অপেক্ষা বেশি। ন্যারো অ্যাঙ্গল বা টেলিফোটো লেন্স নামেও পরিচিত।

লাইট ব্যালেন্সিং ফিল্টার

একটি নির্দিষ্ট বর্ণতাপমাত্রার উপযুক্ত রঙীন ফিল্ম অন্য বর্ণতাপমাত্রার আলোয় ব্যবহার করার জন্য যে ফিল্টারের প্রয়োজন হয়। যেমন, ডেলাইট ফিল্ম ভোর বা সন্ধ্যার লাল আলোয় ব্যবহার করতে হলে এই ফিল্টার দ্বারা ফিল্মের সঙ্গে আলোর সমতা আনা হয়।

লাইট মিটার

ফোটোইলেকট্রিক মাপনযন্ত্র যার সাহায্যে বস্তুর ওপর আপতিত বা বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর পরিমাপ করা যায়। ফোটোগ্রাফির জন্য লাইট মিটার তিন ধরনের হয়ে থাকে — ক্যামেরার অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য, আলাদা ভাবে হাতে ধরে আলো পরিমাপ করার জন্য ও মিটারকে বাইরে থেকে ক্যামেরার সঙ্গে যুক্ত করে পরিমাপ করার জন্য। সেলেনিয়ম সেল, ক্যাডমিয়ম সালফাইড সেল (CdS) অথবা ছোট ব্যাটারির দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের ডায়োডের সাহায্যে লাইট মিটারগুলিতে শক্তি যোগানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি সেল আলোককে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে একটি নিড্‌লকে চালনা করে বা কয়েকটি লাইট এমিটিং ডায়োডকে সক্রিয় করে আলোক পরিমাপ করে। এই মিটার এক্সপোজার মিটার নামেও পরিচিত।

লাইন ফিল্ম

যে ফিল্মের ওপর ছবি তুললে কালো ও সাদা ছাড়া অন্য কোনো মধ্যবর্তী টোন থাকে না। প্রোসেস ক্যামেরার সাহায্যে, সাধারণ কাগজে ছাপার জন্য, ব্লক তৈরির উদ্দেশে, অথবা অফসেট বা সিল্ক স্ক্রীন মুদ্রণের জন্যই এর ব্যবহার। কালিকলমের টোনবিহীন রেখাচিত্র অথবা টোনযুক্ত যে কোন ছবি বা অঙ্কন এই ফিল্মের সাহায্যে রৈখিক প্রতিচ্ছবিতে আনা যায়। যে ফিল্ম নেগেটিভ ও পজিটিভ দু ধরনের অবদ্রবযুক্ত তাকে বলা হয় কনট্যুর লাইন ফিল্ম। সাধারণ পরিস্ফুটনে এর আলোকিত ও ছায়াবৃত অংশ ঘন হয় এবং মধ্যবর্তী টোন হালকা থাকে। এই ফিল্মে ছবি তুললে হাতে আঁকা সাদা-কালো রেখাচিত্রের মত দেখায়। ইকুইডেনসিটি ফিল্ম নামেও পরিচিত। পোষ্টারাইজেশনের কাজেও এই ফিল্মের ব্যবহার ঘটে।

লার্জ ফর্ম্যাট ক্যামেরা

যে সমস্ত ক্যামেরায় ৪″ × ৫″, ৮″ × ১০″ বা তার চেয়েও বড় আকারের প্লেট বা শিট ফিল্ম ব্যবহার করে ছবি তোলা হয়। এই বৃহদাকার ক্যামেরা স্টুডিওয় ব্যবহারের জন্য এবং অধিকাংশই ভিউ ক্যামেরা। বৃহদাকার নেগেটিভের জন্য বড় আকারের কনট্যাক্ট প্রিন্ট পাওয়া বা প্রায় কণাহীন বিবর্ধন সম্ভব হয়।

লিথ্ ফিল্ম

অর্থোক্রোমেটিক, পাতলা অবদ্রবের, অত্যন্ত উচ্চ বৈষম্যের ফিল্ম যা লিথ্ ডেভেলাপারে পরিস্ফুটন করা হয় এবং শুধুমাত্র পরিষ্কার সাদা ও ঘন কালোতে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। টোনযুক্ত যে কোন ছবিকে লিথ্ ফিল্মে কপি করে টোনবিহীন সাদা-কালো ছবিতে পরিণত করা যায়। সাধারণত ছাপাখানার কাজের জন্য এর প্রচলন হলেও ফোটোগ্রাফাররা ছবিতে বিশেষ এফেক্ট সৃষ্টির জন্য কখনো কখনো এর সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। গ্রাফিক আর্টস ফিল্ম নামেও পরিচিত।

লেন্স

আলোকে প্রতিসরিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কাঁচ বা প্লাষ্টিকের অপটিক্যাল এলিমেন্ট। ফোটোগ্রাফিক লেন্স এক বা একাধিক এলিমেন্ট যুক্ত করে তৈরি করা হয়। সরল লেন্স মূলগত ভাবে দু ধরনের : অভিসারী ও অপসারী। অভিসারী লেন্স উত্তল যা আলোকরশ্মিগুলিকে লেন্সের অক্ষরেখা অভিমুখী করে। আর অপসারী বা প্রতিসারী লেন্স অবতল যা আলোকরশ্মিগুলিকে অক্ষরেখা হতে বহির্মুখী করে। উত্তল ও অবতল দু ধরনের লেন্স সহযোগেই যৌগিক লেন্স প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করার জন্য লেন্সকে অভিসারী হতেই হবে।

লো-কনট্রাস্ট ডেভেলাপার

নেগেটিভের বৈষম্য কমানোর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত পরিস্ফুটনের দ্রবণ। অত্যন্ত উচ্চ বৈষম্যযুক্ত আলোয় তোলা ফিল্মকে এই দ্রবণে পরিস্ফুটিত করে প্রতিচ্ছবির বৈষম্য

কমানো যেতে পারে। মেটল-এর সঙ্গে শুধুমাত্র সালফাইট যুক্ত করে যে ডেভেলাপার প্রস্তুত করা হয় তা এই কাজের উপযুক্ত।

লোকালাইজড ডেভেলাপমেন্ট

প্রিন্টের ক্ষেত্রে অংশবিশেষ পরিস্ফুটনের পদ্ধতি। প্রিন্টের অংশ বিশেষের সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ঐ অংশে আলাদাভাবে পরিস্ফুটন দ্রবণ ব্যবহার করে অথবা ঐ স্থানে আঙুলের সাহায্যে দ্রবণ ঘর্ষণ করে পরিস্ফুটনের এই তারতম্য করা যেতে পারে। মুদ্রণের কাগজে আলোকপাতের পর পবিস্ফুটন দ্রবণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করে ছবিতে নানা রকম এফেক্ট সৃষ্টি করা সম্ভব। সিলেকটিভ ডেভেলাপমেন্ট নামেও পরিচিত।

লো-কি

যে ফোটোগ্রাফে দু-একটি সামান্য সাদা হাইলাইট ছাড়া ঘন কালো টোনেরই প্রাধান্য থাকে। ছবিতে কঠোরতা, বিষণ্ণতা ইত্যাদি বোঝানোর জন্য লো-কি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ল্যাটিচুড

ফোটোগ্রাফিক অবদ্রবে যতখানি মাত্রার মধ্যে আলোকপাতের তারতম্যে গ্রহণযোগ্য ভাবে ছবি পাওয়া যায়। অবদ্রবের বৈশিষ্ট্যের ওপর ল্যাটিচুডের মাত্রা নির্ভর করে। অধিক দ্রুতির ফিল্মের ল্যাটিচুড স্বল্প দ্রুতির ফিল্ম অপেক্ষা বেশি। একটি ৪০০ এ. এস. এ. ফিল্মে ১/১২৫ সেকেণ্ডে এফ-১১ আলোকপাতের সঠিক মান হলে একই সময়ে এফ-৮ বা এফ-১৬-তে ছবি পেতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু ৬৪ এ. এস. এ. ফিল্মে এক ষ্টপ বেশি বা কম আলোকপাতে ঠিক ছবি পাওয়া মুশকিল। মুদ্রণের কাগজের ক্ষেত্রে সফ্‌ট কাগজের ল্যাটিচুড হার্ড কাগজ অপেক্ষা বেশি। ৪০০ এ. এস. এ. ফিল্মে পাঁচ ষ্টপ পর্যন্ত ল্যাটিচুড পাওয়া যায়।

ল্যাটেন্ট ইমেজ

আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে সিলভার হ্যালাইড কণাগুলির পরিবর্তন ঘটে যা চোখে দেখা যায় না। এই পরিবর্তিত কিন্তু অদৃশ্য হ্যালাইড কণাগুলি পরিস্ফুটনের পর দৃশ্যগোচর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট ঐ অদৃশ্য প্রতিচ্ছবিই ল্যাটেন্ট ইমেজ বা লীন প্রতিচ্ছবি।

ল্যান্টার্ন স্লাইড

ট্রান্সপেরেন্সি বা রিভার্সাল ফিল্ম প্রোজেকটরে ব্যবহারোপযোগী করে মাউন্ট করার পর তাকে অনেকে ল্যান্টার্ন স্লাইড বলে অভিহিত করেন।

শর্ট ফোকস লেন্স

যে লেন্সের ফোকস দৈর্ঘ ব্যবহৃত ক্যামেরা/ফিল্ম ফর্ম্যাটের কোনাকুনি মাপ অপেক্ষা

কম। এই লেনসের প্রতিচ্ছবি গ্রহণের কৌণিক ক্ষেত্র তুলনামূলক ভাবে বেশি। ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনস নামেও পরিচিত।

শাটার সিস্টেম

ক্যামেরার মধ্যে স্থাপিত সংবেদনশীল ফিল্মের ওপর আলোকপাতের সময় নিয়ন্ত্রণ করার যান্ত্রিক পদ্ধতি। সাধারণত দু ধরনের শাটার বর্তমানে ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয় : বিটউইন-দ্য-লেনস ডায়াফ্রাম শাটার ও ফোকল প্লেন শাটার।

শার্পনেস

প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা বোঝাবার জন্য শব্দটির ব্যবহার। অ্যাকুটেন্স দ্রষ্টব্য।

শ্যাডো এরিয়া

প্রতিচ্ছবির স্বল্পালোকিত বা ছায়াবৃত অংশ। যে প্রতিচ্ছবিতে একই সঙ্গে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ও যথেষ্ট ছায়াযুক্ত অংশ থাকে, তাতে প্রায়শই সমগ্র অংশের অনুপুঙ্খ ভালভাবে ধরা পড়ে না। উভয় অংশের অনুপুঙ্খযুক্ত প্রতিচ্ছবিই ভাল ছবি হিসাবে গণ্য।

স্টপ ডাউন

ক্যামেরা বা বিবর্ধক যন্ত্রের লেনসের অ্যাপারচারকে স্টপ বলে উল্লেখ করা হয়। অ্যাপারচারকে ছোট করে আলোক প্রবেশের পরিমাণ কমানোকে স্টপ ডাউন বলে। লেনসকে স্টপ ডাউন করলে ফোকস গভীরতা বাড়ে।

স্টপ বাথ

রাসায়নিক দ্রবণ যা পরিস্ফুটকের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুটনের উপাদানকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। সাধারণত পরিস্ফুটনের পর এই দ্রবণটি ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত পরিস্ফুটন বন্ধ করা ও পরিস্ফুটকের অংশবিশেষ পরবর্তী রাসায়নিকের সংস্পর্শে এসে যে ক্ষতি করতে পারে তা প্রতিরোধ করা হয়। স্টপ বাথ তৈরি করা হয় গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে জল মিশিয়ে।

সফ্‌ট ফোকস লেনস

স্ফেরিক্যাল বা গোলীয় ত্রুটি-যুক্ত লেনস যা ব্যবহার করে প্রতিচ্ছবিকে সামান্য ঝাপসা ও নরম করা হয়। ছবি তোলার সময় অথবা মুদ্রণের সময় যে কোন ভাবেই প্রতিচ্ছবিকে নরম ও হালকা করা সম্ভব।

সাবট্র্যাক্‌টিভ প্রোসেস

যে মূল পদ্ধতিকে ভিত্তি করে বর্তমানে রঙীন ফোটোগ্রাফ গঠন করা হয় তা সাবট্র্যাক্‌টিভ বা বিযুত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সাদা থেকে নির্দিষ্ট রঙ তুলে নিয়ে বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি। এই পদ্ধতিতে যে তিনটি প্রাথমিক ফিল্টার ব্যবহৃত হয় তা হল ম্যাজেণ্টা,, সবুজাভ-নীল ও হলুদ। এই তিনটির সঠিক সম্মেলনে আলো থেকে সমস্ত রঙ শোষিত হয়ে কালোর সৃষ্টি হয়।

সাবট্র্যাক্টিভ ফিল্টারস

রঙীন কাঁচ, জিলেটিন বা অ্যাসিটেট শিটের ফিল্টার যা ব্যবহার করে সাদা আলোর অন্তর্গত কয়েকটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘের রশ্মি বিশোষণ করা হয়। রঙীন প্রিণ্টে রঙের সমতা আনার জন্য বিবর্ধক যন্ত্রে এই বিযুত ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। ছাপাখানার কাজেও এই ফিল্টার ব্যবহার করে তিনরঙা বা চাররঙা হাফটোন ছবির বিভিন্ন রঙ আলাদা করা যায়।

সায়ান

বিযুত পদ্ধতির তিনটি প্রাথমিক ডাইয়ের একটি। সায়ান বা সবুজাভ-নীল আলো থেকে লাল শোষণ করে নিয়ে লালবিহীন আলোকে সঞ্চারিত করে।

সিলভার ব্রোমাইড

ফোটোগ্রাফিক অবদ্রবে ব্যবহৃত আলোক-সংবেদনশীল সিলভার হ্যালাইড উপাদানের একটি। নেগেটিভ অবদ্রবে স্বল্প পরিমাণ সিলভার আয়োডাইডের সঙ্গে এই উপাদানটি ব্যবহার করা হয়। মুদ্রণের ব্রোমাইড বা ক্লোরো-ব্রোমাইড কাগজেও এর ব্যবহার প্রচলিত।

সিলভার হ্যালাইড

আলোক-সংবেদনশীল স্ফটিক যা ফোটোগ্রাফিক অবদ্রবে ব্যবহার করা হয়, যেমন সিলভার ব্রোমাইড সিলভার ক্লোরাইড বা সিলভার আয়োডাইড। আলোকের সংস্পর্শে হ্যালাইড কণাগুলি কালো ধাতব সিলভারে পরিণত হয়।

সেনজিটিভিটি

ফোটোগ্রাফিক অবদ্রবের ওপর আলোকের প্রতিক্রিয়া। যে অবদ্রবে যত কম আলোর সাহায্যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা যায় সেই অবদ্রব তত বেশি সেনজিটিভ বা সংবেদনশীল।

সেন্টার ওয়েটেড্ মিটার

অ্যাভারেজিং মিটার দ্রষ্টব্য

সেলুলয়েড

ফিল্মের অবদ্রবের ভূমি হিসাবে ব্যবহৃত। কাঠের মণ্ড বা তুলোর ফেঁসো প্রভৃতি থেকে সেলুলোজ সংগৃহীত হয় ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের সেলুলোজ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সেলুলয়েড বস্তু হিসাবে কঠিন, নমনীয় ও স্বচ্ছ হওয়ার দরুন ফিল্মের কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। ফিল্ম বেস দ্রষ্টব্য।

সোলারাইজেশন

মুদ্রণের সময় প্রতিচ্ছবির ছায়াবৃত অংশে অতিরিক্ত আলোকপাত করলে অবদ্রবের সিলভার ক্লোরাইড দেখতে অনেকটা ব্রোঞ্জের মত লাগে—এই ধরনের ছবিকেই প্রাথমিকভাবে সোলারাইজড় ছবি বলা হত। বর্তমানে সাধারণ আলোকপাতের পর

পরিস্ফুটনের মধ্য অবস্থায় পুনরায় আলোকপাত করে পরিস্ফুটন সম্পূর্ণ করার পদ্ধতি সোলারাইজেশন নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে যে ছবি পাওয়া যায় তা নেগেটিভ ও পজিটিভ প্রতিচ্ছবির মিশ্রণে এক অস্বাভাবিক ধরনের ছবি। স্যাবাটিয়র পদ্ধতিতেও অনেকটা এই ধরনের ছবি পাওয়া যায়।

স্যাবাটিয়র এফেক্ট

পরিস্ফুটনের পর অথবা পরিস্ফুটনের মধ্যপথে স্থায়ীকরণ না করে ধৌতকরণ ও নরম আলোর সাহায্যে খুব কম আলোকপাত করে পুনরায় পরিস্ফুটন করা হলে পজিটিভ ও নেগেটিভ মিশ্রিত যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তা স্যাবাটিয়র এফেক্ট নামে পরিচিত। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় বার আলোকপাতের ফলে আরও কিছু সিলভার হ্যালাইড পরিস্ফুটিত হয়ে এই মিশ্র প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। ফিল্ম বা কাগজ যে কোন ক্ষেত্রেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

স্পট মিটার

অ্যাভারেজিং মিটার দ্রষ্টব্য

স্পীড

ফোটোগ্রাফিক অবদ্রবের আলোকের প্রতি সংবেদনশীলতা। এই সংবেদনশীলতা সঠিক পরিমাপ করার জন্য এ. এস. এ., ডি. আই. এন., আই. এস. ও. প্রভৃতি এককের সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে মান বোঝানো হয়।

স্প্লিট ইমেজ

ফোকস করার বিশেষ পদ্ধতি, যা ভিউফাইণ্ডারের দ্বি-বিভক্ত প্রতিচ্ছবিকে এক করে সঠিক ফোকস নির্দেশ করে। ফোকসিং স্ক্রীনের তলায় দুটি অর্ধবৃত্তাকার বা কীলকাকৃতি কাঁচ খণ্ডকে ফোকসিং নবের সাহায্যে ঘুরিয়ে একই তলে এনে প্রতিচ্ছবির দুটি অংশকে এক করে এই কাজ করা হয়।

স্লাইড

ট্রান্সপেরেন্সির বিকল্প নাম।

স্লেভ ইউনিট

ফোটো ইলেকট্রিক সেলযুক্ত ফ্ল্যাশলাইট, যা তার ওপর উজ্জ্বল আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে। কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই এই স্লেভ ইউনিট ফ্ল্যাশ প্রয়োজনীয় স্থানে রেখে দেওয়া হয় এবং ক্যামেরার সঙ্গে ব্যবহৃত ফ্ল্যাশটির আলো এই ইউনিটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোকসম্পাত করে।

হাই কনট্রাস্ট ডেভেলাপার

উচ্চ বৈষম্যের প্রতিচ্ছবির জন্য যে পরিস্ফুটক ব্যবহার করা হয়। এই দ্রবণে পরিস্ফুটনের উপাদান হিসাবে থাকে শুধুমাত্র হাইড্রোকুইনন। কোডাকের এইচ. সি.-১১০ উচ্চ

বৈষম্যের ডেভেলাপার। লিথ্ ডেভেলাপার সর্বাপেক্ষা উচ্চ বৈষম্যের ডেভেলাপার যাতে লিথ ফিল্ম পরিস্ফুটন করা হয়।

হাই-কি

যে ছবিতে সামান্য মধ্যবর্তী টোন ছাড়া সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত হালকা টোনের প্রাধান্য। এই প্রকার ছবিতে ত্রিমাত্রিক বোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। কোমলতা, মাধুর্য প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করার জন্য হাই-কি পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়।

হাইপার ফোকল দূরত্ব

একটি লেনসকে অসীম দূরত্বে ফোকস করার পর নিকটতম যে দূরত্বের প্রতিচ্ছবি গ্রহণযোগ্যভাবে ফোকসের মধ্যে থাকে সেই দূরত্বকে হাইপার ফোকল দূরত্ব বলা হয়। লেনসকে ঐ নিকটতম দূরত্ব-বিন্দুতে—যাকে বলা হয় হাইপার ফোকল পয়েন্ট—ফোকস করা হলে ক্যামেরা ও হাইপার ফোকল পয়েন্টের মধ্যবর্তী অংশ থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত ফোকসের মধ্যে পাওয়া যাবে। ফিক্সড্ ফোকস লেন্সযুক্ত ক্যামেরা এই হিসাবে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে বলে এতে পাঁচ ফুট থেকে অসীম দূরত্বের ছবি ভালই পাওয়া যায়।

হাইপার সেনজিটাইজিং

আলোকপাতের পূর্বে অবদ্রবের সংবেদনশীলতা বাড়াবার প্রক্রিয়া। নিম্নলিখিত দ্রবণের সাহায্যে অবদ্রবের সংবেদনশীলতা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানো যায়—.৮৮০ আমোনিয়া ৩ মি. লি./বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ২৪ মি.লি./এর সঙ্গে জল মিশিয়ে ১ লিটার। সম্পূর্ণ অন্ধকারে এই দ্রবণে ফিল্ম বা প্লেট ডুবিয়ে নেবার পর দ্রবণ ঝরিয়ে নেওয়া হয় এবং ফিলম বা প্লেট দ্রুত শুকিয়ে যায়, তখন যত শীঘ্র সম্ভব তা ব্যবহার করা উচিত।

হাইপো

সোডিয়ম থিওসালফেটের প্রচলিত নাম। পরিস্ফুটনের পর প্রতিচ্ছবি স্থায়ীকরণের জন্য এই উপাদানটির ব্যবহার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ফিক্সার দ্রষ্টব্য।

হাইপো এলিমিনেটর

রাসায়নিক দ্রবণ যা অবদ্রব থেকে স্থায়ীকরণের উপাদান হাইপোকে সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত করে। সাধারণ জলে ধৌত করলে ফিল্ম ভালভাবেই হাইপোমুক্ত হয়। কিন্তু প্রিন্টকে জলে ধুয়ে হাইপোমুক্ত করা সময়সাপেক্ষ, সেজন্য সাধারণত প্রিন্টের ক্ষেত্রেই হাইপো এলিমিনেটর দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। এর সংগঠন এরূপ : .৮৮০ অ্যামোনিয়া ১০ মি.লি./ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ১০০ মি.লি./এর সঙ্গে জল মিশিয়ে ১ লিটার। এই মিশ্রণটি ব্যবহারের পূর্বে প্রস্তুত করা উচিত এবং প্রিন্ট দশ মিনিট মত এই দ্রবণে ধোয়া দরকার। প্রিন্ট এর চেয়ে বেশি সময় দ্রবণে থাকলে ছবির হাইলাইটের ঘনত্ব নষ্ট হয়।

হাইলাইট

প্রতিচ্ছবির সর্বাপেক্ষা আলোকিত অংশ। উজ্জ্বল আলোকিত অংশ এত বেশি আলো প্রতিফলিত করে যে সাধারণত হাইলাইটের অনুপুঙ্খ প্রতিচ্ছবিতে ধরা পড়ে না। আলোকিত ও ছায়াবৃত উভয় অংশের অনুপুঙ্খ সমেত ছবিকেই ভাল ছবি বলে গণ্য করা হয়।

হার্ডনার

রাসায়নিক দ্রবণ, পরিস্ফুটনের পর সিক্ত অবদ্রবকে যা শক্ত ও স্থায়ী থাকতে সাহায্য করে। এই তরল উপাদান আলাদাভাবে অথবা স্থায়ীকরণের দ্রবণের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত পটাশিয়ম বা ক্রোম অ্যালামের ব্যবহার প্রচলিত হলেও, এই কাজ অধিকতর দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য দ্রুতগতি পরিস্ফুটন-যন্ত্রে ফর্মালিনও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হার্ড পেপার

উচ্চ বৈষম্য সৃষ্টিকারী মুদ্রণের কাগজ।

হ্যাণ্ডহেল্ড মিটার

ক্যামেরার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন আলোক-পরিমাপক-মিটার, যা আলাদাভাবে হাতে ধরে আলো পরিমাপ করা হয়। লাইট মিটার দ্রষ্টব্য।

হ্যালেশন

ফিল্মের ওপর পড়া আলো ফিল্মের ভূমি থেকে বা ক্যামেরার অভ্যন্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে অবদ্রবে যে আবছায়া ভাব সৃষ্টি করে। এই আবছায়া ভাব প্রধানত হাইলাইটের চারপাশে ধরা পড়ে। হ্যালেশন প্রতিরোধ করার জন্য আধুনিক সমস্ত ফিল্মে হ্যালেশন-প্রতিরোধক-প্রলেপ (অ্যান্টি-হ্যালেশন-ব্যাকিং) ব্যবহার করা হয় যা অবদ্রবের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত আলোকরশ্মি শোষণ করে হ্যালেশন প্রতিহত করে।